মুসলিম বিশ্বের সুবিখ্যাত ও তথ্যনির্ভর অনন্য আকাইদ গ্রন্থ "শরহুল আকাইদিন নাসাফিয়্যাহ" "এর অনন্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ

সহজ শরহে আকাইদ

আরবী–বাংলা

দ্বিতীয় খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ মুজিবুল্লাহ কাসেমী
রচিত প্রসিদ্ধ শরাহ বয়ানুল ফাওয়াইদ অবলম্বনে

সহজ তরজমা, তাহকীক ও তাশরীহ

অনুবাদ সহযোগীতায়
মুফতী মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ
হাফেয মাওলানা আইউবুর রহমান

সম্পাদনা
হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
শাইখুল হাদীস
মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা।

আল - কাউসার প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার
১১, বাংলাবাজার ঢাকা।
ফোনঃ ৭১৬৫৪৭৭

পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০,,বাংলাবাজার ঢাকা।
মোবাঃ ০১৭১৬ ৮৫৭৭২৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَرُؤْيَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى بِمَعْنَى الْاِنْكِشَافِ التَّامِّ بِالْبَصَرِ . وَهُوَ مَعْنٰى اِثْبَاتِ الشَّيْءِ كَمَا هُوَ بِحَاسَّةِ الْبَصَرِ وَذٰلِكَ اَنَّا اِذَا نَظَرْنَا اِلَى الْبَدْرِ ثُمَّ اَغْمَضْنَا الْعَيْنَ فَلَا خَفَاءَ فِيْ اَنَّهُ وَاِنْ كَانَ مُنْكَشِفًا لَدَيْنَا فِي الْحَالَتَيْنِ لٰكِنَّ اِنْكِشَافَهُ حَالَ النَّظَرِ اِلَيْهِ اَتَمُّ وَاَكْمَلُ وَلَنَا بِالنِّسْبَةِ اِلَيْهِ حَالَةٌ مَخْصُوْصَةٌ . هِيَ الْمُسَمَّاةُ بِالرُّؤْيَةِ جَائِزَةٌ فِي الْعَقْلِ بِمَعْنٰى اَنَّ الْعَقْلَ اِذَا خُلِّيَ وَنَفْسَهُ لَمْ يَحْكُمْ بِاِمْتِنَاعِ رُؤْيَتِهِ مَالَمْ يَقُمْ لَهُ بُرْهَانٌ عَلٰى ذَالِكَ مَعَ اَنَّ الْاَصْلَ عَدَمُهُ وَهٰذِهِ الْقَدْرُ ضَرُوْرِيٌّ . فَمَنِ ادَّعَى الْاِمْتِنَاعَ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ

সহজ তরজমা

আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ অর্থাৎ চাক্ষুশভাবে পুরোপুরি বিকশিত হওয়া। তার উদ্দেশ্য, দৃষ্টিশক্তি দ্বারা বাস্তবসম্মতভাবে উপলব্ধি করা। কেননা আমরা যখন পূর্ণিমা চাঁদের প্রতি তাকাই, অতঃপর চোখ বন্ধ করে ফেলি, তখন এ নিয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। যদিও উভয় অবস্থায় আমাদের নিকট চাঁদ প্রস্ফুটিত (স্পষ্ট প্রতিভাত) হয়ে উঠে। তদুপরি তার প্রতি দৃষ্টিপাত করার সময় অধিক প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে। সে হিসেবে আমাদের বিশেষ এক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যার নাম رؤية বা দর্শন লাভ। তা বিবেক গ্রাহ্য (যুক্তিসম্মত)। অর্থাৎ বিবেককে যদি মুক্ত-স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে সে এর অসম্ভাব্যতা নির্দেশ করবে না; যাবৎ না তার নিকট এর কোনও প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হবে। অথচ তার প্রমাণ না থাকাই মৌলিক কথা। এতটুকু স্বতঃসিদ্ধ (কথা)। কাজেই যে ব্যক্তি অসম্ভাব্যতার প্রবক্তা, তার প্রমাণ পেশ করা আবশ্যক কর্তব্য।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ সম্ভব

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাযহাব মতে, আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করা সম্ভব। জান্নাতে ঈমানদারগণ আল্লাহ তা'আলাকে এমতাবস্থায় দেখবে যে, স্বয়ং তারা তো কোন দিক ও স্থানে অবস্থান করবে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কোন দিক ও স্থান থেকে পুত-পবিত্র থাকবেন। কেননা দুনিয়ায় কোন জিনিস দৃশ্যমান হওয়ার জন্য তা কোন দিক ও স্থানে থাকা স্বাভাবিক শর্ত; আবশ্যিক শর্ত নয়। আর মুসাব্বিহা ও কাররামিয়াদের মতে যদিও দেখা বা দর্শনের জন্য (দৃষ্ট) বস্তুর কোনও দিক ও স্থানে থাকা আবশ্যিক শর্ত, তথাপি তারাও আল্লাহ তা'আলার দীদার বা দর্শনের প্রবক্তা। কেননা তাদের মতে আল্লাহ তা'আলার দেহ আছে। কাজেই দেহের আবশ্যকীয় বস্তু তথা স্থান ও দিক তার জন্য প্রমাণিত হল।

قَوْلُهُ: بِمَعْنَى الْاِنْكِشَافِ التَّامِّ الخ ঃ ব্যাখ্যাকার رُؤْيَة এর ব্যাখ্যায় اِنْكِشَاف এনে ইংগিত করেছেন, এখানে رُؤْيَة শব্দটি মাসদারে মাজহূল। এর এযাফত হয়েছে। মাফউলের দিকে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার দেখা দেওয়া; পরিদৃষ্ট হওয়া। কেননা বিতর্কিত বিষয় এটিই। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আমাদেরকে দেখার ব্যাপারে কারও কোনও দ্বিমত নেই। আর এখানে اِنْكِشَافٌ দ্বারা اِنْكِشَافٌ بِالْبَصَرِ তথা চাক্ষুশ দেখা উদ্দেশ্য। কেননা আন্তরিক দর্শন নিয়ে কারও মতপার্থক্য নেই।

قَوْلُهُ : هُوَ مَعْنٰى اِثْبَاتِ الشَّيْءِ الخ ঃ এ বাক্যটি اِنْكِشَافٌ تَامٌّ بِالْبَصَرِ এর ব্যাখ্যা। আর اِثْبَاتٌ بِمَعْنٰى اِدْرَاك এর প্রকৃত অর্থ, কোন জিনিস চোখে দেখে বাস্তবিকভাবে উপলব্ধি করা। কাজেই বক্রচোখ বা টেরা ব্যক্তির এক জিনিসকে দুটি মনে করার নাম আদৌ رُؤْيَة রাখা হবে না। আবার একে اِنْكِشَاف تَام ও বলা হবে না।

قَوْلُهُ : وَذَالِكَ اِنَّا اِذَا نَظَرْنَا الخ ঃ এখান থেকে বিতর্কিত বিষয়ের বিবরণ শুরু হচ্ছে। সারকথা হল, حدو رسم বা সংজ্ঞা-পরিচয়ের দ্বারা পুর্ণিমা চাঁদ সম্পর্কে আমাদের এক ধরনের অনুভূতি আসে। তারপর স্বচক্ষে দেখে যখন আমরা চোখ বন্ধ করে ফেলি, তখনও আমাদের এক ধরনের উপলব্ধি ও অনুভূতি থাকে, যা পুর্বোক্ত অনুভূতি অপেক্ষা অধিক স্বচ্ছ। অতঃপর আমরা যখন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন চক্ষুযুগল খোলা থাকার কারণে চাদের উপলব্ধি ও অনুভূতি আরও বেশি থাকে। তা পূর্বোক্ত উভয় অনুভূতি-জ্ঞান অপেক্ষা সমধিক স্বচ্ছ ও পূর্ণাঙ্গ। একেই আমরা رُؤيَت বা দর্শন নামে অভিহিত করি। আর দুনিয়ায় যে বস্তু তার সাথে সম্পৃক্ত এবং কোনও দিক ও স্থানে থাকে, তা নিয়ে কারও বিবাদ বা মতানৈক্য নেই। বিবাদ হল, "দিক ও স্থান হতে পুতঃপবিত্র আল্লাহ তা'আলার সত্তার সাথে رُؤيَة খ্যাত حَالَت اِدْرَاكِيَّه সম্পৃক্ত হতে পারে কি না?" তা নিয়ে। অর্থাৎ দিক ও স্থান হতে পুতঃপবিত্র হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ সম্ভব কি-না? আহলে হক বলেন– সম্ভব। আরেক সম্প্রদায় তা অস্বীকার করেন। বলা বাহুল্য যে, দর্শন লাভের সম্ভাব্যতার উপর ঐ সব দলীল প্রমাণ উল্লেখ করাই যথেষ্ট ছিল, যেগুলো পরকালে আল্লাহ পাকের বাস্তবিক দিদার বা দর্শন লাভের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যেমন, وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَة ইত্যাদি। (অর্থাৎ সেদিন কিছু সংখ্যক চেহারা হবে উজ্জল। তারা তাদের প্রভূর দিকে তাকিয়ে থাকবে। সূরা কিয়ামাহ– ২২, ২৩

কেননা কোন জিনিস বাস্তবে থাকার অর্থ, তার সম্ভাব্যতা অবশ্যম্ভাবী। সম্ভাব্য বস্তুই বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু মাশায়েখে কিরাম কেবল বাস্তব দর্শনের দলীল-প্রমাণের উপর নির্ভর করেননি। কেননা এর প্রমাণ নকলী ও শ্রুতলব্ধ। প্রতিপক্ষ رُؤيَةُ اللّٰهِ বা আল্লাহ পাকের দর্শন অসম্ভব বলে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। আর যখন নস কোন অসম্ভব জিনিসের বাস্তবতার সংবাদ দেয়, তখন উক্ত নস যাহের বা বাহ্যিক অর্থে প্রয়োগ হয় না বরং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আবশ্যক হয়। এজন্য মাশায়েখে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত প্রথমে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভের সম্ভাব্যতা প্রমাণ করেন। তারপর বাস্তবতার প্রমাণ পেশ করেন। মূল গ্রন্থকারও جَائِزَة فِى الْعَقْلِ বলে প্রথমে আল্লাহ পাকের দর্শন লাভের সম্ভাব্যতা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর وَاجِبَةٌ بِالنَّقْلِ বলে তার বাস্তবতার বর্ণনা দিয়েছেন।

قَوْلُهُ : بِمَعْنَى اَنَّ الْعَقْلَ الخ ঃ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ বিবেকগ্রাহ্য ও যুক্তিযুক্ত হওয়ার মর্মার্থ হচ্ছে, যদি বিবেককে বাহ্যতঃ প্রভাবিত করা ও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থেকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে আদৌ সে আল্লাহ পাকের দর্শন অসম্ভব বলে সিদ্ধান্ত দেবে না। যাবৎ না তার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাবে। তাছাড়া رُؤيَةُ اللّٰهِ (আল্লাহ পাকের দর্শন) অসম্ভব হওয়ার পেছনে কোন দলীল-প্রমাণ না থাকাই বাস্তব সত্য। কেননা এক আল্লাহ ছাড়া সকল বস্তুর আদি সত্য অনস্তিত্ব; সবই পরবর্তীতে অস্তিত্ব লাভ করেছে। কাজেই যারা رُؤيَةُ اللّٰهِ বা আল্লাহর দর্শন অসম্ভব বলে দাবী করেন, তাদের প্রমাণ পেশ করা আবশ্যক।

وَقَدِ اسْتَدَلَّ اَهْلُ الْحَقِّ عَلَى اِمْكَانِ الرُّؤْيَةِ بِوَجْهَيْنِ عَقْلِيٍّ وَسَمْعِيٍّ ـ تَقْرِيْرُ الْاَوَّلِ اَنَّا قَاطِعُوْنَ بِرُؤْيَةِ الْاَعْيَانِ وَالْاَعْرَاضِ ـ ضَرُوْرَةَ اَنَّا نُفَرِّقُ بِالْبَصَرِ بَيْنَ جِسْمٍ وَجِسْمٍ وَعَرَضٍ وَعَرَضٍ وَلَابُدَّ لِلْحُكْمِ الْمُشْتَرَكِ مِنْ عِلَّةٍ مُشْتَرَكَةٍ وَهِىَ اِمَّا الْوُجُوْدُ اَوِ الْحُدُوْثُ اَوِ الْاِمْكَانُ اِذْلَا رَابِعَ يَشْتَرِكُ بَيْنَهُمَا ـ اَلْحُدُوْثُ عِبَارَةٌ عَنِ الْوُجُوْدِ بَعْدَ الْعَدَمِ ـ وَالْاِمْكَانُ عَنْ عَدَمِ ضَرُوْرَةِ الْوُجُوْدِ وَالْعَدَمِ ـ وَلَا مَدْخَلَ لِلْعَدَمِ فِى الْعِلِّيَّةِ ـ فَتَعَيَّنَ الْوُجُوْدُ ـ وَهُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الصَّانِعِ وَغَيْرِهِ ـ فَيَصِحُّ اَنْ يُّرٰى مِنْ حَيْثُ تَحَقُّقِ عِلَّةِ الصِّحَّةِ وَهِىَ الْوُجُوْدُ وَيَتَوَقَّفُ اِمْتِنَاعُهَا عَلَى ثُبُوْتِ كَوْنِ شَيْئٍ مِنْ

خَوَاصِّ الْمُمْكِنِ شَرْطًا اَوْ مِنْ خَوَاصِّ الْوَاجِبِ مَانِعًا . وَكَذَا يَصِحُّ اَنْ يُّرٰى سَائِرُ الْمَوْجُوْدَاتِ مِنَ الْاَصْوَاتِ وَالطُّعُوْمِ وَالرَّوَائِحِ وَغَيْرِ ذَالِكَ وَاِنَّمَا لَا يُرٰى بِنَاءً عَلٰى اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمْ يَخْلُقْ فِى الْعَبْدِ رُؤْيَتَهَا بِطَرِيْقِ جَرْيِ الْعَادَةِ لَا بِنَاءً عَلٰى اِمْتِنَاعِ رُؤْيَتِهَا

সহজ তরজমা

দুটি কারণে আল্লাহ তাআ'লার দর্শনলাভ সম্ভব

আহলে হক আল্লাহর দর্শন সম্ভব হওয়ার উপর আকলী-নকলী (ঐতিহাসিক ও যুক্তিনির্ভর) উভয়ভাবে প্রমাণ পেশ করেছেন। প্রথম দলীলের আলোচনাঃ দৃশ্যমান (বস্তু) ও আরাযের (আপাতনের) দর্শন লাভ সম্পর্কে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। (কেননা) স্বতঃসিদ্ধ কথা হল, আমরা দুটি দেহ এবং দুটি আরযের মধ্যে দৃষ্টিশক্তি দ্বারা পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি। আর সম্মিলিত হুকুমের জন্য সম্মলিত ইল্লত থাকা জরুরী। তা হয়ত অস্তিত্ব বা নশ্বরতা কিংবা সম্ভাব্যতা হবে। কেননা তাছাড়া চতুর্থ এমন কোন কারণ নেই, যা উভয়ের মধ্যে অংশীদার থাকবে। আর নশ্বরতা দ্বারা উদ্দেশ্য, অস্তিত্বহীনতার পর অস্তিত্ব লাভ করা। সম্ভাব্যতা দ্বারা উদ্দেশ্য, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব জরুরী না হওয়া। আর ইল্লত হওয়ার ক্ষেত্রে আদম বা অস্তিত্বহীনতার কোনও দেখল নেই। সুতরাং উজুদ বা অস্তিত্ব সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল। আর তা সৃষ্টিকর্তা ও অন্যান্যের মাঝে সমানভাবে বিদ্যমান। কাজেই সম্ভাব্যতার ইল্লত (কারণ) তথা উজূদ (অস্তিত্ব) প্রমাণিত হওয়ার দরুন তার দেখা দেওয়া বা আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ সম্ভব হবে। আর তার অসম্ভাব্য সম্ভাব্য বস্তুর বৈশিষ্ট্যাবলি থেকে কোনও বস্তুর শর্ত হওয়া কিংবা ওয়াজিব তথা অনিবার্য সত্তার বৈশিষ্ট্যাবলি থেকে কোনও বস্তু অন্তরায় সাব্যস্ত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। অনুরূপভাবে যাবতীয় বর্তমান বস্তু যেমন শব্দ, ঘ্রাণ এবং স্বাদ ইত্যাদির দর্শন লাভও সম্ভব। তবে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলা স্বীয় স্বভাব-রীতি অনুযায়ী বান্দার ভেতর এসব বস্তুর দর্শন সৃষ্টি করেননি বিধায় এগুলো দেখা যায় না সেগুলোর দর্শন অসম্ভব হওয়ার কারণে নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আকলী দলীল ঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রবীণ ওলামায়ে কিরাম আল্লাহর দর্শন সম্ভব হওয়ার স্বপক্ষে যৌক্তিক ও ঐতিহাসিক (আকলী ও নকলী) দুধরনের প্রমাণ পেশ করে থাকেন। আকলী বা যৌক্তিক দলীল যেমন, দৃশ্যমান এবং আ'রায বা আপতন উভয়ই প্রত্যক্ষ করা যায়। কেননা আমরা দুটি দেহের মধ্যে দেখেই পার্থক্য নির্ণয় করি। যেমন, এ মেয়ে; সে ছেলে। তদ্রুপ দুটি আ'রায বা জিনিসের মধ্যেও দেখেই পার্থক্য নির্ণয় করি। যেমন– এটি কালো; সেটি সাদা। মোটকথা, رُؤْيَة তথা দর্শন লাভ দৃশ্যমান বস্তু এবং আরায বা আসবাবপত্রের মধ্যে সমানভাবে প্রমাণিত। আর যে হুকুম দুটি জিনিসের মধ্যে সমানভাবে পাওয়া যায়, তার ইল্লত বা কারণও এমন হতে হয়, যা উভয়ের মধ্যে সমানভাবে বিদ্যমান থাকবে।

বহু অনুসন্ধানের পর আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, তিনটি জিনিস এমন রয়েছে, যা দৃশ্যমান বস্তু এবং আরাযের মধ্যে সমানভাবে বিদ্যামান। **প্রথমতঃ** উভয়টি সম্ভব। কাজেই সম্ভাবনা উভয়টিতে সমানভাবে প্রযোজ্য বা অংশীদার। **দ্বিতীয়তঃ** দৃশ্যমান বস্তু এবং আরায উভয়টি নশ্বর। যেমন পৃথিবীর নশ্বররতার দলীলে বিবৃত হয়েছে। কাজেই নশ্বরতাও উভয়ের মধ্যে সমানভাবে অংশীদার। **তৃতীয়তঃ** উভয়ই বিদ্যমান। কাজেই উজুদ বা অস্তিত্বও উভয়ের মধ্যে সমানভাবে অংশীদার হল।

তন্মধ্যে প্রথমোক্ত বিষয় দুটি অর্থাৎ সম্ভাব্যতা ও নশ্বরতা ইল্লত বা কারণ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। কেননা সম্ভাব্যতার অর্থ, কোনও বস্তুর অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব উভয়ই জরুরী না হওয়া। আর না হওয়া বা অস্তিত্বহীনতা একটি নেতিবাচক বিষয়। অনুরূপভাবে নশ্বরতার অর্থ, অস্তিত্বহীনতার পর অস্তিত্ব অর্থাৎ না থাকা বা অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব লাভ করা। সুতরাং এর অর্থে عَدَم বা অস্তিত্বহীনতা বিদ্যমান। কাজেই নশ্বরতাও নেতিবাচক বিষয়। আর নেতিবাচক কোন জিনিসের ইল্লত হতে পারে না। কেননা যে জিনিস অপর জিনিসের অস্তিত্ব লাভের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল হয়, তাকেই বলে ইল্লত। আর যে জিনিস স্বয়ং নেতিবাচক বা অস্তিত্বহীন ও অস্তিত্ব বঞ্চিত, তা আরেকটি জিনিসের অস্তিত্বে কোনও ভূমিকা রাখতে পারে না।

মোটকথা, উপরিউক্ত তিনটি সমান্তরাল বা অংশীদার বস্তুর মধ্যে সম্ভাব্যতা ও নশ্বরতা নেতিবাচক হওয়ার কারণে ইল্লত হতে পারে না। বিধায় তৃতীয় সম্ভাবনা সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল। অর্থাৎ দৃশ্যমান বস্তু ও আরাযের দর্শন

তথা পরিদৃষ্ট হওয়ার কারণ উজুদ বা অস্তিত্ব। আর যেহেতু এ দুটির ইল্লত উজুদ, যা আল্লাহ পাকের সত্তায়ও বিদ্যমান। কেননা তিনি কেবল অস্তিত্ববানই নন বরং অনিবার্য সত্তা, সেহেতু তার দর্শনও সম্ভব। কেননা কোনও হুকুমের ইল্লত যেখানে পাওয়া যায়; হুকুমও সেখানে পাওয়া যায়।

قَوْلُهُ : فَيَصِحُّ اَنْ يُّرٰى الخ ঃ এখানে এবং সামনে صِحَّت অর্থ সম্ভাব্যতা। আর يُرٰى ফে'লটি মুজারে মাজহূল।

দর্শনের সম্ভাব্যতা নিয়ে প্রশ্নোত্তর

قَوْلُهُ : وَيَتَوَقَّفُ اِمْتِنَاعُهَا الخ ঃ বাক্যটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন হল, আমরা স্বীকার করি যে, দৃশ্যমান বস্তু ও আ'রায দৃষ্ট হওয়ার ইল্লত উজূদ বা অস্তিত্ব। এটি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার সত্তায়ও বিদ্যমান। তদুপরি বিদ্যমান বস্তু দৃষ্ট হওয়ার জন্য এমনও কোন শর্ত থাকতে পারে, যা সম্ভাব্য বস্তুর বৈশিষ্ট্য। যেমন, কোন স্থানে সমাসীন হওয়া এবং রঙিন হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও উপরিউক্ত শর্তের অনুপস্থিতিতে তার দর্শন হয়ত অসম্ভব। কিংবা অনিবার্য সত্তার বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলির কোন একটি দর্শনের প্রতিবন্ধকও হতে পারে। যেমন, স্থান ও দিক থেকে পুতঃপবিত্র হওয়া এর জন্য অন্তরায়। যদ্দরুন তিনি পরিদৃষ্ট হবেন না।

ব্যাখ্যাকার এর উত্তরে বলেন, দর্শনের জন্য এমন কোন জিনিস শর্তরূপে প্রমাণিত হওয়ার উপর আল্লাহর দর্শনের অসম্ভাব্যতা নির্ভরশীল, যা সম্ভাব্য বস্তুর বৈশিষ্ট্যাবলির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে আল্লাহ পাকের সত্তায় অবর্তমান থাকবে কিংবা অত্যাবশ্যক সত্তার কোনও একটি গুণ দর্শনের প্রতিবন্ধক প্রমাণিত হবে। অথচ এতদুভয়ের কোনটিই প্রমাণিত নয়। কাজেই আল্লাহকে দর্শনের ইল্লত তথা উজুদ বা অস্তিত্ব পাওয়া যাওয়ার কারণে তার দর্শন সম্ভব।

দর্শনযোগ্য হওয়ার পরও কোন কোন জিনিস দেখা যায় না কেন ?

قَوْلُهُ : وَكَذَا يَصِحُّ اَنْ يُّرٰى سَائِرُ الْمَوْجُوْدَاتِ الخ ঃ এখানে উজুদকে দর্শনের ইল্লত সাব্যস্ত করার ব্যাপারে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হল, رُؤْيَة তথা দর্শনের ইল্লত যদি উজূদ বা বিদ্যমান থাকা হত, তাহলে সকল বিদ্যমান বস্তু যেমন স্বর, ঘ্রান, স্বাদ, উষ্ণতা-আর্দ্রতা, ঠাণ্ডা ইত্যাদিও দেখা যেত। অথচ تَالِى বা সমস্ত বিদ্যমান বস্তুর দর্শনও পরিদৃষ্ট হওয়া বাতিল। তদ্রুপ মুকাদ্দামা তথা উজূদ দর্শনের ইল্লত সাব্যস্ত হওয়াও বাতিল। এর জবাবের সারকথা হল, উপরিউক্ত সকল বিদ্যমান বস্তুর দর্শনও সম্ভব। কেননা رُؤْيَة বা দর্শন আল্লাহর সৃষ্টির ফলাফল। তদুপরি এসব জিনিস কেন দেখা যায় না? তার কারণ হল, আল্লাহ তা'আলা তার স্বভাব-রীতি হিসেবে ঠিক করে রেখেছেন যে, বান্দাদের মধ্যে এসব জিনিসের দর্শন সৃষ্টি করবেন না। আবার তিনি ইচ্ছা করলে স্বীয় স্বভাব-রীতির পরিবর্তন হিসেবে এসব জিনিসেরও رُؤْيَة বা দর্শন সৃষ্টি করতে পারেন। এগুলোর দর্শন অসম্ভব বলে এসব জিনিস পরিদৃষ্ট হয় না –বিষয়টি এমন নয়।

وَحِيْنَ اعْتِرَاضٍ بِاَنَّ الصِّحَّةَ عَدَمِيَّةٌ فَلَا تَسْتَدْعِىْ عِلَّةً ـ وَلَوْ سُلِّمَ فَالْوَاحِدُ النَّوْعِيُّ قَدْ يُعَلَّلُ بِالْمُخْتَلِفَاتِ كَالْحَرَارَةِ بِالشَّمْسِ وَالنَّارِ ـ فَلَا يَسْتَدْعِىْ عِلَّةً مُشْتَرَكَةً وَلَوْسُلِّمَ فَالْعَدَمِيُّ يَصْلُحُ عِلَّةً لِلْعَدَمِيِّ وَلَوْ سُلِّمَ فَلَا نُسَلِّمُ اِشْتِرَاكَ الْوُجُوْدِ ـ بَلْ وُجُوْدُ كُلِّ شَيْئٍ عَيْنُهُ ـ اُجِيْبَ بِاَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلَّةِ مُتَعَلَّقُ الرُّؤْيَةِ وَالْقَابِلُ لَهَا ـ وَلَا خَفَاءَ فِىْ لُزُوْمِ كَوْنِهٖ وُجُوْدِيًّا ثُمَّ لَا يَجُوْزُ اَنْ تَكُوْنَ خُصُوْصِيَّةَ الْجِسْمِ وَالْعَرْضِ ـ لِاَنَّا اَوَّلَ مَا نَرٰى شَبَحًا مِنْ بَعِيْدٍ اِنَّمَا نُدْرِكُ مِنْهُ هُوِيَّةً مَا دُوْنَ خُصُوْصِيَّةِ جَوْهَرِيَّةٍ اَوْ عَرْضِيَّةٍ اَوْ اِنْسَانِيَّةٍ اَوْ فَرَسِيَّةٍ وَنَحْوِ ذٰلِكَ ـ وَبَعْدَ رُؤْيَتِهٖ بِرُؤْيَةٍ وَاحِدَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِهُوِيَّةٍ قَدْ نَقْدِرُ عَلٰى تَفْصِيْلِهٖ اِلٰى مَا فِيْهِ مِنَ الْجَوَاهِرِ

وَالْاَعْرَاضِ وَقَدْ لَا نَقْدِرُ ـ فَمُتَعَلَّقُ الرُّؤْيَةِ هُوَ كَوْنُ الشَّيْئِ لَهُ هُوِيَّةٌ مَّا ـ وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِالْوُجُوْدِ ـ وَاشْتِرَاكُهُ ضَرُوْرِيٌّ ـ وَفِيْهِ نَظَرٌ لِجَوَازِ اَنْ يَّكُوْنَ مُتَعَلَّقُ الرُّؤْيَةِ هُوَ الْجِسْمِيَّةُ وَمَا يَتْبَعُهَا مِنَ الْاَعْرَاضِ مِنْ غَيْرِ اِعْتِبَارِ خُصُوْصِيَّةٍ ـ

সহজ তরজমা

আল্লাহ তাআ'লার দর্শন লাভ সম্ভবের সম্ভাব্যতা নিয়ে চারটি প্রশ্নোত্তর

আর যখন প্রশ্ন করা হল, বিশুদ্ধতা তথা দর্শনের সম্ভাব্যতা তো একটি নেতিবাচক বা নাস্তি বিষয়। কাজেই তা কোনও ইল্লতের (কারণের) দাবী রাখবে না। আর যদি মেনেও নেওয়া হয়, তথাপি وَاحِدٌ بِالنَّوْعِ এর বিভিন্ন কারণ হতে পারে। যেমন, উষ্ণতা বা গরমের কারণ সূর্য-আগুণ উভয়ই। কাজেই যৌথ ইল্লতের দাবীদার হবে না। যদি তাও মেনে নেওয়া হয়, তাহলে নেতিবাচক (নাস্তি) বিষয় (আরেকটি) নেতিবাচক বা নাস্তির জন্য ইল্লত হতে পারে। আর যদি মেনে নেওয়া হয়, তবে উজূদ বা অস্তিত্ব যৌথ হওয়া আমরা মানি না। বরং প্রত্যেক জিনিসের উজূদ বা অস্তিত্ব হুবহু একই বস্তু। তাহলে এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হবে– ইল্লত দ্বারা উদ্দেশ্য, দর্শনের মুতা'আল্লাক বা সংশ্লিষ্ট বস্তু এবং ঐ জিনিস, যা পরিদৃষ্ট হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আর তার অস্তিত্বশীলতা ও ইতিবাচক হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া দেহ এবং আরযের বৈশিষ্ট্য হওয়া বৈধ নয়। কেননা আমরা দূর হতে কোন বস্তু-কায়ের প্রথম দর্শনে শুধুমাত্র বস্তুটির অস্তিত্ব উপলব্ধি করি; দৃশ্যমান বা স্বাধিষ্ঠ বা আপাতনত্ব বা মনুষ্যত্ব বা ঘোড়া হওয়ার বৈশিষ্ট্য নয়। আবার কখনও তার কায়া দেখে তার মধ্যে বিদ্যমান স্বাধিষ্ঠ ও আরযসমূহের বিশদ বিবরণ জানতে আমরা সক্ষম হই; আবার কখনও সক্ষম হই না। কাজেই দর্শনের সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তুর هُوِيَّةٌ বা অস্তিত্ব এবং উজূদ দ্বারা তা-ই উদ্দেশ্য। আর তা যৌথ হওয়া আবশ্যক। তবে মু'তাআল্লাক দেহ এবং ঐ আ'রায হতে পারে, যেগুলো বৈশিষ্ট্যের প্রতি কোন প্রকার লক্ষ্য করা ছাড়াই দেহের অনুগত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

উজূদ দর্শনের ইল্লতে মুশতাবিকা কিনা ?

উজূদকে رُؤْيَتْ এর ইল্লতে মুশতারিকা বা যৌথ কারণ সাব্যস্ত করা নিয়ে চারটি প্রশ্ন ওঠে। যথা–

(১) বিশুদ্ধতা তথা সম্ভাব্যতা একটি নাস্তি বিষয়। কেননা তার দ্বারা উদ্দেশ্য অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব কোনটিই জরুরী না হওয়া। আর না হওয়া নাস্তিক বিষয়। কাজেই দর্শনের বিশুদ্ধতা নেতিবাচক বা নাস্তিক বিষয়। আর নাস্তির জন্য কোনও ইল্লত হয় না বরং তার উজূদের ইল্লত না থাকাই যথেষ্ট। সুতরাং দর্শনের বিশুদ্ধতার জন্য কোনও ইল্লত হবে না। না উজূদ বা অস্তিত্ব; না অন্য কিছু।

(২) وَلَوْسُلِّمَ فَالْوَاحِدُ النَّوْعِيُّ الخ ঃ এ প্রশ্নটি বুঝার পূর্বে বুঝতে হবে, এক (১) তিন প্রকার। এক যদি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু হয়, তবে তাকে وَاحِدٌ بِالشَّخْصِ (ব্যক্তি বা বস্তুবাচক এক) বলে। যেমন, যায়েদ একটি সুনির্দিষ্ট একক। যদি এক এমন কোনও কুল্লী (মৌলিক বস্তু) হয়, যার অধীনে একই হাকীকতের (জাতের) বহু সংখ্যক একক রয়েছে। তবে তাকে وَاحِدٌ بِالنَّوْعِ শ্রেণী বাচক একক বলে। যেমন, মানুষ। আর যদি এক এমন কোনও কুল্লী হয়, যার অধীনে একাধিক হাকীকতের (জাতের) বহু সংখ্যক একক রয়েছে, তবে তাকে وَاحِدٌ بِالْجِنْسِ (জাতিবাচক একক) বলে। যেমন, حَيَوَان বা প্রাণী। দ্বতীয়তঃ وَاحِدٌ بِالشَّخْصِ এর জন্য ইল্লত হবে একটি। যেমন, এ মাত্র চুলা থেকে বের করে আপনি একটি রুটি হাতে নিলেন। সুনির্দিষ্ট বস্তু হওয়ার কারণে তা وَاحِدٌ بِالشَّخْصِ (বস্তুবাচক একক) যার ইল্লত কেবলই আগুন। আর নিঃশর্ত আগুন বা উষ্ণতা وَاحِدٌ بِالنَّوْعِ বা শ্রেণীবাচক একক। যার অধীনে রয়েছে বহুসংখ্যক একক। যেমন, চুলার গরম, শরীরের গরম, ছাদের গরম বা উষ্ণতা প্রভৃতি। আর وَاحِدٌ بِالنَّوْعِ এর ইল্লত একাধিক হতে পারে। যেমন, চুলা গরম বা উষ্ণতার ইল্লত আগুন। শারীরিক তাপের ইল্লত জ্বর। ছাদের গরমের ইল্লত সূর্য্যতাপ।

এখন মূল প্রশ্নে আসুন। প্রশ্নকারী বলেন– ধরুন! আমরা মেনেই নিলাম, দর্শনের বিশুদ্ধতা নেতিবাচক হওয়া সত্ত্বেও ইল্লতের দাবী রাখে। তদুপরি আমরা তার জন্য যৌথ একটি ইল্লতের আবশ্যকতা স্বীকার করি না। বরং

رُوْيَت (দর্শন) যদি وَاحِدٌ بِالشَّخْصِ হয়, যার জন্য একই ইল্লত হয়ে থাকে, তখনই তা আবশ্যক হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে رُوْيَت বা দর্শন وَاحِدٌ بِالشَّخْصِ নয় বরং وَاحِدٌ بِالنَّوْعِ আর তার বিভিন্ন এবং একাধিক ইল্লত হতে পারে। যেমন, গরম বা উষ্ণতা وَاحِدٌ بِالنَّوْعِ তার ইল্লত কোথাও আগুন, কোথাও সূর্যতাপ। অনুরূপভাবে আমরা বলতে পারি, দৃশ্যমান বস্তুর ইল্লত তার দেহ বা جَوْهَر তথা স্বাধিষ্ঠ হওয়া। আর আরযের মধ্যে দর্শনের ইল্লত আরয হওয়া। অথচ আল্লাহ তা'আলা জওহর নন। তার দেহ নেই। আবার তিনি আরযও নন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার দর্শনের কোন ইল্লত পাওয়া যায় না। কাজেই তার দর্শন সম্ভব নয়।

(৩) আমরা যদি رُوْيَت বা দর্শন وَاحِدٌ بِالنَّوْعِ হওয়া সত্ত্বেও যৌথ ইল্লতের দাবী রাখে বলে স্বীকার করেও নেই, তথাপি তার ইল্লত উজুদী বা অস্তিত্বশীল হওয়ার আবশ্যকতা আমরা স্বীকার করি না। কেননা দর্শনের বিশুদ্ধতা নেতিবাচক। আর নেতিবাচকের জন্য নেতিবাচক ইল্লত হতে পারে। সুতরাং দর্শনের ইল্লত হবে নেতিবাচক। আর তা হল; সম্ভাব্যতা বা নশ্বরতা। যা থেকে আল্লাহ তা'আলা পুতঃপবিত্র। কাজেই দর্শনের বিশুদ্ধতার ইল্লত তথা সম্ভাব্যতা বা নশ্বরতা না থাকার কারণে আল্লাহ তা'আলার দর্শন বিশুদ্ধ এবং সম্ভব হবে না।

(৪) তা-ও যদি মেনে নেওয়া হয় অর্থাৎ সম্ভাব্যতা ও নশ্বরতা ইল্লত হতে পারে না। আর স্বাধিষ্ঠ বস্তু ও আপতন দর্শনের ইল্লত কেবল উজূদ বা অস্তিত্বই। তদুপরি আমরা স্বীকার করি না যে, স্বাধিষ্ঠ বস্তু, আপাতন এবং আল্লাহ পাকের মাঝে উজূদ অংশীদার বা যৌথ; যদ্দরুন আল্লাহর দর্শনের সম্ভাব্যতা আবশ্যক প্রমাণিত হবে। বরং আমরা বলি, প্রত্যেক জিনিসের অস্তিত্ব হুবহু ঐ জিনিসই। অতএব স্বাধিষ্ঠ ও আপতনগুলো অস্তিত্ব হুবহু ঐ স্বাধিষ্ঠ বস্তুও আপাতনই হবে। আর তা সম্ভাব্য। কাজেই তার দর্শনের ইল্লত তথা অস্তিত্বও সম্ভাব্য হবে। (আর যেহেতু) আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব কেবল সম্ভাব্যই নয় বরং অনিবার্য, বিধায় দর্শনের ইল্লত না থাকার কারণে আল্লাহপাকের দর্শন সম্ভাব্য হবে না।

উপরিউক্ত প্রশ্নের গুলোর জবাব

قَوْلُهُ: أُجِيْبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ..... الخ ঃ জবাবের সারকথা হল, দর্শনের ইল্লত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে رُوْيَت বা দর্শনের সাথে সংশ্লিষ্ট ঐ জিনিস, যা দর্শনের যোগ্যতা রাখে। এমন নিশ্চিত বিষয় অস্তিত্বশীল জিনিসই হবে। কেননা নাস্তি জিনিস আদৌ দর্শনযোগ্য হয় না। অতএব দর্শনের বিশুদ্ধতা ইল্লত তথা এমন জিনিসের দাবীদার অবশ্যই হবে, যার সাথে দর্শন সম্পৃক্ত হতে হবে। কাজেই প্রথম প্রশ্ন তথা "দর্শনের বিশুদ্ধতা নেতিবাচক বা নাস্তি। তার জন্য কোন ইল্লত থাকবে না" খণ্ডিত হয়ে গেল। অনুরূপভাবে দর্শনের ইল্লত দ্বারা যখন দর্শনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং দর্শনের যোগ্যতা উদ্দেশ্য, যার অস্তিত্বশীলতা আবশ্যক তখন তৃতীয় প্রশ্ন তথা "নাস্তির জন্য নাস্তি ইল্লত হতে পারে" বিলুপ্ত হয়ে গেল। তারপর দর্শনের ইল্লত দ্বারা যখন দর্শনের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় উদ্দেশ্য, তখন কোনও জিনিস দর্শনের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া এবং দর্শনের যোগ্যতা রাখার বেলায় তার জওহার কিংবা আরয হওয়ার বৈশিষ্ট্য নেই। কেননা যদি তাই হত অর্থাৎ জওহার ও আরয দর্শনের সাথে সংশ্লিষ্ট হত, তবে অবশ্যই আমাদের পরিদৃষ্ট যাবতীয় জিনিস জওহর-আরয বলেই জ্ঞান হত। অথচ ব্যাপারটি তা নয়। প্রায় সময় আমরা যখন দূর হতে কোন জিনিস দেখি, তখন প্রথম পলকেই অদূরে দৃশ্যমান জিনিসটি জওহর না আরয, মানুষ না ঘোড়া, তদ্রুপ সাদা না কালো কিছুই জানি না। শুধু জানি, অদূরে কিছু একটা আছে। এরই নাম هُوِيَّت এবং দর্শনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং ইল্লত। আর তা-ই হল উজূদ বা অস্তিত্ব। সুতরাং বুঝা গেল, দর্শনের ইল্লত নিঃসন্দেহে উজুদ বা অস্তিত্ব। কাজেই দ্বিতীয় প্রশ্ন তথা "দর্শন হল, وَاحِدٌ بِالنَّوْعِ তার একাধিক ইল্লত হতে পারে" রহিত হয়ে গেল। অতঃপর দৃশ্যমান বস্তু ও আরয এবং আল্লাহ পাকের মাঝে উজুদ সম্পৃক্ত বা যৌথ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ কথা। তা অস্বীকার করা ধৃষ্ঠতা বৈ কিছু নয়। অতএব কারণে চতুর্থ প্রশ্ন তথা অস্তিত্ব যৌথ হওয়ার কথা আমরা স্বীকার করি না –এ দাবীও প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেল।

قَوْلُهُ: ثُمَّ لَا يَجُوْزُ الخ ঃ এখান থেকে فَالْوَاحِدُ النَّوْعِيُّ الخ পর্যন্ত وَهُوَ الْمَعْنٰى بِالْوُجُوْدِ দ্বিতীয় প্রশ্ন তথা এর জবাব। সাথে সাথে দর্শনের মুতাআল্লাক বা সংশ্লিষ্ট বিষয় অস্তিত্বের প্রমাণও বটে। আর

قَوْلُهُ: وَاشْتِرَاكُهُ ضَرُوْرِيٌّ থেকে চতুর্থ প্রশ্নের জবাব।

قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ الخ ঃ উপরিউক্ত জবাবে অভিযোগ রয়েছে। কেননা হতে পারে هويت ধরে নেওয়া বা আত্ম স্বীকৃর বিষয় হওয়ার কারণে দর্শনের মুতা'আলাক হবে না বরং দেহ এবং তার অনুগত আরয হবে। আর স্বাধিষ্ঠ আরয এবং আল্লাহ পাকের মাঝে দেহ অংশীদার নয়। কেননা আল্লাহপাকের দেহাবয়ব নেই। তাহলে দর্শনের ইল্লত তথা দর্শনের মুতা'আল্লাক না থাকার কারণে আল্লাহপাকের দর্শন সম্ভব হবে না।

قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ خُصُوصِيَّةِ الخ ঃ অর্থাৎ দর্শনের মুতা'আল্লাক নিঃশর্ত দেহাবয়ব এবং আরয হবে অর্থাৎ বিশেষ দেহ কিংবা আরয দর্শনের মুতা'আল্লাক হবে না।

وَتَقْرِيرُ الثَّانِىْ اَنَّ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ سَأَلَ الرُّؤْيَةَ بِقَوْلِهٖ رَبِّ اَرِنِىْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ فَلَوْلَمْ تَكُنْ مُمْكِنَةً لَكَانَ طَلَبُهَا جَهْلًا بِمَا يَجُوْزُ فِىْ ذَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَالَايَجُوْزُ اَوْسَفَهًا وَعَبَثًا وَطَلَبًا لِلْمُحَالِ وَالْاَنْبِيَاءُ مُنَزَّهُوْنَ عَنْ ذَالِكَ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ عَلَّقَ الرُّؤْيَةَ بِاسْتِقْرَارِ الْجَبَلِ وَهُوَ اَمْرٌ مُمْكِنٌ فِىْ نَفْسِهٖ وَالْمُعَلَّقُ بِالْمُمْكِنِ مُمْكِنٌ لِاَنَّ مَعْنَاهُ الْاِخْبَارُ بِثُبُوْتِ الْمُعَلَّقِ عِنْدَ ثُبُوْتِ الْمُعَلَّقِ بِهٖ وَالْمُحَالُ لَايَثْبُتُ عَلٰى شَيْءٍ مِنَ التَّقَادِيْرِ الْمُمْكِنَةِ

সহজ তরজমা

দ্বিতীয় দলীলের আলোচনা ঃ হযরত মূসা (আ.) رَبِّ اَرِنِىْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ বলে আল্লাহর কাছে দীদারের (তাকে দর্শনের) দরখাস্ত করেছেন। সুতরাং দর্শন অসম্ভব হয়ে থাকলে তাঁর এ দরখাস্ত, "আল্লাহর ব্যাপারে কি জায়েয আর কি না জায়েয" –এ ব্যাপারে অজ্ঞতাকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলবে কিংবা নির্বুদ্ধিতা, অনর্থককর্ম অথবা অসম্ভব বস্তু সন্ধানের নামান্তর হবে (অবশ্যম্ভাবী করবে)। অথচ আম্বিয়ায়ে কিরাম এসব বিষয় থেকে পবিত্র। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা দর্শনকে পাহাড়ের উপর ঝুলন্ত রেখেছেন। আর তা মৌলিক ও সত্ত্বাগতভাবে সম্ভব। সম্ভবের উপর ঝুলন্ত বিষয়ও সম্ভব হয়ে থাকে। কেননা দ্যুদোল্যমান রাখার উদ্দেশ্য মু'আল্লাক বিহী প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথে মু'আল্লাক (দ্যুদোল্যমান) বস্তুর প্রমাণের সংবাদ দেওয়া। অথচ অম্ভব বস্তু সম্ভাব্য কোনও অবস্থাতেই প্রমাণিত হয় না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

দর্শন সম্ভব হওয়ার নকলী দলীল ঃ আল্লাহর দর্শন সম্ভাব্যতার ব্যাপারে দ্বিতীয় প্রমাণ নকলী বা ঐতিহাসিক। এখানে গ্রন্থকার দুটি প্রমাণ পেশ করেছেন। কিন্তু উভয় প্রমাণ বা দলীলের উৎসমূল একই আয়াত। বিধায় ব্যাখ্যাকার একই শিরোনামে প্রমাণ দুটি উপস্থাপন করেছেন। পৃথক পৃথক প্রথম-দ্বিতীয় শিরোনাম ধার্য করেননি। উক্ত প্রমাণদ্বয়ের উৎস আয়াতটি হল,

فَلَمَّا جَاءَ مُوسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ قَالَ رَبِّ اَرِنِىْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِىْ وَلٰكِنْ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرَانِىْ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَخَرَّ مُوسٰى صَعِقًا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ (سورة الاعراف ١٤٣)

"যখন মূসা (আ.) আমার প্রতিশ্রুত সময়ে দিক্ষিত হল, তার প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন। তখন তিনি আবেদন করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনার দর্শন লাভে ধন্য করুন। আমি আপনাকে এক পলক দেখব। তখন ইরশাদ হল, তুমি আমাকে (দুনিয়ায়) দেখতে পাবে না। তুমি বরং ঐ পাহাড়কে দেখতে থাক। (তার উপর আমি এক ঝলক নিক্ষেপ করব।) সুতরাং যদি তা (পাহাড়) স্বস্থানে স্থির থাকে, তবে তুমিও আমাকে দেখতে পারবে। অতঃপর যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে নূরের ঝলক প্রকাশ করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। আর মূসা (আ.) সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। অতঃপর তার সংজ্ঞা ফিরে এলে তিনি আবেদন করলেন– নিঃসন্দেহে আপনার সত্ত্বা (এ মর্তচক্ষু হতে) পুতঃপবিত্র। (বড় মহীমাময়) আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমাতে প্রত্যার্পন করলাম এবং তোমার নির্দেশিকা لَنْ تَرَانِىْ এর উপর বিশ্বাসী মুমিনদের মধ্যে আমিই প্রথম। উপরিউক্ত আয়াতে কারীমার থেকে উৎসারিত প্রমাণ দুটির আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হল।

(১) হযরত মূসা (আ.) আল্লাহপাকের কথা শুনেছেন। এতে তার হৃদয়পটে বক্তা তথা আল্লাহকে দেখার আগ্রহ সৃষ্টি হল। তিনি দীদার বা আল্লাহকে দর্শনের দরখাস্ত করে বললেন, رَبِّ أَرِنِيْ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার দর্শন দাও। প্রত্যুত্তরে ইরশাদ হল, لَنْ تَرَانِيْ তুমি আমাকে (দুনিয়ায়) দেখতে পাবে না। আমার অপার সৌন্দর্য-অতুল আলোকচ্ছটা সহ্য করতে পারবে না। মূসা (আ.) এর এ দরখাস্তই প্রমাণ করে আল্লাহ দা'আলার দর্শন সম্ভব। কেননা যদি তার দর্শন অসম্ভব হয় আর সে ইলম ও জ্ঞান নবী মূসা (আ.) এর না থাকে, তাহলে তার (মূসা আ. এর) উক্ত দরখাস্তই এসব ব্যাপারে তার অজ্ঞতা প্রমাণ করে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে কোন জিনিস জায়েয কোন জিনিস নাজায়েয এবং কোন জিনিস সম্ভাব্য আর কোন জিনিস অসম্ভাব্য তা তিনি জানেন না। পক্ষান্তরে যদি তাঁর (মূসা আ. এর) উক্ত ইলম থেকে থাকে, তাহলে এ দরখাস্ত তার নির্বুদ্ধিতা, জ্ঞান শূন্যতা, অহেতুক ও অনর্থক কাজ করা এবং অসম্ভব বস্তু সন্ধানের নামান্তর হবে। অথচ নবীগণ এসব (অকমর্ণ্যতা) থেকে পূতঃপবিত্র। সুতরাং বুঝা গেল, আল্লাহ পাকের দর্শন সম্ভব।

(২) আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) এর আবেদনের প্রেক্ষিতে বলেছেন– তুমি আমার অতুল সৌন্দর্য জ্যোতি সহ্য করতে পারবে না। তবে তোমার সান্ত্বনার জন্য একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। অর্থাৎ أُنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ "তুমি ঐ পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর। আমি তার উপর এক সৌন্দর্য ঝলক অবতীর্ণ করছি।" فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ। যদি পাহাড়টি তা ধারণে সক্ষম হয় এবং যথাস্থানে স্থির থাকে, فَسَوْفَ تَرَانِيْ তাহলে তুমিও আমাকে দেখতে পাবে। উক্ত ঘটনা আল্লাহর দর্শনের সম্ভাব্যতা প্রমাণ করে। কেননা তাতে আল্লাহপাক স্বীয় দর্শনকে পাহাড়ের সাথে মু'আল্লাক বা ঝুলন্ত রেখেছেন। বস্তুতঃ তা স্বত্তাগতভাবে সম্ভব। আর যে জিনিস কোনও সম্ভাব্য জিনিসের উপর ঝুলন্ত থাকে, তা-ও সম্ভাব্য হয়ে থাকে। বুঝা গেল, আল্লাহপাকের দর্শন সম্ভব।

এ প্রমাণটির একটি যুক্তি বা মুকাদ্দমা আছে। অর্থাৎ পাহাড়ের স্থিরতা সম্ভব। কেননা পাহাড় একটি কায়া বা দেহ। আর প্রত্যেক দেহের যেভাবে নড়াচড়া করা সম্ভব, তদ্রূপ তার স্থির থাকাও সম্ভব। দ্বিতীয় মুকাদ্দমা হল, যে জিনিস কোনও সম্ভাব্য বস্তুর উপর দ্যুদোল্যমান থাকে, তা-ও সম্ভাব্য হয়ে থাকে। এর কারণ হিসেবে স্বয়ং ব্যাখ্যাকার বলেন, ঝুলন্ত রাখার উদ্দেশ্য مُعَلَّقٌ بِهٖ এর প্রমাণের সাথে সাথে মুআল্লাক সাব্যস্ত হওয়ার সংবাদ দেওয়া। সুতরাং কেমন যেন আল্লাহ তা'আলা দর্শনকে পাহাড়ের স্থিরতার সাথে ঝুলিয়ে দিয়ে অবহিত করছেন, مُعَلَّقٌ بِهٖ তথা পাহাড়ের স্থিরতা ও নীরবতা প্রমাণের সাথে সাথে মুআল্লাক তথা আমার দর্শনও প্রমাণিত হবে।

জ্ঞাতব্য ঃ দর্শনের সম্ভাব্যতার ব্যাপারে উপরিউক্ত আয়াতে আরেকটি প্রমাণ রয়েছে। তা হল, কেউ যদি কারও কাছে খাওয়ার জন্য এমন কোনও জিনিস চায়, যা ভক্ষণযোগ্য নয়, তখন ঐ ব্যক্তি প্রত্যুত্তরে বলবে– إِنَّهُ لَنْ يُؤْكَلَ "তা খাওয়ার জিনিস নয়"। আবার ভক্ষণযোগ্য হল ঠিক। কিন্তু এ ব্যক্তির পক্ষে পরিপাক যোগ্য নয়। অর্থাৎ জিনিসটি তার হযম হবে না। তাহলে উত্তরে সে বলবে– لَنْ تَأْكُلَ অর্থাৎ এটি খাওয়ার জিনিস বটে; কিন্তু তুমি তা খেতে পারবে না, তোমার পাকস্থলী তা হযম করতে পারবে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ পাকের দর্শন যদি অসম্ভব হত, তিনি দর্শনযোগ্য না হতেন, তাহলে হযরত মূসা (আ.) এর দরখাস্তের জবাবে বলতেন– لَنْ أُرٰى অর্থাৎ আমাকে তো দেখা যায় না। অথচ তা বলেন নি বরং আল্লাহ বলেছেন– لَنْ تَرَانِيْ অর্থাৎ আমার দর্শন তো সম্ভব। কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে পারবে না। আমার দীদার বা দর্শন তুমি সহ্য করতে পারবে না।

وَقَدِ اعْتُرِضَ بِوُجُوهٍ اَقْوَاهَا اَنَّ سُؤَالَ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لِاَجْلِ قَوْمِهٖ حَيْثُ قَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَسَأَلَ لِيَعْلَمُوا اِمْتِنَاعَهَا كَمَا عَلِمَهٗ هُوَ. وَبِاَنَّا لَا نُسَلِّمُ اَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ مُمْكِنٌ بَلْ هُوَ اسْتِقْرَارُ الْجَبَلِ حَالَ تَحَرُّكِهٖ وَهُوَ مُحَالٌ وَاُجِيْبَ بِاَنَّ كُلًّا مِنْ ذَالِكَ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَلَا ضَرُوْرَةَ فِىْ اِرْتِكَابِهٖ عَلٰى اَنَّ الْقَوْمَ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ كَفَاهُمْ قَوْلُ مُوْسٰى عَمْ اِنَّ الرُّؤْيَةَ مُمْتَنِعَةٌ وَاِنْ كَانُوْا كُفَّارًا لَمْ يُصَدِّقُوْهُ فِىْ حُكْمِ اللّٰهِ بِالْاِمْتِنَاعِ وَاَيًّا مَا كَانَ يَكُوْنُ السُّؤَالُ عَبَثًا وَالْاِسْتِقْرَارُ حَالَ التَّحَرُّكِ اَيْضًا مُمْكِنٌ بِاَنْ يَّقَعَ السُّكُوْنُ بَدَلَ الْحَرَكَةِ وَاِنَّمَا الْمُحَالُ اِجْتِمَاعُ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُوْنِ

সহজ তরজমা

(উপরিউক্ত প্রমাণদ্বয়ের উপর) কয়েকটি অভিযোগ করা হয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রশ্ন হল, হযরত মূসা (আ.) এর দরখাস্ত ছিল স্বজাতির মন রক্ষার্থে। কেননা তারা বলেছিল– আমরা আপনাকে সত্য বলে মানব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহকে খোলা চোখে না দেখব। কাজেই মূসা (আ.) দরখাস্ত করলেন। যাতে তারাও আল্লাহর দর্শনের অসম্ভাব্যতা দৃঢ় বিশ্বাস করে, যেভাবে স্বয়ং তিনি {মূসা (আ.)} দৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন।

অনুরূপভাবে (প্রশ্নোত্থাপন করা হয়েছে) আমরা দর্শনের مُعَلَّق عَلَيْهِ সম্ভব বলে স্বীকার করি না বরং তা হল, নড়াচড়া কালে পাহাড়ের স্থিরতা। আর তা অসম্ভব। এর জবাব দেওয়া হয়েছে, এগুলোর প্রত্যেকটিই বাস্তবতার পরিপন্থী (অর্থাৎ দুটো বিষয়ই বাহ্যিক অবস্থা বিরোধী।) যা গ্রহণের কোনও প্রয়োজন নেই। তাছাড়া সেসব লোক যদি মুমিন হয়ে থাকে তাহলে তাদেরকে মূসা (আ.) এর এতটুকু বলে দেওয়াই যথেষ্ট ছিল যে, আল্লাহর দর্শন অসম্ভব। আর যদি তারা কাফির হয়ে থাকে তাহলে দর্শনের অসম্ভাব্যতার ব্যাপারে তারা আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত বিশ্বাসই করত না। মোটকথা, সর্বাবস্থাই উপরিউক্ত দরখাস্ত অনর্থক হত। নড়াচড়া বা গতিশীল অবস্থায়ও স্থিরতা ও স্থিতি সম্ভব। অর্থাৎ গতি সঞ্চারের বদলে স্থিরতা এসে যাবে। আর অসম্ভাব তো গতি ও স্থিতির সমন্বয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

উক্ত নকলী দলীলের উপর প্রশ্ন

দর্শনের সম্ভাব্যতার প্রথম নকলী দলীলের উপর মুতাযিলাদের মধ্য থেকে জাহেয এবং তার অনুসারীদের পক্ষ হতে অভিযোগ করে বলা হয়, মূসা (আ.) স্বজাতির খাতিরে দরখাস্ত করেছিলেন। কেননা তার জাতি তাকে বলেছিল, اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً –হে আল্লাহ খোলা চোখে আমাদেরকে দর্শন দাও। অনুরূপভাবে বলেছিল, لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً –আমরা কখনও আপনাকে সত্য বলে মানব না। যাবৎ না আমরা আল্লাহকে খোলা চোখে দেখতে পাব। তখন মূসা (আ.) তাদের মনোরঞ্জনের জন্য দর্শনের দরখাস্ত করলেন। যাতে করে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অস্বীকৃতি শুনে তাদের মনেও দর্শনের অসম্ভাব্যতা বদ্ধমূল হয়ে যায়। যেমন, স্বয়ং মূসা (আ.) এরও উক্ত দর্শনের অসম্ভাব্যতার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। দ্বিতীয় দলীলের উপর প্রশ্নোত্থাপন করা হয়, পাহাড়ের স্থিতি, যার উপর আল্লাহ তা'আলা দর্শনকে ঝুলন্ত রেখেছেন– এর দ্বারা মু'আল্লাক (ঝুলন্ত) দর্শনের সম্ভাব্যতা আবশ্যক হওয়া অসম্ভব বরং পাহাড়ের স্থিতি দ্বারা গতিশীলতার মুহূর্তে স্থিরতা উদ্দেশ্য। আর গতিশীলতার মুহূর্তে স্থিতিশীলতা দুটি দ্বৈত জিনিসের সমন্বয় আবশ্যক করে, বিধায় অসম্ভব। কাজেই তার উপর ঝুলন্ত দর্শনও অসম্ভব হবে।

প্রশ্ন দুটির যৌথ জবাব

উপরিউক্ত প্রশ্ন দুটির উত্তরে যৌথভাবে বলা হয়, উভয়টিই একাধিক কারণে বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত। প্রথম কারণ, মূসা (আ.) যদি স্বজাতির জন্য দর্শনের দরখাস্ত করতেন, তাহলে رَبِّ اَرِنِیْ বলতেন না বরং বলতেন, رَبِّ اَرِهِمْ يَنْظُرُوا اِلَيْكَ অর্থাৎ হে প্রতিপালক! তাদেরকে আপনার দীদার লাভ করান। অনুরূপভাবে اَنْظُرْ اِلَيْكَ এর স্থলে বলতেন। অর্থাৎ তারা যেন আপনাকে দেখে নেয়। দ্বিতীয়তঃ উক্ত আয়াতে স্থিরতা ও স্থিতি নিঃশর্ত বা মুতলাক; নড়াচড়া বা গতিশীলতার সাথে শর্তযুক্ত নয়।

প্রথম প্রশ্নের স্বতন্ত্র জবাব

قَوْلُهُ: عَلٰى اَنَّ الْقَوْمَ الخ ঃ যৌথভাবে প্রশ্নদ্বয়ের উভয় প্রদানের পর এখন পৃথকভাবে উত্তর দেওয়া হচ্ছে। প্রথম প্রশ্নের জবাব হল, হযরত মূসা (আ.) এর জাতি যারা لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً বলেছিল, তারা যদি মুমিন হয়ে থাকে তাহলে মূসা (আ.) এর পক্ষে শুধুমাত্র এতটুকু বলে দেওয়াই যথেষ্ট ছিল যে, আল্লাহ পাকের দর্শন অসম্ভব। কাজেই এমন দরখাস্ত করা সমীচীন নয়। আর যদি কাফির হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে মূসা (আ.) কে সত্যায়ণ করত না। মোটকথা, সর্বাবস্থায় দর্শনের দরখাস্ত অহেতুক ও অনর্থক হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের স্বতন্ত্র উত্তর

قَوْلُهُ: وَالْاِسْتِقْرَارُ الخ ঃ এটি দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর। অর্থাৎ যদি মুআল্লাক আলাইহি তথা স্থিতি দ্বারা গতিশীলতায় স্থিতি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, যেমন প্রতিপক্ষ প্রশ্নকারী বলেছেন, তাহলে তা-ও সম্ভব। কারণ হয়ত নড়াচড়া বা গতির স্থানে স্থিতি ও স্থিরতা চলে আসবে। আর তা অসম্ভব নয় বরং অসম্ভব তো গতিশীল ও স্থিরতার জমায়েত।

وَاجِبَةٌ بِالنَّقْلِ وَقَدْ وَرَدَ الدَّلِيْلُ السَّمْعِىُّ بِاِيْجَابِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى فِى الدَّارِ الْاٰخِرَةِ اَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالٰى وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَاَمَّا السُّنَّةُ فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَهُوَ مَشْهُوْرٌ رَوَاهُ اَحَدٌ وَعِشْرُوْنَ مِنْ اَكَابِرِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَاَمَّا الْاِجْمَاعُ فَهُوَ اَنَّ الْاُمَّةَ كَانُوْا مُجْمِعِيْنَ عَلٰى وُقُوْعِ الرُّؤْيَةِ فِى الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ الْاٰيَاتِ الْوَارِدَةَ فِىْ ذَالِكَ مَحْمُوْلَةٌ عَلٰى ظَوَاهِرِهَا ثُمَّ ظَهَرَتْ مَقَالَةُ الْمُخَالِفِيْنَ وَشَاعَتْ شُبَهُهُمْ وَتَاوِيْلَاتُهُمْ

সহজ তরজমা

আল্লাহ পাকের দর্শন তথা চর্মচোখে পরিদৃষ্ট হওয়া

নকলী দলীল দ্বারা প্রমাণিত। আর পরকালে আল্লাহ তাআলাকে মুমিনদের দর্শনের প্রমাণ স্বরূপ নকলী দলীল অবতীর্ণ হয়েছে। যা হোক, কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– বহুলোক সেদিন হাস্যোজ্জল থাকবে। আপন প্রতিপালককে দেখবে। আর সুন্নাতে রাসূলে রয়েছে, নবীজি ইরশাদ করেছেন– তোমরা আপন প্রতিপালককে দেখবে, যেভাবে পূর্ণিমা রাতে চাঁদ দেখতে পাও। আর এটি হাদীসে মাশাহুর; যা একুশজন বড় বড় সাহাবায়ে কিরাম বর্ণনা করেছে। তাছাড়া ইজমা হল, পরকালে আল্লাহপাকের দীদার লাভ হওয়া এবং এ ব্যাপারে অবতীর্ণ আয়াতে কারীমা তার বাহ্যিক অর্থে প্রযোজ্য –এর উপর উম্মত একমত। পরবর্তীতে বিরোধীদের বক্তব্য প্রকাশ পায় এবং তাদের সংশয় ও ব্যাখ্যা-বিবৃতি ব্যাপকতা লাভ করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

নকলী দলীলের আলোকে পরকালে আল্লাহর দর্শন

ইতোপূর্বে মূল গ্রন্থকার বলেছিলেন– আল্লাহপাকের দর্শন তথা পরিদৃষ্ট হওয়া যৌক্তিকভাবে সম্ভব। আর এখানে বলছেন– পরকালে মুমিন বান্দাদের জন্য আল্লাহর দর্শন লাভ ও দর্শন সংঘটিত হওয়া নকলী দলীল দ্বারা স্বাব্যস্ত। আর যে জিনিস যৌক্তিক এবং দালায়েলে নকলী তথা কুরআন-সুন্নাহ তার বাস্তবতার সংবাদ দেয়, তার সত্যায়ণ বা তা স্বীকৃত দান অত্যাবশ্যক। পরকালে ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ পাকের দীদার নসীব হওয়ার ব্যাপারে নকলী দলীল কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূল ও ইজমা রয়েছে।

কিতাবুল্লাহর দলীল হল, আল্লাহ তা'আলার বাণী وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَه اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَه
এতে মহল্লে ইস্তিশহাদ বা দলীলের মূলস্থান اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَه কেননা اِلٰى অব্যয়টি نَاظِرَه এর সিলা। যখন نظر শব্দটি اِلٰى অব্যয় যোগে মুতা'আদ্দী হয় তখন তার অর্থ হয় رُؤْيَت বা দর্শন। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষের দাবী মতে اِلٰى হরফ নয় বরং ইসম এবং الاء এর মুফরাদ বা একক। যার অর্থ, নেয়ামত। আর نَاظِرَة অর্থ مُنْتَظِرَة। এর মর্মার্থ হচ্ছে, মুমিনগণ জান্নাতে স্বীয় প্রতিপালকের নেয়ামতরাজির অপেক্ষা করবে। কথাটি নিতান্তই অযৌক্তিক এবং আয়াতে কারীমার নির্দেশনার সম্পূর্ণ বিরোধী। কেননা আয়াতটি ঈমানদারদের জন্য সুসংবাদ প্রদান এবং একথা জানানোর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে যে, ঈমানদারদের জন্য সেখানে কেবল আনন্দই আনন্দ; দুঃখ-যন্ত্রনার লেশ মাত্রও নেই। আর অপেক্ষাকে اَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ –মৃত্যুর চেয়ে কঠিন বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে কাফিরদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার আলোচনার স্থানে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন– كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوْبُوْنَ (অর্থাৎ কাফিররা সেদিন আল্লাহ তা'আলার দীদার থেকে বঞ্চিত হবে।) আর তা কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণ হবে, যখন এই মাহরূমী বা বঞ্চিত হওয়া তাদের সাথেই সুনির্দিষ্ট হবে এবং ঈমানদারগণ আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভে ধন্য হবে।

সুন্নাতে রাসূলের দলীল হল, একাধারে একুশজন সাহাবায়ে কিরামের বর্ণিত হাদীসের মাশহূর অর্থাৎ হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে পূর্ণিমা রাতের আলোকোজ্জ্বল চন্দ্রের মতই দেখতে পাবে।

তৃতীয় দলীল ইজমা ঃ বিদ্রোহী প্রতিপক্ষের আবির্ভাবের পূর্বে এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা হয়েছে যে, পরকালে আল্লাহ তা'আলার দীদার হবে। তৎসঙ্গে দীদার বাস্তব হওয়ার ব্যাপারে অবতীর্ণ আয়াত তার বাহ্যিক অর্থে ব্যবহৃত বলেও উম্মতের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদী প্রতিপক্ষ যেমন মুতাযিলা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়েছে পরবর্তীকালে। ব্যাখ্যাতার উক্তি ثُمَّ ظَهَرَتْ এর দ্বারাও তা-ই সুস্পষ্ট অনুমেয়।

وَاَقْوٰى شُبَهِهِمْ مِنَ الْعَقْلِيَّاتِ اَنَّ الرُّؤْيَةَ مَشْرُوْطَةٌ بِكَوْنِ الْمَرْئِىِّ فِىْ مَكَانٍ وَجِهَةٍ وَمُقَابَلَةٍ مِنَ الرَّائِىْ وَثُبُوْتِ مَسَافَةٍ بَيْنَهُمَا بِحَيْثُ لَايَكُوْنُ فِىْ غَايَةِ الْقُرْبِ وَلَافِىْ غَايَةِ الْبُعْدِ وَاتِّصَالِ شُعَاعٍ مِنَ الْبَاصِرَةِ بِالْمَرْئِىِّ وَكُلُّ ذَالِكَ مُحَالٌ فِىْ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْجَوَابُ مَنْعُ هٰذَا الْاِشْتِرَاطِ وَاِلَيْهِ اَشَارَ بِقَوْلِهِ فَيُرٰى لَا فِىْ مَكَانٍ وَلَا عَلٰى جِهَةٍ مِنْ مُقَابَلَةٍ وَاتِّصَالِ شُعَاعٍ اَوْثُبُوْتِ مَسَافَةٍ بَيْنَ الرَّائِىْ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَقِيَاسُ الْغَائِبِ عَلَى الشَّاهِدِ فَاسِدٌ

সহজ তরজমা

আর মুতাযিলাদের শক্তিশালী যৌক্তিক দলীল সমূহের একটি হচ্ছে, দৃশ্যমান বস্তু কোন দিক ও স্থানে থাকা, দর্শকের সামনে থাকা। দর্শক ও দৃষ্ট বস্তুর মধ্যে নাতিদীর্ঘ দূরত্ব থাকা এবং দৃশ্যমান বস্তুর সাথে চোখের জ্যোতি মিলিত হওয়া দর্শনের জন্য শর্ত। এসব কটিই আল্লাহ তা'আলার বেলায় অসম্ভব। জবাব হচ্ছে, এসব জিনিসের শর্ত হওয়া স্বীকার করি না। অনুরূপভাবে মূলগ্রন্থকার উপরিউক্ত বক্তব্য দ্বারা ইংগিত করেছেন, আল্লাহ তা'আলা

পরিদৃষ্ট হবেন। কিন্তু তিনি কোন দিক বা স্থানে অবস্থানের কিংবা চোখের জ্যোতির সাথে সংশ্লিষ্ট নন। দর্শক ও আল্লাহ পাকের মধ্যে (কোন প্রকার) দূরত্বের প্রমাণ নেই। আর অদৃশ্য বা অনুপস্থিতকে উপস্থিতের উপর কেয়াস করা অমূলক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রতিপক্ষের শক্তিশালী দলীল

আল্লাহর দর্শন সম্পর্কে প্রতিপক্ষ মু'তাযিলা প্রমুখদের নকলী দলীলের মত যৌক্তিক দলীলও রয়েছে। যৌক্তিক দলীলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী দলীল হচ্ছে, কোন জিনিসের দর্শন তথা পরিদৃষ্ট হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত আছে। যথা–

(১) দৃষ্ট বস্তু কোন দিক বা স্থানে থাকা।

(২) দর্শক বা দ্রষ্টার বিপরীত এবং সামনে থাকা।

(৩) দর্শক বা দ্রষ্টা এবং দৃষ্ট বা দৃশ্যমান বস্তুর মাঝে নাতিদীর্ঘ দূরত্ব থাকা। কেননা যেভাবে অধিক দূরত্ব দর্শনের অন্তরায় তদ্রুপ নিকট দূরত্ব বা অতিনৈকট্যও দর্শনের জন্য অন্তরায়। যেমন, আমরা স্বীয় নাসিকা চেহারা ইত্যাদি চোখের অতি নিকটবর্তী হওয়ার কারণে স্বচক্ষে দেখি না।

(৪) দ্রষ্টা বা দর্শকের চোখ থেকে বিচ্ছুরিত জ্যোতি দৃশ্যমান বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া।

উপরিউক্ত চারটি শর্তের কোনটিই আল্লাহর পাকের সত্ত্বায় পাওয়া যায় না। প্রথমোক্ত শর্তদ্বয় না থাকা তো সুস্পষ্ট। আর তৃতীয় শর্ত না থাকা আয়াতে কারীমা نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ দ্বারা প্রমাণিত। মোটকথা, যখন দর্শন বা দীদারের উপরিউক্ত শর্তাবলি আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বার মধ্যে পাওয়া যায় না তখন আল্লাহ পাকের দর্শনও অসম্ভব।

জবাব ঃ দর্শন বা দীদারের জন্য উপরিউক্ত শর্তাবলী আমরা স্বীকার করি না বরং আমরা বলি, দর্শন বা দীদার শুধুমাত্র আল্লাহর সৃষ্টফল। উপরিউক্ত শর্তাবলির উপস্থিতি সত্ত্বেও আল্লাহ চাইলে দর্শন বা দীদার না হওয়া যৌক্তিক। যেমন, বিড়াল আঁধার রাতে ইদুর দেখে। অথচ আমরা দেখি না। জ্বিনে ধরা মানুষ জ্বিন দেখে। তার সাথে কথা বলে। অথচ আমরা দেখি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরাঈল আমীনকে দেখতেন; সাহাবায়ে কিরাম সচরাচর দেখতেন না।

অনুরূপভাবে উপরিউক্ত শর্তাবলির উপস্থিতি ছাড়াও দর্শন বা দীদার বাস্তবায়িত হওয়া যৌক্তিক। যেমন, আমরা স্থান দেখি। অথচ স্বয়ং তা কোন স্থানে নয়। নতুবা তাসালসুল (একই জিনিসের বরাবর পুনবাবৃত্তি) আবশ্যক হবে। বেশি থেকে বেশি বলা যেতে পারে যে, উপরিউক্ত বিষয়গুলো দর্শন বা দীদারের স্বভাবগত শর্ত; আবশ্যক শর্ত নয়। অর্থাৎ স্বভাবতঃ কোন জিনিস দেখা এসব শর্ত সাপেক্ষে হয়ে থাকে, কিন্তু স্বভাব বিরুদ্ধ কিছু হওয়াও স্বম্ভব। কাজেই স্বভাব পরিপন্থী আল্লাহ তা'আলার পরিদৃষ্ট হওয়া বা দীদারও সম্ভব। অথচ তিনি দিক বা স্থানে অবস্থানরত নন এবং তিনি বান্দার অতি নিকটবর্তিও বটে। যেমন, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই ঘোষণা করেছেন- আমি বান্দার শাহরগ অপেক্ষাও তার অতি নিকটবর্তী।

একটি প্রশ্নের জবাব

قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ الْغَائِبِ الخ ঃ এ বাক্য একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন হল, উপরিউক্ত বিষয়গুলো বিরাজমান বা বিদ্যমান যাবতীয় জিনিসের দর্শনের জন্য শর্ত। তাহলে আল্লাহপাকের দর্শনের জন্য কেন শর্ত হবে না?

জবাবের সারকথা হল, আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তি বহির্ভূত অদৃশ্য আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বাকে এই অনুভূত, জাগতিক বিদ্যমান বস্তুর উপর কিয়াস করা (অনুমান করা) ভুল।

আবার আল্লাহপাকের দর্শন অস্বীকারের ক্ষেত্রে মুতাযিলাদের প্রদত্ত যৌক্তিক দলীলের জবাব কিছুটা ছাড় দিয়ে দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং আমরা যদি দীদারের বেলায় উপরিউক্ত বিষয়গুলো শর্তসাপেক্ষ বলে স্বীকৃতি দেই, তাহলে সেগুলো শুধু মাত্র এই পার্থিব জগতে শর্ত গণ্য হবে কিংবা জওহর বা আরাযের দর্শনের জন্য শর্ত হবে। আলমে গায়েব (অদৃশ্য জগত) তথা আখেররাতকে এই দৃশ্যজগৎ ও মর্তের বা দুনিয়ার উপর অনুরূপভাবে ইন্দ্রিয় শক্তির উর্ধ্বে আল্লাহপাকের সত্ত্বাকে এ পার্থিব জগতের অনুভূত জিনিসের উপর কিয়াস করা ভুল।

وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلٰى عَدَمِ الْاِشْتِرَاطِ بِرُؤْيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِيَّانَا وَفِيْهِ نَظَرٌ لِاَنَّ الْكَلَامَ فِى الرُّؤْيَةِ بِحَاسَّةِ الْبَصَرِ فَاِنْ قِيْلَ لَوْكَانَ جَائِزَ الْوُجُوْدِ وَالْحَاسَّةُ سَلِيْمَةٌ وَسَائِرُ الشَّرَائِطِ مَوْجُوْدَةٌ لَوَجَبَ اَنْ يُّرٰى وَاِلَّا جَازَ اَنْ يَّكُوْنَ بِحَضْرَتِنَا جِبَالٌ شَاهِقَةٌ لَانَرَاهَا وَاِنَّهَاسَفْسَطَةٌ قُلْنَا مَمْنُوْعٌ فَاِنَّ الرُّؤْيَةَ عِنْدَنَا بِخَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَلَاتَجِبُ عِنْدَ اِجْتِمَاعِ الشَّرَائِطِ

সহজ তরজমা

আবার কখনও কখনও (আল্লাহর দীদারের জন্য উপরিউক্ত বিষয়গুলো) শর্ত না হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আমাদেরকে দেখার দ্বারা প্রমাণ দেওয়া হয়। আর এতে আপত্তি রয়েছে। কেননা কথা হচ্ছে, চর্মচোখে আল্লাহকে দেখা সম্পর্কে। এরপর যদি প্রশ্নকরা হয়, আল্লাহ পকের দর্শনের অস্তিত্ব যদি সম্ভাব্য হয়, আমাদের চর্মচক্ষুও কার্যক্ষম থাকে এবং দর্শনের যাবতীয় শর্তাবলী বিদ্যমান থাকে, তাহলে আল্লাহপাকের পরিদৃষ্ট হওয়া অত্যাবশ্যক। নতুবা আমাদের সামনে সুউচ্চ পর্বত থাকলেও তা পরিদৃষ্ট না হওয়া অবশ্যম্ভাবী হতে হবে। আর তা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা ও বাস্তবতা পরিপন্থী। প্রত্যুত্তরে বলব– আমরা তা মানি না। কেননা আমাদের মতে আল্লাহপাকের সৃষ্টির কারণে দর্শন বা দীদার হয়ে থাকে। সুতরাং শর্তসমূহের জমায়েত হওয়ার সময় (দর্শন) ওয়াজিব নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মু'তাযিলাদের শর্তাবলির আরেকটি জবাব

কেউ কেউ আল্লাহপাকের দীদার সম্পর্কে মুতাযিলাদের বিবৃত বিষয়গুলো শর্ত না হওয়ার ব্যাপারে নিম্নোক্ত প্রমাণ পেশ করেন। তারা বলেন– আল্লাহপাক আমাদেরকে দেখেন। অথচ উপরিউক্ত শর্তাবলীর কোনও কোনটি দর্শকের মধ্যে থাকা জরুরী। যেমন, দর্শকের চোখের জ্যোতি দৃষ্ট বস্তুকে স্পর্শ করা এবং দর্শক ও দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে নাতিদীর্ঘ দূরত্ব থাকা (ইত্যাদি) আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্ত্বায় পাওয়া যায় না। ঠিক তদ্রুপভাবে উপরিউক্ত শর্তের উপস্থিতি ছাড়াই তিনি আমাদেরকে দেখা দেবেন।

উক্ত প্রমাণের উপর ব্যাখ্যাতা একটি প্রশ্নারোপ করেছেন। অর্থাৎ চর্মরোখে আল্লাহর দীদার লাভ করা নিয়ে কথা চলছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আমাদেরকে দেখা চর্মচোখে নয়।

মু'তাযিলাদের একটি যৌক্তিক সন্দেহ

قَوْلُهُ: فَاِنْ قِيْلَ الخ ঃ এটি আল্লাহ পাকের দর্শনের সম্ভাব্যতা নিয়ে মুতাযিলাদের যৌক্তিক সন্দেহ। যাকে شُبْهَةُ الموانع বলা হয়। সন্দেহের সারকথা হল, দর্শকের দৃষ্টিশক্তি সঠিক থাকলেই যদি আল্লাহকে দেখা সম্ভব হত তাহলে প্রত্যেক সুস্থ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন লোকই তাকে দেখতে পেত। আর যদি তোমরা বল, শর্তের উপস্থিতি সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের পরিদৃষ্ট হওয়া আবশ্যক নয়, তাহলে ইন্দ্রিয় শক্তির উপর নির্ভরতাই নিঃশেষ হয়ে যায়। অধিকন্তু আমাদের সামনে সুউচ্চ পাহাড়-পর্বত আছে। কিন্তু সুস্থ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন থাকা সত্ত্বেও ঐ পাহাড় আমাদের কাছে পরিদৃষ্ট না হওয়া উচিৎ। আর তা বাতিল। উত্তর হল, উপরিউক্ত শর্তদ্বয় অর্থাৎ আল্লাহর দীদার সম্ভাব্য হওয়া এবং আমাদের সুস্থ দৃষ্টিশক্তির ফলে দীদার বাস্তবায়িত হওয়ার আবশ্যকীয়তা স্বীকৃতি নয়। কেননা দীদার বা দর্শন আমাদের মতে আল্লাহর সৃষ্ট ফল। শর্তাবলি পাওয়া গেলে তা বাস্তবায়িত হওয়া জরুরী নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা না চাইবেন।

وَمِنَ السَّمْعِيَّاتِ قَوْلُهُ لَاتُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَالْجَوَابُ بَعْدَتَسْلِيْمِ كَوْنِ الْأَبْصَارِ لِلْاِسْتِغْرَاقِ وَإِفَادَتِهِ عُمُوْمَ السَّلْبِ لَاسَلْبَ الْعُمُوْمِ وَكَوْنُ الْإِدْرَاكِ هُوَ الرُّؤْيَةَ مُطْلَقًا لَا الرُّؤْيَةَ عَلٰى وَجْهِ الْإِحَاطَةِ بِجَوَانِبِ الْمَرْئِيِّ اَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِيْهِ عَلٰى عُمُوْمِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَحْوَالِ

সহজ তরজমা

শ্রুত বা নকলী প্রমাণদির মধ্যে মু'তাযিলীদের সবচেয়ে শক্তিশালি প্রমাণ হল, আল্লাহ তা'আলার বাণী لَاتُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ অর্থাৎ তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন (দৃষ্টিশক্তি তার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। সূরা আন'আম-১৩০) আর اَلْأَبْصَارُ এর আলিফ-লাম ইসতিগরাগের জন্য হওয়া এবং سَلْبُ الْعُمُوْمِ এর জন্য না হয়ে عُمُوْمُ السَّلْبِ বুঝানো তদ্রুপ اِدْرَاك শব্দ দ্বারা দর্শনীয় বস্তুর যাবতীয় দিক পরিবেষ্টন না করে ব্যাপক দর্শন উদ্দেশ্য হওয়া (এসব) জেনে নেওয়ার পর জবাব হল, আল্লাহ তা'আলার উক্ত বাণীর মধ্যে সর্বদা ও সর্বাবস্থায় ব্যাপক হওয়ার ব্যাপারে (আদৌ) কোন প্রমাণ নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রতিপক্ষের নকলী দলীল ঃ শারেহ রহ. এখানে আল্লাহর দর্শনের অসম্ভাব্যতার ব্যাপারে মুতাযিলীদের যৌক্তিক দলীল ও তার জবাব আলোচনার পর তাদের নকলী দলীল ও তার জবাব আলোচনা করছেন। এ ব্যাপারে তাদের সর্বাধিক শাক্তিশালী দলীল হল, আল্লাহপাকের বাণী لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ অর্থাৎ তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন। কেননা اَلْأَبْصَارُ শব্দটি বহুবচনও মুআর্‌রফ বিল্লাম- আর উলামায়ে উসূল ও আরবী এবং মুফাসিরীনে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, মুআররফ বিল্লাম বহুবচন ইসতিগরাকের জন্য আসে। কাজেই اِدْرَاك তথা দর্শনের নিষেধাজ্ঞা সকল চর্মচোখের উপরই আরোপিত হবে। আর উপরিউক্ত আয়াতে কারীম لَا يُدْرِكُهُ بَصَرٌ مِنَ الْأَبْصَارِ অর্থে প্রযোজ্য; যা সালেবায়ে কুল্লিয়্যাহ। অর্থাৎ কোনও মুমিন কিংবা কাফির চর্মচোখে আল্লাহকে দেখতে পারবে না। শারেহ রহ. عَلٰى سَبِيْلِ التَّنَزُّلِ (নিচে নেমে) এর চারটি জবাব দিয়েছেন।

উক্ত প্রশ্নের চারটি জবাব

(১) বহুবচনের সীগায় আলিফ-লাম দাখেল হলে ইসতিগরাকের অর্থ দেয়, যদি আহ্‌দে খারেজী উদ্দেশ্য নেওয়ার কোনও নিদর্শন না থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে নছ দ্বারা মুমিনদের চক্ষুযুগল আল্লাহর দর্শন লাভ করবে বলে প্রমাণিত। এতে বুঝা যায়, এখানে اَلْأَبْصَارُ এর আলিফ-লাম আহদে খারেজীর জন্য। আর এর দ্বারা কাফিরদের চক্ষু উদ্দেশ্য। আয়াতের মর্মার্থ হল, কাফিরদের দৃষ্টিশক্তি আল্লাহকে দেখবে না।

(২) আমরা যদি اَلْأَبْصَار এর الف ও لام কে اِسْتِغْرَاقِي বলে স্বীকারও করি, তথাপি তোমাদের উদ্দেশ্য অর্থাৎ عُمُوْمُ السَّلْب এবং سَلْبُ كُل এর উপর আয়াতের ইঙ্গিতাবহ হওয়া প্রমাণিত হয় না। কাজেই আমরা বলি, আয়াতটি سَلْب عُمُوْم এর উপর ইংগিতবহ। কেননা تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ বাক্যটির আলিফ-লাম اِسْتِغْرَاقِي হওয়ার সময় يُدْرِكُهُ كُل এর অর্থে প্রযোজ্য হবে। যা مُوْجِبَه كُلِّيَّه তারপর এর শুরুতে যখন হরফে নফী لا প্রবিষ্ট হল, তখন اِيْجَاب كُل بَصَر বিলুপ্ত হয়ে গেল। আর আয়াতের অর্থ দাঁড়াল, لَاتُدْرِكُهُ جَمِيْعُ الْأَبْصَارِ অর্থাৎ সমস্ত চর্মচক্ষু তাকে দেখবে না। আর তা عُمُوْم السَّلْب নয় বরং سَلْبُ الْعُمُوْم অর্থাৎ কতিপয় চক্ষু তথা মুমিন বান্দার চক্ষু দর্শনের পরিপন্থী নয়।

(৩) আয়তটি سَلْب كُل ও عُمُوْم السَّلْب এর ইংগিতবহ বলে স্বীকৃতি দিলেও আমরা স্বীকার করি না যে, আয়াতে ادراك দ্বারা ব্যাপক দর্শন উদ্দেশ্য বরং আমরা বলি, اِدْرَاك এর উদ্দেশ্য, দর্শনীয় বস্তুর সর্বদিক-সীমা পরিবেষ্টন করে দেখা, এমন যেন না হয় তার কোন দিক দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়। যেমন কথিত আছে, رَاَيْتُ الْهِلَالَ وَمَا اَدْرَكْتُهُ অর্থাৎ আমি চন্দ্র দেখেছি, কিন্তু তা দৃষ্টির বাউণ্ডুলে আনতে পারি নি। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, কোন দৃষ্টিশক্তিই তাকে পরিবেষ্টন করতে পারবে না। একথা আমরাও বলি যে, ঈমানদারগণ আল্লাহকে দেখবে ঠিক কিন্তু তাকে দৃষ্টির বাউণ্ডুলে নিতে কিংবা পরিবেষ্টন করতে পারবে না।

(৪) উপরিউক্ত বিষয়গুলো সব মেনে নেওয়ার পর চতুর্থ জবাব হল, এ আয়াতে কারীমায় ادراك তথা দীদার বা দর্শনের নফী (নিষেধাজ্ঞা) সর্বসময় ও সর্বাবস্থায় সম্পৃক্ত থাকার কোনও প্রমাণ নেই। কাজেই তাকে কিছু সময় যেমন পার্থিব জগতের সাথে খাস করে থাকি। এমতাবস্থায় আয়াতের মর্মার্থ হবে, দুনিয়ায় কোন দৃষ্টিশক্তি আল্লাহকে দেখতে পারে না। আবার আখেরাতের কতিপয় অবস্থার সাথেও খাস করি। তখন আয়াতের মর্মার্থ হবে, পরকালে কোন কোন অবস্থায় কোন দৃষ্টিশক্তি আল্লাহকে দেখতে পাবে না। এ কথা আমরাও স্বীকার করি যে, জান্নাতে ঈমানদারগণ সর্বাবস্থায়ই দর্শন লাভ করবে না বরং কিছু সময়ই দর্শন লাভ করবে। কেউ প্রতি শুক্রবার মাত্র একবার, আবার কেউ প্রতিদিন দুইবার আল্লাহ পাকের দর্শন লাভ করবে। আবার কেউ প্রতি শুক্রবার দুইবার দর্শন লাভ করবে। যেমনটি হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে।

وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِالْآيَةِ عَلٰى جَوَازِ الرُّؤْيَةِ إِذْلَوِ امْتَنَعَتْ لَمَا حَصَلَ التَّمَدُّحُ بِنَفْيِهَا كَالْمَعْدُوْمِ لَايُمْدَحُ بِعَدَمِ رُؤْيَتِهٖ لِاِمْتِنَاعِهَا وَاِنَّمَا التَّمَدُّحُ فِىْ اَنْ يُمْكِنَ رُؤْيَتُهٗ وَلَايُرٰى لِلتَّمَنُّعِ وَالتَّعَزُّزِ بِحِجَابِ الْكِبْرِيَاءِ وَاِنْ جَعَلْنَا الْاِدْرَاكَ عِبَارَةً عَنِ الرُّؤْيَةِ عَلٰى وَجْهِ الْاِحَاطَةِ بِالْجَوَانِبِ وَالْحُدُوْدِ فَدَلَالَةُ الْاٰيَةِ عَلٰى جَوَازِ الرُّؤْيَةِ بَلْ تَحَقُّقِهَا اَظْهَرُلِاَنَّ الْمَعْنٰى اَنَّهٗ مَعَ كَوْنِهٖ مَرْئِيًّا لَايُدْرَكُ بِالْاَبْصَارِ لِتَعَالِيْهِ عَنِ التَّنَاهِىْ وَالْاِتِّصَافِ بِالْحُدُوْدِ وَالْجَوَانِبِ

সহজ তরজমা

আবার কখনও উক্ত আয়াত দ্বারা দর্শনের সম্ভাব্যতার প্রমাণ দেওয়া হয়। কেননা দর্শন অসম্ভব হলে তার নফী (নিষেধাজ্ঞা) দ্বারা প্রশংসা হত না। যেমন, অস্থিত্বহীন বস্তু পরিদৃষ্ট না হওয়ার কারণে প্রশংসা করা হয় না। কেননা তা তার দর্শনই অসম্ভব। প্রশংসা তো ঐ জিনিসের হয়ে থাকে, যা পরিদৃষ্ট হওয়া সম্ভব। কিন্তু বড়ত্বের পর্দা থাকায় জটিলতা এবং অন্তরায় থাকার কারণে পরিদৃষ্ট হয় না। আমরা যদি اِدْرَاك শব্দ দ্বারা দর্শনীয় বস্তুর সীমানা ও দিকসমূহ পরিবেষ্টন করে দেখা উদ্দেশ্য নেই, তাহলে আয়াতের ইংগিত দর্শনের সম্ভাব্যতার উপর বরং বাস্তব দর্শনের উপর অধিক সুস্পষ্ট। কেননা তখন অর্থ দাঁড়াবে, তিনি পরিদৃষ্ট ও দৃশ্যমান হওয়া সত্ত্বেও চর্মচোখে সবদিক থেকে পরিদৃষ্ট হবেন না। কেননা তিনি পরিসীমা ও দিক থেকে পুতঃপবিত্র।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রতিপক্ষের আরেকটি প্রমাণ

মুতাযিলীরা لَاتُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ আয়াতে কারীমা দ্বারা দর্শনের অসম্ভাব্যতার উপর আরেক পদ্ধতিতে দলীল দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রশংসার স্থানে নিজের দর্শনের নফী (নিষেধাজ্ঞা আরোপ) করেছেন। আর যে জিনিসের নফী প্রশংসার কারণ তার অস্তিত্ব ত্রুটির কারণ, কাজেই দর্শনের অস্তিত্ব বা প্রমাণ ত্রুটিপূর্ণ (দর্শন সাব্যস্ত হওয়া দোষণীয়)। আর ত্রুটির সাথে আল্লাহ পাকের সংযুক্ত হওয়া বা কোন দোষে দুষ্ট হওয়া আল্লাহ তা'আলার জন্য অসম্ভব। অতএব তার দর্শনও অসম্ভব।

আমাদের জবাব

আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কতিপয় উলামায়ে কিরাম তাদের উক্ত দলীলের প্রতিবাদ করে বলেন– উপরিউক্ত আয়াতে কারীমা আল্লাহর দর্শনের অসম্ভাব্যতার ব্যাপারে নয় বরং দর্শনের বৈধতা ও সম্ভাব্যতার প্রতি ইঙ্গিতবহ। কেননা আল্লাহ তা'আলা পরিদৃষ্ট না হওয়ার আলোচনা করেছেন প্রশংসার স্থানে। আর সম্ভাব্যতার নফীই প্রশংসার কারণ হয়ে থাকে। যদি আল্লাহর দর্শন অসম্ভব হত, তাহলে তার নফী আদৌ কোন প্রশংসাযোগ্য কাজ হত না। যেমন, অস্তিত্বহীন বস্তুর দর্শন অসম্ভব। কাজেই দর্শনের নফী দ্বারা তার প্রশংসা করা যেত না। প্রশংসা তো হয় আল্লাহর দর্শনের সম্ভাব্যতা নিয়ে। তদুপরি তার বড়ত্ব ও মাহাত্ম পর্দা হয়ে দাঁড়াবে এবং তিনি পরিদৃষ্ট হবেন না। উপরিউক্ত প্রতিবাদকে مُعَارَضَه قَلْبِيَه তথা পাল্টা প্রশ্ন বলা হয়। অর্থাৎ প্রতিপক্ষের প্রমাণ উল্টিয়ে স্বপক্ষে প্রমাণ বানানো।

قَوْلُهٗ: وَاِنْ جَعَلْنَا الْاِدْرَاكَ الخ ঃ অর্থাৎ উপরিউক্ত আয়াতে কারীমায় "এদরাক' শব্দ দ্বারা যদি এমনভাবে দেখা উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, যাতে দর্শনীয় বস্তুর যাবতীয় পরিসীমা এবং সর্বদিক থেকে পরিবেষ্টিত হয়ে যায় এবং কোন দিকই দৃষ্টির আড়ালে না থাকে, তাহলে মাফহূমে মুখালেফ তথা বিপরীত মর্মার্থ কিংবা বাচনভঙ্গি দ্বারা কেবল দর্শনের সম্ভাব্যতার উপরেই নয় বরং তা বাস্তব হওয়ার উপরেও আয়াতে কারীমা অধিকতর সুস্পষ্ট। কেননা এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে, আল্লাহ তা'আলা পরিদৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কারও দৃষ্টিশক্তির পরিসীমায় বা পরিবেষ্টিনে আসবে না। পরিবেষ্টনে কেবল সে জিনিসই আসতে পারে, যা সসীম এবং যার সীমা ও বিভিন্ন দিক রয়েছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা সসীম, সীমাবদ্ধ ও দিগন্ত বিস্তৃত হওয়া থেকে পুতপবিত্র। যেমন, ইতোপূর্বে তান্‌যীহাতের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

وَمِنْهَا اَنَّ الْاٰيَاتِ الْوَارِدَةَ فِىْ سُؤَالِ الرُّؤْيَةِ مَقْرُوْنَةٌ بِالْاِسْتِعْظَامِ وَالْاِسْتِكْبَارِ وَالْجَوَابُ اَنَّ ذَالِكَ لِتَعَنُّتِهِمْ وَعِنَادِهِمْ فِىْ طَلَبِهِمْ لَا لِامْتِنَاعِهَا وَاِلَّا لَمَنَعَهُمْ مُوْسٰى عم عَنْ ذَالِكَ كَمَا فَعَلَ حِيْنَ سَأَلُوْا اَنْ يَّجْعَلَ لَهُمْ اٰلِهَةً فَقَالَ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ وَهٰذَا مُشْعِرٌ بِاِمْكَانِ الرُّؤْيَةِ فِى الدُّنْيَا وَلِهٰذَا اِخْتَلَفَتِ الصَّحَابَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فِىْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ هَلْ رَاٰى رَبَّهٗ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ اَمْ لَا وَالْاِخْتِلَافُ فِى الْوُقُوْعِ دَلِيْلُ الْاِمْكَانِ وَاَمَّا الرُّؤْيَةُ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ حُكِيَتْ عَنْ كَثِيْرٍ مِنَ السَّلَفِ وَلَا خَفَاءَ فِىْ اَنَّهَا نَوْعُ مُشَاهَدَةٍ يَكُوْنُ بِالْقَلْبِ دُوْنَ الْعَيْنِ

সহজ তরজমা

মুতাযিলীদের নকলী দলীলের মধ্যে রয়েছে সেসব আয়াত, যেগুলো দর্শনের আবেদন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং অহঙ্ককার ও দাম্ভিকতাপূর্ণ। এর জবাব হল, নিঃসন্দেহে এ তাদের দাম্ভিকতা ও অবাধ্যতা এবং নিজেদের দাবী-দাওয়ায় হঠকারিতার দরুন; দর্শনের অসম্ভাব্যতার কারণে নয়। নতুবা মূসা (আ.) তাদেরকে এ ব্যাপারে বারণ করতেন। যেভাবে বারণ করেছিলেন যখন বনী ইসরাঈল আবেদন করেছিল– মূসা (আ.) যেন তাদের জন্য উপাস্য নিরূপণ করে দেন। তখন তিনি বলেছিলেন, "বরং তোমরা নির্বোধ সম্প্রদায়।" আর তা দুনিয়ায় দর্শনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে অবহিত করে। এজন্যই সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) "মেরাজের রজনীতে নবীজী আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন কি না –এ নিয়ে মতবিরোধ করেছেন। বস্তুতঃ এ মতবিরোধই সম্ভাব্যতার প্রমাণ। তবে স্বপ্নযোগে আল্লাহ তা'আলাকে দেখার ব্যাপারটি বহু বুযুর্গানে দ্বীন থেকে বর্ণিত আছে। এতে কোন অস্পষ্টতা নেই যে, তা এক ধরনের প্রত্যক্ষ করা বা বাস্তব দর্শন, যা অন্তরে হয়; চর্মচোখে নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মু'তাযিলাদের আরেকটি নকলী দলীল

আল্লাহর দর্শনের অসম্ভাব্যতার ব্যাপারে মুতাযিলীদের দ্বিতীয় নকলী দলীল হল, সেসব আয়াতে কারীমা, যাতে দর্শনের আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। সাথে সাথে ঐ আবেদনকে দাম্ভিকতা ও অবাধ্যতার প্রতীক সাব্যস্ত করেছেন এবং আবেদন কারীদেরকে শাস্তি দানের কথা বলেছেন। যেমন,

(১) فَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَائَنَا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰئِكَةُ اَوْنَرٰى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيْرًا

(২) وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ

(৩) يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوْا مُوْسٰى اَكْبَرَ مِنْ ذَالِكَ فَقَالُوْا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ

সুতরাং আল্লাহর দর্শন যদি সম্ভব হত, তাহলে উক্ত আবেদন দাম্ভিকতা, অবাধ্যতা এবং অন্যায় হত না। আবেদনকারী শাস্তিযোগ্যও হত না। কাজেই বুঝা গেল, আল্লাহ তা'আলার দর্শন সম্ভব নয়। জবাবের সারকথা হল,

দর্শন অসম্ভব ছিল এবং তারা অসম্ভবের প্রার্থনা করেছে বলে উক্ত আবেদনকে দাম্ভিকতা, অবাধ্যতা বলা হয়নি বরং এর কারণ হল, তাদের এ আবেদন ছিল দুষ্টামী ও ষড়যন্ত্রমূলক। ঈমান গ্রহণের উদ্দেশ্যে ছিল না। কাজেই উপরিউক্ত প্রথম আয়াতে ফিরিশতা অবতীর্ণ এবং তৃতীয় আয়াতে কিতাব অবতরণের আবেদনকেও ছোট মুখে বড় কথা হয়েছে। অথচ উভয় কাজেই সম্ভব। অন্যথায় আল্লাহর দর্শন অসম্ভব হলে হযরত মূসা (আ.) তাদের আবেদন থেকে বারণ করতেন। যেমন, এ বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আ.) এর সাথে একবার সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার সময় মূর্তিপূজারী এক জাতির কাছ দিয়ে অতিক্রম করে। তখন তাদেরকে দেখে এ বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আ.) কে বলতে লাগল– হে মূসা! তাদের জন্য যেভাবে এ উপাস্য রয়েছে তদ্রুপ আমাদের জন্যও উপাস্য বানিয়ে দাও। তখন মূসা (আ.) তাদেরকে ধমক দিয়ে বললেন, তোমরা বড় নির্বোধ লোক। যদ্দরুন এমন অযৌক্তিক ও অসঙ্গত আবেদন করছ। পক্ষান্তরে ঐ বনী ইসরাঈল যখন আল্লাহকে দেখার আবেদন করল, তখন মূসা (আ.) তাদেরকে এ আবেদন করতে নিষেধ করেননি। এতে বুঝা গেল, আল্লাহর দর্শন অসম্ভব নয় বরং সম্ভব। অধিকন্তু তারা এ দুনিয়ায় আল্লাহকে দেখার দরখাস্ত করেছিল। তাতেও মূসা (আ.) নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন নি। কাজেই মূসা (আ.) এর এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করাই দুনিয়ায় আল্লাহর দর্শনের সম্ভাব্যতার প্রমাণ। সুতরাং পরকালে আরও উত্তমরূপে সম্ভব হবে। তাছাড়া পার্থিব জগতেও আল্লাহর দর্শন সম্ভব থাকার কারণে সাহাবায়ে কিরামের মাঝে "মিরাজের রজনীতে নবীজি আল্লাহকে দেখেছেন কি না"–এ নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। আর বাস্তাব দর্শনে মতবিরোধই প্রমাণ করে যে, সম্ভাব্যতার ব্যাপারে সকলেই একমত। কেননা বাস্তবায়নের উপর সম্ভাব্যতা অগ্রণী (বাস্তবতার পূর্বে সম্ভাব্যতা থাকে)। কোন জিনিস প্রথমে সম্ভাব্য হয়। এরপর তা বাস্তবায়ন হওয়া-না হওয়ার প্রশ্ন আসে।

মুসলিম শরীফে হযরত আবু যর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি মিরাজ রজনীতে আল্লাহ তা'আলাকে কি দেখেছিলেন ? তখন তিনি বললেন– نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ এ শব্দগুলোতে উভয় পক্ষের দলীল রয়েছে। কেননা এখানে نُور শব্দের পর أَنَّى শব্দে হামযায় যবর এবং শেষে আলিফে মাক্‌সূরার সাথে পঠিত। এটি হরফে ইসতিফহাম বা প্রশ্নবোধ অব্যয়। এমতাবস্থায় نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ এর অর্থ হবে, সে তো ছিল এক নূর বা আলোকবর্তিকা। তাকে আমি দেখব কিভাবে ? আবার এর হামযা ও নূনে যের দিয়ে إِنِّي পড়া হয়। তখন অর্থ হবে, সে ছিল একটি নূর বা আলোকবর্তিকা। নিঃসন্দেহে তা আমি দেখেছি। প্রথম অবস্থায় দর্শনের অস্বীকৃতি আর দ্বিতীয় অবস্থায় দর্শনের স্বীকৃতি ও প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাকী রইল স্বপ্নযোগে দেখা। বহু বুযুর্গানে দ্বীন থেকে বর্ণিত রয়েছে, তারা স্বপ্নযোগে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন। যেমন, ইমাম আবু হানীফা (রহ.), প্রবীণ স্বপ্নব্যাখ্যাতা মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহ.), কুররায়ে সাবআর মধ্য থেকে হযরত হামযা রাযি. প্রমূখ। অবশ্য স্বপ্নযোগে দেখা অন্তরচোখে দেখার নাম; চর্মচোখে দেখা নয়।

وَاللّٰهُ تَعَالٰى خَالِقٌ لِاَفْعَالِ الْعِبَادِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْاِيْمَانِ وَالطَّاعَةِ وَالْعِصْيَانِ لَاكَمَا زَعَمَتِ الْمُعْتَزِلَةُ اَنَّ الْعَبْدَ خَالِقٌ لِاَفْعَالِهٖ وَقَدْكَانَتِ الْاَوَائِلُ مِنْهُمْ يَتَحَاشَوْنَ عَنْ اِطْلَاقِ لَفْظِ الْخَالِقِ وَيَكْتَفُوْنَ بِلَفْظِ الْمُوْجِدِ الْمُخْتَرِعِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ وَحِيْنَ رَاٰى الْجُبَّائِيُّ وَاَتْبَاعُهٗ اَنَّ مَعْنَى الْكُلِّ وَاحِدٌ وَهُوَ الْمُخْرِجُ مِنَ الْعَدَمِ اِلَى الْوُجُوْدِ تَجَاسَرُوْا عَلٰى اِطْلَاقِ لَفْظِ الْخَالِقِ ۔

সহজ তরজমা

বান্দার কাজ কর্মের স্রষ্টা ঃ

আল্লাহ তা'আলা বান্দার কর্ম, কুফর, ঈমান, ইবাদত-আনুগত্য এবং গুণাহ-অবাধ্যতা সৃষ্টিকারী। তবে মুতাযিলীরা কথা মত বান্দা স্বয়ং তার স্রষ্টা নয়। আর প্রবীণ মুতাযিলীরা (বান্দার উপর) খালিক বা সৃষ্টিকর্তা শব্দ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতেন। কেবল مُوْجُوْد ও مُخْتَرِع ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেই ক্ষান্ত থাকতেন। কিন্তু আবু আলী জুব্বাই ও তার অনুসারীরা যখন দেখল, সবগুলোই সমার্থক শব্দ তথা নাস্তি থেকে অস্তিত্ব দানকারী, তখন তারা (বান্দার ক্ষেত্রেও) খালিক বা স্রষ্টা শব্দ ব্যবহারের ধৃষ্ঠতা দেখিয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

বান্দার কাজকর্মের স্রষ্টা কে ?

উপরিউক্ত আলোচনার সারকথা হল, اَفْعَال عِبَاد তথা বান্দার কর্মক্রিয়া দুধরনের।

(১) اَفْعَال اِضْطِرَارِيَّه তথা যেসব কাজকর্ম বান্দার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার দ্বারা সম্পাদিত হয় (অর্থাৎ বান্দার অনৈচ্ছিক কাজকর্ম) যেমন, মৃগী রোগী বা কাঁপুনে রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির নড়াচড়া। এধরনের কাজকর্ম সর্বসম্মতিক্রমে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টা। এগুলো প্রকাশের ক্ষেত্রে বান্দার ইচ্ছাশক্তির আদৌ কোনও দখল নেই।

(২) اَفْعَال اِخْتِيَارِيَّه যেমন কুফর, ঈমান, আনুগত্য ও অবাধ্যতা ইত্যাদি। বিতর্কিত স্থান এটিই। জাবরিয়া সম্প্রদায় এসব কাজকর্মের ব্যাপারেও বান্দাকে মাজবূরে মহয বা একান্ত বাধ্য মনে করে। মুতাযিলীরা বলে– স্বয়ং বান্দা এসব কাজকর্মের স্রষ্টা। এসবে আল্লাহর কুদরতের কোন দখল নেই। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত জাবরিয়াদের মত বান্দাকে একান্ত বাধ্য মনে করে বলেন না যে, তাতে বান্দার শক্তি ও ইচ্ছার কোন দখল নেই। আবার মুতাযিলীদের মত আল্লাহ তা'আলাকে একেবারে বে-দখল বা বেকারও মনে করেন না বরং তারা বলে– বান্দার ঐচ্ছিক কাজকর্মগুলো বান্দা এবং আল্লাহ উভয়ের কুদরত শক্তির মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করে। বান্দার শক্তির সম্পর্ক কাস্ব বা উপার্জনের সাথে সংশ্লিষ্ট আর আল্লাহর কুদরতের সম্পর্ক সৃজনের সাথে। অর্থাৎ বান্দা উপার্জনকারী আর আল্লাহ হলেন স্রষ্টা। অবশ্য প্রবীণ মুতাযিলীরা বান্দার ক্ষেত্রে খালিক শব্দের ব্যবহার থেকে দূরে থাকতেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন স্রষ্টা না থাকার ব্যাপারে প্রবীণ উলামায়ে কিরামের মতৈক্য ছিল। এতে মুতাকদ্দিমীন তথা প্রবীন মুতাযিলীগণ কেবল নামস্বর্বস্ব সীমাবদ্ধতা বুঝেছেন। কিন্তু পরবর্তী যুগের অনুজ মুতাযিলীরা যখন দেখল, خَالِق ۔ مُوْجُوْد ۔ مُخْتَرِع (খালিক, মুজিদ, মুখতারি) প্রভৃতি সবই সমার্থক শব্দ অর্থাৎ নাস্তি থেকে অস্তিত্ব দানকারী অর্থে ব্যবহৃত, তখন তারা বান্দার উপর খালিক শব্দ ব্যবহারের ধৃষ্ঠতা দেখায় এবং সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে থাকে, বান্দা স্বীয় কাজকর্মের স্রষ্টা।

اِحْتَجَّ اَهْلُ الْحَقِّ بِوُجُوْهٍ ـ اَلْاَوَّلُ اَنَّ الْعَبْدَ لَوْكَانَ خَالِقًا لِاَفْعَالِهٖ لَكَانَ عَالِمًا بِتَفَاصِيْلِهَا ضَرُوْرَةَ اَنَّ اِيْجَادَ الشَّيْئِ بِالْقُدْرَةِ وَالْاِخْتِيَارِ لَايَكُوْنُ اِلَّا كَذٰلِكَ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ فَاِنَّ الْمَشْيَ مِنْ مَوْضِعٍ اِلٰى مَوْضِعٍ قَدْ يَشْتَمِلُ عَلٰى سَكَنَاتٍ مُتَخَلِّلَةٍ وَعَلٰى حَرَكَاتٍ بَعْضُهَا اَسْرَعُ وَبَعْضُهَا اَبْطَأُ وَلَاشُعُوْرَ لِلْمَاشِىْ بِذٰلِكَ وَلَيْسَ هٰذَا ذُهُوْلًا عَنِ الْعِلْمِ بَلْ لَوْسُئِلَ لَمْ يَعْلَمْ وَهٰذَا فِىْ اَظْهَرِ اَفْعَالِهٖ وَاَمَّا اِذَا تَاَمَّلْتَ فِىْ حَرَكَاتِ اَعْضَائِهٖ فِى الْمَشْيِ وَالْاَخْذِ وَالْبَطْشِ وَنَحْوِذٰلِكَ وَمَايَحْتَاجُ اِلَيْهِ مِنْ تَحْرِيْكِ الْعَضَلَاتِ وَتَمْدِيْدِ الْاَعْصَابِ وَنَحْوِذٰلِكَ فَالْاَمْرُ اَظْهَرُ

সহজ তরজমা

আহলে হক বিভিন্নভাবে (একাধিক পন্থায় এর জবাবে) প্রমাণ পেশ করেছেন। **প্রথমতঃ** বান্দা যদি স্বীয় কাজকর্মের স্রষ্টা হয়, তাহলে তার (কাজ) সম্পর্কে বিস্তারিত জানা থাকত। কেননা নিশ্চিতভাবে কোন কাজ স্বেচ্ছায় শক্তি-সামর্থ দিয়ে উদ্ভাবন করলে এমনই হয়ে থাকে। অথচ লাযিম বাতিল। কেননা এক স্থান থেকে অন্যত্র চলার পথে এমন অসংখ্য গতি থাকে, যার কোনটি দ্রুত আর কোনটি মন্থর। অথচ চলন্ত পথিকের সে সম্পর্কে কোনও ধারণা জ্ঞান থাকে না। আর তা মূর্খতা বা জ্ঞান থেকে বিস্তৃতি নয় বরং তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে এ ব্যাপারে তার জ্ঞান পাওয়া যাবে না। এতো গেল তার বাহ্যিক কাজকর্মের কথা। মোটকথা, তোমরা যখন চলা, ধরা, আক্রমণ প্রভৃতি সময়ে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন এবং শিরাগুলো প্রলম্বিত করা ইত্যাদি আবশ্যক ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করবে তখন আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবে যে, এসব বিষয়ে বান্দার আদৌ কোনও খবর থাকে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হকপন্থীদের যৌক্তিক দলীল ঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত اَفْعَالِ عِبَادْ তথা বান্দার কাজকর্ম আল্লাহর সৃজিত হওয়ার পক্ষে যৌক্তিক ও নকলী উভয় ধরনের প্রমাণ পেশ করেছেন। উপরিউক্ত বাক্যে ব্যাখ্যাতা প্রথম যে যৌক্তিক প্রমাণ পেশ করেছেন, তার সারকথা হল, বান্দা যদি স্বীয় কাজকর্মের স্রষ্টা হত, তাহলে ঐ কাজকর্মের সার্বিক অবস্থা বিস্তারিতভাবে তার জানা থাকত। অথচ তালি ও লাযিম বাতিল। কাজেই মুকাদ্দাম তথা বান্দা স্বীয় কাজকর্মের স্রষ্টা হওয়াও বাতিল।

মুকাদ্দাম তথা বান্দা কাজকর্মের স্রষ্টা হওয়া এবং তালী তথা কাজকর্মের সার্বিক অবস্থা বিশদভাবে জানা -এর মধ্যকার আবশ্যকীয়তার প্রমাণ হিসেবে ব্যাখ্যাতা ضَرُوْرَةَ اَنَّ اِيْجَادَ الشَّيْئِ الخ বাক্যটি এনেছেন। এর সারকথা হল, খলকের অর্থ ইচ্ছাকৃতভাবে শক্তি-সামর্থ ব্যয়ে কোন জিনিস বা কাজ উদ্ভাবন করা। আর কোনও জিনিসের ইচ্ছা বা সংকল্প ইলম (জ্ঞান) ছাড়া হতে পারে না।

সুতরাং বুঝা গেল, কোন জিনিসের স্রষ্টা হওয়ার জন্য তার বিস্তারিত অবস্থা-জ্ঞান থাকা জরুরী। আর তালী ও লাযিম অর্থাৎ বান্দার স্বীয় কাজকর্মের সার্বিক অবস্থা বিশদভাবে জ্ঞাত না থাকার দলীল হচ্ছে, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে হেঁটে যাওয়া বান্দার ঐচ্ছিক ও স্বাধীন কর্ম। এতে অনেকগুলো নড়াচড়া বা গতিস্থিতি থাকে। অথচ বান্দার এ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান নেই। সে জানে না, কোন পদক্ষেপ কতক্ষণ মাটিতে ছিল। আর কোনটি মাটি থেকে পৃথক শূন্যে ছিল। সে এ-ও জানে না যে, কোন পা মাটিতে পুরোপুরি পড়েছে আর কোনটি সামান্য পড়েছে। পায়ের কোন গতিটি দ্রুত ছিল আর কোনটি ছিল মন্থর। এতো শুধু নিজের কাজকর্মের বাহ্যিক অবস্থা সম্পর্কে বান্দার অজ্ঞাতার প্রতিচিত্র। আর যদি বাতেনি বা ভিতরগত কাজকর্মে গভীরভাবে চিন্তা করা হয় যেমন, চলার সময় অথবা কোন জিনিস ধরা ও গ্রহণের সময় কোন কোন রগ বা শিরা গতিশীল হয়েছিল এবং কোনটি কতটুকু প্রলম্বিত হয়েছিল ইত্যাদি, তখন তার অজ্ঞতা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে। পক্ষান্তরে বান্দার এসব অবস্থা-জ্ঞান আছে, কিন্তু তা থেকে বিস্তৃত অর্থাৎ মেধা-মনন উদাসীন বলা সঠিক নয়। কেননা তা নিছক উদাসীনতাই হয়ে থাকলে জিজ্ঞাসাবাদের পর মনের সে উদাসীনতা বিদূরীত হয়ে যেত এবং চেতনা ফিরে আসত। অথচ জিজ্ঞাসার পরও সে জ্ঞানশূন্যই থেকে যায় (তার অজ্ঞাতা রয়েই যায়)।

اَلثَّانِىْ اَلنُّصُوْصُ الْوَارِدَةُ فِىْ ذٰلِكَ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ اَىْ عَمَلَكُمْ عَلٰى اَنَّ مَا مَصْدَرِيَّةٌ لِئَلَّا يُحْتَاجَ اِلٰى حَذْفِ الضَّمِيْرِ اَوْمَعْمُوْلَكُمْ عَلٰى اَنَّ مَامَوْصُوْلَةٌ وَيَشْمُلُ الْاَفْعَالَ لِاَنَّا اِذَا قُلْنَا اَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوْقَةٌ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَوْلِلْعَبْدِ لَمْ نُرِدْ بِالْفِعْلِ الْمَعْنٰى الْمَصْدَرِىَّ الَّذِىْ هُوَ الْاِيْجَادُ وَالْاِيْقَاعُ بَلِ الْحَاصِلُ بِالْمَصْدَرِالَّذِىْ هُوَ مُتَعَلِّقُ الْاِيْجَادِ وَالْاِيْقَاعِ اَعْنِىْ مَانُشَاهِدُهٗ مِنَ الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ مَثَلًا وَلِلذُّهُوْلِ عَنْ هٰذِهِ النُّكْتَةِ قَدْ يُتَوَهَّمُ اَنَّ الْاِسْتِدْلَالَ بِالْاٰيَةِ مَوْقُوْفٌ عَلٰى كَوْنِ مَامَصْدَرِيَّةً وَكَقَوْلِهٖ تَعَالٰى خَالِقُ كُلِّ شَئٍ اَىْ مُمْكِنٍ بِدَلَالَةِ الْعَقْلِ وَفِعْلُ الْعَبْدِ شَئٌ وَكَقَوْلِهٖ تَعَالٰى اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ فِىْ مَقَامِ التَّمَدُّحِ بِالْخَالِقِيَّةِ وَكَوْنِهَا مَنَاطًا لِاِسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ

সহজ তরজমা

দ্বিতীয় প্রমাণ এ সম্পর্কে অবতীর্ণ নছসমূহ। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ এখানে مَاتَعْمَلُوْنَ এর অর্থ عَمَلَكُم কেননা مَا হরফটি মাসদারিয়া। যাতে উহ্য সর্বনাম মানার প্রয়োজন না হয়। অথবা مَا টি مَعْمُوْلَكُمْ এর অর্থে ব্যবহৃত। কারণ, مَا টি মওসূলার। আর مَعْمُوْل কাজকর্মকেও অন্তর্ভুক্ত করবে। কেননা যখন আমরা বলি- বান্দার কাজকর্ম আল্লাহর সৃষ্ট নাকি বান্দার সৃষ্ট ? তখন فِعْل দ্বারা মাসদারের অর্থ উদ্দেশ্য নেই না, যা اِيْجَاد ও اِيْقَاع তথা সৃজন বরং حَاصِل مَصْدَر বা মাসদারের মর্মার্থ উদ্দেশ্য নেই। যা اِيْجَاد ও اِيْقَاع এর মুতাআল্লাক। (যার সাথে আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের সম্পর্ক।)

উদাহরণতঃ ঐ সব গতি ও স্থিতি, আমরা যা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করি। এ রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুন কেউ কেউ মনে করেন, উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করা مَا শব্দটি মাসদারিয়া হওয়ার উপর নির্ভরশীল। যেমন, আল্লাহর বাণী خَالِقُ كُلِّ شَئٍ। এখানে যৌক্তিক প্রমাণের আলোকে شَئ দ্বারা সম্ভাব্যতা উদ্দেশ্য। বান্দার কাজকর্মও شَئ (জিনিস)। তদ্রুপ আল্লাহর বাণী اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَايَخْلُقُ রয়েছে- সৃজনশীলতার মাধ্যমে স্বীয় প্রশংসার স্থানে এবং তার ইবাদতের যোগ্য পাত্র হওয়ার ব্যাপারে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হকপন্থীদের দ্বিতীয় দলীল

বান্দার কাজকর্ম আল্লাহর সৃষ্ট হওয়ার পক্ষে আহলে হকের দ্বিতীয় প্রমাণ একাধিক নস। তন্মধ্যে **একটি** আল্লাহর বাণী, وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُوْنَ। কারণ, এখানে مَا হরফটি দুটি সম্ভাবনা রাখে। **প্রথমতঃ** مَا মাসদারিয়্যাহ। এটি ইমাম সীবওয়ায় এর নিকট পছন্দনীয় ও গ্রহণযোগ্য। কেননা এমতাবস্থায় কোনও যমীর বা সর্বনাম উহ্য মানার প্রয়োজন পড়ে না। তখন পরোক্ষ ইবারত হবে, وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَعَمَلَكُمْ (আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এবং তোমাদের কাজকর্মের স্রষ্টা)। **দ্বিতীয়তঃ** مَا শব্দটি মওসূলা। تَعْمَلُوْنَ তার সিলাহ। আর যেহেতু সিলার মধ্যে মওসূলার দিকে প্রত্যাবর্তনশীল একটি যজীর থাকা আবশ্যক এজন্য পরোক্ষ ইবারত হবে وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُوْنَهٗ আর مَاتَعْمَلُوْنَهٗ এর অর্থ مَامَعْمُوْلُكُم অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এবং কর্মক্রিয়ার স্রষ্টা। যেমন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْن। এখানে مَا হরফটি মওসূলাহ হওয়ার ভিত্তিতে اَتَعْبُدُوْنَ مَنْحُوْتَكُمْ এর অর্থে ব্যবহৃত। আর مَعْمُوْل শব্দটি কাজকর্মকেও অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা বলা হয়, বান্দার কাজ আল্লাহর সৃষ্ট অথবা বান্দার সৃষ্ট। তখন فِعْل দ্বারা مَعْنٰى مَصْدَرِى তথা আবিষ্কার ও উদ্ভাবন উদ্দেশ্য হয় না বরং আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের সাথে সংশ্লিষ্ট জিনিস উদ্দেশ্য হয়। যাকে হাসেলে মাসাদার বা মাসদারের মর্মার্থ বলা হয়। অন্য ভাষায় বলা যায়, فِعْل দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ জিনিস, যা বান্দার উপার্জনের কারণে

অস্তিত্ব লাভ করে এবং বান্দার সাথে যাকে সম্পৃক্ত করা হয়। যেমন, নামায, যাকাত, ঈমান-কুফর প্রভৃতি। এ রহস্য (তথা فِعْل দ্বারা مَعْنٰى مَصْدَرِى নয় বরং হাসিলে মাসদার উদ্দেশ্য নেওয়া হয়) সম্পর্কে বে-খবর ও উদাসীন হওয়ার কারণে কেউ কেউ বলেছেন– বান্দার কাজকর্ম আল্লাহপাকের সৃষ্ট হওয়ার ব্যাপারে উক্ত আয়াতে কারীমা প্রমাণ পেশ করা مَا হরফটি মাসদারিয়্যাহ হওয়ার উপর নির্ভরশীল; মওসূলা হওয়ার সূরতে প্রমাণ পেশ করা বিশুদ্ধ হবে না।

(২) বান্দার কাজকর্ম আল্লাহর সৃষ্ট হওয়ার ব্যাপারে দ্বিতীয় আয়াত হল, لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْئٍ فَاعْبُدُوْهُ; কেননা এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজেকে প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা বলেছেন। বান্দার কাজকর্মও জিনিস। কাজেই বান্দার কাজকর্মের স্রষ্টাও তিনিই হবেন। এ দলীলের উপর প্রশ্ন ওঠে যে, شَيْئٍ শব্দ তথা মওজূদ বা বিদ্যমান বস্তু ব্যাপক মওজুদাতে মুমকিনা (সম্ভাব্য বিদ্যমান বস্তু) আল্লাহর সত্ত্বা এবং তার গুণাবলিও এর অন্তর্ভুক্ত। অথচ বাস্তবে আল্লাহর সত্ত্বা ও তার গুণাবলি شَيْئٍ শব্দের ব্যাপকতা থেকে মুক্ত। আর شَيْئٍ শব্দ দ্বারা শুধু সম্ভাব্য বস্তু উদ্দেশ্য। কাজেই شَيْئٍ শব্দটি আম মাখসুস মিন্‌হুল বা'আয সাব্যস্ত হল। আর তা অকাট্য প্রমাণ নয়। সুতরাং একটি ই'তিকাদী বা বিশ্বাস সম্পর্কিত ব্যাপারে এর দ্বারা দলীল দেওয়া দুরস্ত হবে না। কেননা ঈমান আকীদা সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করা হয়; যন্নী বা ধারগুণমূলক প্রমাণ দ্বারা নয়।

ব্যাখ্যাকার স্বীয় উক্তি اَىْ مُمْكِنٍ بِدَلَالَةِ الْعَقْلِ দ্বারা এর জবাব দিয়ে বলেছেন– شَيْئٍ দ্বারা বিশেষভাবে সম্ভাব্য বস্তু উদ্দেশ্য হওয়ার প্রমাণ এবং شَيْئٍ কে সম্ভাব্যতার সাথে খাছ বা সুনির্দিষ্টকারী বস্তু আকল বা বিবেক। কেননা বিবেক ও আকলই সিদ্ধান্ত দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা মাখলুক বা কারও সৃষ্টফল নয়। আর যে আমের মুখাসসসি বা খাছকারী যৌক্তিক প্রমাণ হয়, তা قَطْعِىُّ الدَّلَالَةِ বা অকাট্য প্রমাণ হয়ে থাকে। যন্নী তো ঐ আম মাখসুস মিন্‌হুল বা'অম হয়, যার মুখাসসিস হয় নকলী প্রমাণ।

(৩) বান্দার কাজকর্ম আল্লাহর সৃষ্ট হওয়ার প্রমাণে স্বরূপ তৃতীয় আয়াত হল اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ (সৃষ্টা তথা আল্লাহ তাআলা এবং গাইরে খালেক তথা ভ্রান্ত উপাস্য কি সমান হতে পারে?)। এ আয়াতে اِسْتِفْهَام اِنْكَارِى (অস্বীকার সূচক প্রশ্ন) করা হয়েছে। এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং স্রষ্টা হওয়া আলোচনা নিজের প্রশংসার স্থানে করেছেন। তদ্রুপ খালিক বা সৃষ্টা হওয়াকে ইবাদতের যোগ্য হওয়ার মাপকাঠি সাব্যস্ত করেছেন। আর প্রশংসা তখনই হতে পারে, যখন স্রষ্টা হওয়া তার সাথেই সুনির্দিষ্ট হবে। অনুরূপভাবে ইবাদতের যোগ্যতা তার সাথে তখনই সুনির্দিষ্ট হতে পারে, যখন তিনি ছাড়া আর কেউ স্রষ্টা না হবে। সুতরাং স্রষ্টা হওয়া যখন তার সাথেই সুনির্দিষ্ট, তখন বান্দা স্বীয় কাজকর্মের স্রষ্টা হবে না বরং আল্লাহ তা'আলাই বান্দার কাজকর্মের স্রষ্টা হবেন।

لَا يُقَالُ فَالْقَائِلُ بِكَوْنِ الْعَبْدِ خَالِقًا لِاَفْعَالِهِ يَكُوْنُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ دُوْنَ الْمُوَحِّدِيْنَ لِاَنَّا نَقُوْلُ الْاِشْرَاكُ هُوَ اِثْبَاتُ الشَّرِيْكِ فِى الْاُلُوْهِيَّةِ بِمَعْنٰى وُجُوْبِ الْوُجُوْدِ كَمَا لِلْمَجُوْسِ اَوْ بِمَعْنٰى اِسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ كَمَا لِعَبَدَةِ الْاَصْنَامِ وَالْمُعْتَزِلَةُ لَا يُثْبِتُوْنَ ذٰلِكَ بَلْ لَا يَجْعَلُوْنَ خَالِقِيَّةَ الْعَبْدِ كَخَالِقِيَّةِ اللّٰهِ تَعَالٰى لِافْتِقَارِهِ اِلَى الْاَسْبَابِ وَالْاٰلَاتِ الَّتِىْ هِىَ بِخَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِلَّا اَنَّ مَشَائِخَ مَاوَرَاءَ النَّهْرِ قَدْ بَالَغُوْا فِىْ تَضْلِيْلِهِمْ فِىْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ حَتّٰى قَالُوْا اِنَّ الْمَجُوْسَ اَسْعَدُ حَالًا مِنْهُمْ حَيْثُ لَمْ يُثْبِتُوْا اِلَّا شَرِيْكًا وَاحِدًا وَالْمُعْتَزِلَةُ يُثْبِتُوْنَ شُرَكَاءَ لَا تُحْصٰى

সহজ তরজমা

এরূপ প্রশ্ন করা যাবে না যে, তাহলে তো বান্দাকে স্বীয় কাজকর্মের সৃষ্টিকর্তা বলে দাবীদারগণ মুশরিক হবে; একাত্ববাদে বিশ্বাসী হবে না। কেননা আমরা জবাবে বলব, শিরকের অর্থ উলুহিয়্যাত তথা অনিবার্য সত্ত্বা হওয়ার ক্ষেত্রে অংশীদার মানা। যেমন, অগ্নিপূজারীদের শিরক। অথবা ইবাদতের যোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে অংশীদার মানা।

যেমন, মূর্তিপূজারীদের শিরক। মুতাযিলীরা এ (দুটো বিষয়ই) মানে না। অধিকন্তু বান্দার স্রষ্টা হওয়াকে আল্লাহর স্রষ্টা হওয়ার সমান বলেও মানে না। কিন্তু মাশায়েখগণ তাদেরকে এ ব্যাপারে গোমরাহ-পথভ্রষ্ট সনাক্ত করার ক্ষেত্রে অত্যাধিক কঠোরতা করেছেন। এমনকি তারা বলেছেন– অগ্নিপূজারীরা তাদের চেয়ে ভাল। কেননা তারা কেবল একটি শরীক মানে। আর মুতাযিলীরা তো অসংখ শরীক মানে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মু'তাযিলারা কি মুশরিক ?

ইতোপূবে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা স্রষ্টা হওয়াকে ইবাদতের যোগ্য হওয়ার মাপকাঠি সাব্যস্ত করেছেন। এর উপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, যদি স্রষ্টা হওয়া ইবাদতের যোগ্য হওয়ার মাপকাঠি হয় অর্থাৎ যিনি স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তা হবেন, তিনি ইবাদতের যোগ্য হবেন। তাহলে তো মুতাযিলীদেরকে কাফির আখ্যা দিতে হবে। কেননা বান্দাকে স্বীয় কাজকর্মের স্রষ্টা বলে তারা ইবাদতের যোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করার মত অপরাধে লিপ্ত। অথচ আমরা তাদেরকে কাফির বলি না।

ব্যাখ্যাকার বলেন– এ প্রশ্নের কারণ এই নয় যে, শিরক (অংশীদারিত্ব) তাওহীদ তথা একাত্ববাদের পরিপন্থী। তাওহীদের এক অর্থ ওয়াজিবুল উজূদ তথা অনিবার্য সত্ত্বা কেবল একটিই। এক্ষেত্রে কেউ তার অংশীদার নেই। এ অর্থের বিপরীতই শিরক অর্থাৎ ওয়াজিবুল উজূদ হওয়ার ক্ষেত্রে কাউকে আল্লাহর অংশীদার মানা। যেভাবে অগ্নিপূজকরা বলে– সৃষ্টিকর্তা দুজন। এক. খালিকে খায়ের বা কল্যাণের স্রষ্টা। যাকে ইয়াজদা বলা হয়। দুই. খালিকে শার বা অমঙ্গলের স্রষ্টা। যাকে বলে আহরামান। তারা উভয়কেই অনিবার্য সত্ত্বা বলে। অনিবার্য সত্ত্বা হওয়ার ক্ষেত্রে শরীক সাব্যস্ত করে আহরামানকে। আর তাওহীদের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, ইবাদতের যোগ্য কেবল একমাত্র সত্ত্বা। এ ক্ষেত্রে আর কেউ তার শরীক নেই। তাহলে এর বিপরীতে শিরকের মর্মার্থ হবে, ইবাদতের যোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে কাউকে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করা। প্রতিমা পুজারীরা এ দ্বিতীয় অর্থে মুশরিক। কেননা তারাও অনিবার্য সত্ত্বা একজনকেই মানে। তবে ইবাদতের যোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে তারা প্রতিমাগুলোকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে। আর মুতাযিলীরা শিরকের উপরিউক্ত দুটি অর্থের কোনটিরই পক্ষপতিত নয়। তারা অনিবার্য সত্ত্বা হওয়ার ক্ষেত্রেও শরীক মানে না। আবার ইবাদতের যোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রেও শরীক মানে না বরং ইবাদতের যোগ্য হওয়ার মাপকাঠি স্রষ্টা হওয়াকে তারা অস্বীকার করে। আবার বান্দাকে স্রষ্টা বলে ঠিক। তবে আল্লাহর স্রষ্টা হওয়ার সমপর্যায়ের সাব্যস্ত করে না। কেননা বান্দা কোন জিনিস আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জন্য আসবাবপত্র ও উপায়-উপকরণের মুখাপেক্ষী। অথচ আল্লাহ তা'আলা কোনও জিনিসের মোহতাজ বা মোখাপেক্ষী নন। হ্যা, বড়জোর এতটুকু বলা যেতে পারে যে, ইবাদতের যোগ্য হওয়ার মাপকাঠি যখন স্রষ্টা হওয়া, তখন বান্দাকে সৃষ্টিকর্তা বলার দ্বারা তাকে ইবাদতের যোগ্য বলা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কুফরের আবশ্যকতা কুফর নয় বরং কুফরকে আকড়ে ধরা কুফর। কাজেই আমরা তাদেরকে কাফির বলি না। অবশ্য মাশায়েখে মাতুরিদিয়্যাহ এ ব্যাপারে মুতাযিলীদের পথভ্রষ্টতা প্রমাণে খুবই জোর দিয়েছেন। এমনকি অগ্নিপূজারীদেরকে উত্তম বলেছেন। কেননা তারা তো একটি শরীক সাব্যস্ত করে, যাকে আহরামান বলে। আর মুতাযিলীরা অসংখ্য শরীক সাব্যস্ত করে। কেননা যখন বান্দাদেরকে সৃষ্টিকর্তা সাব্যস্ত করল, যার সংখ্যা অগণিত। তখন যেন স্রষ্টা হিসেবে অগণিত বান্দাকে ইবাদতের যোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে শরীক সাব্যস্ত করেছে।

وَاحْتَجَّتِ الْمُعْتَزِلَةُ بِاَنَّا نَفْرُقُ بِالضَّرُوْرَةِ بَيْنَ حَرَكَةِ الْمَاشِيْ وَ بَيْنَ حَرَكَةِ الْمُرْتَعِشِ اِنَّ الْاُوْلٰى بِاِخْتِيَارِهٖ دُوْنَ الثَّانِيَةِ وَبِاَنَّهٗ لَوْكَانَ الْكُلُّ بِخَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى لَبَطَلَتْ قَاعِدَةُ التَّكْلِيْفِ وَالْمَدْحُ وَالذَّمُّ وَالثَّوَابُ وَالْعِقَابُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَالْجَوَابُ اَنَّ ذٰلِكَ اِنَّمَا يَتَوَجَّهُ عَلَى الْجَبَرِيَّةِ الْقَائِلِيْنَ بِنَفْيِ الْكَسْبِ وَالْاِخْتِيَارِ اَصْلًا وَاَمَّا نَحْنُ فَنُثْبِتُهٗ عَلٰى مَا نُحَقِّقُهٗ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى

সহজ তরজমা

মুতাযিলীরা প্রমাণ দেন, আমরা চলন্ত ব্যক্তির গতি এবং কাঁপুনী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির গতির মধ্যে স্বতঃসিদ্ধভাবে এ পার্থক্য করি যে, প্রথম গতি তার ঐচ্ছিক। দ্বিতীয়টি অনুরূপ নয়। আরেকটি দলীল হল, সকল

কাজকর্মই যদি আল্লাহর স্রষ্টফল হয়, তাহলে তাকলীফ তথা দায়িত্ব অপর্ণের মূলনীতি ভেঙ্গে পড়বে। প্রশংসা ও নিন্দা এবং সাওয়াব ও শাস্তি বাতিল হয়ে যাবে। আর তা সুস্পষ্ট। এর জবাব হল, এ প্রমাণ জাবরিয়াদের বিপক্ষে যাবে। যারা কাস্‌ব বা উপার্জন ও স্বাধীনতা একদম না থাকার প্রবক্তা। যেমন, সামনে ইনশা আল্লাহ আমরা এর বিশদ বিবরণ দেব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মু'তাযিলাদের যৌক্তিক দলীল

এক. বান্দা তার ঐচ্ছিক কাজকর্মের স্রষ্টা হওয়ার ব্যাপারে মুতাযিলীরা প্রমাণ স্বরূপ বলে, চলন্ত ব্যক্তির গতি ঐচ্ছিক হওয়া এবং কাঁপুনী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির গতি অনৈচ্ছিক হওয়ার উপর আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। সুতরাং আল্লাহপাক যদি উভয় ধরনের গতির স্রষ্টা হতেন, তাহলে উভয় গতিই ঐচ্ছিক কিংবা অনৈচ্ছিক হত। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য হত না। অথচ তালী বাতিল। অতএব মুকাদ্দামাও অনুরূপ হবে। অর্থাৎ উভয় গতির স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা হওয়াও বাতিল। কাজেই আমরা বলি– অনৈচ্ছিক কর্ম যেমন, কাঁপুনী রোগাক্রান্ত ব্যক্তির গতির স্রষ্টা তো আল্লাহ তা'আলা বটে। তবে ঐচ্ছিক কর্মের স্রষ্টা স্বয়ং বান্দা।

দুই. মুতাযিলাদের দ্বিতীয় প্রমাণ হল, বান্দার যাবতীয় কাজকর্মের স্রষ্টা যদি আল্লাহ তা'আলা হতেন, বান্দার শক্তি-সামর্থ ও ইচ্ছার কোন দখল এসব কর্মসম্পাদন ও বাস্তবায়নে না থাকত, তাহলে বান্দাকে নানা কাজের মুকাল্লাফ বা দায়িত্বশীল বানানো (বান্দার উপর বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব আরোপ করা) এবং নেক কাজে প্রশংসা ও সাওয়াব আর খারাপ কাজে নিন্দা ও শাস্তিযোগ্য সাব্যস্ত করা যথার্থ হত না। কেননা কোন কাজের মুকাল্লাফ বানানো বা দায়িত্ব আরোপ শুদ্ধ হওয়া এবং তার উপর সাওয়াব বা শাস্তিযোগ্য সাব্যস্ত করার জন্য ঐ কাজ বান্দার শক্তি-সামর্থ ও ইচ্ছাধীন থাকা আবশ্যক। আর তালী তথা বান্দার উপর দায়িত্ব বর্তনো এবং প্রশংসা, নিন্দা, প্রতিদান ও শস্তিযোগ্য না হওয়া বাতিল। কেননা বগু নছ দ্বারা দায়িত্ব বর্তানো এবং প্রতিদান ও শাস্তিযোগ্য সাব্যস্ত করা প্রমাণিত। কাজেই মুকাদ্দমা তথা আল্লাহ তা'আলা বান্দার ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক যাবতীয় কাজকর্মের সৃষ্টিকর্তা হওয়াও বাতিল। আর যখন তিনি বান্দার যাবতীয় কাজের স্রষ্টা নন বরং শুধুমাত্র অৈচ্ছিক কাজের স্রষ্টা, তখন ঐচ্ছিক কাজের স্রষ্টা হবে স্বয়ং বান্দা।

আমাদের প্রমাণ

জবাবের সারকথা হল, তোমাদের উপরিউক্ত যাবতীয় দলীল জাবরিয়াদের বিরুদ্ধে; যারা বান্দার কামাই ও স্বাধীনতা অস্বীকার করে এবং বান্দাকে একান্ত বাধ্য মনে করে। আর আমরা বান্দার জন্য কামাই ও স্বাধিকার প্রমাণ করে বলি– আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকর্তা হলে বান্দার ইচ্ছা-স্বাধীনতা এবং শক্তি-স্বামর্থ স্বীয় কাজকর্ম থেকে নিঃশেষ হয়ে যায় না বরং বান্দা যখন আল্লাহ প্রদত্ত নশ্বর ও অস্থায়ী শক্তি-সামর্থ স্বীয় ইচ্ছা মাফিক ব্যাবহার করে, যার নাম কামাই, তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতে কাদীমাহ (অনাদি-অনন্ত ও চিরন্তন শক্তি) দ্বারা ঐ কাজ বাস্তবায়িত করে দেন। আল্লাহর কর্ম খ্যাত ঐ কাজের অস্তিত্ব দানের নামই সৃষ্টি বা সৃজন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা খালিক বা সৃষ্টিকর্তা; বান্দা কাসিব বা উপার্জনকারী প্রমাণিত হল। আর যখন বান্দার শক্তি ও ইচ্ছা-স্বধীনতা বহাল থাকে, তখন কাজ কর্ম-কর্মের দায়িত্ব বর্তানো শুদ্ধ হবে। তদ্রুপ বান্দা যখন নিজের ভাল কাজ ও মন্দ কাজ তথা নেকআমল ও বদআমলের কাসিব তখন তাকে প্রশংসা, নিন্দা এবং প্রতিদান ও শাস্তির যোগ্য সাব্যস্ত করাও দুরস্ত হবে। কেননা প্রতিদান ও শাস্তির যোগ্য হওয়ার ভিত্তি কাসব বা কামাই; খল্‌ক বা সৃজন নয়। এ আলোচনা থেকে খল্‌ক ও কাসব তথা সৃজন ও কামাইয়ের সুস্পষ্ট পার্থক্য ফুটে ওঠে।

শাইখ আবূ মানসূর মাতুরিদী (রহ.) শরহে ফিকহে আকবর গ্রন্থে লিখেছেন–

قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَاَصْحَابُهُ اَلْخَلْقُ فِعْلُ اللّٰهِ وَهُوَ اِحْدَاثُ الْاِسْتِطَاعَةِ فِى الْعَبْدِ وَاسْتِعْمَالُ الْاِسْتِطَاعَةِ الْمُحْدَثَةِ فِعْلُ الْعَبْدِ حَقِيْقَةً لَامَجَازًا

অর্থাৎ সৃষ্টি করা আল্লাহর কাজ। আর তা বান্দার মধ্যে কাজের শক্তি-সামর্থ সৃষ্টি করার নাম। আর অস্থায়ী সামর্থ তথা আল্লাহ প্রদত্ত শক্তির সদ্ব্যবহার বান্দার কাজ। এরই নাম কামাই।

وَقَدْ يُتَمَسَّكُ بِاَنَّهُ لَوْكَانَ خَالِقًا لِاَفْعَالِ الْعِبَادِ لَكَانَ هُوَ الْقَائِمُ وَالْقَاعِدُ وَالْاٰكِلُ وَالشَّارِبُ وَالزَّانِيُ وَالسَّارِقُ اِلٰى غَيْرِذٰلِكَ، وَهٰذَا جَهْلٌ عَظِيْمٌ، لِاَنَّ الْمُتَّصِفَ بِالشَّيْئِ مَنْ قَامَ بِهٖ ذٰلِكَ الشَّيْئُ لَامَنْ اَوْجَدَهٗ اَوَلَايَرَوْنَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى هُوَ الْخَالِقُ لِلسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ وَسَائِرِ الصِّفَاتِ فِى الْاَجْسَامِ وَلَايَتَّصِفُ بِذٰلِكَ وَرُبَّمَا يُتَمَسَّكُ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ وَالْجَوَابُ اَنَّ الْخَلْقَ هٰهُنَا بِمَعْنَى التَّقْدِيْرِ

সহজ তরজমা

কতিপয় মুতযিলাদের পক্ষ থেকে প্রমাণস্বরূপ বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা যদি বান্দার কাজ-কর্মের স্রষ্টা হন, তাহলে তিনিই হবেন দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট, পানাহারকারী, ব্যভিচারী, চোর প্রভৃতি। আর তা চরম মূর্খতা (মারাত্মক ভ্রষ্টতা)। কেননা কোন বস্তুর সাথে গুণান্বিত তাকেই বলে, যার সাথে ঐ বস্তুটি প্রতিষ্ঠিত; ঐ বস্তুর আবিষ্কারকের সাথে নয়। সে কি এ কথা জানে না যে, দেহাবয়বের মধ্যে সাদা-কালো এবং অন্যান্য রঙের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলাই। অথচ তিনি এসব গুণে গুণান্বিত নন। আবার কখনও (মুতাযিলাদের পক্ষ থেকে) আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ এবং فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয়। আর জবাব হল, এখানে খাল্ক শব্দটি তাকদীর অর্থে ব্যবহৃত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কোন কোন মু'তাযিলার দলীল

বান্দার ঐচ্ছিক কর্মের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা না হওয়ার উপর মুতাযিলারা নিম্নোক্ত প্রমাণও পেশ করে। অর্থাৎ বান্দার কর্ম যেমন, দাঁড়ানো, বসা, পানাহার করা ইত্যাদির স্রষ্টা যদি আল্লাহ তা'আলা হতেন, তাহলে কিয়াম বা দাঁড়ানোর স্রষ্টা হিসেবে দণ্ডায়মান, কুউদ বা বসার স্রষ্টা হিসেবে উপবিষ্ট, আক্ল ও শুর্ব তথা পানাহারের স্রষ্টা হিসেবে পানাহারকারী তাকেই বলা হত। অথচ তালী তথা আল্লাহর দণ্ডায়মান, উপবেশনকারী, পানাহারকারী ইত্যাদি হওয়া বাতিল। অনুরূপভাবে মুকাদ্দমা তথা আল্লাহ তা'আলার বান্দার কাজ-কর্মের স্রষ্টা হওয়াও বাতিল।

আমাদের জবাব

ব্যাখ্যাকার উপরিউক্ত প্রমাণের প্রেক্ষিতে বলেন- এ প্রমাণ প্রদান মুতাযিলীদের চরম মুর্খতাই বুঝায়। কেননা দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট, পানাহারকারী প্রভৃতি গুণবাচক শব্দ। যা স্ব-স্ব উৎসমূল তথা দাঁড়ানো, বসা, পানাহারের সাথে গুণান্বিত সত্ত্বা বুঝায়। যার সাথে এসব গুণ প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাকেই এসব গুণে গুণান্বিত বলা হবে; এগুলোর স্রষ্টা বা আবিষ্কারকে নয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা দেহাবয়বের মধ্যে সাদা-কালা ইত্যাদি গুণাবলির স্রষ্টা। কিন্তু কেউ আল্লাহ তা'আলাকে এসব গুণে গুণান্বিত মনে করে তাকে সাদা-কালো বলে না বরং দেহ বা শরীরকে সাদা-কালো বলা হয়। কেননা সাদা-কালো শরীরের সাথে প্রতিষ্ঠিত। কাজেই শরীরই এসবের সাথে গুণান্বিত হবে।

মুতাযিলীগণ এমন কিছু নস দ্বারাও প্রমাণ পেশ করে, যেগুলোতে খালেকীন শব্দ বহুবচনরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তাতে প্রমণিত হয়, খালিক বা স্রষ্টা কেবল আল্লাহ তা'আলাই নয় বরং বান্দাও খালিক। অনুরূপভাবে এমন সব নস দ্বারাও প্রমাণ পেশ করে, যেগুলোতে খল্ক (সৃষ্টিকরা) শব্দের সম্পর্ক বান্দার সাথে করা হয়েছে। যেমন, وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ। এ আয়াতের খল্কের সম্পর্ক হযরত মূসা (আ.) এর প্রতি করা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল, বান্দাও খালিক বা স্রষ্টা। ব্যাখ্যাকার এর জবাবে বলেন, উভয় স্থানে খল্ক শব্দের অর্থ তাকদীর অর্থাৎ অনুমান করা এবং নকশা ও পতিবিম্ব প্রস্তুত করা।

وَهِيَ اَيْ اَفْعَالُ الْعِبَادِ كُلُّهَا بِاِرَادَتِهٖ وَمَشِيْئَتِهٖ تَعَالٰى وَتَقَدَّسَ وَقَدْ سَبَقَ اَنَّهُمَا عِنْدَنَا عِبَارَةٌ عَنْ مَعْنًى وَاحِدٍ وَحُكْمِهٖ لَا يَبْعُدُ اَنْ يَكُوْنَ ذٰلِكَ اِشَارَةً اِلٰى خِطَابِ التَّكْوِيْنِ وَقَضِيَّتِهٖ اَيْ قَضَائِهٖ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْفِعْلِ مَعَ زِيَادَةِ اَحْكَامٍ لَا يُقَالُ لَوْكَانَ الْكُفْرُ بِقَضَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى لَوَجَبَ الرِّضَاءُ بِهٖ لِاَنَّ الرِّضَاءَ بِالْقَضَاءِ وَاجِبٌ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ لِاَنَّ الرِّضَاءَ بِالْكُفْرِ كُفْرٌ لِاَنَّا نَقُوْلُ اَلْكُفْرُ مَقْضِيٌّ لَاقَضَاءٌ وَالرِّضَاءُ اِنَّمَا يَجِبُ بِالْقَضَاءِ دُوْنَ الْمَقْضِيِّ وَتَقْدِيْرِهٖ وَهُوَ تَحْدِيْدُ كُلِّ مَخْلُوْقٍ بِحَدِّهِ الَّذِيْ يُوْجَدُ مِنْ حُسْنٍ وَقُبْحٍ وَنَفْعٍ وَضَرٍّ وَمَا يَحْوِيْهِ مِنْ زَمَانٍ اَوْمَكَانٍ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ ثَوَابٍ وَعِقَابٍ وَالْمَقْصُوْدُ تَعْمِيْمُ اِرَادَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَقُدْرَتِهٖ لِمَا مَرَّ مِنْ اَنَّ الْكُلَّ بِخَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَهُوَ يَسْتَدْعِي الْقُدْرَةَ وَالْاِرَادَةَ لِعَدَمِ الْاِكْرَاهِ وَالْاِجْبَارِ.

সহজ তরজমা

আর তা অর্থাৎ বান্দার যাবতীয় কাজকর্ম আল্লাহর ইচ্ছা ও চাওয়ার কারণে বিদ্যমান। ইতোপূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, আমাদের নিকট এতদুভয়ের (এরাদা ও মাশিয়ত) দ্বারা উদ্দেশ্য একই অর্থ। এবং তার (আল্লাহর) হুকুমে (অস্তিত্ব লাভ করে)। এর দ্বারা সৃজনের সম্বোধনের প্রতি ইংগিত হওয়া অসম্ভব কিছু নয় এবং আল্লাহর সিদ্ধান্তে তৈরী হয়েছে। কাযা (قَضَاء) দ্বারা উদ্দেশ্য অধিক দৃঢ়তার সাথে কাজ করা। এরূপ প্রশ্ন করা যাবে না যে, কুফর যদি আল্লাহর সিদ্ধান্তে হয়ে থাকে, তাহলে এর সন্তুষ্টি অনিবার্য। কেননা কাযা বা সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক। আর লাযিম বাতিল। কেননা কুফরের উপর সন্তুষ্ট থাকা কুফরী। কারণ, আমরা জবাব দেব, কুফর চূড়ান্ত বিষয়; সিদ্ধান্ত নয়। আর সন্তুষ্টি শুধুমাত্র সিদ্ধান্তের উপর ওয়াজিব; চূড়ান্ত বিষয়ে নয়। এবং বান্দার সকল কার্যবলি আল্লাহ তা'আলার তাকদীরের কারণে হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু বা মাখলুককে তার ঐ গুণে সুনির্দিষ্ট করা, যে গুণে সে অস্তিত্ব লাভ করবে। যেমন, সুন্দর ও বিশ্রী এবং মঙ্গল-অমঙ্গল তথা ভাল-মন্দ ও লাভ-ক্ষতি এবং ঐ স্থান এবং কালের সাথে (বিশেষিত করা), যাতে সেটি অন্তর্ভুক্ত এবং প্রতিদান ও শক্তির সাথে, যা তাতে প্রতিফলিত হবে। আর গ্রন্থাকারের উদ্দেশ্য, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও কুদকত বা শক্তিকে ব্যাপকতা দান। কেননা পেছনে গেছে যে, বান্দার যাবতীয় কাজকর্ম আল্লাহর সৃষ্ট ফল। আর খাল্ক বা সৃষ্টি করা কুদরত ও ইচ্ছার দাবী। কেননা আল্লাহ তা'আলা বাধ্য-অপারগ নন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

বান্দার কাজকর্ম আল্লাহর ইচ্ছাধীন

প্রমাণ হয়ে গেল যে, বান্দার যাবতীয় কাজকর্মের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা এবং জানা গেল যে, ইচ্ছা ও চাওয়া ছাড়া কোন জিনিসের আবিষ্কার হতে পারে না। তখন বুঝা গেল, বান্দার যাবতীয় কাজকর্ম আল্লাহর ইচ্ছাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। চাই কাজটি লাভজনক ও হিতকর হোক কিংবা ক্ষতিকর ও অমঙ্গলজনক হোক। এতে মুতাযিলীদের প্রতিবাদ (মত খণ্ডন) করা হয়েছে। তারা বলে মন্দ ও নিকৃষ্ট কাজ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় প্রকাশ পায় না।

قَوْلُهٗ : قَدْ سَبَقَ اَنَّهَا..الخ ঃ অর্থাৎ ইতোপূর্বে সিফাতে আযালিয়্যাহ তথা অনাদি চিরন্তন সিফাতসমূহের আলোচনায় শারেহ রহ. বলেছেন; আমাদের নিকট এরাদা ও মাশিয়্যত একই সিফাতের নাম। আর কাররামিয়্যাহ মাশিয়্যাতকে কাদীম বা অবিনশ্বর এবং এরাদাকে নশ্বর বলেন।

قَوْلُهٗ وَحُكْمُهٗ.. الخ ঃ ব্যাখ্যাকার বলেছেন– হুকুম দ্বারা সৃজনের সম্বোধন তথা কোন বস্তু আবিষ্কারের ইচ্ছা করার মুহূর্তে كُنْ (কুন) বলাও হতে পারে। যেমন ইরশাদ হয়েছে –

اِنَّمَا اَمْرُهٗ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْن

আবার হুকুম শব্দ দ্বারা একটু পরে অত্যাসন্ন কাযাও উদ্দেশ্য হতে পারে।

قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ اَىْ قَضَاءُ الخ ঃ ব্যাখ্যাকার কাযার ব্যাখ্যা **فَعْل** (ফা তে যবর) দ্বারা করেছেন। তারপূর্বে তাকবীনের আলোচনার সূচনায় বলেছিলেন, تَكْوِيْن ও فِعْل একই জিনিস। বুঝা গেল, কাযা দ্বারা তাকবীন উদ্দেশ্য।

কুফরীতে সন্তুষ্ট থাকা ওয়াজিব নয়

قَوْلُهُ: لاَيُقَالُ..الخ ঃ (এখানে উত্থাপিত) প্রশ্নের সারকথা হল, ভাল-মন্দ সকল কাজই যদি আল্লাহর সিদ্ধান্তে অস্তিত্ব লাভ করে তাহলে কুফরও আল্লাহর সিদ্ধান্তে বাস্তবায়িত হবে। অথচ কুফর আল্লাহর সিদ্ধান্তে বাস্তবায়িত হয়ে থাকলে কুফরের উপর সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক হত। কেননা কাযা'র উপর সন্তুষ্ট থাকা ওয়াজিব। আর তালী তথা কুফরের উপর সন্তুষ্টি ওয়াজিব হওয়া বাতিল। কেননা কুফরের উপর সন্তুষ্টিও কুফরের নামান্তর। তদ্রূপ মুকাদ্দমা তথা আল্লাহর সিদ্ধান্তে কুফর বাস্তবায়িত হওয়াও বাতিল।

জবাব ঃ জবাবের সারাংশ হল, কাযা'র উপর সন্তুষ্ট থাকা ওয়াজিব। যা আল্লাহর কাজ। কুফরের উপর সন্তুষ্ট থাকা ওয়াজিব নয়। যা সিদ্ধান্তকৃত বিষয় এবং বান্দার বৈশিষ্ট্য। অতএব কেমন যে প্রশ্নকারী কাযা ও মুকতাযার (সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তকৃতের) মধ্যে পার্থক্য করতে পারেননি। যদ্দরুন উপরিউক্ত প্রশ্ন উঠেছে।

তাকদীরের অর্থ

قَوْلُهُ: وَهُوَ تَحْدِيْدُ كُلِّ..الخ ঃ এটি তাকদীরের অর্থের বিবরণ। সারকথা হল, যে কোন সৃষ্টিজীব যে কোন স্থান ও কালে যেসব গুণের সাথে বিদ্যমান থাকবে, যেগুলো পূর্ব হতেই সুনির্দিষ্ট করে দেওয়ার নাম তাকদীর বা নিয়তী। আল্লাহপাকের ঐ নির্দিষ্ট করণ অনুযায়ী সকল সৃষ্টিজীব অস্তিত্ব লাভ করে। যেরূপভাবে কোন প্রসাদ বা ঘর নির্মানের পূর্বে তার একটি নকশা ও ম্যাপ যেহেনে কিংবা কাগজে প্রস্তুত করা হয় অর্থাৎ ঘরটির এতটুকু দৈর্ঘ ও এতটুকু প্রস্থ থাকবে। এতটি কামরা হবে। অমুক দিকে বারান্দা, অমুক দিকে বাথরূম বা টয়লেট হবে। অমুক দিকে রান্নাঘর থাকবে ইত্যাদি। তারপর ঐ নকশা অনুযায়ী বাস্তবে ঘর নির্মিত হয়। অনুরূপভাবে বিশ্বজগতের একটি নকশাও আল্লাহর কাছে সংগোপনে প্রস্তুত ছিল। যাতে প্রত্যেক জিনিসের ভাল-মন্দ লাভ-ক্ষতি, তার অস্তিত্ব কাল ও স্থান সুনির্দিষ্ট হয়ে ছিল। সে নকশা অনুযায়ীই প্রত্যেক জিনিস বাস্তব অস্তিত্ব লাভ করে। মুসলমানগণ উক্ত নকশাকে তাকদীর বলে, যে নকশা অনুযায়ী পৃথিবীতে সবকিছু অস্তিত্ব লাভ করে।

فَاِنْ قِيْلَ فَيَكُوْنُ الْكَافِرُ مَجْبُوْرًا فِىْ كُفْرِهٖ وَالْفَاسِقُ فِىْ فِسْقِهٖ فَلَا يَصِحُّ تَكْلِيْفُهُمَا بِالْاِيْمَانِ وَالطَّاعَةِ، قُلْنَا اِنَّهٗ تَعَالٰى اَرَادَ مِنْهُمَا الْكُفْرَ وَالْفِسْقَ بِاخْتِيَارِهِمَا فَلَاجَبْرَ كَمَا اَنَّهٗ عَلِمَ مِنْهُمَا الْكُفْرَ وَالْفِسْقَ بِاخْتِيَارٍ وَلَمْ يَلْزَمْ تَكْلِيْفُ الْمُحَالِ، وَالْمُعْتَزِلَةُ اَنْكَرُوْا اِرَادَةَ اللّٰهِ تَعَالٰى لِلشُّرُوْرِ وَالْقَبَائِحِ حَتّٰى قَالُوْا اِنَّهٗ اَرَادَ مِنَ الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ اِيْمَانَهٗ وَطَاعَتَهٗ لَاكُفْرَهٗ وَمَعْصِيَتَهٗ زَعْمًا مِنْهُمْ اَنَّ اِرَادَةَ الْقَبِيْحِ قَبِيْحَةٌ كَخَلْقِهٖ وَاِيْجَادِهٖ وَنَحْنُ نَمْنَعُ ذٰلِكَ بَلِ الْقَبِيْحُ كَسْبُ الْقَبِيْحِ وَالْاِتِّصَافُ بِهٖ فَعِنْدَهُمْ يَكُوْنُ اَكْثَرُ مَا يَقَعُ مِنْ اَفْعَالِ الْعِبَادِ عَلٰى خِلَافِ اِرَادَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَهٰذَا شَنِيْعٌ جِدًّا

সহজ তরজমা

সুতরাং যদি প্রশ্ন করা হয়, তাহলে তো কাফির স্বীয় কুফরীতে এবং পাপাচারী ফাসেক তার পাপাচারে বাধ্য। তাকে ঈমান ও আনুগত্যের দায়িত্ব আরোপ সহীহ নয়। আমরা জবাব দেব– আল্লাহ তা'আলা তাদের ইখতিয়ার বা স্বাধীনতার সাথে কুফর ও পাপাচারের ইচ্ছা করেছেন। কাজেই বাধ্য-বাধকতা নেই। যেরূপভাবে (তাদের) উভয় থেকে ইচ্ছাকৃত কুফর ও ফিস্ক (পাপাচার) প্রকাশ পাওয়ার কথা আল্লাহ তা'আলা জানেন এবং অসম্ভবের মুকাল্লাফ বানানো (অসম্ভব কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া) আবশ্যক হবে না। মুতাযিলীরা আল্লাহর পক্ষ থেকে অপকর্ম, জঘন্য ও নিন্দনীয় কাজের ইচ্ছা করাকে অস্বীকার করেছে। এমনকি তারা বলেছে– আল্লাহ তা'আলা কাফির ও

ফাসিক থেকে (তাদের) ঈমান-আনুগত্যের ইচ্ছা করেছেন; কুফর ও অবাধ্যতার ইচ্ছা নয়। কেননা তাদের বিশ্বাস, অপকর্মের ইচ্ছা করাও অপকর্মের নামান্তর। যেমন, তার সৃষ্টি ও আবিষ্কার (খারাপ)। আমরা তা অস্বীকার করি। (বলি,) বরং মন্দ কামাই এবং মন্দের সাথে বা নিন্দনীয় কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া নিন্দনীয়। বিধায় তাদের মতে বান্দার প্রায় কাজই আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাস্তবায়িত হয়। আর তা বড় নিন্দনীয় (সাঙ্ঘাতিক) ব্যাপার।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

বান্দার কাজ আল্লাহর ইচ্ছাধীন হলেও বান্দা নয়

ইতোপূর্বে ব্যাখ্যাকার বলেছিলেন, وَالْمَقْصُوْدُ تَعْمِيْمُ إِرَادَةِ اللّٰهِ

এর উপর মুতাযিলীদের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হয় অর্থাৎ যখন বান্দার ভাল-মন্দ সকল কাজকর্ম আল্লাহর ইচ্ছায় অস্তিত্ব লাভ করে, তখন কাফিরের কুফর এবং ফাসিকের ফিস্‌কও আল্লাহর ইচ্ছায় অস্তিত্ব লাভ করবে। আর আল্লাহ তা'আলা যে কাজের ইচ্ছা করবেন, বান্দা ঐ কাজে বাধ্য। তার থেকে এর বিপরীত প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব। কাজেই কাফির কুফরী করতে বাধ্য। পক্ষান্তরে তার ঈমান গ্রহণ করা অসম্ভব। অনুরূপভাবে ফাসিক ফিস্‌ক করতে বাধ্য। তার পক্ষে ইবাদত-আনুগত্য করা অসম্ভব। আর অসম্ভব জিনিসের উপর বাধ্য করা সহীহ নয়। কাজেই কাফিরকে ঈমানের এবং ফাসিককে আনুগত্যের দায়িত্ব বর্তানো বিশুদ্ধ নয়।

জবাব ঃ ব্যাখ্যাকারের জবাবের সারকথা হল, আল্লাহর ইচ্ছার সম্পর্ক নিছক (মুতলাক) ফে'ল (কাজ) কিংবা তরক (বর্জন) এর সাথে নয় বরং ঐচ্ছিক কর্ম কিংবা বর্জনের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেছেন, অমুক থেকে ঐচ্ছিকভাবে কুফরী প্রকাশ পাবে; অমুক থেকে ঐচ্ছিকভাবে ফিস্‌ক ও পাপাচার প্রকাশ পাবে। বিধায় এখন সে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী স্বেচ্ছায়ই কুফরী এবং পাপাচারে লিপ্ত হবে; কুফর বা ফিস্‌কে বাধ্য হবে না। যেভাবে আল্লাহর প্রথম থেকেই জানা ছিল, কাফির স্বেচ্ছায়ই কুফরী করবে। আর ফাসিক স্বেচ্ছায়ই ফাসেকি পাপাচার করবে। কিন্তু কাফির স্বীয় কুফরীতে এবং ফাসিক স্বীয় পাপাচারে আদৌ বাধ্য নয়। কাজেই উপরিউক্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না এবং অসম্ভব কাজে বাধ্য করাও আবশ্যক হবে না।

মু'তাযিলাদের একটি অলীক দাবী

قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَزِلَةُ أَنْكَرَهُ .... الخ ঃ অর্থাৎ মু'তাযিলারা বা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা বান্দার সমস্ত কাজকর্মে ব্যাপক ব্যাপৃত হওয়াকে অস্বীকার করে। বলে, বান্দার ভাল কাজ তো আল্লাহর ইচ্ছায়ই প্রকাশ পায়; আর মন্দ কাজ আল্লাহর ইচ্ছায় প্রকাশ পায় না। কেননা আল্লাহ তা'আলা অপকর্ম এবং মন্দ কাজের ইচ্ছা করেন না। এমনকি তিনি কাফির থেকেও ঈমানেরই ইচ্ছা করেন এবং ফাসেক থেকে আনুগত্যের ইচ্ছা করেন। বস্তুতঃ মু'তাযিলার নিকট যেভাবে মন্দের সৃষ্টি মন্দ, তদ্রুপ মন্দের ইচ্ছাও মন্দ। আমরা এ মূলনীতি অস্বীকার করে বলি, মন্দের সৃষ্টি মন্দ নয় এবং মন্দের ইচ্ছাও মন্দ নয়। বরং মন্দ কামাই এবং মন্দের সাথে বিশেষিত হওয়া মন্দ, যা বান্দার ঐচ্ছিক কর্ম। তাহলে মু'তাযিলাদের মূলনীতির ভিত্তিতে বান্দার অধিকাংশ কাজই জঘন্যও (সাংঘাতিক ব্যাপার। কেননা এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার পরাস্ত হওয়া এবং স্বয়ী উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়বে।

حُكِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ اَنَّهُ قَالَ مَاأَلْزَمَنِيْ اَحَدٌ مِثْلَ مَاأَلْزَمَنِيْ مَجُوْسِيٌّ كَانَ مَعِيْ فِي السَّفِيْنَةِ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ لَاتُسْلِمُ فَقَالَ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمْ يُرِدْ اِسْلَامِيْ فَاِذَا اَرَادَ اِسْلَامِيْ اَسْلَمْتُ فَقُلْتُ لِلْمَجُوْسِيِّ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُرِيْدُ اِسْلَامَكَ وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَايَتْرُكُوْنَكَ فَقَالَ الْمَجُوْسِيُّ فَاَنَا اَكُوْنُ مَعَ الشَّرِيْكِ الْاَغْلَبِ وَحُكِيَ اَنَّ الْقَاضِيْ عَبْدَ الْجَبَّارِ الْهَمْدَانِيَّ دَخَلَ عَلَى الصَّاحِبِ ابْنِ عَبَّادٍ وَعِنْدَهُ الْاُسْتَاذُ اَبُوْ اِسْحٰقَ الْاِسْفِرَائِنِيُّ فَلَمَّا رَاٰى الْاُسْتَاذَ قَالَ سُبْحَانَ مَنْ تَنَزَّهَ عَنِ الْفَحْشَاءِ فَقَالَ الْاُسْتَاذُ عَلَى الْفَوْرِ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَجْرِيْ فِيْ مُلْكِهِ اِلَّا مَاشَاءَ

সহজ তরজমা

আমর ইবনে উবাইদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– কেউ আমাকে এমন নিরুত্তর করতে পারেনি, যেরূপ করেছিল এক অগ্নিপূজক। সে নৌকায় আমার সহযাত্রী ছিল। আমি তাকে বললাম– তুমি কেন মুসলমান হও না? তখন সে বলল– কারণ, আল্লাহ তা'আলা আমার মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা করেননি। কাজেই তিনি যখন আমার ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করবেন, তখন আমি মুসলমান হয়ে যাব। অতঃপর আমি অগ্নিপূজককে বললাম– আল্লাহ তা'আলা চান তুমি মুসলমান হও! কিন্তু শয়তান তোমাকে ছাড়ে না। তখন অগ্নিপূজক বলল– তাহলে আমি আমার বিজয়ী শরীকের সাথেই থাকব। আরও বর্ণিত আছে, কারী আব্দুল জাব্বার হামদানী সাহেব ইবনে আব্বাদের নিকট গেলেন। তার নিকট শিক্ষক আবূ ইসহাক ইসফারাইনী উপস্থিত ছিলেন। উস্তাদকে দেখেই তিনি বললেন– পবিত্রতা বর্ণনা করি ঐ সত্ত্বার, যিনি জঘন্যতা বা মন্দ কাজ থেকে মুক্ত। উস্তাদ তৎক্ষণাত উত্তর দিলেন, পবিত্রতা ঐ সত্ত্বার, যার রাজত্বে তা-ই কার্যকর হয়, যা তিনি ইচ্ছা করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

উপরিউক্ত ঘটনা দুটি উল্লেখ করার পেছনে ব্যাখ্যাকারের উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ পাকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজকর্ম বাস্তবায়িত হওয়ার দাবী করা জঘন্য খারাপ– এ ব্যাপারে গুরুত্বরোপ করা। প্রথমোক্ত ঘটনায় অগ্নিপূজক– إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يُرِدْ إِسْلَامِىْ বলে আর দ্বিতীয় ঘটনায় উস্তাদ আবূ ইসহাক– سُبْحَانَ مَنْ لَا يَجْرِىْ فِىْ مُلْكِهٖ إِلَّا مَا شَاءَ বলে মু'তাযিলাদের উপর আক্রমণ করেছেন।

وَالْمُعْتَزِلَةُ اِعْتَقَدُوْا اَنَّ الْاَمْرَ يَسْتَلْزِمُ الْاِرَادَةَ وَالنَّهْىَ عَدَمَ الْاِرَادَةِ فَجَعَلُوْا اِيْمَانَ الْكَافِرِ مُرَادًا وَكُفْرَهٗ غَيْرَ مُرَادٍ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ اَنَّ الشَّيْئَ قَدْ لَايَكُوْنُ مُرَادًا وَيُؤْمَرُ بِهٖ وَقَدْ يَكُوْنُ مُرَادًا وَيُنْهٰى عَنْهُ لِحِكَمٍ وَمَصَالِحَ يُحِيْطُ بِهَا عِلْمُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَوْ لِاَنَّهٗ لَايُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ اَلَايُرٰى اَنَّ السَّيِّدَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُّظْهِرَ عَلَى الْحَاضِرِيْنَ عِصْيَانَ عَبْدِهٖ يَاْمُرُهٗ بِشَيْئٍ وَلَايُرِيْدُهٗ مِنْهُ وَقَدْ يَتَمَسَّكُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ بِالْآيَاتِ وَبَابُ التَّاوِيْلِ مَفْتُوْحٌ عَلَى الْفَرِيْقَيْنِ

সহজ তরজমা

মু'তাযিলীদের আকীদা হল, হুকুমের জন্য ইচ্ছা এবং নিষেধাজ্ঞার জন্য অনিচ্ছা থাকা জরুরী। এজন্য তারা কাফিরের ঈমানকে উদ্দিষ্ট্য আর কুফরকে অনুদিষ্ট্য সাব্যস্ত করেছে। আমরা জানি, অনেক সময় একটি জিনিসের ইচ্ছা হয় না। অথচ তার হুকুম করা হয়। আবার কখনও একটি জিনিসের ইচ্ছে করা হয়, অথচ তা থেকে বারণ করা হয়। (এমন করা হয়) এমন হেকমত এবং কল্যাণার্থে, যার সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা সম্যক অবগত। অথবা এ কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা তার কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হতে পারে না। জানা নেই– মনিব যখন উপস্থিত লোকদের সামনে স্বীয় গোলামের অবাধ্যতার কথা প্রকাশ করতে চায়, তখন তাকে কোন একটি কাজের হুকুম করে। অথচ তার থেকে উক্ত কাজ সম্পাদন চায় না। উভয় পক্ষ থেকে আয়াতে কারীমা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয়। তাবীল বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দ্বার উভয় দলের জন্যই উন্মুক্ত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হুকুম ও ইচ্ছা এবং নিষেধাজ্ঞা ও অনিচ্ছার মাঝে কি আবশ্যকতা আছে ?

সারকথা, হুকুম ও ইচ্ছা এবং নিষেধাজ্ঞা ও অনিচ্ছার মধ্যে আবশ্যকতা (বাধ্যতামূলক সম্পর্ক) থাকা মুতাযিলীদের একটি আকীদা। এটি একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস। সুতরাং কখনও কখনও একটি কাজের ইচ্ছা এবং তার বাস্তবায়ন কাম্য হয় না। এতদসত্ত্বেও তার হুকুম করা হয়। যেমন, কোন মনিব স্বীয় গোলামের অবাধ্যতা প্রকাশ করার জন্য তাকে কোন কোন নির্দেশ দেয়। তখন সে চায় না, গোলাম ঐ কাজ করুক বরং কাজ না করাই তার কাম্য থাকে। যেন তার অবাধ্যতা লোকজন অবগত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে কখনও কখনও একটি কাজের ইচ্ছা ও তার বাস্তবায়ন কাম্য থাকে। তদুপরি আল্লাহ তা'আলা এমন কিছু হিকমত ও কল্যাণার্থে তা থেকে বারণ করেন, যেগুলো (যে হিকমত ও কল্যাণ) কেবল তিনিই জানেন। কেননা আল্লাহর কোন কাজের ব্যাপারে তাকে

জিজ্ঞাসাবাদের কোন অধিকার আমাদের নেই। কাজেই যখন কোন একটি কাজের ইচ্ছা করেন, তখন আদেশের স্থলে তা থেকে কেন বারণ করেন– একথা জিজ্ঞাসা করার অধিকার আমাদের নেই।

وَلِلْعِبَادِ اَفْعَالٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ يُثَابُوْنَ بِهَا اِنْ كَانَتْ طَاعَةً وَيُعَاقَبُوْنَ عَلَيْهَا اِنْ كَانَتْ مَعْصِيَةً لَاكَمَا زَعَمَتِ الْجَبْرِيَّةُ اَنَّهُ لَافِعْلَ لِلْعَبْدِ اَصْلًا وَاَنَّ حَرَكَاتِهِ بِمَنْزِلَةِ حَرَكَاتِ الْجَمَادَاتِ لَاقُدْرَةَ عَلَيْهَا وَلَاقَصْدَ وَلَا اِخْتِيَارَ، وَهٰذَا بَاطِلٌ لِاَنَّانُفَرِّقُ بِالضَّرُوْرَةِ بَيْنَ حَرَكَةِ الْبَطْشِ وَحَرَكَةِ الْاِرْتِعَاشِ وَنَعْلَمُ اَنَّ الْاَوَّلَ بِاخْتِيَارِهٖ دُوْنَ الثَّانِىْ وَلِاَنَّهُ لَوْلَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ فِعْلٌ اَصْلًا لَمَاصَحَّ تَكْلِيْفُهُ وَلَايَتَرَتَّبُ اِسْتِحْقَاقُ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ عَلٰى اَفْعَالِهٖ وَلَا اِسْنَادُ الْاَفْعَالِ الَّتِىْ تَقْتَضِىْ سَابِقِيَّةَ الْقَصْدِ وَالْاِخْتِيَارِ اِلَيْهِ عَلٰى سَبِيْلِ الْحَقِيْقَةِ مِثْلُ صَلّٰى وَكَتَبَ وَصَامَ بِخِلَافِ مِثْلِ طَالَ الْغُلَامُ وَاسْوَدَّ لَوْنُهُ وَالنُّصُوْصُ الْقَطْعِيَّةُ تَنْفِىْ ذٰلِكَ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ وَقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اِلٰى غَيْرِذٰلِكَ

সহজ তরজমা

বান্দার কিছু ঐচ্ছিক কর্ম রয়েছে। তা যদি ইবাদত-আনুগত্যের অন্তর্গত হয়, তাহলে তার উপর প্রতিদান দেওয়া হবে। আর যদি অবাধ্যতা ও পাপাচারের অন্তর্গত হয়, তাহলে তার জন্য শাস্তি দেওয়া হবে। জাব্‌রিয়াদের দাবী মাফিক নয় যে, বান্দার কোনও ঐচ্ছিক কর্মক্রিয়াই নেই। তার গতিস্থিতি (নড়াচড়া) জড়পদার্থের গতিস্থিতির অনুরূপ। এতে তার শক্তি-সামর্থ বা ইচ্ছা-স্বাধীনতা নেই। এ দাবী ভ্রান্ত। কেননা আমরা সুস্পষ্টভাবে কোন কিছু ধরার জন্য গতি এবং কাঁপুনী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির গতির মধ্যে প্রার্থক্য করি। বিশ্বাস করি যে, প্রথমোক্ত গতি ঐচ্ছিক; দ্বিতীয়টি নয়। আরেক কারণ হল, বান্দার যদি কোন কাজই না থাকে, তবে তাকে দায়িত্ব আরোপ করা শুদ্ধ হবে না। তার কাজের উপর প্রতিদান ও শাস্তি বিধানের যোগ্যতাও প্রতিফলিত হবে না। (এমনকি) এসব কাজকর্মের সম্পর্ক বান্দার সাথে বাস্তবসম্মত হবে না। যেগুলো পূর্ব থেকে ইচ্ছা-এখতিয়ার বা স্বধীনতার দাবী রাখে। যেমন, নামায পড়ল, লিখল এবং রোযা রাখল– طَالَ الْغُلَامُ (শিশুটি লম্বা হল।) اِسْوَدَّ لَوْنُهُ (কৃষ্ণকায় হল বা তার রং কালো হল।) এর বরখেলাপ। অকাট্য নছগুলো এসব বিষয় প্রত্যাখ্যান করে। যেমন, আল্লাহর বাণী– (১) جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (২) فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ এবং এছাড়া অন্যান্য আয়াতসমূহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

বান্দার স্বাধীনতাও বাধ্যবাধকতা

উপরিউক্ত বিষয়টি জাব্‌র ও ইখতিয়ার (বাধ্যকরণ ও স্বধীনতা) নামে প্রসিদ্ধ এবং একটি জটিলতর মাসয়ালা। এমনকি ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে। (তিনি বলেন,) আমাকে জাবর ও ইখতিয়ার কাবু করে ছেড়েছে। প্রবীণ উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করতেন। কিন্তু পরবর্তী উলামায়ে কিরামকে বাধ্য হয়ে জাবরিয়্যাহ ও মুতাযিলাদের প্রতিবাদে মুখ খুলতে হয়েছে। এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য মাযহাব তিনটি।

(১) ম'তাযিলাদের মাযহাব। তারা বলে, বান্দার কাজকর্ম শুধুমাত্র বান্দার শক্তি-সামর্থে বাস্তবায়িত হয়। সে মতে তারা বান্দাকে স্বীয় কাজকর্মের স্রষ্টা বলে। এ মতবাদের প্রতিবাদ (খণ্ডন) খাল্‌কে আফআল তথা কর্মসমূহের সৃজনের মাসআলায় আলোচিত হয়েছে।

(২) জাবরিয়্যাদের মাযহাব। তারা বলে– বান্দার কাজকর্ম শুধুমাত্র আল্লাহর কুদরতে বাস্তবায়িত হয়। তাতে বান্দার শক্তি-সামর্থ ও ইচ্ছা-স্বাধীনতার কোনও দখল নেই। সে একান্ত বাধ্য এবং জড়প্রদার্থের মত।

(৩) আশ'আরিয়্যাদের মাযহাব। তারা বলে– বান্দার কাজকর্ম বাস্তবায়নের পিছনে মূল প্রতিক্রিয়া তো

আল্লাহর কুদরতের, তবে বান্দার শক্তি-সামর্থ এবং ইচ্ছারও দখল রয়েছে। বান্দা যখন স্বীয় শক্তি-সামর্থ ও ইচ্ছা কাজে খাটায় অর্থাৎ কর্ম সম্পাদনের (বাস্তবায়নের) বাহ্যিক উপায় স্বেচ্ছায় অবলম্বন করে, যাকে কামাই বা উপার্জন বলে, তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ কাজ বাস্তবায়িত করে দেন। যাকে খাল্ক বা সৃজন বলে। কাজেই বান্দার কাজকর্ম তারই উপার্জন এবং আল্লাহর সৃষ্ট।

পাঁচটি কারণে জাব্রিয়্যাদের ভ্রান্ত

ব্যাখ্যাকার জাবরিয়্যাদের মতবাদের ভ্রান্ততার উপর **প্রথম** নিম্নোক্ত প্রমাণ পেশ করেছেন। অর্থাৎ কোন কিছু ধরার গতি এবং কাঁপুনে রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির গতির মাঝে আমরা তফাত দেখতে পাই। উক্ত পার্থক্য– প্রথমটি ঐচ্ছিক ও দ্বিতীয়টি অনৈচ্ছিক কর্ম হওয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়। বুঝা গেল, বান্দার কিছু কর্ম ঐচ্ছিক। যার অস্তিত্বের পেছনে তার ইচ্ছার দখল রয়েছে। কাজেই বান্দাকে একান্ত বাধ্য বলা ভ্রান্ত প্রমাণিত হল।

দ্বিতীয় প্রমাণ ঃ জড়পদার্থের উপর দায়িত্ব বর্তানো সর্বসম্মিতিক্রমে নিরর্থক ও ভ্রান্ত। সুতরাং বান্দার কোন কাজ যদি ঐচ্ছিক না হত এবং সে নিজের কাজে জড়পদার্থের অনুরূপ হত, তাহলে যেভাবে জড়পদার্থের উপর দায়িত্ব চাপানো শুদ্ধ নয়, তদ্রূপ বান্দার উপরেও দায়িত্বভার দেওয়া (কর্তব্য বর্তানো) শুদ্ধ হত না। অতএব বুঝা গেল, বান্দার ঐচ্ছিক কর্ম রয়েছে। সে নিজ কর্মে জড়পদার্থের মত বাধ্য নয়।

তৃতীয় প্রমাণ ঃ বান্দার কোনও কাজ যদি ঐচ্ছিক না হত, তাহলে কোনও কাজেই তাকে প্রতিদান বা শাস্তিযোগ্য সাব্যস্ত করা যেত না। কেননা প্রতিদান ও শাস্তি বিধান ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। অথচ বহু নছ দ্বারা বান্দার প্রতিদান এবং শাস্তিযোগ্য হওয়া প্রমাণিত। অতএব বুঝা গেল, বান্দার ঐচ্ছিক কর্ম রয়েছে।

চতুর্থ প্রমাণ ঃ ভাষাবিদগণ ঐসব কাজকর্মের বাস্তবসম্মত ইসনাদ বা সম্বন্ধ স্থাপন করেন, যেসব কাজকর্মে অবশ্যই ইচ্ছা-স্বধীনতা রয়েছে। যেমন, নামায পড়ল, লিখল ইত্যাদি। উপরিউক্ত ক্রিয়াকর্মের বাস্তবসম্মত ইসনাদ বান্দার সাথে হওয়াই সেগুলো ঐচ্ছিক হওয়ার (প্রকৃষ্ট) প্রমাণ। এর পরিপন্থী اِسْوَدَّ لَوْنُهٗ ও طَالَ الْغُلَامُ ইত্যাদি। কেননা তা অনৈচ্ছিক কর্ম। বান্দার সাথে এগুলোর সম্বন্ধ বান্দার জন্য কোনও কর্মক্রিয়া প্রমাণ করে না।

পঞ্চম প্রমাণঃ এ প্রমাণ শ্রুত। অর্থাৎ বহু নছ আকীদায়ে জাব্র তথা জাবর সংক্রান্ত আকীদা প্রত্যাখ্যান করে। যেমন, جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ এ আয়াতটি বান্দার প্রতি কাজের সম্বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে তাদের কাজের বিনিময়ে প্রতিদান সংশ্লিষ্ট হওয়ার উপরও ইংগিত করে। আর প্রতিদান কেবল ঐচ্ছিক কর্মের উপরেই সংশ্লিষ্ট হয় (বা ঐচ্ছিক কর্মের বিনিময়েই কেবল প্রতিদান পাওয়া যায়)। সুতরাং বুঝা গেল, বান্দার ঐচ্ছিক কর্ম রয়েছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ আয়াতটিও ঈমান এবং কুফর বান্দার ইচ্ছাধীন থাকার প্রমাণ।

فَاِنْ قِيْلَ بَعْدَ تَعْمِيْمِ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاِرَادَتِهٖ اَلْجَبْرُ لَازِمٌ قَطْعًا لِاَنَّهُمَا اِمَّا اَنْ يَتَعَلَّقَا بِوُجُوْدِ الْفِعْلِ فَيَجِبُ اَوْ بِعَدَمِهٖ فَيَمْتَنِعُ وَلَا اِخْتِيَارَ مَعَ الْوُجُوْبِ وَالْاِمْتِنَاعِ قُلْنَا يَعْلَمُ وَيُرِيْدُ اَنَّ الْعَبْدَ يَفْعَلُهٗ اَوْيَتْرُكُهٗ بِاِخْتِيَارِهٖ فَلَا اِشْكَالَ

সহজ তরজমা

সুতরাং যদি প্রশ্ন করা হয়– আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছাকে ব্যাপকতা দানের পর সুনিশ্চিত জাব্র তথা বাধ্যতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। কেননা আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছার সম্বন্ধ হয়ত কর্ম বাস্তবায়নের সাথে হবে। তখন ঐ কর্মক্রিয়া ওয়াজিব ও আবশ্যক হবে। নতুবা কর্মটি অকার্যকর হওয়ার সাথে হবে। তখন কমটি নিষিদ্ধ হবে। আর ওয়াজিব ও নিষিদ্ধ হওয়ার সাথে ইচ্ছা-স্বাধীনতা বহাল থাকে না। আমরা জবাবে বলব, আল্লাহর ইলম (জ্ঞান) ও ইচ্ছা সংশ্লিষ্ট উক্ত কাজ বান্দা স্বেচ্ছায় করবে অথবা বর্জন করবে –এ ব্যাপারে। কাজেই কোনও আপত্তি রইল না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

জাব্‌রিয়াদের অভিযোগ

এ অভিযোগ আল্লাহর ইলম ও ইচ্ছার ব্যাপকতা নিয়ে। সারকথা হল, যদি "বান্দার যাবতীয় কাজকর্ম আল্লাহর ইলমে (বা জানা) আছে এবং তার ইচ্ছায় বাস্তবায়িত হয়" বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তবে বান্দার একান্ত বাধ্য হওয়া অবশ্যকরূপে প্রমাণিত হবে (বা বান্দাকে নিশ্চিতভাবে একান্ত বাধ্য বলতে হবে)। কেননা আল্লাহর ইলম ও ইচ্ছার সম্বন্ধ যদি কর্ম বাস্তবায়নের সাথে হয়, তাহলে কর্ম বাস্তবায়ন ওয়াজিব ও আবশ্যক গণ্য হবে। আর যদি কর্ম না হওয়ার (বা কর্মের অকার্যকরিতার) সাথে হয়, তাহলে কর্মের অকার্যকরিতা (কর্ম না হওয়া) অনিবার্য এবং অস্তিত্ব হবে নিষিদ্ধ (বা অসম্ভব)। আর আবশ্যকতা ও নিষিদ্ধতার (অসম্ভাব্যতার) সাথে ইচ্ছা-ইখতিয়ার বহাল থাকে না। কেননা ইখতিয়ারের মর্ম, বান্দা যদি চায় করবে; নতুবা করবে না।

আমাদের জবাব

শারেহ রহ.উপরিউক্ত অভিযোগের জবাবে বলেন– আল্লাহর ইলম বা ইচ্ছার সম্বন্ধ কেবল বান্দা অমুক কাজ করবে অথবা করবে না –এর সাথেই নয় বরং "বান্দা স্বেচ্ছায় অমুক কাজ করবে অথবা বর্জন করবে"এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। যেহেতু আল্লাহর ইলম ও ইচ্ছার আওতায় বান্দার ইচ্ছাও রয়েছে, আবার আল্লাহর ইলম ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কিছুই হতে পারে না, তাই নিশ্চতভাবে কাজ করা বা বর্জন করা উভয়ই বাঁন্দার ইচ্ছা অনুযায়ী হবে। বান্দা এতে বাধ্য হবে না।

فَاِنْ قِيلَ، فَيَكُوْنُ فِعْلُهُ الْاِخْتِيَارِيُّ وَاجِبًا اَوْ مُمْتَنِعًا وَهٰذَا يُنَافِى الْاِخْتِيَارَ، قُلْنَا اِنَّهُ مَمْنُوْعٌ، فَاِنَّ الْوُجُوْبَ بِالْاِخْتِيَارِ مُحَقِّقٌ لِلْاِخْتِيَارِ لَا مُنَافٍ لَهُ، وَاَيْضًا مَنْقُوْضٌ بِاَفْعَالِ الْبَارِىْ تَعَالٰى

সহজ তরজমা

সুতরাং যদি প্রশ্ন করা হয়, তাহলে তো বান্দার ঐচ্ছিক কর্ম ওয়াজিব অথবা নিষিদ্ধ (আবশ্যক বা অসম্ভব) হবে। আর তা ইচ্ছা বিরোধী। বলব, আমরা (তা) মানি না। কেননা ইখতিয়ারের (স্বাধিকার) সাথে কর্ম ওয়াজিব হওয়া (কাজের আবশ্যকতা) ইখতিয়ারকে সুনিশ্চিত করে দেয়। তার পরিপন্থী নয়। তদ্রুপ আল্লাহ তা'আলার কর্মক্রিয়া দ্বারাও এ অভিযোগ খণ্ডিত হয়ে যায়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আরেকটি অভিযোগ ঃ এটি উপরিউক্ত জবাবের উপর অভিযোগ। সারকথা হল, যখন আল্লাহ তা'আলার ইল্‌ম অথবা ইচ্ছায় থাকবে যে, বান্দা অমুক কাজটি স্বেচ্ছায় করবে। সুতরাং যেহেতু আল্লাহর ইলম ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু হতে পারে না, তাই বান্দার সেই ঐচ্ছিক কর্ম ওয়াজিব এবং আবশ্যক হবে। আর যদি আল্লাহর ইলম ও ইচ্ছার সম্পর্ক "বান্দা স্বেচ্ছায় অমুক কাজ করবে অথবা বর্জন করবে" এর সাথে হয়, তাহলে তরক বা বর্জন করা ওয়াজিব এবং কাজটি অসম্ভব হবে। আর আবশ্যকতা ও অসম্ভাব্যতার সাথে ইচ্ছা-স্বাধীনতা বহাল থাকে না। কেননা ইচ্ছা তখনই থাকতে পারে যখন কাজ করা বা বর্জন করা উভয়ই সম্ভব হয়। আর যদি সম্ভাব্যতার স্থানে ওয়াজিব (আবশ্যকতা) কিংবা অসম্ভাব্যতা হয়, তবে তো বান্দা কাজ করা বা বর্জন করার ব্যাপারে বাধ্য হবে, স্বাধীন থাকবে না।

শারেহ রহ. উপরিউক্ত প্রশ্নের জবাব প্রত্যাখানের নিমিত্ত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহর ইলমের সম্পর্ক যখন "বান্দা স্বেচ্ছায় অমুক কাজ করবে" এর সাথে হবে, তখন বান্দার পক্ষ থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত কাজ পাওয়া যাওয়া আবশ্যক। আর তা ইচ্ছা-স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে দেয়; ইচ্ছা-স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়। আল্লাহর কর্মক্রিয়া দ্বারা উপরিউক্ত প্রশ্নের পরিসমাপ্তিও ঘটে। কেননা আল্লাহর স্বীয় কর্মের ইল্‌ম রয়েছে। উক্ত কর্মের সাথে তার ইচ্ছাও সম্পৃক্ত হয়। যদ্দরুন এসব কাজের অস্তিত্ব আবশ্যক হয়। কিন্তু তথাপিও আল্লাহর ইচ্ছা খতম হয় না। সেসব কাজকর্ম তার ইচ্ছাতেই প্রকাশ পায়। সুতরাং বুঝা গেল, ইচ্ছার সাথে ওয়াজিব হওয়া (বা কাজের আবশ্যকতা) ইচ্ছা পরিপন্থী নয়।

فَاِنْ قِيْلَ لَا مَعْنٰى لِكَوْنِ الْعَبْدِ فَاعِلًا بِالْاِخْتِيَارِ اِلَّا كَوْنُهٗ مُوْجِدًا لِاَفْعَالِهٖ بِالْقَصْدِ وَالْاِرَادَةِ وَقَدْ سَبَقَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى مُسْتَقِلٌّ بِخَلْقِ الْاَفْعَالِ وَاِيْجَادِهَا وَمَعْلُوْمٌ اَنَّ الْمَقْدُوْرَ الْوَاحِدَ لَايَدْخُلُ تَحْتَ قُدْرَتَيْنِ مُسْتَقِلَّتَيْنِ قُلْنَا لَا كَلَامَ فِىْ قُوَّةِ هٰذَا الْكَلَامِ وَمَتَانَتِهٖ اِلَّا اَنَّهٗ لَمَّا ثَبَتَ بِالْبُرْهَانِ اَنَّ الْخَالِقَ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى، وَبِالضَّرُوْرَةِ اَنَّ لِقُدْرَةِ الْعَبْدِ وَاِرَادَتِهٖ مَدْخَلًا فِىْ بَعْضِ الْاَفْعَالِ كَحَرَكَةِ الْبَطْشِ دُوْنَ الْبَعْضِ كَحَرَكَةِ الْاِرْتِعَاشِ اِحْتَجْنَا فِى التَّفَصِّىْ عَنْ هٰذَا الْمَضِيْقِ اِلَى الْقَوْلِ بِاَنَّ اللّٰهَ خَالِقٌ وَالْعَبْدُ كَاسِبٌ وَتَحْقِيْقُهٗ اَنَّ صَرْفَ الْعَبْدِ قُدْرَتَهٗ وَاِرَادَتَهٗ اِلَى الْفِعْلِ كَسْبٌ، وَاِيْجَادُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَلْفِعْلَ عَقِيْبَ ذَالِكَ خَلْقٌ وَالْمَقْدُوْرُ الْوَاحِدُ دَاخِلٌ تَحْتَ قُدْرَتَيْنِ لٰكِنْ بِجِهَتَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، فَالْفِعْلُ مَقْدُوْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى بِجِهَةِ الْاِيْجَادِ وَمَقْدُوْرُ الْعَبْدِ بِجِهَةِ الْكَسْبِ، وَهٰذَا الْقَدْرُ مِنَ الْمَعْنٰى ضَرُوْرِىٌّ وَاِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلٰى اَزْيَدَ مِنْ ذَالِكَ فِىْ تَلْخِيْصِ الْعِبَارَةِ الْمُفْصِحَةِ عَنْ تَحْقِيْقِ كَوْنِ فِعْلِ الْعَبْدِ بِخَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاِيْجَادِهٖ مَعَ مَا لِلْعَبْدِ فِيْهِ مِنَ الْقُدْرَةِ وَالْاِخْتِيَارِ، وَلَهُمْ فِى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا عِبَارَاتٌ، مِثْلُ اَنَّ الْكَسْبَ وَاقِعٌ بِاٰلَةٍ وَالْخَلْقَ لَا بِاٰلَةٍ وَالْكَسْبَ مَقْدُوْرٌ وَقَعَ فِىْ مَحَلِّ قُدْرَتِهٖ وَالْخَلْقَ لَا فِىْ مَحَلِّ قُدْرَتِهٖ وَالْكَسْبَ لَايَصِحُّ اِنْفِرَادُ الْقَادِرِ بِهٖ، وَالْخَلْقَ يَصِحُّ ـ

সহজ তরজমা

তদুপরি যদি বলা হয়, বান্দা স্বাধীন কর্তা হওয়ার কোন অর্থ নেই। অবশ্য সে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনও কাজের অস্তিত্ব দান করে। আর পিছনে আলোচিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কাজকর্ম সৃজনে এবং উদ্ভাবনে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র। আর এ-ও বিদিত যে, একটি ক্ষমতাধীন বস্তু দুটি কুদরতের আওতাভুক্ত হতে পারে না। তাহলে আমরা জবাব দেব, এ বক্তব্যের দৃঢ়তা এবং শক্তিশালী হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহের (দ্বিমতের) অবকাশ নেই। তবে যেহেতু অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, স্রষ্টা কেবল আল্লাহ তা'আলা এবং নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত আছে, কোন কোন কাজে বান্দার ইচ্ছা ও শক্তির দখল রয়েছে। যেমন কিছু ধরার উদ্দেশ্যে গতি। আবার কোন কোন কাজে বান্দার ইচ্ছা ও শক্তির দখল নেই। যেমন কাঁপুনী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির গতিস্থিতি। কাজেই এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য আমরা বলি– আবশ্যকরূপে আল্লাহ তা'আলা স্রষ্টা এবং বান্দা কাসিব বা উপার্জনকারী।

এ জবাবের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হল, কাজকর্মের প্রতি বান্দার ইচ্ছা ও শক্তি প্রয়োগের নাম কাস্‌ব বা কামাই। তারপর উক্ত কাজটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বাস্তবায়ন করে দেওয়ার নাম খল্‌ক বা সৃজন। আর একটি ক্ষমতাধীন বস্তু দুটি কুদরতের আত্তভুক্ত হয়, তবে ভিন্ন ভিন্ন দুটি দিক বিচারে। কেননা উদ্ভাবনের দিক থেকে কাজ আল্লাহর কুদরতের আত্তভুক্ত। আর বান্দার ক্ষমতাধিন হল উপার্জন হিসেবে। এতটুকু বিষয় তো স্বতঃসিদ্ধ। যদিও আমরা ঐ ইবারতকে এর চেয়ে বেশী সংক্ষেপ করতে সক্ষম নই, যা বান্দার ইচ্ছা ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও বান্দার কাজকর্ম আল্লাহর সৃজন ও উদ্ভাবনের প্রতিফল হওয়ার তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে। খাল্‌ক ও কাস্‌ব (সৃজন ও অর্জন) এর পার্থক্যের ব্যাপারে মাশাইখগণের বক্তব্য বিভিন্ন রকম। যেমন, কাস্‌ব বা কামাই উপায়-উপকরণের দ্বারা হয়। আর খাল্‌ক হয় উপকরণ ছাড়া। আবার কাসব এমন ক্ষমতাধীন বস্তু, যা কুদরতের স্থানে পতিত হয়। আর খল্‌ক তার কুদরতের স্থানে (ক্ষমতাধীন স্থানে) পতিত হয় না। কাসবের ক্ষেত্রে ক্ষমতাবানের স্বাতন্ত্রতা যথার্থ নয়; খালকের বেলায় যথার্থ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

বান্দাকে স্বাধীন কর্তা এবং তার জন্য ঐচ্ছিক কর্মের স্বীকৃতির উপর জাব্‌রিয়্যদের পক্ষ থেকে আমাদের উপর একটি অভিযোগ উঠে অর্থাৎ বান্দা স্বাধীন কর্তা হওয়ার মর্মার্থ হল, বান্দায় স্বেচ্ছায় ও ইচ্ছাকৃতভাবে স্বীয় কাজকর্মের উদ্ভাবক। ইতোপূর্বে আপনি বলেছেন– বান্দার কাজকর্মের স্রষ্টা এবং উদ্ভাবক কেবল আল্লাহ্ তা'আলা। আর তা পরস্পর সাংঘর্ষিক দুটি বিষয়ের সহাবসস্থান। যা ভ্রান্ত ও বাতিল। তাছাড়া ক্ষমতাধীন একটি বস্তু তথা বান্দার কর্মটি আল্লাহর কুদরত এবং বান্দার কুদরত স্বতন্ত্র দুটি কুদরতের আওতাভুক্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়। কাজেই দুটির কোনও একটি আবশ্যক হবে। হয়ত বান্দা স্বাধীন কর্তা হবে না বরং স্বীয় কাজকর্মে একান্ত বাধ্য হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলাই তার কাজের স্রষ্টা এবং উদ্ভাবক হবেন। নতুবা আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার কাজকর্মের স্রষ্টা হবেন না বরং বান্দাই স্ব-ইচ্ছায় স্বীয় কর্মের স্রষ্টা ও উদ্ভাবক হবে। দ্বিতীয় সূরত সর্বসম্মতিক্রমে ভ্রান্ত। কাজেই প্রথম সূরত তথা বান্দা স্বাধীন কর্তা না হওয়া এবং স্বীয় কাজকর্মে জড়পদার্থের মত একান্ত বাধ্য হওয়া প্রমাণিত।

জবাবের সারকথা, যখন আল্লাহ্ তা'আলার স্রষ্টা হওয়া দলীল দ্বারা প্রমাণিত। যার মর্ম, বান্দার কাজকর্ম অস্তিত্ব লাভের পেছনে আল্লাহর কুদরত ক্রিয়াশীল। অপর দিকে এ-ও নিশ্চিত যে, কোন কোন কাজে বান্দার শক্তি ও ইচ্ছার দখল রয়েছে। সে মতে বান্দাকে সেসব কাজের উদ্ভাবক মানতে হয়। যা সুস্পষ্ট সংঘর্ষপূর্ণ। এ সংঘর্ষ থেকে পরিত্রাণের জন্য বাধ্য হয়েই আমাদরেকে বলতে হচ্ছে– আল্লাহ্ খালিক, বান্দা কাসিব। এ জবাবের রহস্য হল, বান্দা যখন কোন কাজের ইচ্ছা করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ঐ কাজের কুদরত ও শক্তি বান্দার ভেতর সৃষ্টি করে দেন। আর সে শক্তি কাজের দিকে ধাবিত হয়। তখন ঐ কাজটি আল্লাহ্ তা'আলা বাস্তবায়িত করে দেন। কাজেই বান্দার ইচ্ছা-শক্তি কাজে খাটানোর নাম কাস্‌ব। তারপর কাজটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বাস্তবায়িত করে দেওয়ার নাম খাল্‌ক। এমতাবস্থায় অবশ্যই ক্ষমতাধীন একটি বস্তু দুটি কুদরতের আওতাভুক্ত হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। তবে দুটি ভিন্ন ধারায়। কেননা উদ্ভাবনের দিক থেকে কাজটি আল্লাহর কুদরতের আত্ততাভূক্ত আর কাস্‌ব (অর্জনের) দিক থেকে বান্দার কুদরতের আওতাভুক্ত। কাজেই এখন কোন প্রশ্ন রইল না।

খালক কাস্‌বের পার্থক্য

قَوْلُـهُ : وَلَهُمْ فِى الْفَرق بَيْنَهُمَا ..الخ ঃ অর্থাৎ খাল্‌ক ও কাসবের পার্থক্য নিরূপণে মাশায়িখগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেন– কাস্‌ব তথা বান্দার কাজ উপায়-উপকরণ যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইত্যাদির মোখাপেক্ষী। পক্ষান্তরে খাল্‌ক তথা আল্লাহর কাজ কোন প্রকার উপায়-উপকরণ ছাড়াই হয়ে যায়।

কেউ কেউ বলেন– অর্জিত কাজ এমন ক্ষমতাধীন বস্তু, যা কাসিব (অর্জনকারী) এর কুদরতের (শক্তি-সামর্থের) স্থান তথা কাসিবের সত্ত্বায় পতিত হয়। পক্ষান্তরে সৃজিত কর্ম এমন ক্ষমতাধীন বস্তু, যা খালিকের কুদরতের স্থান তথা খালিকের সত্ত্বায় পতিত হয় না। যেমন, যায়েদের গতিস্থিতি (নড়াচড়া আল্লাহর সৃষ্টির কারণে যে কুদরতের প্রতিক্রিয়ায় পতিত হয়েছে, ঐ কুদরতের স্থানে পতিত হয় নি। কেননা সে কুদরত আল্লাহ্ তা'আলার। যার স্থান ও গুণিক আল্লাহর সত্ত্বা। সুতরাং যায়েদের নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী নড়াচড়া-গতিস্থিতি যদি আল্লাহর সত্ত্বায় পতিত হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলার নশ্বর গতির (ক্ষণস্থায়ী নড়াচড়ার) স্থান হওয়া আবশ্যক হয়। আর ঐ নড়াচড়া যে কুদরতের মাধ্যমে যায়েদের অর্জনে অর্জিত হয়েছে, তা সে কুদরতের স্থান তথা যায়েদের সত্ত্বায় পতিত হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন– বান্দার কুদরত দ্বারা যা হয়, তাতে ক্ষমতাবান তথা বান্দা একক এবং স্বতন্ত্র নয়। কেননা বান্দার কুদরত প্রতিক্রিয়াশীল নয়। পক্ষান্তরে খাল্‌ক যা আল্লাহর কাজ এবং আল্লাহর কুদরতে হয়, তাতে ক্ষমতাবান তথা আল্লাহ্ তা'আলা একক ও স্বতন্ত্র; বান্দার অর্জনের মোখাপেক্ষী নন।

فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ أَثْبَتُّمْ مَا نَسَبْتُمْ إِلَى الْمُعْتَزِلَةِ مِنْ إِثْبَاتِ الشَّرِكَةِ قُلْنَا اَلشَّرِكَةُ أَنْ يَجْتَمِعَ اِثْنَانِ عَلَى شَيْءٍ، وَيَنْفَرِدُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَا هُوَلَهُ دُوْنَ الْآخَرِ، كَشُرَكَاءِ الْقَرْيَةِ وَالْمَحَلَّةِ وَكَمَا إِذَا جُعِلَ الْعَبْدُ خَالِقًا لِأَفْعَالِهِ وَالصَّانِعُ خَالِقًا لِسَائِرِ الْأَعْرَاضِ وَالْأَجْسَامِ بِخِلَافِ مَا إِذَا أُضِيفَ أَمْرٌ إِلَى شَيْئَيْنِ بِجِهَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ كَالْأَرْضِ تَكُوْنُ مِلْكًا لِلّٰهِ تَعَالَى بِجِهَةِ التَّخْلِيقِ وَلِلْعِبَادِ بِجِهَةِ ثُبُوْتِ التَّصَرُّفِ، وَكَفِعْلِ الْعَبْدِ يُنْسَبُ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى بِجِهَةِ الْخَلْقِ وَإِلَى الْعَبْدِ بِجِهَةِ الْكَسْبِ ـ

সহজ তরজমা

সুতরাং যদি বলা হয়, আপনারা তো সে-ই অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত করলেন, যার সম্পর্ক মু'তাযিলাদের সাথে করেছিলেন। আমরা জবাব দেব– অংশীদারিত্ব হল, এক জিনিসের উপর (কর্তৃত্বে) দুজন একত্রিত হওয়া। অতঃপর প্রত্যেকেই স্বীয় অংশে স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া, অপর কেউ (অংশীদার) না হওয়া। যেমন, গ্রাম ও মহল্লার অংশীদারগণ। আবার (উদাহরণতঃ) যখন বান্দাকে স্বীয় কাজকর্মের স্রষ্টা সাব্যস্ত করা হবে এবং আল্লাহ তা'আলাকে সমস্ত আ'রায এবং দেহাযবয়ের স্রষ্টা সাব্যস্ত করা হবে। পক্ষান্তরে যখন কোন জিনিসের সম্পর্ক দুটি ভিন্ন ধারায় দুটি জিনিসের সাথে হবে, তা এর পরিপন্থী। যেমন, জমীন আল্লাহর মালিকানাধীন সৃজনের দিক থেকে। আর বান্দার মালিকানাধীন ব্যবহারের দিক থেকে। (তদ্রুপ) বান্দার কাজকর্ম সৃজনের দিক বিচারে আল্লাহর সম্পৃক্ত হয়। আর কাস্‌বের (অর্জনের) দিক বিচারে বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

একই কাজে বান্দার ইচ্ছা ও আল্লাহর স্বজনের সমপৃক্ততা কি শিরক ?

প্রশ্নের সারকথা হল, বান্দাকে স্বীয় কাজকর্মের সৃষ্টিকর্তা বলার দরুন তোমরা মু'তাযিলীদের উপর সৃজনের মধ্যে বান্দাকে আল্লাহ তা'আলার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করার অভিযোগ করেছে। এ অভিযোগ তো তোমাদের উপরেও বর্তায়। কেননা বান্দার কর্মক্রিয়াকে যখন বান্দা এবং আল্লাহ তা'আলা উভয়ের ক্ষমতাধীন সাব্যস্ত করা হল, তখন বান্দাকে আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

জবাবের সারকথা, অংশীদারিত্বের অর্থ হচ্ছে, দুজন লোক এক জিনিসের অংশীদার হবে। অতঃপর প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক একাংশ থাকবে। যাতে অপর কেউ অংশীদার থাকবে না। যেমন, গ্রাম ও মহল্লার লোকজন বা অংশীদারগণ। তারা ঐ গ্রাম ও মহল্লার অধিবাসী হওয়ার দিক দিয়ে সকলেই অংশীদার। এতদসত্ত্বেও তাদের প্রত্যেকেরই ঐ গ্রাম ও মহল্লায় পৃথক বসতবাড়ি রয়েছে। যাতে অপর কেউ শরীক নেই। এ হিসেবে মু'তাযিলাদের উপর অংশীদারিত্বের অভিযোগ উঠে। কেননা তারা স্রষ্টা হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এবং বান্দাকে শরীক সাব্যস্ত করে প্রত্যেকের অংশ পৃথক করে এবং বলে, বান্দা স্বীয় কাজকর্মের স্রষ্টা আর আল্লাহ আরায ও দেহাবিয়বের স্রষ্টা। পক্ষান্তরে কোনও জিনিসের সম্বন্ধ দুটি ভিন্ন ধারায় দুটি জিনিসের সাথে করা এর পরিপন্থী। তখন তাকে অংশীদারিত্ব বলা হয় না। যেমন, জমীর সম্বন্ধ আল্লাহর সাথে করা হয়। বলা হয়, জমি আল্লাহর মালিকানাধীন। আবার বান্দার সাথেও করা হয়। বলা হয়, অমুক জমী যায়েদের। কিন্তু সম্বন্ধের ধারা ভিন্ন ভিন্ন। আল্লাহর সাথে সম্বন্ধ হয় খল্‌ক (সৃজন) এর দিক দিয়ে। "জমী আল্লাহর" মানে আল্লাহর সৃষ্ট। আর বান্দার সাথে সম্বন্ধ হয় ব্যবহারের দিক দিয়ে। আর "যায়েদের জমী" মানে যায়েদ তাতে হস্তক্ষেপের মালিক। যায়েদ তা ব্যবহারের মালিক। অনুরূপভাবে আমরা কর্মের সম্বন্ধ বান্দা এবং আল্লাহ উভয়ের সাথে করি এবং উভয়ের ক্ষমতাধীন বলি। তবে তা দুটি ভিন্ন ধারায়। আল্লাহর সাথে খাল্‌ক বা সৃজনের দিক দিয়ে আর বান্দার সাথে কাস্‌ব বা অর্জনের দিক দিয়ে। কাজেই আল্লাহর ক্ষমতাধীন হওয়ার মর্ম হল, কাজটি সৃষ্টিতে আল্লাহর কুদরত রয়েছে। আর বান্দার ক্ষমতাধীন থাকার মর্ম হল, কাজটি অর্জনের কুদরত বান্দার রয়েছে। কাজেই এখন কোনও প্রশ্নই থাকে না।

فَإِنْ قِيلَ فَكَيْفَ كَانَ كَسْبُ الْقَبِيحِ قَبِيحًا سَفَهًا مُوجِبًا لِاسْتِحْقَاقِ الذَّمِّ بِخِلَافِ خَلْقِهِ قُلْنَا لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْخَالِقَ حَكِيمٌ لَا يَخْلُقُ شَيْئًا إِلَّا وَ لَهُ عَاقِبَةٌ حَمِيدَةٌ وَإِنْ لَمْ نَطَّلِعْ عَلَيْهَا فَجَزَمْنَا بِأَنَّ مَا نَسْتَقْبِحُهُ مِنَ الْأَفْعَالِ قَدْ يَكُونُ لَهُ فِيهَا حِكَمٌ وَمَصَالِحُ كَمَا فِي خَلْقِ الْأَجْسَامِ الْخَبِيثَةِ الضَّارَّةِ الْمُؤْلِمَةِ بِخِلَافِ الْكَاسِبِ فَإِنَّهُ قَدْ يَفْعَلُ الْحَسَنَ وَقَدْ يَفْعَلُ الْقَبِيحَ، فَجَعَلْنَا كَسْبَهُ لِلْقُبْحِ مَعَ وُرُودِ النَّهْيِ عَنْهُ قَبِيحًا سَفَهًا مُوجِبًا لِاسْتِحْقَاقِ الذَّمِّ وَالْعِقَابِ

সহজ তরজমা

তদুপরি যদি বলা হয়, তাহলে কিভাবে মন্দ জিনিসের অর্জন মন্দ, নির্বুদ্ধিতা এবং নিন্দনীয় কাজ হতে পারে ? অথচ খল্‌কে কাবীহ বা মন্দের সৃজন তদ্রুপ নয়। (উত্তরে) আমরা বলব– কেননা প্রমাণিত সত্য যে, প্রজ্ঞাময় সৃষ্টিকর্তা যে জিনিসই সৃষ্টি করেন, তাতে (অবশ্যই) কোন শুভ পরিণাম থাকে। যদিও আমরা সে সম্পর্কে অবগত নই। কাজেই আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, যেসব কর্মকে আমরা মন্দ বা নিকৃষ্ট মনে করি, অনেক সময় তাতে বহু হিকমত (প্রজ্ঞা) ও কল্যাণ নিহীত থাকে। যেমন, কষ্টদায়ক, ক্ষতিকারক এবং নিকৃষ্ট দেহাবয়বের সৃজনে। এর বিপরীত কাসেব। সে কখনও ভাল কাজ করে। আবার কখনও মন্দ কাজ করে। কাজেই আমরা নিষেধাজ্ঞা আসার পরও তার মন্দ কাজ করাকে মন্দ, নির্বুদ্ধিতা এবং তিরষ্কৃত ও শাস্তিযোগ্য হওয়ার কারণ অভিহিত (সাব্যস্ত) করি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মন্দ কাজের সৃজন কি অন্যায়

উপরিউক্ত প্রশ্নের ব্যাখ্যাঃ বান্দা যখন কাসিব আর আল্লাহ খালিক। তদুপরি কেন মন্দ কাজের কাস্‌ব (যা বান্দার কর্ম) কে নিকৃষ্ট এবং দুনিয়ায় তিরষ্কার ও পরকালে শাস্তিযোগ্য হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করা হয় ? আর ঐ মন্দ কর্মের সৃজনকে (যা আল্লাহর কাজ) না নিকৃষ্ট সাব্যস্ত করা হয়, না তিরষ্কার ও শাস্তিযোগ্য হওয়ার কারণ অভিহিত করা হয় ? অথচ বান্দার কাজ কাস্‌ব আল্লাহর কাজ খাল্‌ক অপেক্ষা দুর্বল। কাজেই মন্দ অর্জন বা কাস্‌ব যদি অন্যায় হয় তাহলে তার সৃজন আরও গুরুতর অন্যায় হওয়া উচিৎ।

জবাবের ব্যাখ্যা ঃ খালিক তথা আল্লাহ তা'আলা যেহেতু হাকীম-প্রজ্ঞাময়। তার কোন কাজ হিকমত, প্রজ্ঞা বা রহস্য ও উপকার শূন্য নয়। কাজেই আমরা যেসব কর্মকে নিকৃষ্ট মনে করি, তাতেও বহুবিধ হিকমত রহস্য ও কল্যাণ আছে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। যেমন, নিকৃষ্ট দেহ সমূহ, সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি সৃষ্টির মধ্যে আমরা দেখি। আমাদের দৃষ্টিতে এসব জিনিস যদিও নিকৃষ্ট, তদুপরি এগুলোর মধ্যে বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে। যেমন, বহু ডাক্তার বলেছেন, বিচ্ছু পোড়া ছাই মূত্রাশয়ের পাথরকে চূর্ণবিচূর্ণ করে বের করে দেয়। অনুরূপভাবে সাপের গোশত-চর্বি বহু রোগের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়। এসব উপকারীতার কারণে এগুলোর সৃজনকে আমরা নিকৃষ্ট বলি না। পক্ষান্তরে কাসিব তথা বান্দা সে কখনও ভাল কাজ করে আবার কখনও মন্দ করে। এ হিসেবে কোন নিকৃষ্ট ও খারাপ কাজে শরী'আতের নিষিদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও যখন সে তা কাসব বা অর্জন করে, তখন আমরা তার খারাপ কাজকে খারাপ এবং দুনিয়াতে নিন্দনীয় ও আখেরাতে শাস্তিযোগ্য হওয়ার কারণ অভিহিত করি।

وَالْحَسَنُ مِنْهَا اَىْ مِنْ اَفْعَالِ الْعِبَادِ، وَهُوَ مَا يَكُوْنُ مُتَعَلَّقَ الْمَدْحِ فِى الْعَاجِلِ وَالثَّوَابِ فِى الْاٰجِلِ، وَالْاَحْسَنُ اَنْ يُفَسَّرَ بِمَا لَا يَكُوْنُ مُتَعَلَّقًا لِلذَّمِّ وَالْعِقَابِ، لِيَشْمَلَ الْمُبَاحَ بِرِضَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَىْ بِاِرَادَتِهٖ مِنْ غَيْرِ اِعْتِرَاضٍ، وَالْقَبِيْحُ مِنْهَا وَهُوَ مَا يَكُوْنُ مُتَعَلَّقُ الذَّمِّ فِى الْعَاجِلِ وَالْعِقَابِ فِى الْاٰجِلِ لَيْسَ بِرِضَاءِهٖ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الْاِعْتِرَاضِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ، وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، يَعْنِىْ اَنَّ الْاِرَادَةَ وَالْمَشِيَّةَ وَالتَّقْدِيْرَ يَتَعَلَّقُ بِالْكُلِّ، وَالرِّضَاءُ وَالْمَحَبَّةُ وَالْاَمْرُ لَا يَتَعَلَّقُ اِلَّا بِالْحَسَنِ دُوْنَ الْقَبِيْحِ ـ

সহজ তরজমা

বান্দার সৎকর্ম (ভাল কাজ) অর্থাৎ যেগুলোর সাথে দুনিয়ায় প্রশংসা এবং পরকালে প্রতিদানের সম্পর্ক রয়েছে। আরও উত্তম হল, সেসব কর্ম উদ্দেশ্য নেওয়া, যেগুলোর সাথে দুনিয়ায় নিন্দা-তিরস্কার এবং পরকালে শাস্তির সংশ্লিষ্টতা নেই। যাতে মুবাহ (বৈধ) কাজগুলোও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। (মোটকথা, বান্দার ভালকাজ) আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী হয়ে থাকে। অর্থাৎ বান্দার বিরুদ্ধে (কোনও) অভিযোগ ছাড়াই তার ইচ্ছায়ই হয়ে থাকে। আর নিকৃষ্ট কাজ, যেগুলোর সাথে দুনিয়ার নিন্দা ও পরকালে শাস্তির সম্পর্ক থাকে, সেগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টিতে হয় না। কেননা সে ব্যাপারে আল্লাহর অভিযোগ আছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- তিনি স্বীয় বান্দার কুফরীতে সন্তুষ্ট হন না। মুছান্নিফ রহ.এর উদ্দেশ্য হল, এরাদা-মাশিয়্যাত এবং তাকদীরের সম্পর্ক বান্দার যাবতীয় কাজের সাথে রয়েছে। আর ভালবাসা ও হুকুমের সম্পর্ক কেবল ভাল কাজের সাথে; মন্দ কাজের সাথে নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আল্লাহর সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি কোন্ কাজে ?

মুসান্নিফ রহ. বলতে চাচ্ছেন- আল্লাহ পাকের এরাদা-মাশিয়্যত এবং তাকদীরের সম্পর্ক বান্দার ভাল-মন্দ সকল কাজের সাথেই। কিন্তু সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা তথা পছন্দ এবং নির্দেশের সম্পর্ক কেবল ভাল কাজের সাথে। (অর্থাৎ তিনি কেবল সৎকর্মই ভালবাসেন এবং সেজন্য হুকুম করেন।) যেমন, স্বয়ং তিনি ইরশাদ করেছেন- لَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ (আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দার কুফরীতে সন্তুষ্ট হন না।) কেননা সন্তুষ্টির অর্থ এমন ইচ্ছা, যার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ এবং জবাবদিহিতা থাকবে না। অথচ কুফর এবং অন্যান্য অসৎ ও মন্দ কাজগুলো যদি আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে, তদুপরি সে কাজ সম্পর্কে জবাবদিহিতা চাওয়া হবে। কাজেই এ ইচ্ছাকে সন্তুষ্টি বলা হবে না।

সৎকাজের উত্তম সংজ্ঞা

وَقَوْلُهٗ : وَهُوَ .. الخ এটি সৎকর্মের প্রশংসাসূচক বাক্য। অর্থাৎ সৎকর্ম এমন কাজকে বলে, যার বিনিময়ে বান্দা দুনিয়াতে প্রশংসা-স্তুতি এবং পরকালে সাওয়াব ও প্রতিদানের যোগ্য হবে। এ সংজ্ঞার আলোকে মুবাহকর্মগুলো সৎকর্মের থেকে বেরিয়ে যাবে। কেননা মুবাহকর্ম যেভাবে নিন্দা ও শাস্তির কারণ নয়, তদ্রুপ প্রশংসা ও প্রতিদান পাওয়ারও কারণ নয়। কাজেই ব্যাখ্যাকার বলেছেন- সৎকর্ম দ্বারা (ব্যাপকভাবে) এমন সব কর্ম উদ্দেশ্য নেওয়া অধিক শ্রেয়, যেগুলোর সাথে দুনিয়াতে নিন্দা এবং পরকালে শাস্তির সংশ্লিষ্টতা নেই। যাতে মুবাহকর্মগুলোও এ সংজ্ঞাভুক্ত হয়ে যায়।

وَالْاِسْتِطَاعَةُ مَعَ الْفِعْلِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ، وَهِيَ حَقِيْقَةُ الْقُدْرَةِ الَّتِيْ يَكُوْنُ بِهَا الْفِعْلُ اِشَارَةٌ اِلٰى مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ التَّبْصِرَةِ مِنْ اَنَّهَا عَرَضٌ يَخْلُقُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِى الْحَيَوَانِ يَفْعَلُ بِهِ الْاَفْعَالَ الْاِخْتِيَارِيَّةَ، وَهِيَ لِلْفِعْلِ، وَالْجُمْهُوْرُ عَلٰى اَنَّهَا شَرْطٌ لِاَدَاءِ الْفِعْلِ لَاعِلَّةٌ، وَبِالْجُمْلَةِ هِيَ صِفَةٌ يَخْلُقُهَا اللّٰهُ تَعَالٰى عِنْدَ قَصْدِ اِكْتِسَابِ الْفِعْلِ بَعْدَ سَلَامَةِ الْاَسْبَابِ وَالْآلَاتِ، فَاِنْ قَصَدَ فِعْلَ الْخَيْرِ خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى قُدْرَةَ فِعْلِ الْخَيْرِ، فَيَسْتَحِقُّ الْمَدْحَ وَالثَّوَابَ، وَاِنْ قَصَدَ فِعْلَ الشَّرِّ، خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى قُدْرَةَ فِعْلِ الشَّرِّ، فَكَانَ هُوَ الْمُضِيْعُ لِقُدْرَةِ فِعْلِ الْخَيْرِ فَيَسْتَحِقُّ الذَّمَّ وَالْعِقَابَ، وَلِهٰذَا ذُمَّ الْكَافِرُوْنَ بِاَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَاِذَا كَانَتِ الْاِسْتِطَاعَةُ عَرَضًا وَجَبَ اَنْ تَكُوْنَ مُقَارِنَةً لِلْفِعْلِ بِالزَّمَانِ لَاسَابِقَةً عَلَيْهِ، وَاِلَّا لَزِمَ وُقُوْعُ الْفِعْلِ بِلَا اِسْتِطَاعَةٍ وَقُدْرَةٍ عَلَيْهِ لِمَامَرَّ مِنْ اِمْتِنَاعِ بَقَاءِ الْاَعْرَاضِ ـ

সহজ তরজমা

সামর্থ থাকে কাজের সাথে। মুতাযিলারা ভিন্ন মত পোষণ করে। আর তা (اِسْتِطَاعَت) বস্তুতঃ এমন কুদরত, যার মাধ্যমে কাজ অস্তিত্ব লাভ করে। এতে সে বিষয়ের প্রতি ইংগিত রয়েছে, যা "তাবসেরা" মুছান্নিফ রহ. উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ اِسْتِطَاعَت এমন একটি আরয (আপতন), যা আল্লাহ তা'আলা প্রাণীর ভেতর সৃষ্টি করে থাকেন। এর মাধ্যমে প্রাণীজগৎ ঐচ্ছিক কাজ সমাধা করে। এটি কাজের ইল্লত। পক্ষান্তরে জমহূর উলামায়ে কিরামের মাযহাব মতে তা কাজকর্মের ইচ্ছার জন্য শর্ত; ইল্লত নয়।

মোটকথা, اِسْتِطَاعَت এমন একটি গুণ, যা আল্লাহ তা'আলা (কাজটি) অর্জনের ইচ্ছাকালে সৃষ্টি করেন। তৎসঙ্গে (কর্তার বাহ্যিক) আসবাপত্র ও উপায়-উপকরণ যথোপযুক্ত নিরাপদ থাকে। সুতরাং সে যদি সৎ কাজ বা নেক কাজের ইচ্ছা করে তাহলে আল্লাহ নেক কাজের শক্তি-সামর্থ সৃষ্টি করে দেন। অতএব স্বয়ং সে সৎকাজের শক্তি বিনষ্টকারী হল। যদ্দরুন সে তিরষ্কার ও শাস্তি যোগ্য হয়। এজন্যই কাফিরদেরকে এই বলে তিরষ্কার করা হয়েছে যে, তারা হক (সৎ) কথা শোনার সামর্থ রাখত না (তাদের ভাল কথা শোনার সামর্থ ছিল না।) আর اِسْتِطَاعَت যখন আরয, তখন তার কর্মক্রিয়ার সময় সাপেক্ষ হওয়া জরুরী। তার পূর্বে আসা নয়। নতুবা কাজের শক্তি-সামর্থ ছাড়া কাজটি বাস্তবায়িত হওয়া আবশ্যক হবে। কেননা ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, আরয বহাল থাকা অসম্ভব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শক্তি-সামর্থ থাকে কাজের সাথে ঃ সারকথা হল, اِسْتِطَاعَت শব্দটি কখনও কখনও আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সঠিক ও নিরাপদ থাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটি রূপক অর্থ। এ অর্থে কাজের পূর্বে اِسْتِطَاعَت বা সামর্থ আসে। কেননা এর উপরই কাজের দায়িত্ব বর্তনোর ভিত্তি। সুতরাং কাজের পূর্বে যদি বান্দার সামর্থ অর্জন না হয়, তাহলে অক্ষম ব্যক্তিকে কাজের দায়িত্ব দেওয়া আবশ্যক হয়। যা দুরস্ত নয়। আবার কখনও اِسْتِطَاعَت শব্দটি বান্দার এমন কুদরত ও সামর্থ অর্থে ব্যবহৃত হয়, যার মাধ্যমে কাজটি বাস্তবায়িত হয়। আর এটিই প্রকৃত অর্থ। যাকে আশায়েরাগণ সময় সাপেক্ষ কাজ মনে করেন। এ হিসেবে পূর্ব হতে বান্দার মধ্যে কাজটির সামর্থ শক্তি থাকে না বরং যখন সে কাজের ইচ্ছা করে তখন আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে ঐ কাজের যোগ্যতা ও সামর্থ সৃষ্টি করে দেন। এর সাথেই কাজটি বাস্তবায়িত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মু'তাযিলারা বলে, اَلْاِسْتِطَاعَةُ قَبْلَ الْفِعْلِ وَمَعَ الْفِعْلِ। অর্থাৎ বান্দার মধ্যে এ শক্তি-সামর্থ কাজের পূর্বেও ছিল। যাতে অক্ষম ব্যক্তিকে কোন কাজের দায়িত্ব বর্তানো আবশ্যক না হয়। আবার কাজের সময়ও বিদ্যমান ছিল। যাতে শক্তি-সামর্থ ছাড়া কাজ বাস্তবায়িত হওয়া আবশ্যক না হয়ে পড়ে।

শক্তি-সামর্থ কাজের ইল্লত না শর্ত ?

অধিকন্তু কতিপয় আশায়েরা কাজ বাস্তবায়িত হওয়ার শক্তি-সামর্থকে কাজের ইল্লত সাব্যস্ত করেন। কিন্তু অধিকাংশ আশায়েরাগণ শর্ত সাব্যস্ত করেন।

ইল্লত আর শর্তের মধ্যে পার্থক্য হল, যে বস্তু কোন জিনিসের অস্তিত্বের পেছনে প্রতিক্রিয়াশীল এবং ঐ জিনিসের অংশ হয় না, তাকে বলে ইল্লত। পক্ষান্তরে যে বস্তু কোন জিনিসের অস্তিত্বের পেছনে প্রতিক্রিয়াশীল নয় এবং জিনিসটির অশংও নয়; অবশ্য তার উপর জিনিসটির অস্তিত্ব নির্ভরশীল, তাকে বলে শর্ত।

ইস্তিত্ব'আত শব্দের অর্থ

قَوْلُهُ : وَهِيَ حَقِيْقَةُ الْقُدْرَةِ ...الخ ঃ কেউ ভাবতে পারেন, এখানে اِسْتِطَاعَت শব্দটি আসবাবপত্র ও উপায়-উপকরণ নিরাপদ থাকা অর্থে ব্যবহৃত। যা সর্বসম্মতিক্রমে কাজের পূর্বে লাভ হয়। এজন্য লেখক এখানে বলেছেন- اِسْتِطَاعَت এর প্রকৃত অর্থ কুদরত। বাকী রইল, আসবাবপত্রের নিরাপদ থাকার কথা। সুতরাং তা হল, রূপক অর্থ। এ অর্থে (রূপক অর্থে) اِسْتِطَاعَت বিতর্কিত বিষয় নয়; তা সর্বসম্মতভাবে কাজের পূর্বে হাসিল হয়। তারপর হাকীকত শব্দটি হয়ত কুদরতের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। তখন অর্থ দাঁড়াবে اِسْتِطَاعَت হুবহু ঐ কুদরত, যার মাধ্যমে কাজটি বাস্তবায়িত হয়। নতুবা হাল বা মাফউলে মুতলাক হিসেবে মানসূব হবে। তখন অর্থ দাঁড়াবে, اِسْتِطَاعَت বস্তুতঃ এমন কুদরত, যার মাধ্যমে কাজটি অস্তিত্বে আসে। বাকী রইল আসবাবপত্রের নিরাপদ থাকার কথা। তারা একে রূপক অর্থে اِسْتِطَاعَت বা শক্তি-সামর্থ বলেন।

قَوْلُهُ :اِشَارَةٌ ......الخ ঃ ইংগিতবহ স্থান মূল গ্রন্থকারের উক্তি بِهَا এর মধ্যে শুধুমাত্র "বা"। সাহেবে তাবসেরা বলে উদ্দেশ্য শাইখ আবুল মুঈন।

قَوْلُهُ : وَبِالْجُمْلَةِ .... الخ ঃ মু'তাযিলাদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে এ বাক্যে।

প্রশ্ন ঃ কাজের পূর্বে যখন কুদরত-সামর্থ আসে না, তখন হিতকর ও সৎকাজ বর্জনকারী তিরষ্কার ও শাস্তিযোগ্য হবে না বরং সে হবে অক্ষম-অপারগ। সে ব্যক্তি বলতে পারবে, পূর্বে থেকে এ কাজের শক্তি আমার ছিল না। তাহলে আমি কিভাবে কাজ করতে পারতাম ?

জবাব ঃ জবাবের সারসংক্ষেপ হল, اِسْتِطَاعَت চাই ইল্লত হোক বা শর্ত হোক, সর্বাবস্থায় তা এমন একটি গুণ, যা আল্লাহ তা'আলা বান্দার মধ্যে সৃষ্টি করেন, আসবাব-পত্রের নিরাপদ থাকার পর কাজটির ইচ্ছা করার সময়। সুতরাং বান্দা যদি সৎকাজের ইচ্ছা করে, তাহলে মঙ্গল ও কল্যাণকর কাজের আর যদি শিরকের ইচ্ছা করে তাহলে শিরকের শক্তি-সামর্থ তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করে দেন। সুতরাং শিরকের ইচ্ছা করে স্বয়ং বান্দাই মঙ্গল ও সৎকাজের শক্তি-সামর্থ বিনষ্টকারী হল। যদ্দরুন তার দ্বারা কল্যাণকর কাজ বাস্তবায়িত হয়নি। একারণেই সে নিন্দা ও শাস্তিযোগ্য হয়েছে। পক্ষান্তরে সে যদি শিরকের ইচ্ছা না করত বরং সৎকাজের ইচ্ছা করত, তাহলে আল্লাহপাক তার মধ্যে সৎকাজের শক্তি সৃষ্টি করে দিতেন এবং মঙ্গলজনক ও সৎকাজ বাস্তবায়িত হত।

কাফির-মুশরিকরা কেন তিরস্কৃত হল ?

قَوْلُهُ : وَلِهٰذَا ....الخ ঃ অর্থাৎ এজন্যই শিরকের ইচ্ছা করে সৎকাজ ও মঙ্গলের ইচ্ছা পরিত্যাগকারী ব্যক্তি সৎকাজের শক্তি বিনষ্টকারী বলে বিবেচিত হয়েছে। কাফিরদেরকে এই বলে নিন্দা করা হয়েছে যে, لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ। অর্থাৎ তার মানার উদ্দেশ্য হক ও সত্য কথা শ্রবণের ইচ্ছা করে না। তারা যদি সত্যকে শ্রবণের ইচ্ছা করত, তাহলে স্বভাবতই আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে শ্রবণের শক্তি সৃষ্টি করে দিতেন। সুতরাং তারা শ্রবণের ইচ্ছা ত্যাগ করে যেন তারাই শক্তি-সামর্থ বিনষ্টকারী সাব্যস্ত হল। ফলে নিন্দাযোগ্য হয়েছে।

শক্তি-সামর্থ কিভাবে কাজের সাথে থাকে ?

قَوْلُهُ : وَاِذَا كَانَتِ الْاِسْتِطَاعَةُ .....الخ ঃ কাজের সাথে শক্তি থাকে অর্থাৎ কাজ সময় সাপেক্ষ হওয়ার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে এখানে। দলীলের সারকথা হল, ইতোপূর্বে গুণ বা সিফাত বলে اِسْتِطَاعَت এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আর সিফাত হল আরয। কাজেই اِسْتِطَاعَت আরয, বিধায় আবশ্যকরূপে কাজের সাথে সংযুক্ত হবে; কাজের পূর্বে লাভ হবে না। যেমনটি মুতাযিলীরা বলে থাকে। কেননা তা যদি কাজের পূর্বে হয় এবং কাজের পূর্বে পাওয়া যায়, তাহলে যখন থেকে اِسْتِطَاعَت বিদ্যমান- তখন থেকে কাজ হওয়া পর্যন্ত তা বহাল থাকবে,

এমনটি হতে পারে না। কেননা শক্তি-সামর্থ বা اِسْتِطَاعَتْ আরয। আর পূর্বেই বলা হয়েছে, আরয অবশিষ্ট থাকা অসম্ভব। এমতাবস্থায় শক্তি-সামর্থ ছাড়া কাজ পাওয়া যাওয়া আবশ্যক হবে। এটি অসম্ভব। অতএব কাজের পূর্বে শক্তি-সামর্থ বা اِسْتِطَاعَتْ হওয়া ভ্রান্ত; কাজের সাথে হওয়াই প্রমাণিত।

فَاِنْ قِيْلَ لَوْ سُلِّمَتْ اِسْتِحَالَةُ بَقَاءِ الْاَعْرَاضِ فَلَا نِزَاعَ فِىْ اِمْكَانِ تَجَدُّدِ الْاَمْثَالِ عَقِيْبَ الزَّوَالِ فَمِنْ اَيْنَ يَلْزَمُ وُقُوْعُ الْفِعْلِ بِدُوْنِ الْقُدْرَةِ قُلْنَا اِنَّمَا نَدَّعِىْ لُزُوْمَ ذَالِكَ اِذَا كَانَتِ الْقُدْرَةُ الَّتِىْ بِهَا الْفِعْلُ هِىَ الْقُدْرَةُ السَّابِقَةُ، وَاَمَّا اِذَا جَعَلْتُمُوْهَا الْمِثْلَ الْمُتَجَدِّدَ الْمُقَارِنَ فَقَدْ اِعْتَرَفْتُمْ بِاَنَّ الْقُدْرَةَ الَّتِىْ بِهَا الْفِعْلُ لَا تَكُوْنُ اِلَّا مُقَارِنَةً لَهُ ثُمَّ اِنِ ادَّعَيْتُمْ اَنَّهُ لَابُدَّ لَهَا مِنْ اَمْثَالٍ سَابِقَةٍ حَتّٰى لَا يُمْكِنُ الْفِعْلُ بِاَوَّلِ مَا يَحْدُثُ مِنَ الْقُدْرَةِ فَعَلَيْكُمُ الْبَيَانُ.

সহজ তরজমা

যদি বলা হয়, আরয বহাল থাকার অসম্ভব্যতা যদি মেনেও নেওয়া হয় তাহলে তা বিদূরীত হওয়ার পর নতুন নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে কোন বিবাদ নেই। তদুপরি শক্তি ছাড়া কাজ হওয়া কিরূপে আবশ্যক হবে? আমরা জবাব দেব– এর আবশ্যকতার দাবী আমরা তখনই করে থাকি, যখন ঐ শক্তি যার দ্বারা কাজটি অস্তিত্ব লাভ করে, তা পূর্বেকার শক্তিই হয়। মোটকথা, আপনারা যখন তাকে নূতন বলে অভিহিত করবেন, যা কাজের সাথে সংযুক্ত তখন আপনারা (যেন) স্বীকার করলেন– যে শক্তির মাধ্যমে কাজ অস্তিত্বে আসে, তা কাজের সাথে সংযুক্ত। তদুপরি যদি আপনারা দাবী করেন, এ শক্তির জন্য এমন দৃষ্টান্ত থাকা আবশ্যক, যা কাজের পূর্বে হবে। এমনকি পূর্বেকার নশ্বর শক্তির মাধ্যমে কাজের অস্তিত্ব সম্ভব নয়, তাহলে আপনাদের কর্তব্য প্রমাণ পেশ করা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শক্তি-সামর্থ অক্ষুন্ন থাকে কিনা ?

ইতোপূর্বে কাজের সাথে اِسْتِطَاعَتْ হওয়ার প্রমাণে লেখক বলেছিলেন– اِسْتِطَاعَتْ যদি কাজের সাথে পাওয়া যায় তাহলে আরয বহাল থাকা অসম্ভব হওয়ার কারণে ঐ اِسْتِطَاعَتْ কাজ পাওয়া যাওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে না। তাহলে তো শক্তি-সামর্থ ছাড়া কাজ বাস্তবায়িত হওয়া আবশ্যক হবে। এর উপর মুতাযিলাদের পক্ষ থেকে একাধিক অভিযোগ উঠে। যেমন, **প্রথমতঃ** আরয বহাল থাকার অসম্ভাব্যতা আমরা মানি না। **দ্বিতীয়তঃ** যদি মেনেও নেওয়া হয়, যে اِسْتِطَاعَتْ কাজের পূর্বে হয়, হুবহু তাই বহাল থাকবে না। তাহলে আমরা বলব– নূতন নূতন সাদৃশ সৃষ্টির মাধ্যমে আরযের বহাল থাকা নিয়ে তো কোন বিবাদ নেই। কাজেই হতে পারে উক্ত (পূর্বের) শক্তি-সামর্থ বিদূরীত হয়ে যাবে এবং সাদৃশ তৈরি হয়ে যাবে। তারপর সাদৃশও বিদূরীত হয়ে যাবে। আবার নূতন সাদৃশ তৈরি হবে এবং ঐ মুহূর্তেই কাজটিও অস্তিত্ব লাভ করবে। তাহলে শক্তি ও সামর্থের সাথেই কাজটি বাস্তবায়িত হবে। কেননা ক্ষমতার সাদৃশও ক্ষমতাই। কাজেই শক্তি-সামর্থ ও ক্ষমতা ব্যতীত কাজ অস্তিত্বে আসা আবশ্যক হবে না।

ব্যাখ্যাকারের জবাবের সারকথা, আমরা ক্ষমতা ছাড়া কাজ সংঘটিত হওয়ার আবশ্যকতার দাবী তখনই করি, যখন ঐ ক্ষমতা বা শক্তি-সামর্থ, যার দ্বারা কাজ অস্তিত্ব লাভ করে, তাকে পূর্বেকার কুদরত সাব্যস্ত করা হবে। আর যদি কাজের সাথে মিলিত নূতন সদৃশকে সাব্যস্ত করা হয়, তখন তো আপনারা স্বীকার করেই নিলেন, যে কুদরত দ্বারা কাজ সংঘটিত হয় তা কাজের সাথে মিলিত থাকে। যেমন, ১টা বেজে ১৫ মিনিট ৫সেকেণ্ডে একটি কুদরত পাওয়া গেল, তারপর এ কুদরত দূরীভূত হয়ে ষষ্ঠ সেকেণ্ডে তদনুরূপ আরেকটি কুদরত তৈরি হল। পরে তা-ও দূরীভূত হয়ে গেল এবং সপ্তম সেকেণ্ডে তদনুরূপ আরেকটি কুদরত জন্মাল। তার সাথে কাজও অস্তিত্ব লাভ করল। তাহলে আমরা জানতে চাই, যে কুদরত দ্বারা কাজটি সংঘটিত হল, তা কি পূর্বের ঐ কুদরত যা পঞ্চম সেকেণ্ডে ছিল। না কি নূতন সৃষ্ট সদৃশ কুদরত, যা সপ্তম সেকেণ্ডে এসে জন্মাল ?

প্রথম অবস্থায় ক্ষমতা বা কুদরত ব্যতীতই কাজ সংঘটিত হওয়া আবশ্যক হবে। কেননা পূর্বেকার কুদরত

কাজ সংঘটিত হওয়ার মুহূর্তে অর্থাৎ সপ্তম সেকেণ্ডে ছিল না। আর দ্বিতীয় অবস্থায় তোমাদের অভিমত তথা اِسْتِطَاعَت কাজের সাথে হয়- তা প্রমাণিত। কেননা সপ্তম সেকেণ্ডে তার সদৃশ রয়েছে এবং তখনই কাজ সংঘটিত হয়েছে। তদুপরি তোমরা যখন দ্বিতীয় সূরত তথা যে কুদরত দ্বারা কাজ সংঘটিত হয় তাকে পূর্বেকার কুদরত বলার পরিবর্তে নূতন সদৃশ সাব্যস্ত কর, তখন আমরা বলব- তোমাদের দাবী যদি এই হয় যে, কুদরতের জন্য এমন সদৃশ থাকা প্রয়োজন, যা কাজের পূর্বে থাকবে। তাহলে এ দাবীর স্বপক্ষে তোমাদেরকে প্রমাণ দিতে হবে। অথচ তোমাদের কাছে প্রমাণ নেই। কাজেই তোমাদের দাবী অমূলক এবং নূতন সদৃশ তৈরির উক্তিটি ভ্রান্ত।

وَاَمَّا مَا يُقَالُ لَوْفَرَضْنَا بَقَاءَ الْقُدْرَةِ السَّابِقَةِ اِلٰى اَنَّ الْفِعْلَ اِمَّا بِتَجَدُّدِ الْاَمْثَالِ وَاِمَّا بِاسْتِقَامَةِ بَقَاءِ الْاَعْرَاضِ فَاِنْ قَالُوا بِجَوَازِ وُجُودِ الْفِعْلِ بِهَا فِى الْحَالَةِ الْاُوْلٰى فَقَدْ تَرَكُوا مَذْهَبَهُمْ، حَيْثُ جَوَّزُوْا مُقَارَنَةَ الْفِعْلِ الْقُدْرَةَ، وَاِنْ قَالُوا بِامْتِنَاعِهِ لَزِمَ التَّحَكُّمُ وَالتَّرْجِيْحُ بِلَا مُرَجِّحٍ، اِذِ الْقُدْرَةُ بِحَالِهَا لَمْ تَتَغَيَّرْ، وَلَمْ يَحْدُثْ فِيْهَا مَعْنًى لِاِسْتِحَالَةِ ذَالِكَ عَلَى الْاَعْرَاضِ، فَلِمَ صَارَ الْفِعْلُ بِهَا فِى الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ وَاجِبًا وَفِى الْحَالَةِ الْاُوْلٰى مُمْتَنِعًا، فَفِيْهِ نَظَرٌ، لِاَنَّ الْقَائِلِيْنَ بِكَوْنِ الْاِسْتِطَاعَةِ قَبْلَ الْفِعْلِ لَايَقُوْلُوْنَ بِامْتِنَاعِ الْمُقَارَنَةِ الزَّمَانِيَّةِ وَبِاَنَّ كُلَّ فِعْلٍ يَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ بِقُدْرَةٍ سَابِقَةٍ عَلَيْهِ بِالزَّمَانِ اَلْبَتَّةَ حَتّٰى يَمْتَنِعَ حُدُوْثُ الْفِعْلِ فِىْ زَمَانِ حُدُوْثِ الْقُدْرَةِ مَقْرُوْنَةً بِجَمِيْعِ وَلِاَنَّهُ يَجُوْزُ اَنْ يَمْتَنِعَ الْفِعْلُ فِى الْحَالَةِ الْاُوْلٰى لِاِنْتِفَاءِ شَرْطٍ وَوُجُوْدِ مَانِعٍ، وَيَجِبُ الشَّرَائِطُ فِى الثَّانِيَةِ لِتَمَامِ الشَّرَائِطِ مَعَ اَنَّ الْقُدْرَةَ الَّتِىْ هِىَ صِفَةُ الْقَادِرِ فِى الْحَالَتَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ

সহজ তরজমা

যাহোক (মুতাযিলাদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত উপরিউক্ত প্রশ্নের) জবাবে যে কথা বলা হয় অর্থাৎ যদি পূর্বেকার কুদরত কাজ সংঘটিত হওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত বহাল থাকার কথা আমরা মেনে নেই, চাই তা নূতন সদৃশ তৈরির আকারে হোক কিংবা আরযের অবশিষ্টতা স্বীকার করে হোক, তাহলে প্রথম সূরতে ঐ শক্তির মাধ্যমে কাজের অস্তিত্ব লাভ জায়েয হওয়ার দাবীদার হলে তারা স্বীয় মাযহাব ছেড়ে দিয়ে শক্তি-সামর্থ কাজের সাথে মিলিত হওয়াকে জায়েয সাব্যস্ত করলেন। আর যদি তার অসম্ভাব্যতার দাবীদার হন, তাহলে হুকুম প্রদান এবং কারণ ছাড়া প্রাধান্য দান আবশ্যক হবে। কেননা (তখনও) কুদরত বহাল তবীয়তে আছে। তাতে কোনরূপ পরিবর্তন হয়নি। কারণ, আরযে তা অসম্ভব। তাহলে দ্বিতীয় অবস্থায় কাজটি আবশ্যক হল আর প্রথম অবস্থায় কেন অসম্ভব হল? সুতরাং এ জবাবে আপত্তি রয়েছে। কেননা যারা কাজের পূর্বে ক্ষমতা থাকার প্রবক্তা, তারা সময়ের সাথে মিলিত হওয়ার প্রবক্তা নন এবং এ বিষয়েরও প্রবক্তা নন যে, নিশ্চিতভাবে প্রত্যেকটা কাজ এমন ক্ষমতার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হওয়া ওয়াজিব, যা তার পূর্বে হয়। এমনকি যাবতীয় শর্তযুক্ত কুদরত তৈরী হওয়ার সময় কাজের অস্তিত্ব অসম্ভব। আর এজন্যই হতে পারে প্রথম অবস্থায় কোন শর্ত না থাকা কিংবা তাতে কোন গুণ সৃষ্টির কারণে কাজটি অসম্ভব হবে। আর যাবতীয় শর্তাবলির উপস্থিতির কারণে দ্বিতীয় অবস্থায় কাজটি আবশ্যক হবে। অথচ যে কুদরত ক্ষমতাবানের গুণ, তা উভয় অবস্থায় একই রকম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মু'তাযিলাদের উপরিউক্ত প্রশ্নের আক্রমনাত্মক জবাব

মুতাযিলাদের পক্ষ থেকে ইতোপূর্বে فَاِنْ قِيْلَ বলে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কিফায়া মুছান্নিফ রহ. তার জবাবে বলেন– মুতাযিলাদের বক্তব্য অনুসারে যে কুদরত কাজের পূর্বে হয়ে থাকে, আমরা যদি কাজ বাস্তবায়িত হওয়া পর্যন্ত তা বহাল থাকার কথা মেনে নেই। চাই নূতন সদৃশ তৈরির নিমিত্তে হোক। যেমন, আশায়েরাদের মাযহাব। অথবা আরযের অবশিষ্টতা দুরস্ত সাব্যস্ত করতঃ হুবহু ঐ কুদরতের বহাল থাকাকে মেনে নেই। যেমনটি অন্যান্যদের মাযহাব। তাহলে আমরা জানতে চাই, প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ ঐ কুদরত যাতে স্বয়ং কুদরত অথবা তার প্রথম সদৃশ নশ্বর হয়েছে, তাতে কাজের অস্তিত্ব জায়েয না কি জায়েয নয় ? যদি জায়েযের পক্ষপাতি হন তবে স্বীয় মাযহাব বর্জন করা আবশ্যক হবে। কেননা এমতাবস্থায় কাজটি কুদরতের সাথে মিলিত হওয়া আবশ্যক। অথচ আপনাদের মাযহাব হল, কাজের পূর্বে কুদরত বা ক্ষমতা থাকা। আর যদি প্রথম সূরতে কাজটির অসম্ভাব্যতার পক্ষপতি হন, তাহলে তাহাক্কুম তথা প্রমাণবিহীন দাবী এবং কারণ ছাড়া প্রাধান্য দান আবশ্যক হবে। কেননা কুদরত বহাল রয়েছে। যেমন ছিল প্রথম অবস্থায়। দ্বিতীয় অবস্থায়ও তদ্রুপই আছে; তাতে কোন পরিবর্তন হয়নি। নূতন কিছু সৃষ্টিও হয়নি। যেমন, প্রথমে দুর্বল ছিল। এখন শক্তিশালী হল। কেননা কুদরত একটি আরয। আর আরযের মধ্যে কোন পরিবর্তন কিংবা নতুনত্ব সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। কারণ, আরযের মধ্যে পরিবর্তন এবং কোন বিশেষত্ব আসা মানে ঐ পরিবর্তন ও নতুনত্ব (যা স্বয়ং আরয) আরেকটি আরযের সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আর এক আরয অন্য আরযের সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং কুদরত যখন বহাল রয়েছে, তখন প্রথম অবস্থায় ঐ কুদরতের কারণে কাজের অসম্ভাব্যতা এবং দ্বিতীয় অবস্থায় কাজের বৈধতা গায়ে জোরে চাপানো এবং কারণ ছাড়া প্রাধান্য দান বৈ কি। এ হল কিফায়া গ্রন্থকারের জবাবের সারকথা।

জবাবের উপর পাল্টা প্রশ্ন

এ সম্পর্কে ব্যাখ্যার বলেন– এ জবাবের উপর আপত্তি রয়েছে। কেননা আপনার জবাবে গৃহীত দুটি পন্থা অবলম্বনেই আমরা জবাব দিতে পারব। সুতরাং প্রথম প্রশ্ন অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় উক্ত ক্ষমতার মাধ্যমে কাজের অস্তিত্ব বৈধ বলার সূরতে তাদের উপর স্ব-মাযহাব পরিত্যাগের অভিযোগ সঠিক নয়। কেননা ক্ষমতা কাজের পূর্বে হওয়ার প্রবক্তাগণ কাজের মুহূর্তে ক্ষমতা মিলিত হওয়াকে অসম্ভব বলে না যে, সময়ের সাথে মিলিত হওয়ার বৈধতার কারণে তাদের উপর স্ব-মাযহাব পরিত্যাগের অভিযোগ উঠবে বরং তারা সময়ের সাথে মিলিত হওয়াকে বৈধ মনে করে এবং বলে, কুদরত কখনও কাজের সাথে হয়; কখনও পূর্বে হয়। অনুরূপভাবে তারা একথাও বলে না যে, প্রত্যেকটি কাজ এমন কুদরত বা শক্তি-সামর্থের মাধ্যমে অস্তিত্বে আসা জরুরী, যা ঐ কর্মক্রিয়ার পূর্বে হয়। যদ্দরুন ক্রিয়াশীলতার যাবতীয় শর্তাবলি সম্বলিত কুদরত তৈরির সময় কাজের অস্তিত্ব অসম্ভব হবে।

অনুরূপভাবে জবাবের দ্বিতয়ী পন্থা তথা প্রথম অবস্থায় কাজের অসম্ভাব্যতা আর দ্বিতীয় অবস্থায় কাজকে ওয়াজিব ও আবশ্যক বলার সূরতে তাদের উপার تَحَكُّم ও تَرْجِيْحٌ بِلَا مُرَجِّحٍ অর্থাৎ প্রমাণ বিহীন দাবী এবং কারণ ছাড়া প্রদান দানের অভিযোগ উঠবে না। কেননা তারা বলতে পারেন– প্রথম অবস্থায় কুদরত কার্যকর হওয়ার কোনও শর্ত না থাকার কারণে কিংবা কাজের অস্তিত্বে কোন প্রতিবন্ধক থাকার কারণে কাজটি অসম্ভব হতে পারে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় কুদরত কার্যকর হওয়ার যাবতীয় শর্তাবলি বিদ্যমান থাকা এবং কাজের অস্তিত্বে কোন প্রতিববন্ধক না থাকার কারণে কাজটির অস্তিত্ব ওয়াজিব এবং আবশ্যক হবে। কাজেই কারণ ব্যতীত প্রধান দান আবশ্যক হবে না। কেননা প্রভাব বিস্তারের শর্তাবলি বিদ্যমান থাকা এবং কোন প্রতিবন্ধক না থাকা দ্বিতীয় অবস্থায় কাজের অস্তিত্বের জন্য প্রাধান্য দাতা। অথচ উভয় অবস্থায় কুদরত সমান। তাতে কোন প্রকার পরিবর্তন হয়নি কাজেই এক আরযের সাথে আরেক আরয প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক হবে না।

وَمِنْ هٰهُنَا ذَهَبَ بَعْضُهُمْ اِلٰى اَنَّهُ اِنْ اُرِيْدَ بِالْاِسْتِطَاعَةِ الْقُدْرَةُ الْمُسْتَجْمِعَةُ بِجَمِيْعِ شَرَائِطِ التَّاثِيْرِ، فَالْحَقُّ اَنَّهَا مَعَ الْفِعْلِ وَاِلَّا فَقَبْلَهُ، وَاَمَّا اِمْتِنَاعُ بَقَاءِ الْاَعْرَاضِ فَمَبْنِيٌّ عَلٰى مُقَدَّمَاتٍ صَعْبَةِ الْبَيَانِ وَهِيَ اَنَّ بَقَاءَ الشَّيْءِ اَمْرٌ مُحَقَّقٌ زَائِدٌ عَلَيْهِ، وَاَنَّهُ يَمْتَنِعُ قِيَامُ الْعَرَضِ بِالْعَرَضِ وَاَنَّهُ يَمْتَنِعُ قِيَامُهُمَا بِالْمَحَلِّ

সহজ তরজমা

এজন্যই কারও কারও মাযহাব হল, اِسْتِطَاعَت দ্বারা যদি এমন কুদরত উদ্দেশ্য হয়, যা ক্রিয়াশীলতার যাবতীয় শর্ত সম্বলিত, তাহলে যথার্থ হচ্ছে, তা কাজের সাথে হয় নতুবা কাজের পূর্বে। অবশ্য আরযের অসম্ভাব্যতার কথা আলাদা। সুতরাং তা এমন কিছু ভূমিকার উপর নির্ভরশীল, যেগুলো প্রমাণ করা কঠিন ব্যাপার। আর তা হল, বস্তুর অবশিষ্টতা একটি প্রকৃত জিনিস। যা তার থেকে অতিরিক্ত। তদ্রুপ একটি আরয আরেকটি আরযের সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। এমনিভাবে দুটি আরয একত্রে একই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সমন্বয় সাধন ঃ উপরে কিফায়া গ্রন্থকারের মত খণ্ডানোর দ্বিতীয় পদ্ধতির জবাব দিতে গিয়ে বলা হয়েছিল– প্রথম অবস্থায় কুদরত কার্যকর হওয়ার কোন শর্ত না থাকা এবং দ্বিতীয় অবস্থায় ক্রিয়াশীলতার যাবতীয় শর্ত বিদ্যমান থাকা সম্ভব। যার ফলে প্রথম অবস্থায় কাজটি অসম্ভব আর দ্বিতীয় অবস্থায় কাজটি আবশ্যক হবে। সুতরাং এ জবাব থেকে কুদরতের দুটি শ্রেণী প্রমাণিত হয়।

এক. এমন কুদরত, যা কার্যকরিতার যাবতীয় শর্ত সম্বলিত।

দুই, এমন কুদরত, যা কার্যকরিতার যাবতীয় শর্ত সম্বলিত নয়।

এখানে ব্যাখ্যাকার বলছেন– উক্ত শ্রেণীবিন্যাসের কারণে কেউ কেউ বলেন, اِسْتِطَاعَت দ্বারা যদি ঐ কুদরত উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, যা কার্যকরিতার সমুদয় শর্ত সম্বলিত, তাহলে যথার্থ হবে। তা কাজের সাথে মিলিত হবে নতুবা কাজের পূর্বে হবে। ইমাম রাযী রহ. এর মাযহাবও তাই। সুতরাং শরহে মাওয়াকিফ গ্রন্থে তার উদ্ধৃতিতে বর্ণিত আছে, কুদরত কখনও এমন শক্তি বুঝাতে ব্যবহৃত হয়, যার দ্বারা বিভিন্ন জৈবিক কাজ সম্পাদিত হয় অর্থাৎ প্রাণীজগতের মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনকারী শিরাগুলোতে আল্লাহ তা'আলা যে শক্তি অন্তর্নিহীত রেখেছেন। এ অর্থে কুদরত কাজের পূর্বে হয়। এমনকি কাজের সাথেও হয় এবং পরেও হয়। আবার কখনও কুদরত এমন শক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা কার্যকরিতার সমস্ত শর্ত সম্বলিত। এ অর্থে কুদরত কাজের সাথে মিলিত হয়।

পরবর্তীতে ইমাম রাযী রহ. বলেন– সম্ভবতঃ শাইখ আশ'আরী কুদরত দ্বারা এ দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। অর্থাৎ এমন শক্তি-সামর্থ, যা কার্যকরিতার সকল শর্ত সম্বলিত। পক্ষান্তরে মু'তাযিলীরা প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন অর্থাৎ প্রাণীজগতের অঙ্গ-প্রতঙ্গ সঞ্চালন শক্তি। তাহলে এভাবে উভয় মাযহাবের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয় এবং বিতর্ক কেবল শাব্দিক অর্থে রয়ে যায়।

আরযের বহাল থাকা নিয়ে প্রশ্নোত্তর

قَوْلُهُ : وَاَمَّا اِمْتِنَاعُ بَقَاءِ الْاَعْرَاضِ ...الخ ঃ উপরে কতিপয় লোকদের মাযহাব প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, اِسْتِطَاعَت দ্বারা এমন কুদরত উদ্দেশ্য, যা কার্যকরিতার সকল শর্ত সম্বলিত হবে। সুতরাং তা কাজের সাথে হবে। আর যদি কার্যকরিতার সকল শর্ত সম্বলিত না হয়, তাহলে কাজের পূর্বে হয়। এর উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় অর্থাৎ যখন اِسْتِطَاعَة কাজের পূর্বে হয়, তখন তো কাজ হওয়া পর্যন্ত তা বহাল থাকতে পারে না। কেননা اِسْتِطَاعَت একটি আরয। আর আরয বহাল থাকা অসম্ভব। কাজেই اِسْتِطَاعَت ছাড়া কাজ বহাল থাকা আবশ্যক হবে।

ব্যাখ্যাকার এ প্রশ্ন নিরসনের লক্ষ্যে বলেছেন– আরয বহাল থাকা এমন কতগুলো ভূমিকার উপর নির্ভরশীল, যেগুলো প্রমাণ করা কঠিন। কেননা আরযের অসম্ভাব্যতার প্রমাণ হিসেবে বলা হয়, আরয বহাল থাকার মর্ম হল, অবিশিষ্টতা। যা স্বয়ং আরয এবং আরেকটি আরযের সাথে প্রতিষ্ঠিত। এমতাবস্থায় একটি আরয আরেকটি আরেযের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্যক হবে। যা অসম্ভব। এ প্রমাণ নিম্নোক্ত তিনটি ভূমিকার উপর নির্ভরশীল।

এক. কোন বস্তুর অবশিষ্টতা ঐ বস্তু হতে অতিরিক্ত বিষয়। তখনই আরযের অবশিষ্টতায় আরয مَاقَامَ بِہٖ (যার সাথে প্রতিষ্ঠিত) এবং بَقَاء (অবশিষ্টতা) প্রতিষ্ঠিত হবে।

দুই. আরযের সাথে আরযের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। এটা অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণে আরযের অবশিষ্টতা অসম্ভব।

তিন. আরয এবং তার অবশিষ্টতা উভয়টি একই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। এ তিনটি ভূমিকাই প্রশ্নবিদ্ধ। **প্রথমটির কারণ ঃ** পরবর্তী সময়ের দিকে লক্ষ্য করে বস্তুর অস্তিত্বের নাম (বস্তুটির) অবশিষ্টতা। বস্তুর অস্তিত্ব থেকে তা অতিরিক্ত নয়। (বিধায় প্রথম ভূমিকা বিতর্কিত।)

দ্বিতীয়টির কারণঃ কিয়াম বা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ স্থান দখলকারী নয় যে, আরযের সাথে আরয প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারা একটি আরয আরেকটি আরযের অনুগামী হয়ে স্থান দখলকারী হওয়া আবশ্যক হবে। অথচ উক্ত আরয স্বয়ং স্থানাধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে কোন স্থানের অনুগামী এবং মোহতাজ; বরং কিয়ামের অর্থ হল, اِخْتِصَاص نَاعِت তথা দুটি জিনিসের পরস্পর এমন নিবিড় সম্পর্ক, যদ্দরুন একটিকে সিফাত বা গুণ আর অপরটিকে মওসূফ বা গুণান্বিত বলা যায়। এ অর্থ বিচারে আরযের কিয়াম বা প্রতিষ্ঠা আরেক আরযের সাথে সম্ভব। যেমন شِدَّت (রূক্ষতা) এর কিয়াম سَوَاد (কালো) এর সাথে। কাজেই سَوَاد شَدِيْد বলা শুদ্ধ।

আর তৃতীয় ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার কারণ হল, বাদীপক্ষ বলতে পারেন– যেভাবে দ্রুতগামী দেহে গতি এবং দ্রুতি দুটি আরয একই দেহে বিদ্যমান, অনুরূপভাবে আরয এবং তার অবশিষ্টতা উভয়টি একই স্থানে প্রতিষ্ঠিত; আরযের অবশিষ্টতার সাথে প্রতিষ্ঠিত নয় যে, আরযের প্রতিষ্ঠা আরযের সাথে অবশ্যম্ভাবী হবে।

وَلَمَّا اِسْتَدَلَّ الْقَائِلُوْنَ بِكَوْنِ الْاِسْتِطَاعَةِ قَبْلَ الْفِعْلِ بِاَنَّ التَّكْلِيْفَ حَاصِلٌ قَبْلَ الْفِعْلِ ضَرُوْرَةَ اَنَّ الْكَافِرَ مُكَلَّفٌ بِالْاِيْمَانِ وَتَارِكَ الصَّلٰوةِ مُكَلَّفٌ بِهَا بَعْدَ دُخُوْلِ الْوَقْتِ فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْاِسْتِطَاعَةُ مُتَحَقِّقَةً حِيْنَئِذٍ لَزِمَ تَكْلِيْفُ الْعَاجِزِ، وَهُوَ بَاطِلٌ، اَشَارَ اِلَى الْجَوَابِ بِقَوْلِهٖ وَيَقَعُ هٰذَا الْاِسْمُ يَعْنِىْ لَفْظَ الْاِسْتِطَاعَةِ عَلٰى سَلَامَةِ الْاَسْبَابِ وَالْآلَاتِ وَالْجَوَارِحِ كَمَا فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا، فَاِنْ قِيْلَ الْاِسْتِطَاعَةُ صِفَةُ الْمُكَلَّفِ، وَسَلَامَةُ الْاَسْبَابِ وَالْآلَاتِ لَيْسَتْ صِفَةً لَهٗ، فَكَيْفَ يَصِحُّ تَفْسِيْرُهَا بِهَا قُلْنَا اَلْمُرَادُ سَلَامَةُ الْاَسْبَابِ وَالْآلَاتِ لَهٗ، وَالْمُكَلَّفُ كَمَا يَتَّصِفُ بِالْاِسْتِطَاعَةِ يَتَّصِفُ بِذَالِكَ حَيْثُ يُقَالُ هُوَ ذُوْسَلَامَةِ الْاَسْبَابِ اِلَّا اَنَّهٗ لِتَرَكُّبِهٖ لَا يُشْتَقُّ مِنْهُ اِسْمُ فَاعِلٍ يُحْمَلُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْاِسْتِطَاعَةِ وَصِحَّةُ التَّكْلِيْفِ تَعْتَمِدُ عَلٰى هٰذِهِ الْاِسْتِطَاعَةِ الَّتِىْ هِىَ سَلَامَةُ الْاَسْبَابِ وَالْآلَاتِ لَا الْاِسْتِطَاعَةِ بِالْمَعْنَى الْاَوَّلِ - فَاِنْ اُرِيْدَ بِالْعَجْزِ عَدَمُ الْاِسْتِطَاعَةِ بِالْمَعْنَى الْاَوَّلِ فَلَا نُسَلِّمُ اِسْتِحَالَةَ تَكْلِيْفِ الْعَاجِزِ وَاِنْ اُرِيْدَ بِالْمَعْنَى الثَّانِىْ فَلَا نُسَلِّمُ لُزُوْمَهٗ لِجَوَازِ اَنْ تَحْصُلَ قَبْلَ الْفِعْلِ سَلَامَةُ الْاَسْبَابِ وَالْآلَاتِ وَاِنْ لَمْ تَحْصُلْ حَقِيْقَةُ الْقُدْرَةِ الَّتِىْ بِهَا الْفِعْلُ

সহজ তরজমা

যারা اِسْتِطَاعَت কাজের পূর্বে হওয়ার পক্ষপাতি, তারা যখন প্রমাণ দিল যে, দায়িত্ব বর্তানো হয় কাজের পূর্বে। কেননা কাফির ঈমানের ব্যাপারে এবং সময় বা ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর নামায পরিত্যাগ কারী নামাযের ব্যাপারে আদিষ্ট হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত। সুতরাং তখন যদি ক্ষমতা না থাকে তাহলে অক্ষম-অপরাগকে দায়িত্ব বর্তানো আবশ্যক হবে। অথচ অক্ষম ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়া ভ্রান্ত। কাজেই মুছান্নিফ রহ. এর জবাবের প্রতি

ইংগিত করে বলেন– আসবাবপত্র, উপায়-উপকরণ এবং বাহ্যিক অঙ্গ-পত্যঙ্গ সুস্থ থাকলে উক্ত শব্দ তথা اِسْتِطَاعَت বলা হয় (ব্যবহার করা হয়)। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا - অর্থাৎ মানুষের (মধ্য হতে তার) জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্য বাইতুল্লাহর হজ্ব করা আবশ্যক কর্তব্য, যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান- ৯৭)

সুতরাং যদি প্রশ্ন করা হয়, اِسْتِطَاعَت একজন মুকাল্লাফ বা আদিষ্ট ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য; আসবাবপত্র ও উপায়-উপকরণ নিরাপদ থাকা তার বৈশিষ্ট্য নয়। তাহলে আসবাবপত্রের নিরাপত্তা বা সুস্থতা দ্বারা اِسْتِطَاعَت এর ব্যাখ্যা কিভাবে শুদ্ধ হতে পারে ? আমরা বলব– এর দ্বারা উদ্দেশ্য আসবাবপত্রের নিরাপত্তা। আর মুকাল্লাফ যেভাবে اِسْتِطَاعَت এর সাথে গুণান্বিত হয়, তদ্রুপ আসবাবপত্রের অধিকারীও হয়। অবশ্য তার সংযুক্তির কারণে ইসমে ফায়েলের সীগা নির্গত হয় না, যা তার উপর প্রযোজ্য হবে। (পক্ষান্তরে) اِسْتِطَاعَت এর বিপরীত। (তার থেকে ইসমে ফায়েলের সীগা নির্গত হয়)। দায়িত্ব অর্পণের বিশুদ্ধতা এ اِسْتِطَاعَت এর উপরেই নির্ভরশীল, যার নাম আসবাবপত্রের নিরাপত্তা; اِسْتِطَاعَت প্রথম অর্থে নয়। সুতরাং অক্ষম হওয়ার দ্বারা যদি প্রথম অর্থে اِسْتِطَاعَت না হয়, তাহলে এমন অক্ষম ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণের অসম্ভাব্যতা আমরা স্বীকার করি না। পক্ষান্তরে যদি দ্বিতীয় অর্থে استطاعت উদ্দেশ্য হয়, তাহলে অক্ষম ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণের আবশ্যকতা আমরা স্বীকার করি না। কেননা সম্ভাবনা আছে, কাজের পূর্বে আসবাব-পত্রের নিরাপত্তা লাভ হবে; যদিও ঐ প্রকৃত কুদরত বা ক্ষমতা হাসিল না হয়, যার দ্বারা কাজটি অস্তিত্ব লাভ করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শক্তি -সামর্থ কাজের পূর্বে হওয়ার দলীল

কাজের পূর্বে اِسْتِطَاعَت হওয়ার দাবীদার মু'তাযিলরা প্রমাণ স্বরূপ বলে– বান্দাকে কোন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় ঐ কাজ অস্তিত্ব লাভের পূর্বে। যেমন, কাফির ঈমান গ্রহণের পূর্বে কাফির থাকা কালে ঈমান গ্রহণের জন্য আদিষ্ট হয়। তদ্রুপ ওয়াক্ত শুরু হলে মুসলমান নামাযের জন্য আদিষ্ট হয় তা আদায়ের পূর্বে। সুতরাং কাজের পূর্বে যদি ক্ষমতা বা اِسْتِطَاعَت না হয়, তাহলে এক অক্ষম ব্যক্তিকে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা আবশ্যক হবে। আর অক্ষম ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ ভ্রান্ত।

মুছান্নিফ রহ. স্বীয় উক্তি وَيَقَعُ هٰذَا الْاِسْمُ দ্বারা এর জবাবের প্রতি ইংগিত করেছেন। তাঁর সে ইংগিত এবং শারেহ রহ. এর বিশ্লেষণের আলোকে জবাবের সারকথা হল, اِسْتِطَاعَت এর একটি অর্থ এ আলোচনাল সূচনায় বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ঐ কুদরত যার দ্বারা কাজ অস্তিত্বে আসে। এ অর্থের বিপরীতে অক্ষম বলে ঐ ব্যক্তিকে, যার মাঝে কাজটি অস্তিত্বে আসার মত ক্ষমতা নেই। আর اِسْتِطَاعَت এর দ্বিতীয় অর্থ হল, কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের সহজলভ্যতা ও সুস্থতা। এ অর্থের বিপরীতে অক্ষম বলবে ঐ ব্যক্তিকে, যার কাজের অবলম্বন এবং উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা নেই এবং কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ-নিরাপদ নয়। সুতরাং কাজের দায়িত্ব অর্পণের ভিত্তি দ্বিতীয় অর্থে اِسْتِطَاعَت অর্থাৎ প্রয়োজনীয় আসবাব ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তার উপর নির্ভরশীলল; প্রথম অর্থে اِسْتِطَاعَت এর উপর নয়। কাজেই মু'তাযিলাদের উক্ত প্রমাণে অক্ষমতার উদ্দেশ্য যদি প্রথম অর্থে اِسْتِطَاعَت না হওয়া হয়, তাহলে এমন অক্ষম ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণের অসম্ভব্যতা আমরা স্বীকার করি না। কেননা প্রথম অর্থে اِسْتِطَاعَت এর উপর দায়িত্ব অর্পণের ভিত্তি নয় যে, প্রথম অর্থ اِسْتِطَاعَت থেকে অক্ষম ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ অসম্ভব হবে। আর যদি অক্ষমতা দ্বারা দ্বিতীয় অর্থে اِسْتِطَاعَت উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আমরা স্বীকার করি না যে, اِسْتِطَاعَت কাজের পূর্বে না হলে অক্ষমকে মুকাল্লাফ বানানো বা দায়িত্ব আরোপ আবশ্যক হবে। কেননা কাজের পূর্বে সে ব্যক্তি দ্বিতীয় অর্থে اِسْتِطَاعَت শূন্য নাও হতে পারে। অর্থাৎ তার আসবাবপত্র পুরোপুরি নিরাপদ আছে। এ অর্থে اِسْتِطَاعَت তথা আসবাবপত্রের নিরাপত্তা, যার উপর দায়িত্ব অর্পণের ভিত্তি, একে আমরাও কাজের পূর্বে হয় বলে স্বীকার করি।

জবাবের সারকথা হল, اِسْتِطَاعَتْ প্রথম অর্থে কর্মক্রিয়ার সাথে মিলিত হয়। এর উপর দায়িত্ব অর্পণ নির্ভরশীল নয়, যার ফলে তা কর্মের পূর্বে হওয়া আবশ্যক হবে। আর اِسْتِطَاعَتْ দ্বিতীয় অর্থের নিমিত্তে দায়িত্ব অর্পন নির্ভরশীল। বিধায় তা কর্মের পূর্বে হতে হবে। যাতে অক্ষমের উপর দায়িত্ব অর্পন আবশ্যক না হয়।

আসবাব পত্রের নিরাপত্তা দ্বারা اِسْتِطَاعَتْ এর ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ : فَاِنْ قِيْلَ ..الخ এখানে একটি প্রশ্নের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ اِسْتِطَاعَتْ মুকাল্লাফ তথা বান্দার বৈশিষ্ট্য। কাজেই বান্দাকে مُسْتَطِيْع (সামর্থবান) বলা হয়। আর নিরাপত্তা আসবাবপত্রের বৈশিষ্ট্য। বিধায় তার সম্বন্ধ হয় আসবাব-পত্রের সাথে এবং سَلَامَةُ الْاَسْبَابِ বলা হয়। সুতরাং সামর্থ ও নিরাপত্তার মওসূফ (গুণান্বিত) যখন ভিন্ন ভিন্ন, তখন اِسْتِطَاعَتْ এর ব্যাখ্যা আসবাবপত্রের নিরাপত্তা দ্বারা করা কিভাবে বিশুদ্ধ হবে?

জবাবের সারকথা, اِسْتِطَاعَتْ যেভাবে বান্দার সিফাত বা বৈশিষ্ট্য এবং সে হিসেবে বান্দাকে সামর্থবান বলা হয়। তদ্রুপ সালামতে আসবাব বা উপকরণের সুস্থতাও বান্দার সিফাত বা বৈশিষ্ট্য। ফলে তাকে ذُوْ سَلَامَتِ الْاَسْبَابِ কিংবা سَلِيْمُ الْاَسْبَابِ বলা হয়। তবে পার্থক্য হল, اِسْتِطَاعَتْ মুফরাদ, যার থেকে ইসমে ফায়েলের সীগা নির্গত হয়ে বান্দার উপর প্রযোজ্য হয়। আর ذُوْسَلَامَتِ الْاَسْبَابِ মুরাক্কাব। এর থেকে اِسْم فَاعِل এর সীগা বের হতে পারে না। যাকে মুকাল্লাফ বা বান্দার উপর প্রয়োগ করা যাবে।

وَقَدْ يُجَابُ بِاَنَّ الْقُدْرَةَ صَالِحَةٌ لِلضِّدَّيْنِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ حَتّٰى اَنَّ الْقُدْرَةَ الْمَصْرُوْفَةَ اِلَى الْكُفْرِ هِىَ بِعَيْنِهَا اَلْقُدْرَةُ الَّتِىْ تُصْرَفُ اِلَى الْاِيْمَانِ لَا اخْتِلَافَ اِلَّا فِى التَّعَلُّقِ وَهُوَ لَا يُوْجِبُ الْاِخْتِلَافَ فِىْ نَفْسِ الْقُدْرَةِ فَالْكَافِرُ قَادِرٌ عَلَى الْاِيْمَانِ الْمُكَلَّفِ بِهٖ اِلَّا اَنَّهُ صَرَفَ قُدْرَتَهُ اِلَى الْكُفْرِ وَضَيَّعَ بِاخْتِيَارِهٖ صَرْفَهَا اِلَى الْاِيْمَانِ فَاسْتَحَقَّ الذَّمَّ وَالْعِقَابَ وَلَا يَخْفٰى اَنَّ فِىْ هٰذَا الْجَوَابِ تَسْلِيْمًا لِكَوْنِ الْقُدْرَةِ قَبْلَ الْفِعْلِ لِاَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْاِيْمَانِ فِىْ حَالِ الْكُفْرِ تَكُوْنُ قَبْلَ الْاِيْمَانِ لَامَحَالَةَ ـ فَاِنْ اُجِيْبَ بِاَنَّ الْمُرَادَ اَنَّ الْقُدْرَةَ وَاِنْ صَلُحَتْ لِلضِّدَّيْنِ لٰكِنَّهَا مِنْ حَيْثُ التَّعَلُّقِ بِاَحَدِهِمَا لَا تَكُوْنُ اِلَّامَعَهُ حَتّٰى اِنَّ مَا يَلْزَمُ مُقَارَنَتُهَا لِلْفِعْلِ هِىَ الْقُدْرَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفِعْلِ وَمَايَلْزَمُ مُقَارَنَتُهَا لِلتَّرْكِ هِىَ الْقُدْرَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهٖ وَاَمَّا نَفْسُ الْقُدْرَةِ فَقَدْ تَكُوْنُ مُتَقَدِّمَةً مُتَعَلِّقَةً بِالضِّدَّيْنِ قُلْنَا هٰذَا مِمَّا لَايُتَصَوَّرُ فِيْهِ نِزَاعٌ اَصْلًا بَلْ هُوَ لَغْوٌ مِنَ الْكَلَامِ، فَلْيَتَاَمَّلْ ـ

সহজ তরজমা

আবার কখনও এর জবাবে বলা হয়, ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে কুদরত দুটি দ্বৈত বস্তুর যোগ্যতা রাখে। এমনকি যে কুদরত কুফরের দিকে আকৃষ্ট হয়, হুবহু তা-ই ঈমানের দিকে ধাবিত হতে পারে। তফাৎ শুধু সম্পর্কের। মূল কুদরতের বিভাজন আবশ্যক করে না (বা কেবল সম্পর্কের ব্যবধান উৎস শক্তির পার্থক্য আবশ্যক করে না।) কাজেই কাফির আদিষ্ট ঈমান গ্রহণে সক্ষম। কিন্তু সে তার শক্তিকে ধাবিত করেছে কুফরের দিকে; ঈমানের প্রতি ধাবিত করা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেছে। যার ফলে সে নিন্দা ও শাস্তিযোগ্য হয়ে গেছে। এ জবাবে সুস্পষ্টতই কাজের পূর্বে কুদরত হওয়ার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। কেননা কুফর অবস্থায় ঈমানের কুদরত সুনিশ্চিত ঈমানের পূর্বে হয়। সুতরাং যদি জবাব দেওয়া হয়, কুদরত যদিও দুটি দ্বৈত বস্তুর যোগ্যতা রাখে, তথাপি তন্মধ্যে একটির সাথে সম্পর্ক থাকার প্রতি লক্ষ্য করলে তার সাথেই সম্পৃক্ত হবে। এমনকি যে কুদরত কর্মক্রিয়ার সাথে মিলিত হওয়া আবশ্যক, তা-ও সেই কুদরত, যা কর্মক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত। আর যে কুদরত কর্মক্রিয়া বর্জনের সাথে মিলিত হওয়া আবশ্যক তা-ও সেই কুদরত, যার সম্পর্ক বর্জনের সাথে প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য মুতলাক কুদরতের কথা

ভিন্ন। সুতরাং তা পূর্বে হয়। দুটি দ্বৈত বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত থাকে। আমরা বলব– এ তো এমন কথা, যাতে কোনও প্রকার বিতর্কের কল্পনাও করা যায় না বরং তা অলীক কথা। কাজেই গভীরভাবে ভাবা দরকার।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মু'তাযিলাদের দলীলের আরেকটি জবাব

استطاعت। কর্মক্রিয়ার পূর্বে হওয়ার পক্ষে মু'তাযিলাদের উপরিউক্ত প্রমাণ তথা যদি কর্মক্রিয়ার পূর্বে ক্ষমতা বা সামর্থ না হয় তাহলে অক্ষম ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করা আবশ্যক হবে। প্রমাণের উপরিউক্ত জবাব ছাড়াও কেউ কেউ আরেকটি জবাব দেন। আর তা হল, ইমাম আবু হানীফা রহ. এর নিকট কুদরত দুটি দ্বৈত বস্তুর যোগ্যতা রাখে। (বা পরস্পর বিরোধী দুটি জিনিসের যোগ্যতা রাখে।) অর্থাৎ যে কুদরতের (শক্তির) মাধ্যমে বান্দা থেকে কুফর ও পাপাচার প্রকাশ পায়, ঐ কুদরতের মাধ্যমেই বান্দা থেকে ঈমান ও আনুগত্য প্রকাশ পেতে পারে। তবে তফাৎ শুধু সম্পর্কের। অর্থাৎ এক সময় ঐ শক্তির সম্পর্ক হয় কুফরের সাথে আবার আরেক সময় হয় ঈমানের সাথে। আর সম্পর্কের ভিন্নতা (পার্থক্য) মূল শক্তিতে তফাৎ সৃষ্টিকে আবশ্যক করে না। যেমন সিজদা যদি আল্লাহর জন্য হয় তবে তা হয় আনুগত্য বা ইবাদত। আর প্রতীমার জন্য হলে তা হয় অবাধ্যতা বা পাপচার। এতদসত্ত্বেও উভয় অবস্থায় তার প্রকৃতি বা বাস্তবতা একই। অর্থাৎ জমীনে কপাল রাখা। সুতরাং একজন কাফির তার কুফরে ব্যয়িত শক্তি দ্বারা ঈমানও গ্রহণ করতে পারে। কাজেই ঈমান গ্রহণের পূর্বে কুফর অবস্থায় সে ঈমানের উপর সক্ষম; অক্ষম নয় যে, তাকে ঈমান গ্রহণে আদিষ্ট বললে অক্ষম ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ আবশ্যক হবে।

قوله ولايخفى الخ ঃ উপরিউক্ত জবাবের ব্যাপারে ব্যাখ্যাতা বলেন– এ জবাবের দ্বারা যদিও প্রতিপক্ষ মু'তাযিলাদের প্রমাণ খণ্ডিত (ভ্রান্ত সাব্যস্ত) হয়ে যায়, তথাপি তাদের দাবী অর্থাৎ কাজের পূর্বে ক্ষমতা বা সামর্থ হওয়ার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। কেননা কাফির থাকা অবস্থায় ঈমান গ্রহণে সক্ষমতা সুনিশ্চিত ঈমানের পূর্বে হবে। তাহলে কর্মক্রিয়ার পূর্বে সক্ষমতা বা কুদরত থাকা প্রমাণিত হয়ে গেল। তাদের দাবীও তা-ই।

قوله فان اجيب الخ ঃ ব্যাখ্যাতার আপত্তি তথা "উপরিউক্ত জবাবে মু'তাযিলাদের দাবীর স্বীকৃতিদান আবশ্যক হয়ে পড়ে" এর উত্তরে কেউ কেউ বলেছেন– (আসল উদ্দেশ্য হল) কুদরত যদিও পরস্পর বিরোধী দুটি জিনিসের যোগ্যতা রাখে, তদুপরি তন্মধ্যে একটির সাথে সম্পৃক্ততার দিক থেকে তার সাথে হবে, পূর্বে হবে না। যেমন, কুফর অবস্থায় কুদরতের সম্পর্ক হয় কুফরের সাথে। কাজেই তা কুদরতের সাথে হবে, কুফরের পূর্বে হবে না। পক্ষান্তরে ঈমানের অবস্থায় কুফরের সম্পর্ক ঈমানের সাথে হয়। কাজেই সেই কুদরত ঈমানের সাথে হবে; ঈমানের পূর্বে হবে না। মোটকথা, মুতলাক কুদরত, যার উপর দায়িত্ব অর্পণ নির্ভরশীল তা তো কর্মক্রিয়ার পূর্বে হয়। আর বিশেষ কুদরত, যার সম্পর্ক কর্মক্রিয়া বা বর্জনের সাথে, তা কর্মক্রিয়ার সাথে মিলিত এবং কাজের সাথে হয়।

قَوْلُهٗ قُلْنَا الخ ঃ এটি উপরিউক্ত জবাবের উপর আপত্তি। সার সংক্ষেপ হল, যে কুদরত কর্ম অথবা বর্জনের সাথে সম্পৃক্ত হবে, তা তো কর্ম অথবা বর্জনের সাথেই মিলিত হবে। এতে বিবাদ-বিসম্বাদের কোনও অবকাশ নেই বরং তা অনর্থক কথা। যেমন, কেউ বলল– যে কুদরত কর্মের সাথে আছে, তা মিলিত আছে।

وَلَا يُكَلَّفُ الْعَبْدُ بِمَا لَيْسَ فِيْ وُسْعِهٖ سَوَاءٌ كَانَ مُمْتَنِعًا فِيْ نَفْسِهٖ كَجَمْعِ الضِّدَّيْنِ اَوْ مُمْكِنًا كَخَلْقِ الْجِسْمِ وَاَمَّا مَا يَمْتَنِعُ بِنَاءً عَلٰى اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى عَلِمَ خِلَافَهٗ اَوْاَرَادَ خِلَافَهٗ كَاِيْمَانِ الْكَافِرِ وَطَاعَةِ الْعَاصِىْ فَلَا نِزَاعَ فِيْ وُقُوْعِ التَّكْلِيْفِ بِهٖ لِكَوْنِهٖ مَقْدُوْرًا لِلْمُكَلَّفِ بِالنَّظْرِ اِلٰى نَفْسِهٖ ثُمَّ عَدَمُ التَّكْلِيْفِ بِمَا لَيْسَ فِى الْوُسْعِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَالْاَمْرُ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اَنْبِئُوْنِىْ بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ لِلتَّعْجِيْزِ دُوْنَ التَّكْلِيْفِ ـ وَقَوْلُهٗ تَعَالٰى حِكَايَةً رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَاطَاقَةَ لَنَابِهٖ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّحْمِيْلِ هُوَ التَّكْلِيْفُ بَلْ اِيْصَالُ مَالَايُطَاقُ مِنَ

الْعَوَارِضِ اِلَيْهِمْ وَاِنَّمَا النِّزَاعُ فِى الْجَوَازِ فَمَنَعَتْهُ الْمُعْتَزِلَةُ بِنَاءً عَلَى الْقُبْحِ الْعَقْلِىِّ وَجَوَّزَهُ الْاَشْعَرِىُّ لِاَنَّهُ لَا يَقْبُحُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى شَىْءٌ.

সহজ তরজমা

বান্দার উপর তার সামর্থের বাইরে কোনও দায়িত্ব অর্পণ করা হয় না। চাই কাজটি সত্ত্বাগতভাবেই অসম্ভব হোক। যেমন, দুটি দ্বৈত জিনিসকে একত্র করা। অথবা সত্ত্বাগতভাবেই সম্ভব হোক। যেমন, দেহ সৃষ্টি করা। বাকী রইল ঐ কর্ম, যা এ হিসেবে অসম্ভব যে, আল্লাহ তা'আলা তার বিপরীত জ্ঞান রাখেন অথবা সে তার বিপরীত ইচ্ছা করেছেন। যেমন, কাফিরের ঈমান এবং পাপিষ্ঠের ইবাদত। কাজেই এর দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে কোন বিবাদ নেই। কেননা তা আদিষ্ট বা মুকাল্লাফ বান্দার ব্যক্তি সত্ত্বার ক্ষমতাধীন। অতঃপর সামর্থের বাইরে দায়িত্ব অর্পণ বাস্তবসম্মত না হওয়া আল্লাহ তা'আলার বাণী– لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا এর কারণে স্বতঃসিদ্ধ। আর আল্লাহর বাণী– اَنْبِئُوْنِىْ بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ এর মধ্যে নির্দেশ বাক্য অক্ষম বানানোর উদ্দেশ্যে; দায়িত্ব অর্পণের উদ্দেশ্যে নয়। আর বিবরণের ধাঁচে আল্লাহর বাণী– رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ এর মধ্যে تَحْمِيْل দ্বারা দায়িত্ব অর্পণ উদ্দেশ্য নয় বরং বান্দার উপর সেসব বিপদাপদ ও মসিবত আরোপ করা উদ্দেশ্যে, যেগুলো তাদের সাধ্য-সামর্থের বাইরে। অথচ বিতর্ক কেবল বৈধতা ও সম্ভাব্যতার ব্যাপারে। কাজেই মু'তাযিলারা যৌক্তিক নিকৃষ্টতার ভিত্তিতে তা অস্বীকার করেছে। আর আশ'আরীরা বৈধ সাব্যস্ত করেছে। কেননা তাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার কোন কাজ মন্দ বা খারাপ নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সাধ্যাতীত কাজের দায়িত্ব আরোপ

মাসআলা হল, বান্দাকে مَالَا يُطَاقُ অর্থাৎ এমন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা, যা তার সাধ্য-সামর্থের বাইরে জায়েয কী না? জায়েয হলে বাস্তবেও তা হয়েছে কিন না? অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে অসম্ভব বা তার সামর্থের বাইরে কোন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন কি না?

মাসআলাটি বিশদ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। সার সংক্ষেপ হচ্ছে, مَالَا يُطَاقُ বা সামর্থের বাইরে কাজ তিন প্রকার।

(১) সত্ত্বাগতভাবে অসম্ভব। যেমন, দুটি বিপরীতমূখী বস্তুকে একত্র করা।

(২) কাজটি সত্ত্বাগতভাবে সম্ভব বটে। কিন্তু স্বভাবগতভাবে বান্দার পক্ষে সে কাজ করা অসম্ভব। যেমন, মহাশূন্যে বা বাতাসে উড়ে বেড়ানো। দেহ সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

(৩) বস্তুতঃ বান্দার পক্ষে কাজটি করা সম্ভব। কিন্তু আল্লাহর ইল্‌মে উক্ত কাজ বান্দার পক্ষ থেকে না হওয়া কিংবা আল্লাহর ইচ্ছা বান্দা থেকে উক্ত কাজ প্রকাশ না পাওয়া চূড়ান্ত হয়ে আছে। সুতরাং ঐ কাজ বান্দার পক্ষ থেকে প্রকাশ পেলে আল্লাহর ইল্‌ম ভুল হওয়া এবং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইচ্ছায় ব্যর্থ হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়। অথচ তা অসম্ভব। আর যে সম্ভাবনা বা সম্ভাব্য বস্তু কোনও অসম্ভাব্যতাকে অবশ্যম্ভাবী করে, তাকে مُحَالٌ بِالْغَيْرِ (অন্যের কারণে অসম্ভব) বলে। এ সূত্রে উক্ত কাজটি সত্ত্বাগতভাবে সম্ভব তবে অন্যের কারণে অসম্ভব।

* সুতরাং مَالَا يُطَاقُ এর প্রথম প্রকার مُحَالٌ بِالذَّاتِ বা সত্ত্বাগতভাবে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা আদৌ জায়েয নয় এবং বাস্তব সম্মতও নয়। জমহূরের অভিমতও তা-ই। কেউ কেউ এ ব্যাপারে ঐক্যমতের দাবীও করেছেন। অবশ্য মতৈক্যের এ দাবী বিশুদ্ধ নয়। কেননা বহু আশায়েরা যদিও সত্ত্বাগতভাবে অসম্ভব কাজের দায়িত্ব অর্পণ কার্যকরী মনে করনে না, কিন্তু জায়েয বলেন। কেননা আল্লাহর কাজ নিকৃষ্ট বা খারাপ নয়। পক্ষান্তরে বৈধতা অস্বীকার কারীরা বলেন– সত্ত্বাগতভাবে অসম্ভব বস্তুর কল্পনা করা অসম্ভব। আর যে জিনিসের কল্পনা করা যায় না, তা মাজহূলে মুতলাক বা সম্পূর্ণ অজানা। কাজেই সত্ত্বাগতভাবে অসম্ভব বস্তু সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আর এমন অজানা বিষয়ের উপর কোন জিনিসের হুকুম বর্তানো বিশুদ্ধ নয়। সুতরাং এর উপর দায়িত্ব অর্পণের বৈধতার হুকুম লাগানো এবং সত্ত্বাগতভাবে অসম্ভব বস্তুর দায়িত্ব অর্পণ বৈধ বলাও বিশুদ্ধ নয়।

কিন্তু বৈধতার পক্ষপাতিরা এর বিরুদ্ধে আপত্তি করে বলেন, সত্ত্বাগতভাবে অসম্ভব বস্তু সম্পূর্ণ অজানা হওয়ার কারণে তার উপর মুকাল্লাফ বানানো বা দায়িত্ব অর্পণের বৈধতার হুকুম লাগানো যদি বিশুদ্ধ না হয়, তাহলে তোমাদের পক্ষ থেকে এর উপর অবৈধতার হুকুম লাগানোও বিশুদ্ধ নয়।

✪ আর مَالَا يُطَاقُ এর তৃতীয় প্রকার তথা সত্ত্বাগতভাবে সম্ভব এবং অন্যের কারণে অসম্ভব বস্তুর দায়িত্ব অর্পণ বৈধ এবং বাস্তবও তা-ই। যেমন, আবূ জাহল, আবূ লাহাব প্রমুখ কাফিরদের ব্যাপারে যদিও আল্লাহর অনাদি জ্ঞান ছিল– তারা ঈমান গ্রহণ করবে না। যদ্দরুন তাদের ঈমান গহণ সত্ত্বাগতভাবে সম্ভব এবং অন্যের কারণে অসম্ভব ছিল। তদুপরি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঈমান গ্রহণের মুকাল্লাফ বানিয়েছেন। কেননা সত্ত্বাগতভাবে ঈমান গ্রহণ করা তাদের সাধ্য-সামর্থের মধ্যে ছিল। আল্লাহপাকের এর বিপরীত ইল্‌ম থাকার কারণে তাদের শক্তি সামর্থ দূরীভূত হয় নি। অথচ দায়িত্ব অর্পণ নির্ভর করে সামর্থ্য ও ইচ্ছা বহাল থাকার ওপর। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই কোন কোন গবেষক এ প্রকারকে مَالَا يُطَاقُ (সামর্থের বাইরে) গণ্য করেন নি।

✪ مَالَا يُطَاقُ এর দ্বিতীয় প্রকার তথা যা বস্তুতঃ সম্ভব। কিন্তু বান্দা কর্তৃক তা বাস্তবে সম্পাদিত হওয়া স্বভাবগতভাবে অসম্ভব। যেমন, বাতাশে উড়ে বেড়ানো, দেহ সৃষ্টি করা প্রভৃতি। সুতরাং এ প্রকারের দায়িত্ব অর্পণ বাস্তবে না হওয়া সতঃসিদ্ধ। ব্যাখ্যাতার উক্তি ثُمَّ عَدَمُ التَّكْلِيْفِ بِمَا لَيْسَ فِى الْوُسْعِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ এর মধ্যে এ প্রকারই উদ্দেশ্য। তবে এ ধরনের কাজকর্মের দায়িত্ব অর্পণ করা বৈধ কি না –এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যেমন, ব্যাখ্যাতা বলেছেন– وَاِنَّمَا النِّزَاعُ فِى الْجَوَازِ

পক্ষান্তরে মুতাযিলারা এর বৈধতা অস্বীকার করেছে এবং প্রমাণ স্বরূপ বলেছে– বান্দাকে এমন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা, যা তার পক্ষে স্বভাবতই অসম্ভব, যৌক্তিকভাবে নিকৃষ্ট এবং খারাপ। তাছাড়া আল্লাহর দিকে খারাপ কাজের সম্বন্ধ করা বৈধ নয়। কাজেই বান্দাকে এমন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা জায়েয নয়, যা স্বভাবগতই তার পক্ষে করা অসম্ভব। পক্ষান্তরে আশ'আরীরা مَالَا يُطَاقُ এর উল্লেখিত প্রকারকে জায়েয সাব্যস্ত করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রকৃত মালিক। মালিকের জন্য তার অধিনস্থের উপর সব ধরনের অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা রয়েছে। বান্দার উপর তার কোন অধিকার প্রয়োগ বা হস্তক্ষেপ নিকৃষ্ট নয়। কাজেই বান্দাকে مَالَا يُطَاقُ এর দায়িত্ব অর্পণ করাও আল্লাহর জন্য নিকৃষ্ট হবে না। মূল গ্রন্থকারের অভিমতও তা-ই মনে হয়। কেননা তার নিকট যদি مَالَا يُطَاقُ এর দায়িত্ব অর্পণ না হত, তাহলে বলতেন– وَلَايَجُوْزُ التَّكْلِيْفُ بِمَا لَيْسَ فِى وُسْعِهِ অর্থাৎ সামর্থের বাইনে কোন কাজের দায়িত্ব অর্পণ জায়েয নয়। অথচ তিনি এমনটি বলেন নি বরং বলেছেন– لَايُكَلَّفُ الْعَبْدُ بِمَا لَيْسَ فِى وُسْعِهِ অর্থাৎ বান্দাকে مَالَا يُطَاقُ এর মুকাল্লাফ বানানো হয় না (বান্দার সামর্থের বাইরে কোনও কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় না।) সুতরাং এ তো বাস্তবে হওয়ার অস্বীকৃতি; বৈধতার নয়।

قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ مُمْتَنِعًا فِى نَفْسِهِ الخ ঃ এখানে مَالَا يُطَاقُ তথা সাধ্যাতীত কাজের প্রথম প্রকার উদ্দেশ্য। قَوْلُهُ: اَوْمُمْكِنًا الخ অর্থাৎ যে কাজ সত্ত্বাগতভাবে সম্ভব কিন্তু বান্দার পক্ষে তা করা স্বভাবতই অসম্ভব। এটি সাধ্যতীর কাজের দ্বিতীয় প্রকার। যার দায়িত্ব অর্পণ বাস্তবে না হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত এবং বৈধতার ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত। এ দ্বিতীয় প্রকারই বিতর্কিত স্থান। আর قَوْلُهُ: وَاَمَّا مَا يَمْتَنِعُ الخ দ্বারা সাধ্যতীত কাজের তৃতীয় প্রকার উদ্দেশ্য। যা বাস্তবে হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত।

قَوْلُهُ : ثُمَّ عَدَمُ التَّكْلِيْفِ الخ ঃ এখানে বাস্তবে দায়িত্ব অর্পণ না করা উদ্দেশ্য। কেননা তা স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। অবশ্য সাধ্যতীত কাজের বৈধতা বা সম্ভাবনা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। সামনে وَاِنَّمَا النِّزَاعُ فِى الْجَوَازِ বলে এর সুস্পষ্ট বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالْاَمْرُ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى الخ ঃ ব্যাখ্যাতার উপরিউক্ত বক্তব্য ثُمَّ عَدَمُ التَّكْلِيْفِ بِمَا لَيْسَ فِى الْوُسْعِ। এর উপর উত্থাপিত একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব এটি। প্রশ্ন হল, আল্লাহ তা'আলা কেবল হযরত আদম (আ.) কে যাবতীয় জিনিসের নাম শিখিয়ে ছিলেন। যেমন, তিনি বলেছেন– وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا কিন্তু ফিরিশ্‌তাদেরকে এসব জিনিসের নামের জ্ঞান দেননি। ইল্‌ম বা জ্ঞার ছাড়া এসব জিনিসের নাম বলার সামর্থ ফিরিস্তাদের ছিল না। অথচ আল্লাহ তা'আলা اَنْبِئُوْنِى بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ বলে তাদেরকে اِنْبَاء বা নাম বলার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। তদুপরি আপনি কিভাবে বলেন– সাধ্যাতীত কাজের দায়িত্ব অর্পণ বাস্তবে না হওয়া স্বতঃসিদ্ধ?

জবাবের সারকথা হল, উপরিউক্ত আয়াতে ফিরিশ্‌তাদেরকে নাম বলার নির্দেশ দায়িত্ব অর্পণের নিমিত্ত নয়। কাজেই এর দ্বারা সাধ্যাতীত কাজের দায়িত্ব অর্পণ বাস্তবে হওয়ার পক্ষে প্রমাণ পেশ করা যাবে না বরং তাদেরকে অক্ষম বানানো অর্থাৎ আদম (আ.) এর বিপরীতে ফিরিশ্‌তাদের অক্ষমতা প্রকাশ করার নিমিত্ত এই নির্দেশ, যারা (আ.) এর বিপরীতে নিজেদেরকে পৃথিবীর খেলাফতের অধিকযোগ্য মনে করত। আল্লাহ তা'আলা যখন বললেন–

তখন তারা বলেছিল– إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ (অর্থাৎ আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে তথায় অশান্তি ঘটাবে এবং রক্তপাত করবে। আমরা তো আপনার স্বপ্রশংস স্তুতি ও পবিত্রতা বর্ণনা করি। –সূরা বাকারা – ৩০)

তাক্‌লীফ ও তা'জীয -এর পার্থক্য

তাকলীফ ও তা'জীযের মধ্যে পার্থক্য হল, প্রথমটির ক্ষেত্রে বা তাকলীফের ক্ষেত্রে আদিষ্ট ব্যক্তি থেকে আদিষ্ট কর্মের বাস্তবায়ন নির্দেশ দাতার কাম্য হয়। পক্ষান্তরে তা'জীযের ক্ষেত্রে আদিষ্ট ব্যক্তি থেকে আদিষ্ট কাজের বাস্তবায়ন না পাওয়া কাম্য হয়। যাতে তার অক্ষমতা প্রকাশ পায়। যেমন, কিয়ামত দিবসে ফটো নির্মাতাদেরকে তার নির্মিত প্রতিচিত্র বা ফটোগুলোতে প্রাণসঞ্চার করার নির্দেশ দেওয়া হবে তাদেরকে অক্ষম বানানোর জন্য।

সাহাবায়ে কিরামকে সাধ্যাতীত কাজের আদেশ দান

قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى حِكَايَةً الخ ঃ এটি একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন হল, হযরত সাহাবায়ে কিরামকে নানা কুমন্ত্রণা এবং চিন্তা-ভাবনা মনে না আনার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। এ কাজ তাঁদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াল। ফলে তারা নবীজীর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন– এ কাজের ক্ষমতা আমাদের নেই। তখন নবীজী তাদেরকে দু'আ করার নির্দেশ দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম যখন رَبَّنَا لَاتُحَمِّلْنَا مَالَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ দু'আ করলেন তখন আল্লাহপাক উক্ত নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিলেন এবং لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ করলেন। এতে বুঝা গেল, সাধ্যাতীত কাজের দায়িত্ব অর্পণ বাস্তবে হয়েছে। তদুপরি مَالَا يُطَاقُ সাধ্যতীত কাজের দায়িত্ব অর্পণ বাস্তবে না হওয়া স্বতঃসিদ্ধ বলা কিভাবে বিশুদ্ধ হতে পারে? এর জবাবের সারকথা, মুমিনগণের প্রার্থনার বিবরণের নিমিত্ত আল্লাহর বাণী– رَبَّنَا لَاتُحَمِّلْنَا مَالَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ এর تَحْمِيل দ্বারা তাকলীফ উদ্দেশ্য নয় বরং তাদের সাধ্যাতীত বিপদাপদ ও মসীবত পৌছানো উদ্দেশ্য। আয়াতের মর্ম হবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের উপর এমন সব মসীবত চাপিয়ে দিয়েন না, যেগুলোর বহনক্ষমতা (বা যেগুলো সহ্য করার শক্তি) আমাদের নেই।

وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا عَلَى نَفْيِ الْجَوَازِ ـ وَتَقْرِيرُهُ اَنَّهُ لَوْكَانَ جَائِزًا لَمَا لَزِمَ مِنْ فَرْضِ وُقُوعِهِ مُحَالٌ ضَرُوْرَةَ اَنَّ اِسْتِحَالَةَ اللَّازِمِ تُوجِبُ اِسْتِحَالَةَ الْمَلْزُومِ تَحْقِيقًا لِمَعْنَى اللُّزُومِ لٰكِنَّهُ لَوْ وَقَعَ لَزِمَ كِذْبُ كَلَامِ اللّٰهِ تَعَالَى وَهُوَ مُحَالٌ وَهٰذِهِ نُكْتَةٌ فِي بَيَانِ اِسْتِحَالَةِ كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ عِلْمُ اللّٰهِ وَاِرَادَتُهُ وَاخْتِيَارُهُ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ ـ وَحَلُّهَا اَنَّا لَانُسَلِّمُ كُلَّ مَا يَكُوْنُ مُمْكِنًا فِي نَفْسِهِ لَا يَلْزَمُ مِنْ فَرْضِ وُقُوعِهِ مُحَالٌ وَاِنَّمَا يَجِبُ ذٰلِكَ لَوْ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ الْاِمْتِنَاعُ بِالْغَيْرِ وَاِلَّا لَجَازَ اَنْ يَكُوْنَ لُزُوْمُ الْمُحَالِ بِنَاءً عَلَى الْاِمْتِنَاعِ بِالْغَيْرِ اَلَا تَرَى اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَمَّا اَوْجَدَ الْعَالَمَ بِقُدْرَتِهِ وَاخْتِيَارِهِ فَعَدَمُهُ مُمْكِنٌ فِي نَفْسِهِ مَعَ اَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ فَرْضِ وُقُوعِهِ تَخَلُّفُ الْمَعْلُوْلِ عَنْ عِلَّتِهِ التَّامَّةِ وَهُوَ مُحَالٌ وَالْحَاصِلُ اَنَّ الْمُمْكِنَ لَا يَلْزَمُ مِنْ فَرْضِ وُقُوعِهِ مُحَالٌ بِالنَّظَرِ اِلَى ذَاتِهِ وَاَمَّا بِالنَّظَرِ اِلَى اَمْرٍ زَائِدٍ عَلَى نَفْسِهِ فَلَانُسَلِّمُ اَنَّهُ لَايَسْتَلْزِمُ الْمُحَالَ ـ

সহজ তরজমা

আবার কখনও আল্লাহর বাণী– لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا দ্বারা সাধ্যাতীত কাজের অবৈধতার পক্ষে প্রমাণ পেশ করা হয়। যার বিবরণ হচ্ছে, যদি সাধ্যাতীত কাজের দায়িত্ব অর্পণ বৈধ হত, তাহলে বাস্তবে তা হওয়ার স্বীকৃতি দানের অসম্ভাব্যতা অবশ্যম্ভাবী হত না। কেননা লাযেমের অসম্ভাব্যতা মালযুমের অসম্ভাব্যতাকে আবশ্যক করে লুযূমে অর্থ সাব্যস্ত করার জন্য। কিন্তু তা যদি বাস্তবে সংঘটিত হয় তাহলে আল্লাহর কালাম মিথ্যা হওয়া

আবশ্যক হয়, যা অসম্ভব। আর তা সেসব জিনিসের অসম্ভাব্যতা প্রমাণের ক্ষেত্রে একটি তথ্য, যা বাস্তবে না হওয়ার সাথে আল্লাহর জ্ঞান, ইচ্ছা, ইখতিয়ার সংশ্লিষ্ট। এ সমস্যার সমাধান হল, সত্ত্বাগতভাবে সম্ভব বস্তুর অস্তিত্ব মেনে নিলে অসম্ভব বস্তুর অনাবশ্যকতা আমরা স্বীকার করি না। এমন তো কেবল তখনই আবশ্যক হয়, যখন তার সাথে ভিন্ন কারণে অসম্ভাব্যতা সংযুক্ত না হয়। নতুবা ভিন্ন কারণে অসম্ভাব্যতার ফলে অসম্ভব বস্তু আবশ্যক হতে পারে। তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, যখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতে স্বেচ্ছায় বিশ্বজগত সৃষ্টি করলেন, তখন সত্ত্বাগতভাবে তার অনস্তিত্ব সম্ভব? তদুপুরি তার বাস্তবতা স্বীকার করলে স্বয়ংসম্পূর্ণ কারণ থেকে তার মা'লূল (কৃত বস্তু) পিছিয়ে যাওয়া আবশ্যক হয়। অথচ তা অসম্ভব। মোটকথা, সম্ভাব্য বস্তুর সত্ত্বা দেখে তার বাস্তবতা স্বীকার করলে অসম্ভব বস্তু আবশ্যক হয় না। অবশ্য সত্ত্বা থেকে অতিরিক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করলে তার অসম্ভাব্যতা আবশ্যক করে না বলে আমরা স্বীকার করি না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

বস্তুতঃ সাধ্যাতীত কাজের দায়িত্ব অর্পন জায়েয

কেউ কেউ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا আয়াতে কারীমা, যাতে সাধ্যতীত কাজের দায়িত্ব অর্পণ বাস্তবে না হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়েছে, এর দ্বারা উক্ত বিষয়ের অবৈধতার পক্ষে প্রমাণ পেশ করেন। কেননা তা যদি জায়েয হত, তাহলে তার বাস্তবতা মানার কারণে অসম্ভব কিছু আবশ্যক হত না। কারণ, সম্ভাব্য বস্তুর বাস্তবতা মানলে অসম্ভাব্যতা আবশ্যক হয় না। অথচ তার বাস্তবতা মানলে অসম্ভাব্যতা তথা আল্লাহর কালাম لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا মিথ্যা হওয়া আবশ্যক হয়। এতে বুঝা গেল, সাধ্যতীত কাজের দায়িত্ব অর্পণ জায়েয নয়। এ প্রমাণের ব্যাপারে ব্যাখ্যাতা বলেন– এটি একটি ভ্রান্তি যার দ্বারা ঐ সকল অসম্ভব বস্তু প্রমাণ করা হয়, যার বিপরীত জিনিসের সাথে আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা-ইখতিয়ার সংশ্লিষ্ট। যেমন, বলা হল– আবূ জাহল, আবূ লাহাব প্রমুখ কাফিরের ঈমান গ্রহণ যদি সম্ভব হত, তাহলে তাদের ঈমান আনয়ণের কারণে অসম্ভব কিছু আবশ্যক হত না। কেননা সম্ভাব্য বস্তুকে বাস্তবে মেনে নিলে অসম্ভব বস্তু আবশ্যক হয় না। অবশ্য তাদের ঈমান গ্রহণের ফলে অসম্ভব বস্তু আবশ্যক হত অর্থাৎ আল্লাহর জ্ঞান মিথ্যা হওয়া এবং তার উচ্ছা অকার্যকর হওয়া আবশ্যক হত। কেননা আল্লাহর জ্ঞান এবং ইচ্ছা ইখতিয়ার سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। সুতরাং বুঝা গেল, এসব কাফিরের ঈমান গ্রহণ সম্ভব ছিল না বরং অসম্ভব ছিল।

উক্ত সমস্যার সমাধানঃ প্রমাণদাতার উক্তি "সম্ভাব্য বস্তুর বাস্তবতা মেনে নিলে অসম্ভব বস্তু আবশ্যক হয় না"–বিশুদ্ধ নয়। কারণ, হতে পারে একটি বস্তু সত্ত্বাগতভাবে সম্ভব অথচ ভিন্ন কারণে অসম্ভব। সুতরাং তার বাস্তবতা মেনে নিলে তা সত্ত্বাগতভাবে সম্ভব হওয়ার কারণে নয় বরং ভিন্ন কারণে অসম্ভাব্যতা আবশ্যক হবে।

অনুরূপভাবে সাধ্যতীত কাজ সত্ত্বাগতভাবে সম্ভব। কিন্তু ভিন্ন কারণে তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার অনস্তিত্বের সংবাদ দেওয়ার কারণে বাস্তবে হওয়া অসম্ভব। এ হিসেবে তার বাস্তবতা মেনে নিলে অসম্ভব বস্তু আবশ্যক হতে পারে।

قَوْلُهُ: ضَرُوْرَةَ اَنَّ اِسْتِحَالَةَ اللَّازِمِ الخ ঃ লাযেমের অসম্ভাব্যতা মালযূমের অসম্ভাব্যতাকে আবশ্যক করার কারণ হল, লাযেম যদি অসম্ভব হয় আর মালযূম সম্ভব হয় তাহলে লাযেম ব্যতীত মালযূম পাওয়া যাবে। অথচ তা এতদুভয়ের মধ্যে আবশ্যকতার সম্পর্ক বিনষ্ট করে দেয়। ফলে এ দুটি পরস্পর লাযেম মালযূমই থাকবে না।

قَوْلُهُ: اَلَا تَرٰى الخ ঃ সত্ত্বাগতভাবে সম্ভব বস্তু যদি ভিন্ন কারণে অসম্ভব হয়, তাহলে সে সূত্রে এটি অসম্ভব বস্তুকে আবশ্যক করতে পারে –এর সমর্থনে এ বাক্য আনা হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত ও ইচ্ছায় বিশ্ব জগত সৃষ্টি করেছেন। কাজেই বিশ্বজগত আল্লাহর কুদরত ও ইচ্ছাধীন। আর যে জিনিস অন্যের কুদরত ও ইচ্ছাধীন থাকে, বস্তুতঃ সত্ত্বাগতভাবে তার অনস্তিত্ব সম্ভব। কিন্তু আল্লাহর মা'লূল এ বিশ্বজগতের অস্তিত্ব না মানা হলে মা'লূল তার পূর্ণাঙ্গ ইল্লাত থেকে পিছিয়ে যাওয়া আবশ্যক হবে, যা অসম্ভব। সুতরাং বিশ্বজগতের অনস্তিত্ব সত্ত্বাগতভাবে সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন কারণে অসম্ভব। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তা অসম্ভবকে আবশ্যক করতে পারে। মোটকথা, সত্ত্বাগতভাবে সম্ভাব্য বস্তুর বাস্তবতা বা বাস্তবে সংঘঠিত হওয়া মেনে নিলে অসম্ভব কিছু আবশ্যক হয় না। অবশ্য তার সত্ত্বা ছাড়া ভিন্ন কোন কারণেও তা বাস্তবে সংঘটিত হওয়ার অসম্ভাব্যতা অবশ্যম্ভাবী নয় বলে আমরা স্বীকার করি না।

وَمَايُوْجَدُ مِنَ الْاَلَمِ فِى الْمَضْرُوْبِ عَقِيْبَ ضَرْبِ اِنْسَانٍ وَالْاِنْكِسَارِ فِى الزُّجَاجِ عَقِيْبَ كَسْرِ اِنْسَانٍ قَيَّدَ بِذٰلِكَ لِيَصْلُحَ مَحَلًّا لِلْخِلَافِ فِىْ اَنَّهُ هَلْ لِلْعَبْدِ فِيْهِ صُنْعٌ اَمْ لَا وَمَا اَشْبَهَهُ كَالْمَوْتِ عَقِيْبَ الْقَتْلِ كُلُّ ذٰلِكَ مَخْلُوْقُ اللّٰهِ تَعَالٰى لِمَا مَرَّ مِنْ اَنَّ الْخَالِقَ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَحْدَهُ وَاَنَّ كُلَّ الْمُمْكِنَاتِ مُسْتَنَدَةٌ اِلَيْهِ بِلَا وَاسِطَةٍ وَالْمُعْتَزِلَةُ لَمَّا اَسْنَدُوْا بَعْضَ الْاَفْعَالِ اِلٰى غَيْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى قَالُوْا اِنْ كَانَ الْفِعْلُ صَادِرًا عَنِ الْفَاعِلِ لَابِتَوَسُّطِ فِعْلٍ اٰخَرَ فَهُوَ بِطَرِيْقِ الْمُبَاشَرَةِ وَاِلَّا فَبِطَرِيْقِ التَّوْلِيْدِ وَ مَعْنَاهُ اَنْ يُوْجِبَ فِعْلٌ لِفَاعِلِهٖ فِعْلًا اٰخَرَ كَحَرَكَةِ الْيَدَيْنِ تُوْجِبُ حَرَكَةَ الْمِفْتَاحِ فَالْاَلَمُ يَتَوَلَّدُ مِنَ الضَّرْبِ وَالْاِنْكِسَارُ مِنَ الْكَسْرِ وَلَيْسَا مَخْلُوْقَيْنِ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَعِنْدَنَا الْكُلُّ بِخَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ لَا صُنْعَ لِلْعَبْدِ فِى تَخْلِيْقِهٖ وَالْاَوْلٰى اَنْ لَايُقَيَّدَ بِالتَّخْلِيْقِ لِاَنَّ مَا يُسَمُّوْنَهُ مُتَوَلِّدَاتٍ لَاصُنْعَ لِلْعَبْدِ فِيْهِ اَصْلًا اَمَّا التَّخْلِيْقُ فَلِاسْتِحَالَتِهٖ مِنَ الْعَبْدِ وَاَمَّا الْاِكْتِسَابُ فَلِاسْتِحَالَةِ اِكْتِسَابِ مَا لَيْسَ قَائِمًا بِمَحَلِّ الْقُدْرَةِ وَلِهٰذَا لَايَتَمَكَّنُ الْعَبْدُ مِنْ عَدَمِ حُصُوْلِهَا بِخِلَافِ اَفْعَالِهِ الْاِخْتِيَارِيَّةِ ـ

সহজ তরজমা

কারও আঘাতের ফলে আহত ব্যক্তির মধ্যে যেসব যন্ত্রণাদাহ অনুভূত হয় এবং কারও ভাঙার দরুন কোনও শিশির মধ্যে যে ভাঙন দেখা যায় ....। এ শর্তারোপের কারণ হল, যাতে বিষয়টি "ভাঙনে বান্দার হাত আছে কি না" –এ বিতর্কের ক্ষেত্রে হতে পারে। এবং তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ জিনিস ...। যেমন, কারও হত্যার কারণে মৃত্যু বরণ করা। এসবই আল্লাহর সৃষ্ট। কেননা পিছনে গেছে যে, সৃষ্টিকর্তা কেবল আল্লাহ তা'আলা। এসব সম্ভাব্য জিনিস তারই সাথে সম্বন্ধযুক্ত। পক্ষান্তরে মু'তাযিলারা কিছু কাজ-কর্ম আল্লাহর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করার সময় তারা বলেছে– যদি কাজটি কর্তার অন্য কোন কাজের মাধ্যম ছাড়া প্রকাশ পায় তাহলে কাজটি হবে প্রত্যক্ষভাবে সম্পাদন। নতুবা হবে তাওলীদ অর্থাৎ কোন কাজ কর্তার জন্য আরেকটি কাজ সৃষ্টি করা। যেমন, হস্ত সঞ্চলন চাবির মধ্যে নড়াচড়া সৃষ্টি করে। কাজেই যন্ত্রণা সৃষ্টি হয় প্রহারের দ্বারা এবং ভাঙন সৃষ্টি হয় ভাঙার দ্বারা। (দুটির) কোনটিই আল্লাহর সৃষ্ট নয়। পক্ষান্তরে আমাদের নিকট সবই আল্লাহর সৃষ্ট। কোন কিছু সৃষ্টির পেছনে বান্দার হাত নেই। অবশ্য উত্তম ছিল, তাখলীক বা সৃজনের সাথে শর্তযুক্ত না করা। কেননা মু'তাযিলারা যেসব কর্মকে মুতাওয়াল্লিদাত বলে, তাতে বান্দার কোন কর্তৃত্ব বা হাত নেই। মোটকথা, তাখলীক তো বান্দার পক্ষে অসম্ভব হওয়ার কারণে (স্বীকৃত নয়) আর কাসব বা অর্জন, বান্দার পক্ষে এমন জিনিস অর্জন করা অসম্ভব হওয়ার কারণে (স্বীকৃত নয়।) যা কুদরতের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় না। এজন্যই বান্দা এসবের অনর্জনে সক্ষম নয়। (অবশ্য) তার ঐচ্ছিক কাজ-কর্ম এর পরিপন্থী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তাওলীদ ও মুতাওয়াল্লিদাত কি ?

এ আলোচনার সারকথা, বান্দার কোন ঐচ্ছিক কর্ম স্বীয় কর্তার জন্য আরেকটি কাজ সৃষ্টি করার নাম তাওলীদ। আর যেসব কাজ বান্দা থেকে সরাসরি প্রকাশ পায় না বরং বান্দার কোনও ঐচ্ছিক কর্মের প্রতিক্রিয়া বা প্রতিফল হয় অর্থাৎ তার ঐচ্ছিক কর্মের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করে, এসব কর্মকে মুতাওয়াল্লিদাত বলে। যেমন,

প্রহার করা বান্দা থেকে সরাসরি প্রকাশিতব্য ঐচ্ছিক কর্ম। যার ফলে প্রহৃত বা আহত ব্যক্তির মধ্যে যন্ত্রণাদাহ জন্ম নেয়। অথবা শিশি বা কাঁচ ভাঙা বান্দা থেকে সরাসরি প্রকাশিতব্য একটি কর্ম, যদ্দরুন কাঁচে ভাঙন সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে হত্যা বান্দা থেকে সরাসরি প্রকাশিতব্য কর্ম, যদ্দরুন নিহত ব্যক্তির মৃত্যু অবধারিত হয়। সুতরাং আহত ব্যক্তির যন্ত্রণাদাহ, কাঁচে ভাঙন এবং নিহত ব্যক্তির মৃত্যুকে মুতাওয়াল্লিদাত বলবে।

মু'তাওয়াল্লিদাত নিয়ে মতভেদ

এগুলোর ব্যাপারে মুতাযিলারা বলে– যেহেতু এসব বান্দার ঐচ্ছিক কর্ম দ্বারা সৃষ্টি হয়, আর ঐচ্ছিক কর্ম স্বয়ং বান্দার সৃষ্ট; আল্লাহর সৃষ্ট নয়। যেমন, খলকে আফ'আলের (কর্ম সৃজনের) ব্যাপারে মুতাযিলাদের মাযহাব পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। সুতরাং ঐসব ঐচ্ছিক কর্মের মাধ্যমে সৃষ্ট কর্মসমূহ, যেগুলোকে মুতাওয়াল্লিদাত বলা হয় তা-ও বান্দার সৃষ্ট হবে; আল্লাহর সৃষ্ট হবে না। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত হল, যেভাবে বান্দা থেকে সরাসরি প্রকাশিত ঐচ্ছিক কর্ম আল্লাহর সৃষ্ট, তদ্রূপ ঐসব ঐচ্ছিক কর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত কর্মসমূহ যেগুলোকে মুতাওয়াল্লিদাত বলা হয়, সেগুলোও আল্লাহর সৃষ্ট। অধিকন্তু এসব কর্মে বান্দার দুর্বলতা আরও প্রবল। কেননা বান্দা স্বীয় ঐচ্ছিক কর্মের স্রষ্টা না হলেও অন্ততপক্ষে কাসিব বা অর্জনকারী। পক্ষান্তরে মুতাওয়াল্লিদাত কর্মসমূহে সৃজন বা অর্জন কোন ভাবেই তার হাত নেই। সে তার স্রষ্টাও নয়; অর্জনকারীও নয়। কারণ, সৃষ্টিকর্তা কেবল আল্লাহ তা'আলা। বান্দার পক্ষে কোন কাজ সৃষ্টি করা অসম্ভব। তাছাড়া এ মুতাওয়াল্লিদাত বান্দার যে ঐচ্ছিক কর্মের মাধ্যমে সৃষ্ট, তার সাথে এসব প্রতিষ্ঠিত নয় বরং অন্যের সাথে প্রতিষ্ঠিত। যেমন, নিহত ব্যক্তির মৃত্যু যে হত্যাকারীর হত্যাযজ্ঞের দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করেছে, তা ঐ হত্যাকারীর সাথে প্রতিষ্ঠিত নয়। কাজেই হত্যাকারী ব্যক্তি তার অর্জনকারীও হতে পারে না। কেননা অর্জনের জন্য প্রয়োজন অর্জিত কাজ যে ক্ষমতা-বলে অর্জিত হয়েছে, ঐ ক্ষমতা-বলের সাথে থাকা।

একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব

قَوْلُهُ: قَيَّدَ بِذَالِكَ الخ ঃ এটি একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন হল, মূলগ্রন্থকার عَقِيْبَ ضَرْبِ اِنْسَانٍ এবং عَقِيْبَ كَسْرِ اِنْسَانٍ এর শর্ত কেন লাগিয়েছেন?

জবাবঃ বিতর্কিত বিষয়টি নির্দিষ্ট করার জন্য এখানে এ শর্তারোপ করা হয়েছে। কেননা যে ব্যথা-যন্ত্রণা কারও আঘাতের কারণে এবং যে ভাঙন কারও ভাঙার ফলে সৃষ্টি হয়, তা-ই হল আমাদের এবং মুতাযিলাদের মধ্যে বিতর্কিত বিষয়। তাদের মতে এসব বান্দার সৃষ্ট; আমাদের নিকট আল্লাহর সৃষ্ট। অবশ্য ব্যথা বা ভাঙন যা আল্লাহর সৃষ্ট ফল, বস্তুতঃ তা বিতর্কিত বিষয়ই নয় বরং তা সর্বসম্মতভাবে আল্লাহর সৃষ্ট।

قَوْلُهُ: اَلْاَوْلٰى اَنْ لَا يُقَيَّدَ بِالتَّخْلِيْقِ الخ ঃ মূল গ্রন্থকার বলেছেন– لَاصُنْعَ لِلْعَبْدِ فِى تَخْلِيْقِهٖ অর্থাৎ আঘাতের ফলে সৃষ্ট ব্যথা এবং ভাঙার ফলে সৃষ্ট ভাঙনে বান্দার কোন দখল বা হাত নেই। কেননা এর বিপরীত মর্ম দাঁড়ায়, অর্জনে বান্দার দখল বা হাত আছে। অথচ বান্দা যেভাবে মুতাওয়াল্লিদাতের খালিক নয়; তদ্রূপ তার কাসিবও নয়। এজন্য ব্যাখ্যাতা বলেন– তাখলীক বা সৃজনের শর্তারোপ না করা এবং لَاصُنْعَ لِلْعَبْدِ فِى تَخْلِيْقِهٖ বলা সবচেয়ে উত্তম ছিল।

قَوْلُهُ: وَلِهٰذَا ..الخ ঃ অর্থাৎ মুতাওয়াল্লিদাতের অস্তিত্বে বান্দার অর্জনের দখল নেই। এ হিসেবে সে তা অনর্জনে সক্ষম নয়। যেমন কাউকে আঘাত করবে আবার চাইবে আহত ব্যক্তির মধ্যে যেন ব্যথা সৃষ্টি না হয়। এমনটি করা অসম্ভব। ঐচ্ছিক কাজ এর বিপরীত। যেমন, আঘাত। এটি বাস্তবায়ন না করতেও সে সক্ষম।

وَالْمَقْتُوْلُ مَيِّتٌ بِاَجَلِهٖ اَىِ الْوَقْتِ الْمُقَدَّرِ لِمَوْتِهٖ لَاكَمَازَعَمَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ مِنْ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ قَطَعَ عَلَيْهِ الْاَجَلَ ـ لَنَا اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْحَكَمَ بِاٰجَالِ الْعِبَادِ عَلٰى مَا عُلِمَ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ وَبِاَنَّهٗ اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَايَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ـ وَاحْتَجَّتِ الْمُعْتَزِلَةُ بِالْاَحَادِيْثِ الْوَارِدَةِ فِىْ اَنَّ بَعْضَ الطَّاعَاتِ يَزِيْدُ فِى الْعُمُرِ وَبِاَنَّهٗ لَوْ كَانَ مَيِّتًا بِاَجَلِهٖ لَمَا اسْتَحَقَّ الْقَاتِلُ ذَمًّا وَلَاعِقَابًا وَّلَادِيَةً وَّلَاقِصَاصًا اِذْلَيْسَ مَوْتُ

الْمَقْتُولِ بِخَلْقِهِ وَلَا بِكَسْبِهِ ـ وَالْجَوَابُ عَنِ الْاَوَّلِ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى كَانَ يَعْلَمُ اَنَّهُ لَوْ يَفْعَلُ هٰذِهِ الطَّاعَةَ لَكَانَ عُمُرُهُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً لٰكِنَّهُ عَلِمَ اَنَّهُ يَفْعَلُهَا وَيَكُوْنُ عُمُرُهُ سَبْعِيْنَ سَنَةً فَنُسِبَتْ هٰذِهِ الزِّيَادَةُ اِلٰى تِلْكَ الطَّاعَةِ بِنَاءً عَلٰى عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَنَّهُ لَوْلَاهَا لَمَا كَانَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ وَعَنِ الثَّانِىْ اَنَّ وُجُوْدَ الْعِقَابِ وَالضِّمَانِ عَلَى الْقَاتِلِ تَعَبُّدِيٌّ لِاِرْتِكَابِ الْمَنْهِيِّ وَكَسْبِهِ الْفِعْلَ الَّذِىْ يَخْلُقُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَقِيْبَهُ الْمَوْتَ بِطَرِيْقِ جَرْىِ الْعَادَةِ فَاِنَّ الْقَتْلَ فِعْلُ الْقَاتِلِ كَسْبًا وَاِنْ لَمْ يَكُنْ خَلْقًا ـ

সহজ তরজমা

নিহত ব্যক্তির মৃত্যু তার মরণের চূড়ান্ত সময়েই হয়ে থাকে। এমন নয় যেমন মুতাযিলারা বলেছে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার অবধারিত সময়ের যবনিকাপত ঘটিয়েছেন। আমাদের প্রমাণ, আল্লাহপাক স্বীয় ইল্‌ম অনুযায়ী বান্দার মৃত্যুর সময়ের ফায়সালা করে দিয়েছেন এবং এ সিদ্ধান্তও দিয়েছেন– যখন মানুষের মৃত্যুর চূড়ান্ত সময় এসে যাবে, তখন সে এক মুহূর্তকালও বিলম্ব করতে পারবে না। পূর্বেও যেতে পারবে না। মুতাযিলারা ঐসব হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করে, যা এ ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, কোন কোন ইবাদত মানুষের জীবনায়ূ বাড়িয়ে দেয়। আবার এর দ্বারাও প্রমাণ পেশ করে যে, নিহত ব্যক্তি যদি তার মৃত্যুর নির্ধারিত সময়ে মৃত্যুবরণ করত, তাহলে হত্যাকারী ঘাতক নিন্দাযোগ্য হত না। হত না শাস্তির এবং রক্তপণ ও কিসাসযোগ্য। কেননা নিহতের মৃত্যু না তার সৃষ্টির কারণে হয়েছে, না তার অর্জনের কারণে।

প্রথম দলীলের জবাব হল, আল্লাহ তা'আলা জানতেন– বান্দা যদি অমুক ইবাদত না করত তবে তার জীবনায়ূ বা বয়স হত চল্লিশ বছর। কিন্তু তার জানা ছিল, সে ইবাদত করবে এবং তার বয়স হবে সত্তর বছর। কাজেই এ বৃদ্ধির সম্বন্ধ করা হয়েছে ঐ ইবাদতের সাথে। কেননা আল্লাহ পাক জানেন– এ ইবাদত না হলে এ বৃদ্ধি হত না।

দ্বিতীয় দলীলের জবাব হল, ঘাতকের উপর শাস্তি ও জরিমানা আবশ্যক হয় তাআব্বুদী হিসেবে তার নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া এবং এমন কাজ করার কারণে, যার ফলে আল্লাহ তা'আলা স্বভাবতই মৃত্যু অবধারিত করে দেন। কেননা হত্যা অর্জন হিসেবে ঘাতকের কর্ম; যদিও সৃজন হিসেবে (তার কর্ম) নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"আজাল" শব্দের মর্মার্থ ঃ اَجَل শব্দটি কখনও ব্যাপক সময় বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। আবার কখনও হয় অন্তিম সময় বুঝানোর জন্য। মূল গ্রন্থকারের ভাষ্যে উভয় অর্থই উদ্দেশ্য হতে পারে। بِاَجَلِهِ এর بَاء হরফটি যদি কারণ দর্শানোর জন্য হলে পরোক্ষ বাক্য দাঁড়াবে بِحُصُوْلِ آخِرِ مُدَّةِ حَيَاتِهِ অথবা بِانْقِضَاءِ مُدَّةِ حَيَاتِهِ অর্থাৎ নিহতের মৃত্যু তার জীবনায়ূ ফুরিয়ে যাওয়ার কারণে অথবা জীবনের অন্তিম সময় এসে যাওয়ার কারণে হয়। আর যদি بَاء হরফটি ظَرْفِيَّتْ এর জন্য হয় তাহলে পরোক্ষ বাক্য হবে فِىْ آخِرِ مُدَّةِ حَيَاتِهِ ব্যাখ্যাতা আল্লাহর বাণী– اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ আয়াত মাফিক (যাতে اِذَا যরফিয়্যাতের জন্য এসেছে) بَاء হরফটিকে ظَرْفِيَّت এর অর্থে প্রয়োগ করেছেন এবং اَجَل দ্বারা মৃত্যুর নির্ধারিত সময় উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

মৃত্যু হয় সুনির্দিষ্ট সময়ে

প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর জন্য সুনিশ্চিতভাবে কোন প্রকার সংশয়-সন্দেহ ও ইতঃস্ততা ব্যতীত আল্লাহর ইল্‌মে একটি সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে। যা থেকে কোন ক্রমেই এক মুহূর্তকালও আগ-পিছ হতে পারে না। এ ব্যাপারে কোনও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা ইতঃস্ততা আছে কি না? হকপন্থী উলামায়ে কিরাম প্রথম মতের পক্ষে। তারা বলেন– নিহতের মৃত্যু এমন এক সময় হয়, যে সময়টি আল্লাহর অনাদি চিরন্তন জ্ঞানে তার মৃত্যুর জন্য সুনির্দিষ্ট ছিল। তাকে হত্যা করা না হলেও ঐ সময়ের পর তার জীবিত থাকা আবশ্যক ছিল না বরং তখনও সে সময়ই মৃত্যুবরণ করার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। আবার সে সময় মৃত্যুবরণ না করারও সম্ভাবনা ছিল। মুতাযিলারা দ্বিতীয় সূরত অবলম্বন করেছে। বলেছে– নিহতের মৃত্যু তার নির্ধারিত সময়ে হয় নি বরং তার পূর্বে হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তার ঘাতককে

হত্যার সামর্থ দিয়ে তার নির্দিষ্ট সময়ের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। তাকে হত্যা করা না হলে সে তার নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকত।

উভয় পক্ষের দলীল প্রমাণ

আমাদের প্রমাণঃ আল্লাহ তা'আলা বান্দার নির্ধারিত সময় কোন প্রকার সংশয় ব্যতীত অর্থাৎ দ্বিধা-দ্বন্ধ ছাড়া চূড়ান্ত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ এমনভাবে সিদ্ধান্ত দেন নি যে, অমুক কাজ করলে জীবনায়ূ এত দিন হবে; অমুক কাজ করলে জীবনায়ূ হবে এত দিন। অনুরূপভাবে তিনি এ সিদ্ধান্তও দিয়েছেন যে, মানুষ তার মৃত্যুর অবধারিত সময়ের আগে-পরে মরতে পারে না।

মু'তাযিলারা স্বপক্ষে ঐসব হাদীস্ দ্বারা প্রমাণ পেশ করে, যেগুলোতে কোন কোন ইবাদতকে জীবনায়ূ বৃদ্ধির কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, لَايَرُدُّ الْقَدَرَ اِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيْدُ فِى الْعُمْرِ اِلَّا الطَّاعَةُ অর্থাৎ একমাত্র দু'আই ভাগ্যলিপি বদলাতে পারে এবং একমাত্র ইবাদতই জীবনায়ূ বাড়াতে পারে। সুতরাং সময় যদি অবশ্যই অবধারিত হত তাহলে ইবাদতের মাধ্যমে জীবনায়ুর বৃদ্ধি পাওয়ার কোন অর্থই থাকে না। মু'তাযিলারা স্বপক্ষে যৌক্তিক প্রমাণ টেনে বলেন, নিহত ব্যক্তি যদি তার নির্ধারিত সময় অর্থাৎ আল্লাহর ইল্‌মে তার মৃত্যুর নির্ধারিত সময়ে মরত, তাহলে ঘাতক দুনিয়ায় নিন্দা এবং পরকালে শাস্তিযোগ্য আর ভুলবশতঃ হত্যার ক্ষেত্রে রক্তপণ এবং ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে কিসাসযোগ্য হত না। কেননা নিহতের মৃত্যু তার অন্তিম সময় এসে যাওয়ার কারণে হয়েছে; ঘাতকের সৃজন বা অর্জনের কারণে নয়। কেননা মৃত্যু ঘাতকের হত্যাকর্মের প্রতিক্রিয়া বা প্রতিফল হওয়ার দরুন মুতাওয়াল্লিদাতের অর্ন্তভুক্ত। আর আপনারা আশায়েরাদের নিকট বান্দা এ জাতীয় কর্মের সৃষ্টিকারীও নয়, অর্জনকারীও নয়।

শারেহ রহ. মুতাযিলার প্রথম প্রমাণের জবাবে বলেন– আল্লাহ তা'আলা অনাদিকাল থেকেই জানতেন, বান্দা অমুক কাজ না করলে আমি তার বয়স চল্লিশ বছর নির্ধারণ করতাম। কিন্তু কোন প্রকার সংশয় বিহীন তার জানা ছিল, বান্দা সে ইবাদত করবে। এজন্য সুনিশ্চিতভাবে তিনি তার বয়স সত্তর বছর নির্ধারণ করেছেন। এখন সত্তর বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কিংবা পরেও তার মৃত্যু বিলম্বিত হতে পারে না। সুতরাং যেহেতু আল্লাহর ইলেমে ছিল, সে অমুক ইবাদত না করলে তার বয়স সত্তর বছর হত না বরং চল্লিশ বছর হত, অতএব কেমন যেন উক্ত ইবাদত করার জ্ঞান থাকা তার বয়স চল্লিশের স্থলে সত্তর নির্ধারণের সবব বা কারণ হয়েছে। এ হিসেবেই হাদীসেপাকে আয়ূ বৃদ্ধির সম্বন্ধ করা হয়েছে ইবাদতের সাথে। বস্তুতঃ এখানে জীবনায়ূ বৃদ্ধিই হয়নি। কেননা তার বয়স চল্লিশ বছর নির্ধারণের পর কোন ইবাদতের কারণে বয়স বাড়িয়ে পুনরায় সত্তর বছর নির্ধারণ করলেই আয়ূ বৃদ্ধি বাস্তব সম্মত হবে। অথচ ব্যাপার তা নয়। কেউ কেউ উপরিউক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন– জীবনায়ূ বাড়ানোর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যতগুলো নেককাজের জন্য এর চেয়ে অধিক সময় প্রয়োজন, সে কাজগুলো এতটুকু বয়সেই তা দ্বারা হয়ে যাবে।

যৌক্তিক প্রমাণের জবাব

ঘাতকের উপর জরিমানা কিংবা শাস্তি অবধারিত হওয়া আমরে তা'আব্বদী তথা স্বীয় দাসত্ব প্রকাশার্থে। কেননা সে এমন নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়েছে, যার ফলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া আল্লাহর স্বভাবধর্ম। কারণ, বান্দা হত্যা কর্মের খালিক বা স্রষ্টা না হলেও অন্তত কাসিব বা অর্জনকারী বটে। আর প্রতিদান এবং শাস্তি বিধান কাস্‌ব বা অর্জনের উপরেই নির্ভরশীল।

وَالْمَوْتُ قَائِمٌ بِالْمَيِّتِ مَخْلُوْقٌ اللّٰهِ تَعَالٰى لَاصُنْعَ لِلْعَبْدِ فِيْهِ تَخْلِيْقًا وَلَا اِكْتِسَابًا وَمَبْنٰى هٰذَا عَلٰى اَنَّ الْمَوْتَ وُجُوْدِىٌّ بِدَلِيْلِ قَوْلِهِ تَعَالٰى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ وَالْاَكْثَرُوْنَ عَلٰى اَنَّهٗ عَدَمِىٌّ وَمَعْنٰى خَلَقَ الْمَوْتَ قَدَّرَهٗ۔

সহজ তরজমা

মৃত্যু মাইয়েত বা মৃতের সাথে প্রতিষ্ঠিত; আল্লাহর সৃষ্ট। তাতে বান্দার কোন হাত নেই। সৃজন হিসেবেও নয়; অর্জন হিসেবেও নয়। এর ভিত্তি হল "মৃত্যু একটি অস্তিত্বশীল গুণ" এর ওপর। আল্লাহর বাণী– خلق الموت

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ-এর প্রমাণ থাকার কারণে। আর অধিকাংশের মাযহাব হল, মৃত্যু একটি নাস্তি গুণ। আর خَلَقَ الْمَوْتَ মানে قَدَّرَ الْمَوْتَ অর্থাৎ তিনি মৃত্যুকে সুনির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মৃত্যু আল্লাহর সৃষ্টি

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, নিহতের মৃত্যু মুতাওয়াল্লিদাতের অন্তর্গত। আর আশায়েরাদের মতে বান্দার ঐচ্ছিক কর্মের ন্যায় তার ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট মুতাওয়াল্লিদাত খ্যাত কর্মগুলোও আল্লাহর সৃষ্ট। কাজেই নিহতের মৃত্যুও আল্লাহর সৃষ্ট। পক্ষান্তরে মুতাযিলার নিকট নিহতের মৃত্যু ঘাতকের সৃষ্ট কর্ম। যেভাবে হত্যাকর্ম যার মাধ্যমে নিহতের মৃত্যু হয় ঘাতকের সৃষ্ট। মূলগ্রন্থাকার মুতাযিলাদের প্রতিবাদ করে বলেন– মৃত্যু মৃতের (মাইয়েতের) সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়; তা আল্লাহর সৃষ্ট। সৃজন কিংবা অর্জন কোন দিক দিয়ে বান্দার হাত নেই।

মৃত্যু অস্তিত্বশীল নাকি অস্তিত্বহীন

قَوْلُهُ : وَمَبْنٰى هٰذَا ..الخ ঃ অর্থাৎ মৃত্যু মাইয়্যেতের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকা মৃত্যুর অস্তিত্বশীলতার উপর নির্ভরশীল। কেননা অস্তিত্বশীল বস্তুই কেবল কোন স্থানে কায়েম হয়। আর মউত অস্তিত্বশীল বস্তু হওয়ার প্রমাণ আল্লাহর বাণী– خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ যাতে খলকের সংশ্লিষ্টতা মৃত্যু এবং হায়াত বা জীবন উভয়ের সাথে প্রকাশ করা হয়েছে। আর যে জিনিসের সাথে খলকের সম্পর্ক হয়, তা অস্তিত্বশীল হয়। কাজেই জীবনের মত মৃত্যুও অস্তিত্বশীল বস্তু। কিন্তু অধিকাংশ মাশায়েখগণ বলেন– মউত নাস্তি বিষয়। বাস্তবে অস্তিত্বহীন। আর অস্তিত্বহীন জিনিস কোন স্থানের মোখাপেক্ষী হয় না, যার সাথে কায়েম হবে। কাজেই মউত মৃত ব্যক্তির সাথে কায়েম নয়। পক্ষান্তরে যারা মউতের অস্তিত্বশীলতার দাবীদার, তাদের দলীলের জবাবে মাশায়েখগণ বলেন– خَلَقَ الْمَوْتَ এর মধ্যে খল্ক অর্থ তাকদীর বা নির্ধারিত। আর খলকের বিপরীতে তাকদীর ব্যাপক। তার সম্পর্ক অস্তিত্বশীল এবং নাস্তি বা অনস্তিত্বশীল বস্তু উভয়ের সাথেই হয়। কেননা যেভাবে কোন জিনিস হওয়া বিদিত ও নির্ধারিত, তদ্রুপ না হওয়াও বিদিত ও নির্ধারিত।

وَالْاَجَلُ وَاحِدٌ لَاكَمَا زَعَمَ الْكَعْبِيُّ اَنَّ لِلْمَقْتُوْلِ اَجَلَيْنِ اَلْقَتْلَ وَالْمَوْتَ وَاَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقْتَلْ لَعَاشَ اِلٰى اَجَلِهِ الَّذِىْ هُوَ الْمَوْتُ وَلَاكَمَا زَعَمَتِ الْفَلَاسِفَةُ اَنَّ لِلْحَيَوَانِ اَجَلًا طَبْعِيًّا وَهُوَ وَقْتُ مَوْتِهِ بِتَحَلُّلِ رُطُوْبَتِهِ وَانْطِفَاءِ حَرَارَتِهِ الْغَرِيْزِيَّتَيْنِ وَاَجَلًا اِخْتِرَامِيَّةً بِحَسَبِ الْاٰفَاتِ وَالْاَمْرَاضِ ـ

সহজ তরজমা

মৃত্যুর সময় একটিই। কা'বীর উক্তি মাফিক নিহতের জন্য মৃত্যুর সময় দুটি নয়। **এক.** হত্যা। **দুই.** মওত। অন্যথায় তাকে হত্যা না করা হলে সে তার আয়ূকাল তথা মৃত্যুর সময় পর্যন্ত জীবীত থাকত। দার্শনিকদের উক্তি মাফিকও নয় যে, প্রাণীর জন্য রয়েছে একটি স্বাভাবিক মৃত্যুক্ষণ। অর্থাৎ তার স্বভাবজাত রস শুকিয়ে যাওয়া এবং স্বভাবজাত উষ্ণতা নির্বাপিত হওয়ার দরুন তার মৃত্যুর সময়। আরেকটি হল, নানা বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাধির কারণে আকস্মিক মৃত্যুর সময়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মৃত্যুর সময় কয়টি ?ঃ আশআরী এবং অধিকাংশ মু'তাযিলা এ ব্যাপারে একমত যে, বান্দার মৃত্যুর জন্য আল্লাহ পাক যে সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তা একটিই। তবে আশ'আরী এ সময়ের পূর্বে বান্দার মৃত্যু জায়েয বা সম্ভব সাব্যস্ত করেন না। এমনকি নিহতের মৃত্যুও নির্দিষ্ট সময়ে হয়েছে মানেন। যেমন, পূর্বে বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে অধিকাংশ মু'তাযিলা এ সময়ের পূর্বেও মৃত্যুকে বৈধ বা সম্ভব সাব্যস্ত করে। যেমন, নিহতের ব্যাপারে তাদের অভিমত হল, তার মৃত্যু সময়ের পূর্বে হয়ে গেছে। তাকে যদি হত্যা না করা হত, তাহলে সে তার অন্তিম সময়

আসা পর্যন্ত জীবীত থাকত। আর মু'আযিলার মধ্য হতে কা'বী নামে প্রসিদ্ধ আবুল কাসেম মৃত্যু এবং হত্যার মধ্যে পার্থক্য করেন। অর্থাৎ "মৃত্যু আল্লাহর কর্ম আর হত্যা ঘাতক বান্দার কর্ম" এ পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন- নিহতের দুটি মৃত্যুক্ষণ। একটি হত্যা; অপরটি মৃত্যু। তিনি আরও বলেন- তাকে হত্যা করা না হলে সে তার দ্বিতীয়ক্ষণ তথা মৃত্যুর পূর্ব নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবীত থাকত। আর দার্শনিকদের দাবী তথা প্রাণীর জন্য রয়েছে দুটি মৃত্যুক্ষণ। একটি স্বাভাবিক মৃত্যু। অর্থাৎ তার স্বভাবগত রস শুকিয়ে যাওয়া এবং স্বভাবগত তাপ বা উষ্ণতা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কারণে মৃত্যুর সময়। যেমন, তৈল শেষ হয়ে প্রদীপ নিভে যায়। আর দ্বিতীয়টি আকস্মিক মৃত্যু। নানা বিপদাপদ এবং রোগ ব্যাধির কারণে যে মৃত্যু সময় হয়। যেমন, তৈল থাকা সত্ত্বেও প্রবল বাতাসের কারণে প্রদীপ নিভে যায়। মূল গ্রন্থকার এ সবের প্রতিবাদে বলেন- মৃত্যুর সময় একটিই।

وَالْحَرَامُ رِزْقٌ لِاَنَّ الرِّزْقَ اِسْمٌ لِمَا يَسُوْقُهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَى الْحَيَوَانِ فَيَاكُلُهُ وَذٰلِكَ قَدْ يَكُوْنُ حَلَالًا وَقَدْ يَكُوْنُ حَرَامًا وَهٰذَا اَوْلٰى مِنْ تَفْسِيْرِهِ بِمَا يَتَغَذّٰى بِهِ الْحَيَوَانُ لِخُلُوِّهِ عَنْ مَعْنَى الْاِضَافَةِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى مَعَ اَنَّهُ مُعْتَبَرٌ فِىْ مَفْهُوْمِ الرِّزْقِ وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ الْحَرَامُ لَيْسَ بِرِزْقٍ لِاَنَّهُمْ فَسَّرُوْهُ تَارَةً بِمَمْلُوْكٍ يَاكُلُهُ الْمَالِكُ وَتَارَةً بِمَا لَا يَمْنَعُ مِنَ الْاِنْتِفَاعِ بِهِ وَذٰلِكَ لَا يَكُوْنُ اِلَّا حَلَالًا لٰكِنْ يَلْزَمُ عَلَى الْاَوَّلِ اَنْ لَا يَكُوْنَ مَا تَاكُلُهُ الدَّوَابُّ رِزْقًا ـ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ اَنَّ مَنْ اَكَلَ الْحَرَامَ طُوْلَ عُمْرِهِ لَمْ يَرْزُقْهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَصْلًا ـ وَمَبْنٰى هٰذَا الْاِخْتِلَافِ عَلٰى اَنَّ الْاِضَافَةَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى مُعْتَبَرَةٌ فِىْ مَعْنَى الرِّزْقِ وَاَنَّهُ لَا رَازِقَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ وَاَنَّ الْعَبْدَ يَسْتَحِقُّ الذَّمَّ وَالْعِقَابَ عَلٰى اَكْلِ الْحَرَامِ وَمَا يَكُوْنُ مُسْتَنِدًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى لَا يَكُوْنُ قَبِيْحًا وَمُرْتَكِبُهُ لَا يَسْتَحِقُّ الذَّمَّ وَالْعِقَابَ وَالْجَوَابُ اَنَّ ذٰلِكَ لِسُوْءِ اَسْبَابِهِ بِاخْتِيَارِهِ ـ

সহজ তরজমা

এবং হারামও রিযিক। কেননা রিযিক ঐ জিনিসের নাম, যা প্রাণীজগতের জীবীকা স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা সরবরাহ করে থাকেন। তা কখনও হারাম হয়ে থাকে। আবার কখনও হালাল হয়ে থাকে। রিযিকের এ ব্যাখ্যা তার আরেক ব্যাখ্যা থেকে উত্তম অর্থাৎ "রিযকি ঐ জিনিসকে বলে, যাকে প্রাণী খাদ্যস্বরূপ গ্রহণ করে।" কারণ, এ ব্যাখ্যাটি আল্লাহর সাথে সম্বন্ধমুক্ত। অথচ রিযিকের মধ্যে আল্লাহর সাথে সম্বন্ধ ধর্তব্য। পক্ষান্তরে মু'তাযিলার নিকট হারাম রিযিক নয়। কেননা রিযিক দ্বারা কখনও কখনও তারা এমন মালিকানাধীন বস্তু উদ্দেশ্য নেয়, যার দ্বারা কল্যাণ লাভ করা অসম্ভব নয়। এমন জিনিস কখনও হালাল আবার কখনও হারাম হয়ে থাকে। অবশ্য প্রথম অর্থে চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্যদ্রব্য রিযিক না হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়। আর উভয় অর্থে "জীবনভর হারাম ভক্ষণকারীকে আল্লাহ পাক রিযিক দেননি" প্রশ্ন ওঠে। এ মতবিরোধ আরেকটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ রিযিকের অর্থে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা ধর্তব্য। তাছাড়া রায্যাক বা রিযিকদাতা কেবল আল্লাহ তা'আলা এবং হারাম ভক্ষণের ফলে বান্দা নিন্দা ও শাস্তিযোগ্য হয়। আর যে জিনিস আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ হয় তা নিন্দনীয় বা খারাপ হতে পারে না। এতে লিপ্ত ব্যক্তি নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য হতে পারে না। জবাব হল, নিঃসন্দেহে বান্দা স্বেচ্ছায় তার আসবাব উপকরণকে ভুলপথে ব্যবহারের কারণে নিন্দিত ও শাস্তিযোগ্য হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রিযিক মানে কি ?

রিযিক কখনও শব্দটি মাসদার হিসেবেও ব্যবহৃত হয় আবার ইসমে মাসদার হিসিবেও ব্যবহৃত হয়। মাসদার হলে শাব্দিক অর্থ হবে "কাউকে তার নির্দিষ্ট অংশ দেওয়া।" প্রচলন এবং শরঈ অর্থ হবে' 'আল্লাহ তা'আলার পক্ষ

থেকে প্রাণীকূলকে তার পানাহারের বস্তু কিংবা সাধারণ হিতকর ও লাভজনক জিনিস প্রদান করা; তা দ্বারা লাভবান ও উপকৃত হওয়ার সামর্থ দেওয়া।' আর ইসমে মাসদার হলে রিযিকের শাব্দিক অর্থ হবে, কারও নির্দিষ্ট বা বিশেষ অংশ। আর প্রচলন ও শরঈ অর্থ হবে- যিরিক এমন জিনিস, যা আল্লাহ তা'আলা প্রাণীকূলকে উপকৃত হওয়ার জন্য দান করে তাকে উপকৃত হওয়ার সামর্থ দেওয়া। মোটকথা, রিযিকের অর্থে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা ধর্তব্য। রিযিক যা-ই হবে, আল্লাহর পক্ষে থেকে হবে। আল্লাহর দিকে সম্বন্ধযুক্ত হবে। কেননা لَا رَزَّاقَ اِلَّا اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপর কেউ রিযিকদাতা নেই, যার দিকে রিযিক সম্বন্ধযুক্ত হবে। এ ব্যাপারে আশাআরী এবং মু'তাযিলারা একমত। তবে রিযিকের ব্যাখ্যায় মতভেদ রয়েছে।

আশআরীদের বর্ণিত ব্যাখ্যা হালাল-হারাম উভয়ের উপরই রিযিক প্রযোজ্য হয়। এ হিসেবে তারা হালালের ন্যায় হারামকেও রিযিক বলেন। পক্ষান্তরে মু'তাযিলাদের ব্যাখ্যা মতে হারামের রিযিক উপর প্রযোজ্য হয় না। এ হিসেবে তারা রিযকিকে হালালের সাথে বিশেষিত করে বলেন- اَلْحَرَامُ لَيْسَ بِرِزْقٍ অর্থাৎ হারাম দ্রব্য রিযিক নয়। আর আশআরী রিযিকের ব্যাখ্যায় বলেন- مَا سَاقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَى الْحَيَوَانِ فَيَاْكُلُهُ অর্থাৎ রিযিক এমন দ্রব্য, যা আল্লাহ তা'আলা প্রাণীকূলের পানাহার প্রভৃতি উপকারার্থে দান করেন। আর তা হালালও হতে পারে আবার হারামও হতে পারে। কোনও কোনও আশআরী রিযিকের সংজ্ঞায় বলেন- مَا يَتَغَذّٰى بِهِ الْحَيَوَانُ অর্থাৎ এমন দ্রব্য যা প্রাণীজগৎ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে বা খাদ্য বানায়। আর প্রাণী হালাল-হারাম উভয় ধরনের দ্রব্যই স্বীয় খাবাররূপে গ্রহণ করে। কাজেই এ সংজ্ঞার আলোকেও হালাল-হারাম উভয় ধরনের দ্রব্যই রিযিক বলে গণ্য হবে। অবশ্য দ্বিতীয় সংজ্ঞায় আল্লাহর দিকে রিযিকের সম্বন্ধ নেই, যদিও বাহ্যিক প্রমাণ যেমন اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ইত্যাদি আয়াতে কারীমার কারণে তা লক্ষ্যণীয়। এ হিসেব ব্যাখ্যাতা দ্বিতয়ী সংজ্ঞাকে অধিক উত্তম সাব্যস্ত করেছেন।

মু'তাযিলারা রিযিকের সংজ্ঞা দেয় مَمْلُوْكًا يَاْكُلُ الْمَالِكُ এ সংজ্ঞায় مَمْلُوْكًا শব্দটি اَلْمَجْعُوْلُ مِلْكًا অর্থে ব্যবহৃত অর্থাৎ যাকে মালিকানাধীন করা হয়েছে। আর মালিকাধীন করে আল্লাহ তা'আলা। কেননা রিযিকের অর্থে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা তাদের নিকটেও গ্রহণযোগ্য। কাজেই উক্ত বাক্যের অর্থ হবে- আল্লাহ তা'আলা কাউকে ভক্ষণের জন্য যেসব দ্রব্যের মালিকানা দেন বা মালিক বানান, তা-ই রিযিক। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে পানাহার এবং উপকৃত হওয়ার জন্য কাউকে কোন জিনিসের মালিক বানানো শরঈ অনুমোদন। এতে বুঝা গেল, রিযিক এমন দ্রব্যই হবে, যার দ্বারা উপকৃত হওয়ার শরঈ অনুমোদন আছে। অথচ হারাম দ্বারা উপকৃত হওয়ার শরঈ অনুমোদন নেই। কাজেই হারাম দ্রব্য রিযিক হতে পারে না।

আবার কখনও মু'তাযিলারা রিযিকের সংজ্ঞা দেয়- مَا لَا يَمْنَعُ مِنَ الْاِنْتِفَاعِ بِهِ তাদের নিকটে রিযিকের অর্থে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ ধর্তব্য হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করে উক্ত সংজ্ঞার মর্মার্থ হবে- রিযিক এমন দ্রব্য, যার দ্বারা উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেননি। অথচ হারাম এমন জিনিস, যার দ্বারা উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। কাজেই দ্বিতীয় সংজ্ঞার আলোকেও হারাম দ্রব্য রিযিক নয়।

মু'তাযিলীর প্রদত্ত সংজ্ঞায় আপত্তি

قَوْلُهُ : لٰكِنْ يَرِدُ عَلَى الْاَوَّلِ ....الخ ঃ এটি মু'তাযিলাদের প্রদত্ত প্রথম সংজ্ঞার উপর আপত্তি। সারকথা হল, তাদের প্রথম সংজ্ঞা বিশুদ্ধ হতে পারে না। কারণ, তা বিশুদ্ধ মেনে নেওয়া হলে প্রাণীকূল ও চতুষ্পদ জন্তুর আহার্য ও খাদ্যদ্রব্য রিযিক বলে গণ্য না হওয়া আবশ্যক হয়। কেননা জীব-জন্তুর মধ্যে মালিকানাসত্ত্ব নেই। আর তা যখন রিযিক হবে না, তখন প্রাণীজগৎ এবং চতুষ্পদ জন্তু আল্লাহর রিযিক প্রাপ্ত বলে গণ্য হবে না। অথচ তা ভ্রান্ত, অলিক কথা। কেননা আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا এর আলোকে গোটা মর্তজগতের তাবৎ প্রাণী ও জীবজন্তু আল্লাহর মারযূক তথা রিযিক প্রাপ্ত। কাজেই প্রথম সংজ্ঞা বিশুদ্ধ হতে পারে না।

قَوْلُهُ : وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ الخ ঃ এটি মু'তাযিলাদের বর্ণিত উভয় সংজ্ঞার উপরেই একটি আপত্তি। সারকথা হল, তাদের বর্ণিত সংজ্ঞা দুটি, যার আলোকে হারাম (দ্রব্য) রিযিক নয়, তা মেনে নিলে প্রশ্ন ওঠে- যে ব্যক্তি সারা জীবন হারাম খেল, তাকে আল্লাহ রিযিকই দেননি। সে আল্লাহর মারযূক বা রিযিক প্রাপ্ত নয়। অথচ আল্লাহর

বাণী- وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا এর আলোকে একথা বাতিল। বরং এ আয়াতে সকল প্রাণী ও জীবজন্তুকে আল্লাহর রিযিকপ্রাপ্ত বলা হয়েছে। কাজেই উপরিউক্ত সংজ্ঞা দুটি ভ্রান্ত।

قَوْلُهُ : مَنْ اَكَلَ طُوْلَ عُمْرِهٖ ...الخ ঃ এখানে উদাহরণতঃ মনে করুন, কোন নবজাতককে জন্ম লগ্ন থেকে মরণ পর্যন্ত ছিনতাইকৃত অথবা চোরাই বকরীর দুধ পান করানো হল। এমন কি ঐ নবজাতক মরে গেল।

হারাম দ্রব্য কি রিযিক ?

قَوْلُهُ : وَمَبْنٰى هٰذَا الْاِخْتِلَافِ ঃ অর্থাৎ হারাম (দ্রব্য) রিযিক হওয়া-না হওয়ার ব্যাপারে আশআরী এবং মু'তাযিলাদের মধ্যকার মতভেদের ভিত্তি তিনটি মুকাদ্দামা। যথা,

(১) রিযিকের অর্থে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা ধর্তব্য। অর্থাৎ রিযিক আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। তিনি ব্যতীত আর কেউ রিযিক দাতা নেই। এ ব্যাপারে আশআরী এবং মু'তাযিলীরা একমত।

(২) বান্দা হারাম খাওয়ার ফলে দুনিয়াতে নিন্দা ও ঘৃণা এবং পরকালে শাস্তিযোগ্য। এক্ষেত্রেও উভয় দল একমত।

(৩) যে জিনিস আল্লাহর দিকে সম্বোধিত হয়, তা নিন্দিত বা খারাপ হতে পারে না। তাতে লিপ্ত ব্যক্তি দুনিয়াতে ঘৃণা এবং পরকালে শাস্তিযোগ্য হবে না। এ ভূমিকাই বিতর্কিত। মুতাযিলীরা এর স্বপক্ষে। তারা বলে, হারাম দ্রব্য যদি রিযিক হয়, তাহলে যেহেতু রিযিকের অর্থে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ ও সম্বোধন ধর্তব্য (প্রথম ভূমিকার হুকুম মাফিক) বিধায় আল্লাহর দিকে হারাম সম্বোধিত হবে। আর যে জিনিস আল্লাহর দিকে সম্বোধিত হয়, তা নিন্দিত বা ঘৃণিত হতে পারে না। কাজেই হারাম নিন্দিত বা ঘৃণিত না হওয়ার প্রশ্ন উঠে। আর যে জিনিস খারাপ ও নিন্দিত না হবে, তার ব্যবহারকারী দুনিয়াতে তিরস্কার এবং পরকালে শাস্তিযোগ্য হয় না। সুতরাং হারামে লিপ্ত ব্যক্তি দুনিয়ায় তিরস্কার এবং পরকালে শাস্তিযোগ্য না হওয়ার প্রশ্ন উঠবে। আর উভয় প্রশ্ন তথা হারাম ঘৃণিত বা খারাপ না হওয়া এবং তাতে লিপ্ত ব্যক্তি নিন্দা ও শাস্তিযোগ্য না হওয়া ভ্রান্ত। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় প্রশ্নও দ্বিতীয় ভূমিকার প্রতিবন্ধক হওয়ার কারণে ভ্রান্ত। যা উভয় মাযহাবের নিকট স্বতঃসিদ্ধ। আর তা হারামকে রিযিক মানার কারণে অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কাজেই হারাম দ্রব্য রিযিক হওয়াও ভ্রান্ত।

আশআরীরা একথা (অর্থাৎ যে জিনিস আল্লাহর দিকে সম্বোধিত হয়, তা নিন্দিত বা খারাপ হতে পারে না।) অস্বীকার করে বলে- আল্লাহর কোন কাজ খারাপ নয়। অনুরূপভাবে মু'তাযিলারা যে কথা বলে অর্থাৎ হারাম দ্রব্য যদি রিযিক হত, তাহলে রিযিক আল্লাহর দিকে সম্বোধিত হওয়ার কারণে তার ব্যবহারকারী নিন্দা ও শাস্তিযোগ্য হত না।

এর জবাবে আশআরীদের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যাতা বলেন- হারামে লিপ্ত ব্যক্তি নিন্দা ও শাস্তিযোগ্য হওয়ার কারণ হল, সে জীবীকা উপার্জনের জায়েয এবং শরী'আতসম্মত পন্থা পরিহার করে নাজায়েয ও নিষিদ্ধ পন্থা অবলম্বন করেছে। যেমন, আমর ইবনে কুরবার এর হাদীসে জানা যায়। তিনি নবীজীর খেদমতে এসে আরয করলেন- আমার মনে হয়, স্বহস্তে দফ (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র) বাজানো ছাড়া অন্য কোন পন্থায় আমার জীবীকা সর্বরাহ হবে না। কাজেই আমাাকে এমন গানের অনুমতি দিন, যাতে কোন প্রকার অশ্লীলতা থাকবে না। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন-

كَذَبْتَ اَىْ عَدُوَّ اللّٰهِ ـ لَقَدْ رَزَقَكَ اللّٰهُ طَيِّبًا ـ فَاخْتَرْتَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِكَ مَكَانَ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ مِنْ حَلَالِهٖ ـ

এ হাদীসে مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِكَ বাক্যাংশ এর ব্যাখ্যাস্বরূপ। হাদীস শরীফে উপরিউক্ত বাক্যাংশের তরজমা হল, "হে আল্লাহর দুশমন! তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহ তোমার জন্য হালাল এবং পবিত্র রিযিক সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তুমি নিজের জন্য আল্লাহ তা'আলার হালালকৃত রিযিকের পরিবর্তে তার হারামকৃত জিনিস রিযিক হিসেবে গ্রহণ করেছ।

অতএব লক্ষ্য করুন ! উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা হারাম (দ্রব্য) রিযিক হওয়া বুঝা যায়। আর প্রমাণের মূখ্যস্থান হল, যা مَا حَرَّمَ اللّٰهُ مِنْ رِزْقِكَ এর ব্যাখ্যা। সাথে সাথে আরও জানা গেল, আমর ইবনে কুব্‌রাহ জীবীকা নির্বাহের শরী'আত সম্মত পন্থা পরিত্যাগ করে শরী'আত অসম্মত পন্থা অবলম্বন করার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার তীব্র নিন্দা করেছেন এবং তাকে আল্লাহর দুশমন বলেছেন।

وَكُلٌّ يَسْتَوْفِى رِزْقَ نَفْسِهٖ حَلَالًا كَانَ اَوْ حَرَامًا لِحُصُوْلِ التَّغَذِّىْ بِهِمَا جَمِيْعًا وَلَايُتَصَوَّرُ اَنْ لَا يَاْكُلَ اِنْسَانٌ رِزْقَهٗ وَيَاْكُلَ غَيْرُهٗ رِزْقَهٗ لِاَنَّ مَا قَدَّرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى غِذَاءَ شَخْصٍ يَجِبُ اَنْ يَاْكُلَهٗ وَيَمْتَنِعُ اَنْ يَاْكُلَ غَيْرُهٗ وَاَمَّا بِمَعْنَى الْمِلْكِ فَلَا يَمْتَنِعُ ـ

সহজ তরজমা

আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ রিযিক পরিপূর্ণ গ্রহণ করবে। চাই হালাল হোক বা হারাম হোক। (এ ব্যাপকতা) উভয় প্রকার রিযিক দ্বারা তার খাদ্যের কাজ হওয়ার (যার দ্বারা খাদ্যের কাজ হয়, দ্বিতীয় সংজ্ঞা হিসেবে তা রিযিক হওয়ার) কারণে। আর কল্পনাও করা যায় না যে, কোন মানুষ স্বীয় রিযিক খাবে না কিংবা অন্য কেউ তার রিযিক খেয়ে ফেলবে।। কেননা যে জিনিসকে আল্লাহ তা'আলা কারও খাবার (হিসেবে) নির্ধারণ করেছেন, তা ভক্ষণ করা তার জন্য আবশ্যক। অন্য কেউ তা ভক্ষণ করা সম্ভব নয়। মোটকথা, রিযিক অর্থ মালিকানা হলে (যেমন মু'তাযিলাদের সংজ্ঞায় রয়েছে) একজনের রিযিক অন্য কারও ভক্ষণ করা অসম্ভব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রিযিকের অর্থ যদি 'মালিকানা' করা হয়, যেমন মু'তাযিলীদের প্রথম সংজ্ঞা مَمْلُوْكٌ يَاْكُلُهُ الْمَالِكُ দ্বারা বুঝা যায়, তাহলে একজনের রিযিক অন্য কারও ভক্ষণ করা অসম্ভব নয় বরং অনেক সময়ই এমন হয়ে থাকে যে, একটি জিনিস একজনের মালিকানাধীন। অথচ সে তা ভক্ষণ করে না বরং অন্য কেউ যেমন, বন্ধু-বান্দব, আত্মীয় স্বজন, চোর-ডাকাত খায়। অবশ্য এ প্রশ্ন যথোচিত নয়। কেননা যখন মালিক ছাড়া অপর কেউ জিনিসটি খেয়ে ফেলে, তখন প্রমানিত হল যে, তা মালিকের রিযিক ছিল না। কারণ, সংজ্ঞায় يَاْكُلُ الْمَالِكُ শর্তমূলক সিফাত।

وَاللّٰهُ تَعَالٰى يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ بِمَعْنٰى خَلْقِ الضَّلَالَةِ وَالْاِهْتِدَاءِ لِاَنَّهُ الْخَالِقُ وَحْدَهٗ وَفِى التَّقْيِيْدِ بِالْمَشِيَّةِ اِشَارَةٌ اِلٰى اَنْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْهِدَايَةِ بَيَانَ طَرِيْقِ الْحَقِّ لِاَنَّهٗ عَامٌّ فِىْ حَقِّ الْكُلِّ وَلَا الْاِضْلَالُ عِبَارَةً عَنْ وِجْدَانِ الْعَبْدِ ضَالًّا اَوْ تَسْمِيَتِهٖ ضَالًّا اِذْ لَا مَعْنٰى لِتَعْلِيْقِ ذٰلِكَ بِمَشِيَّتِهٖ تَعَالٰى نَعَمْ قَدْ تُضَافُ الْهِدَايَةُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ مَجَازًا بِطَرِيْقِ التَّسْبِيْبِ كَمَا يُسْنَدُ اِلَى الْقُرْاٰنِ ـ وَقَدْ يُسْنَدُ الْاِضْلَالُ اِلَى الشَّيْطَانِ مَجَازًا كَمَا يُسْنَدُ اِلَى الْاَصْنَامِ ـ ثُمَّ الْمَذْكُوْرُ فِىْ كَلَامِ الْمَشَائِخِ اَنَّ الْهِدَايَةَ عِنْدَنَا خَلْقُ الْاِهْتِدَاءِ وَمِثْلُ هَدَاهُ اللّٰهُ فَلَمْ يَهْتَدِ مَجَازٌ عَنِ الدَّلَالَةِ وَالدَّعْوَةِ اِلَى الْاِهْتِدَاءِ وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ بَيَانُ طَرِيْقِ الصَّوَابِ وَهُوَ بَاطِلٌ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِىْ مَعَ اَنَّهٗ بَيَّنَ الطَّرِيْقَ وَدَعَاهُمْ اِلَى الْاِهْتِدَاءِ وَالْمَشْهُوْرُ اَنَّ الْهِدَايَةَ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ الدَّلَالَةُ الْمُوْصِلَةُ اِلَى الْمَطْلُوْبِ وَعِنْدَنَا الدَّلَالَةُ عَلٰى طَرِيْقٍ يُوْصِلُ اِلَى الْمَطْلُوْبِ سَوَاءٌ حَصَلَ الْوُصُوْلُ وَالْاِهْتِدَاءُ اَوْلَمْ يَحْصُلْ

সহজ তরজমা

আল্লাহ তা'আলা যাকে চান পথভ্রষ্ট করে দেন, যাকে চান হেদায়েত (সৎ পথ প্রদর্শন) করেন। আল্লাহর সঠিক পথ দেখানো এবং পথভ্রষ্ট করা মানে তিনি হেদায়াত ও গোমরাহী সৃষ্টি করেন। কেননা সৃষ্টিকর্তা কেবল তিনিই। আর ইচ্ছা বা مَشِيَّت এর শর্তারোপের দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে যে, হেদায়াত বলে সঠিক পথের বিবরণ দেওয়া

উদ্দেশ্য নয়। কেননা তা তো সকলের বেলায়ই সমান প্রযোজ্য। অনুরূপভাবে পথভ্রষ্ট অর্থ বান্দাকে পথভ্রষ্ট পাওয়া কিংবা তাকে পথভ্রষ্ট রাখা উদ্দেশ্য নয়। কারণ, তাকে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সংশ্লিষ্ট করা অর্থহীন। অবশ্য কোনও কারণ বশতঃ রূপকার্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে হেদায়াতের সম্বোধন করা হয়। যেরূপভাবে প্রতীমার দিকে করা হয়। অধিকন্তু মাশাইখদের ভাষায় বর্ণিত আছে, আমাদের নিকট হেদায়াতের অর্থ হেদায়াত সৃষ্টি করা। আর هَدَاهُ اللّٰهُ فَلَمْ يَهْتَدِ। জাতীয় উদাহরণে সত্য-সঠিক পথের দিকে ইংগিত এবং আহবান উদ্দেশ্য। মু'তাযিলীদের নিকট হেদায়েত অর্থ, সঠিক পথের বিবরণ দেওয়া। আর তা আল্লাহর বাণী اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِىْ এর কারণে বাতিল। প্রসিদ্ধ আছে যে, মু'তাযিলীর নিকট হেদায়াত এমন ইংগিতের নাম, যা অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। আর আমাদের নিকট ঐ পথপ্রদর্শনের নাম হেদায়াত, যা অভিষ্ট লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দেয়। চাই সে বাস্তবে গন্তব্যে পৌঁছুক বা না পৌছুক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হোদায়াতও اِضْلَال অর্থ

আল্লাহ তা'আলা বহু আয়াতেই নিজেকে হেদায়াত এবং পথ ভ্রষ্টতার সাথে গুণান্বিত করেছেন। সুতরাং তিনি এক স্থানে ইরশাদ করেছেন- اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ কিন্তু হেদায়াত ও পথভ্রষ্টতার ব্যাখ্যায় আশ'আরী এবং মু'তাযিলীরা দ্বিধা-বিভক্ত। আশ'আরীগণ বলেন- হেদায়াত অর্থ, আনুগত্য এবং পথপ্রাপ্তী সৃজন। অর্থাৎ বান্দার ভেতর আনুগত্য সৃষ্টি করা এবং বান্দাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা। আর اِضْلَال অর্থ, পথভ্রষ্টতা এবং পাপাচার-অবাধ্যতা সৃষ্টি করা। তারা আরও বলেন- আল্লাহ তা'আলাই যার মধ্যে ইচ্ছা আনুগত্য সৃষ্টি করেন। কেননা সকল জিনিসের সৃজন আল্লাহর সাথে খাছ। পক্ষান্তরে মু'তাযিলীরা বলে, ইবাদত-আনুগত্যএবং পাপাচার-অবাধ্যতার স্রষ্টা যদি আল্লাহ তা'আলাই হতেন তাহলে বান্দা প্রতিদান কিংবা শাস্তিযোগ্য হত না। কারণ, ইবাদত-আনুগত্য এবং পাপাচার-অবাধ্যতা আল্লাহর সৃজনের কারণে অস্তিত্ব লাভ করত; বান্দার ইচ্ছা ও শক্তি সামর্থে নয়। অথচ প্রতিদান এবং শাস্তি বিধান বান্দার ইচ্ছা ও শক্তি সামর্থের উপর নির্ভরশীল। কাজেই হেদায়াত অর্থ ইবাদত-আনুগত্য আর পথভ্রষ্টতা অর্থ, অবাধ্যতা-পাপাচার সৃষ্টি করা নয় বরং হেদায়াত অর্থ, সঠিক পথ বাতলে দেওয়া। আর اِضْلَال অর্থ, বান্দাকে পথভ্রষ্ট পাওয়া অথবা তাকে পথভ্রষ্ট রাখা।

ব্যাখ্যাতা বলেন- মূল গ্রন্থকারের উক্তি কিংবা আল্লাহর বাণী- اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ এর মধ্যে হেদায়াত ও اِضْلَال বা পথভ্রষ্টতাকে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করার মধ্যে ইংগিত রয়েছে যে, হেদায়াতের অর্থ সঠিক পথ বাতলে দেওয়া হতে পারে না। যেমনটি মু'তাযিলীরা বলে থাকে। কেননা সঠিক পথ বাতলে দেওয়া পথভ্রষ্ট এবং পথপ্রাপ্ত সকলের জন্য সমান। কুরআনে কারীমের জাগায় জাগায় يَا اَيُّهَا النَّاسُ বলে ব্যাপক সম্বোধনের সাথে সকলের জন্যই সত্য সঠিক পথ বাতলে দেওয়া হয়েছে। তদ্রূপ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ এর মধ্যে আহবান তথা সঠিক পথের বিবরণ ব্যাপক রাখা এবং হেদায়াতকে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে শর্তযুক্ত করার মধ্যেও ইংগিত রয়েছে যে, সঠিক পথের বিবরণ ব্যাপক। আবার হেদায়াতকে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে শর্তযুক্ত করার মধ্যেও ইংগিত রয়েছে যে, সঠিক পথের বিবরণ ব্যাপক এবং হেদায়াত খাছ। তদ্রূপ اِضْلَال কে مَشِيَّت এর সাথে শর্তযুক্ত করার মধ্যেও ইংগিত রয়েছে যে, اِضْلَال অর্থ وِجْدَانُ الْعَبْدِ ضَالًّا অর্থাৎ পথভ্রষ্ট পাওয়া বা পথভ্রষ্ট জানা নয় এবং تَسْمِيَةُ الْعَبْدِ ضَالًّا তথা বান্দার নাম পথভ্রষ্ট রাখাও নয়। কেননা وِجْدَان অর্থ ইল্ম। আল্লাহর সব জিনিসেরই ইল্ম রয়েছে। কাম্য হোক বা না হোক। কাজেই اِضْلَال তথা وِجْدَانُ الْعَبْدِ ضَالًّا কে مَشِيَّت এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা অর্থহীন। কারণ, আল্লাহ পাক ইচ্ছে মাফিক যে কারও নাম পথভ্রষ্ট রাখতে পারেন -উক্তি করাই ইংগিত করে যে, নাম রাখা কেবল আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, যার নাম রাখা হল, তার মধ্যে সে গুণের কোন ধর্তব্য নেই। সুতরাং এ-ও বৈধ হওয়া উচিৎ যে, আল্লাহ তা'আলা কোন নেক বান্দার নামও পথভ্রষ্ট রাখবেন। অথচ তা ভ্রান্ত।

আশ'আরীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

قَوْلُهُ: نَعَمْ قَدْ يُضَافُ الخ ঃ এটি মু'তাযিলীর পক্ষ থেকে আশ'আরীর উপর একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন হল, হেদায়াতের অর্থ যদি 'পথপ্রাপ্তী' করা হয় এবং اِضْلَال অর্থ যদি 'পথভ্রষ্টতা সৃষ্টি' হয়, তাহলে হেদায়াতের সম্বন্ধ কোন পয়গাম্বরের সাথে এবং اِضْلَال এর সম্বন্ধ শয়তানের সাথে হত না। কারণ, আপনাদের নিকট স্রষ্টা কেবল

আল্লাহ তা'আলা। অথচ তালী ভ্রান্ত। কেননা আল্লাহর বাণী- وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ এর মধ্যে হেদায়াতের সম্বন্ধ পয়গাম্বরের সাথে এবং কুরআনের শব্দ وَلَاُضِلَّنَّهُمْ এর মধ্যে اِضْلَال এর সম্বন্ধ শয়তানের সাথে করা হয়েছে। তদ্রুপ মুকাদ্দামা তথা হেদায়াত অর্থ 'পথপ্রাপ্তী সৃষ্টি করা' এবং اِضْلَال অর্থ 'পথভ্রষ্টতা সৃষ্টি করা' হওয়াও ভ্রান্ত। পক্ষান্তরে হেদায়াত অর্থ 'সঠিক পথ বাতলানো 'এবং اِضْلَال অর্থ, বান্দাকে পথভ্রষ্ট পাওয়াই বিশুদ্ধ।

জবাব ঃ জবাবের সারকথা, যেভাবে اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ এর মধ্যে হেদায়াতের সম্পর্ক কুরআনের সাথে এবং رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ এর মধ্যে اِضْلَال এর সম্পর্ক প্রতিমার সাথে اِسْنَادُ الْفِعْلِ اِلَى السَّبَبِ (ফে'লের সম্বন্ধ সববের সাথে) এর অন্তর্গত হওয়ার কারণে সর্বসম্মতভাবে রূপক। আবার কখনও কখনও হেদায়াতের নিসবত পয়গাম্বরের দিকে রূপকভাবে করা হয়। কেননা তিনি হলেন বান্দার হেদায়াত পাওয়ার সবব বা কারণ। যেমন, ঈমান বাড়িয়ে দেওয়া বস্তুতঃ আল্লাহর কাজ। কিন্তু আয়াতে কারীমা এ বৃদ্ধির সবব হয়। এ হিসেবে আল্লাহর বাণী اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا এর মধ্যে বৃদ্ধির নিসবত রূপকভাবে কুরআনের দিকে করা হয়েছে। অনুরূপ اِضْلَال এর নিসবত রূপকভাবে শয়তানের দিকে করা হয়েছে। কেননা সে পথভ্রষ্টতার সবব।

আশ'আরী ও মু'তাযিলীর মতামতের বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : ثُمَّ الْمَذْكُوْرُ الخ ঃ যেহেতু হেদায়াতের ব্যাখ্যায় আশ'আরী এবং মু'তাযিলা উভয়ের অভিমত ভিন্ন ভিন্ন। বিধায় ব্যাখ্যাতা খানিকটা বিশ্লেষণ করেছেন এবং উভয় পক্ষেরই এক একটি অভিমত ইলমে কালামের আলোকে ثُمَّ الْمَذْكُوْرُ فِيْ كَلَامِ الْمَشَائِخِ শিরোনামে আলোচনা করেছেন। অনুরূপভাবে উভয় পক্ষের একটি করে অভিমত তাফসীর গ্রন্থাবলির আলোকে وَالْمَشْهُوْرُ শিরোনামে আলোচনা করেছেন। কাজেই তিনি বলেছেন- মাশায়েখে আশায়েরার ভাষ্যে বর্ণিত আছে যে, আমাদের নিকট হেদায়াত অর্থ পথপ্রাপ্তী সৃষ্টি করা তথা ইবাদত-আনুগত্য সৃষ্টি করা।

মু'তাযিলীদের আপত্তি তার জবাব

এ সংজ্ঞার ব্যাপারে মু'তাযিলাদের পক্ষ থেকে বলা হয় هَدَاهُ اللّٰهُ فَلَمْ يَهْتَدِيْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হেদায়াত দিয়েছেন, তাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। কিন্তু সে হেদায়াত পথপ্রাপ্ত হয়নি। অথবা যেমন আল্লাহর বাণী- وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى অর্থাৎ আমি ছামূদ সম্প্রদায়কে হেদায়াত দিয়েছি। কিন্তু তারা হেদায়াতের উপর গোমরাহীকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং তারা পথপ্রাপ্ত হয়নি। বুঝা গেল, হেদায়াত অর্থ পথপ্রাপ্তী সৃষ্টি করা নয় বরং তার অর্থ হবে, সঠিক পথ বাতলানো।

ব্যাখ্যাতার জবাবের সারকথা, মুসাব্বাব বলে সবব উদ্দেশ্য নেওয়াও মাজাযে মুরসালের একটি পদ্ধতি। যেমন, আল্লার বাণী- يُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا এর মধ্যে রিযিক দ্বারা তার সবব বৃষ্টি উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে পথপ্রাপ্তীর প্রতি আহবান এবং ইংগিত সবব। আর হেদায়াত মুসাব্বাব। সুতরাং هَدَاهُ اللّٰهُ فَلَمْ يَهْتَدِيْ এর মত উদাহরণগুলোতে মাজাযে মুরসাল হিসেবে মুসাব্বাব তথা হেদায়াত বলে তার সবব তথা পথপ্রাপ্তীর প্রতি আহবান করা উদ্দেশ্য।

মু'তাযিলার নিকট হেদায়াতের অর্থ সঠিক পথ বাতলে দেওয়া, ইবাদত আনুগত্য নয়। কারণ, তাদের মতে ইবাদত-আনুগত্য এবং পাপাচার-অবাধ্যতা ইত্যাদি সকল ঐচ্ছিক কাজকর্মের স্রষ্টা স্বয়ং বান্দা। কাজেই হেদায়াতের অর্থ যদি ইবাদত-আনুগত্য (যা বান্দার ক্রিয়া) সৃজন হত, তাহলে নছসমূহে হেদায়াতের সম্বোধন বান্দার দিকে হত, আল্লাহর দিকে হত না। অথচ নছসমূহে হেদায়াতের সম্বোধন করা হয়েছে আল্লাহর দিকে। বুঝা গেল, হেদায়াতের অর্থ ইবাদত-আনুগত্য সৃজন নয় বরং সঠিক পথ বাতলে দেওয়া। ব্যাখ্যাতা বলেন- হেদায়াতের অর্থ সঠিক পথ বাতলে দেওয়া হতে পারে না। **প্রথমতঃ** এজন্য যে, হেদায়াতের অর্থ যদি তা-ই হত, তাহলে আল্লাহ তা'আলা নবীজীর থেকে হেদায়াতের নফী করতেন না। অথচ তিনি তা করেছেন। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে- اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ। অতএব বুঝা গেল, হেদায়াতের অর্থ তা নয়।

দ্বিতীয়তঃ হেদায়াতের অর্থ যদি তা-ই হত তাহলে নবীজী স্বজাতির জন্য আল্লাহর নিকট হেদায়াতের দু'আ করতেন না। কেননা সঠিক পথের দিশা দান বা বিবরণের কাজ তাঁর দ্বারা পালিত হয়ে ছিল। এমতাবস্থায় উক্ত প্রার্থনা অর্জিত জিনিস পুনঃঅর্জনের নামান্তর। অথচ তিনি যথারীতি প্রার্থনা করেছেন, اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ

لَا يَعْلَمُوْنَ। অতএব বুঝা গেল, তা হেদায়াতের অর্থ হতে পারে না। উপরিউক্ত আলোচনা ছিল আশআরী এবং মু'তাযিলীর মতামতের বিবরণ। ইলমে কালামের কিতাবাদিতে এরূপই উল্লেখ রয়েছে। নিম্নে উভয়মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতামত আলোচনা করা হচ্ছে। যা মুফাস্‌সিরীনে কিরাম সাধারণতঃ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ এর ব্যাখ্যায় আলোকপাত করে থাকেন।

মোটকথা, মু'তাযিলার মতে হেদায়াত এমন পথ প্রদর্শনের নাম, যা কার্যতঃ অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। আর কার্যতঃ পৌঁছে দেওয়ার জন্য কার্যতঃ পৌঁছে যাওয়াও আবশ্যক। পক্ষান্তরে আমাদের মতে হেদায়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এমন পথনির্দেশ, যা গন্তব্যে বা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দেয়। বাস্তবে সে ব্যক্তি গন্তব্যস্থলে পৌঁছুক বা না পৌঁছুক। যেমন, আয়াতে কারীমা وَأَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنَاهُمْ এর মধ্যে এ অর্থই উদ্দেশ্য। আয়াতের মর্মার্থ হবে, আমি ছামূদ সম্প্রদায়কে গন্তব্যে বা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দেওয়ার পথনির্দেশ করেছিলাম। কিন্তু তারা সে পথে চলার বদলে সরে থাকাকে প্রাধান্য দিয়েছে। ফলে তারা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুতে সক্ষম হয়নি। (অর্থাৎ তারা সে পথে চলেনি। উল্টো ভিন্নপথ ধরেছে। কাজেই অভিষ্ঠ লক্ষ্যে তারা পৌঁছতে পারেনি।)

وَمَا هُوَ الْأَصْلَحُ لِلْعَبْدِ فَلَيْسَ ذَالِكَ بِوَاجِبٍ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَاِلَّا لَمَا خَلَقَ الْكَافِرَ الْفَقِيْرَ الْمُعَذَّبَ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَمَا كَانَ لَهٗ اِمْتِنَانٌ عَلَى الْعِبَادِ وَاسْتِحْقَاقُ شُكْرٍ فِى الْهِدَايَةِ وَاِفَاضَةِ اَنْوَاعِ الْخَيْرَاتِ لِكَوْنِهَا اَدَاءً لِلْوَاجِبِ ـ وَلَمَا كَانَ اِمْتِنَانُهٗ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوْقَ اِمْتِنَانِهٖ عَلٰى اَبِىْ جَهْلٍ ـ لَعَنَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ اِذْ فَعَلَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا بِغَايَةٍ مَقْدُوْرَةٍ مِنَ الْاَصْلَحِ لَهٗ ـ وَلَمَا كَانَ لِسُؤَالِ الْعِصْمَةِ وَالتَّوْفِيْقِ وَكَشْفِ الضَّرَّاءِ وَالْبَسْطِ فِى الْخِصْبِ وَالرَّخَاءِ مَعْنًى ـ لِاَنَّ مَا لَمْ يَفْعَلْ فِىْ حَقِّ وَاحِدٍ فَهُوَ مُفْسَدَةٌ لَهٗ يَجِبُ عَلَى اللّٰهِ تَرْكُهَا ـ وَلَمَا بَقِىَ فِىْ قُدْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى بِالنِّسْبَةِ اِلٰى مَصَالِحِ الْعِبَادِ شَيْءٌ ـ اِذْ قَدْ اَتٰى بِالْوَاجِبِ ـ

সহজ তরজমা

বান্দার পক্ষে যা কল্যাণকর ও হিতকর, তা আল্লাহর উপর ওয়াজিব নয়। নতুবা পরকালে শাস্তিপ্রাপ্ত কাফির এবং দুনিয়ায় শাস্তিপ্রাপ্ত ফকীরকে তিনি সৃষ্টি করতেন না। হেদায়াত এবং বিভিন্ন প্রকার কল্যাণ প্রদানের কারণে বান্দার পক্ষ থেকে তিনি কৃতজ্ঞতার যোগ্য এবং বান্দার উপর অনুগ্রহ প্রকাশের যোগ্য হতেন না। কেননা এ কাজটুকু তো কর্তব্য পালন মাত্র। অভিশপ্ত আবূ জাহ্‌ল অপেক্ষা অধিক নবীজীর উপর অনুগ্রহ জেতানোর অধিকার হত না। কেননা প্রত্যেকের সাথেই জীবনভর তার জন্য কল্যাণকর ব্যবহার করছেন। তদ্রূপ পাপাচার থেকে রক্ষা করা, নেক কাজের তাওফীক দান, বিপদাপদ দূরীভূত করা এবং সজীবতা ও স্বচ্ছলতা বাড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে (আল্লাহর নিকট) প্রার্থনা করার কোন অর্থ থাকত না। কারণ, যার সাথে যে আচরণ করা হয়নি, তার জন্য সেটি ক্ষতিকর ও অমঙ্গলজনক। তা বর্জন করা আল্লাহর জন্য আবশ্যক। আবার বান্দার উপকারীতার দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহর কুদরতে কোন জিনিস অবশিষ্ট থাকত না। কারণ, তিনি তো কর্তব্য পালন করেছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

বান্দার জন্য যা উপকারী তা কি আল্লাহর উপর ওয়াজিব

মু'তাযিলার মতে বান্দার জন্য কল্যাণকর ও সংগত জিনিস দেওয়া, চাই তা কেবল ধর্মীয় দিক থেকে হোক। যেমন কতিপয় মু'তাযিলার মাযহাব কিংবা দীন-দুনিয়া উভয় দিক থেকে কল্যাণকর হোক। যেমন, অন্যান্য মু'তাযিলার মাযহাব। আল্লাহর উপর তা ওয়াজিব।

মু'তাযিলার দাবী মতে বান্দার জন্য কল্যাণকর এবং হিতকর জিনিস অবশ্যই দু ধরনের হবে। হয়ত তার উপকারীতার জ্ঞান আল্লাহর থাকবে অথবা থাকবে না। যদি উপকারীতার জ্ঞান আল্লাহর থাকে আর তিনি তা না

দেন, তা হবে কার্পণ্যতা। আর যদি আল্লাহর সে জ্ঞান না থাকে, তাহলে আল্লাহর মূর্খতা ও অজ্ঞতা অবশ্যম্ভাবী হবে। অথচ উভয়টিই আল্লাহর বেলায় অসম্ভব এবং ভ্রান্ত)। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আল্লাহর উপর কোন জিনিস ওয়াজিব হওয়াকে স্বীকার করে না। এ ব্যাপারে মাতারিদিয়্যাহর পক্ষ থেকে আবশ্যকতার যে মতামত পাওয়া যায়, তার দ্বারা وُجُوب مِنَ اللّٰهِ (আল্লাহর পক্ষ থেকে আবশ্যকতা) উদ্দেশ্য, وُجُوب عَلَى اللّٰهِ (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নয়। যার দাবীদার মু'তাযিলারা।

মুতাযিলাদের বিরুদ্ধে ৫টি দলীল ঃ

তাদের প্রতিউত্তরে ব্যাখ্যাতা এখানে পাঁচটি প্রমাণ পেশ করেছেন। যথা–

(১) اَصْلَح لِلْعَبْدِ তথা বান্দার কল্যাণ করা যদি আল্লাহর উপর আবশ্যক হত, তাহলে ফকীর-দরিদ্র, যে দুনিয়াতে দরিদ্রতা ও দৈন্যতার সাজাপ্রাপ্ত (বা অভাব ক্লীষ্ট) এবং কাফির, যে পরকালে সাজাপ্রাপ্ত, তাকে তিনি সৃষ্টি করতেন না। কেননা তাদের দুজনের ব্যাপারেই নেতিবাচক দিক তথা তাদের দৈন্যতা ও কুফরী সৃষ্টি না করাই অধিক উপকারী ও কল্যাণকর। অথচ আল্লাহ (দুজন বা) দুটোই সৃষ্ট করেছেন। বুঝা গেল, اَصْلَح لِلْعَبْدِ আল্লাহর উপর ওয়াজিব নয়।

(২) তা যদি আল্লাহর উপর ওয়াজিব হত তাহলে বান্দাকে হেদায়াত দেওয়া, নানা রকমের উপকারীতা এবং কল্যাণকর জিনিস দেওয়ার কারণে তিনি কৃতজ্ঞতা এবং বান্দার উপর অনুগ্রহ জেতানোর হকদার হতেন না। কারণ, কর্তব্য পালনের কারণে কৃতজ্ঞতার যোগ্য এবং কারও উপর অনুগ্রহ জেতানোর হকদার হয় না। যেভাবে কারও গচ্ছিত আমানত মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া কিংবা কেউ আবশ্যক ঋণ পরিশোধ করার দ্বারা সে কৃতজ্ঞতা বা অনুগ্রহ জেতানোর হকদার হয় না। অথচ আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করতঃ বলেন– بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدَا كُمْ لِلْاِيْمَانِ অনুরূপভাবে আল্লাহর নেয়ামতের কারণে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ওয়াজিব। বুঝা গেল, اَصْلَحُ لِلْعَبْدِ আল্লাহর উপর ওয়াজিব নয়।

(৩) তা যদি ওয়াজিব হত তাহলে আবূ জাহলের বিপরীতে নবীজীর উপর আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ জেতাতেন না। কেননা দুজনের কারও ব্যাপারে একটি বিষয় অতীব উপকারী ও কল্যাণকর হবে। অথচ আল্লাহ তা করবেন না, এমনটি হতে পারে না। নতুবা আল্লাহ তা'আলা সারা জীবন দুজনের প্রত্যেককেই তার জন্য হিতকর ও কল্যাণকর জিনিস দান করেছেন বলে স্বীকার করতে হবে। এমতাবস্থায় দুজনই সমান হবে। কাজেই আবূ জাহেলের বিপরীতে নবীজীর উপর অনুগ্রহ জিতানো (প্রকাশ করা) উচিৎ নয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা নবীজীর উপর অধিক অনুগ্রহ জিতিয়েছেন। বুঝা গেল, اَصْلَحُ لِلْعَبْدِ আল্লাহর উপর ওয়াজিব নয়।

(৪) তা যদি আল্লাহর উপর ওয়াজিব হত তাহলে আল্লাহর নিকট পাপাচার থেকে হেফাযত করা, নেক কাজের তাওফীক দেওয়া, বিপদাপদ দূরীভূত করা এবং স্বচ্ছলতা দান করা বা রিযিক বাড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদির প্রার্থনা করা অনর্থক হত। কারণ, যখন তিনি একটি জিনিস কাউকে দিলেন না তখন প্রমাণ হল, ঐ জিনিসটি তার জন্য কল্যাণকর ছিল না। নতুবা অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা কর্তব্য পালন করতেন এবং সে জিনিস দান করতেন। কিন্তু যখন তা দিলেন না, বুঝা গেল, সে জিনিস তার জন্য কল্যাণকর ছিল না বরং ক্ষতিকর ছিল। যা পরিত্যাগ করা আল্লাহর উপর অনিবার্য ছিল। এমতাবস্থায় উক্ত জিনিসের প্রার্থনা করা অনর্থক। অথচ সকল পয়গাম্বর এবং অলি-আল্লাহ কর্তৃক উপরিউক্ত জিনিসের প্রার্থনার ব্যাপারে সকলেই একমত। বহু হাদীস শরীফেও উক্ত জিনিসের প্রার্থনার কথা বিদ্যমান। বুঝা গেল, আল্লাহর উপর اَصْلَحُ لِلْعَبْدِ ওয়াজিব নয়।

(৫) যদি তা-ই হত তাহলে আল্লাহর কুদরত, শক্তি-সামর্থ সসীম হওয়া অবশ্যম্ভাবী হত। কেননা তার কুদরতে এমন কোন জিনিস থাকা অসম্ভব, যা বান্দার জন্য কল্যাণকর হওয়ার পরও তিনি তাকে তা দেননি। নতুবা ওয়াজিব বর্জনকারী হওয়া অবশ্যম্ভাবী হবে। অথচ তা আপনাদের নিকটেও ভ্রান্ত। সুতরাং আল্লাহর শক্তি-সামর্থে কোনও اَصْلَحُ لِلْعَبْدِ তথা বান্দার জন্য কল্যাণকর জিনিন অবশিষ্ট না থাকলে আল্লাহর কুদরত সসীম হওয়া অবশ্যম্ভাবী। অথচ তা ভ্রান্ত। কাজেই আল্লাহর উপর اَصْلَحُ لِلْعَبْدِ অনিবার্য হওয়াও ভ্রান্ত।

وَلَعَمْرِىْ اَنَّ مَفَاسِدَ هٰذَا الْاَصْلِ اَعْنِىْ وُجُوْبَ الْاَصْلَحِ بَلْ اَكْثَرِ اُصُوْلِ الْمُعْتَزِلَةِ اَظْهَرُ مِنْ اَنْ يَّخْفٰى وَاَكْثَرُ مِنْ اَنْ يُّحْصٰى . وَذَالِكَ لِقُصُوْرِ نَظْرِهِمْ فِى الْمَعَارِفِ الْاِلٰهِيَّةِ وَرُسُوْخِ قِيَاسِ الْغَائِبِ عَلَى الشَّاهِدِ فِىْ طِبَاعِهِمْ . وَغَايَةُ تَشَبُّثِهِمْ فِىْ ذٰلِكَ اَنَّ تَرْكَ الْاَصْلَحِ يَكُوْنُ بُخْلًا وَ سَفَهًا . وَجَوَابُهٗ اَنَّ مَنْعَ مَا يَكُوْنُ حَقَّ الْمَانِعِ وَقَدْ ثَبَتَ بِالْاَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ كَرَمُهٗ وَحِكْمَتُهٗ وَعِلْمُهٗ بِالْعَوَاقِبِ يَكُوْنُ مَحْضَ عَدْلٍ وَحِكْمَةٍ . ثُمَّ لَيْتَ شِعْرِىْ مَا مَعْنٰى وُجُوْبِ الشَّيْئِ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اِذْ لَيْسَ مَعْنَاهُ اِسْتِحْقَاقَ تَارِكِهِ الذَّمَّ وَالْعِقَابَ . وَهُوَ ظَاهِرٌ . وَلَالُزُوْمَ صُدُوْرِهٖ عَنْهُ بِحَيْثُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ التَّرْكِ بِنَاءً عَلٰى اِسْتِلْزَامِهٖ مُحَالًا مِنْ سَفَهٍ اَوْجَهْلٍ اَوْعَبَثٍ اَوْ بُخْلٍ اَوْ نَحْوِ ذَالِكَ . لِاَنَّهٗ رَفْضٌ لِقَاعِدَةِ الْاِخْتِيَارِ وَمَيْلٌ اِلَى الْفَلْسَفَةِ الظَّاهِرَةِ الْعُوَارِ .

সহজ তরজমা

আমার জীবনের শপথ ! এ মূলনীতি তথা হিতকর জিনিসের অনিবার্যতা বরং মু'তাযিলার অধিকাংশ মূলনীতির ক্ষতি সুস্পষ্ট এবং সীমাহীন। আল্লাহর চিন-পরিয়ের ব্যাপারে এ তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা এবং সৃষ্ট জগতে আল্লাহর অদৃশ্য থাকার কারণে। এ ব্যাপারে সর্বশেষ বা চূড়ান্ত প্রমাণ হল, কল্যাণকর জিনিস পরিত্যাগ করা কার্পন্যতা ও অজ্ঞতা। এর জবাব হল, অকাট্য প্রমাণ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহশীল, প্রজ্ঞাময় হওয়া এবং পরিণতি সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তার যে জিনিস না দেওয়ার অধিকার রয়েছে, এমন জিনিস না দেওয়া একমাত্র ইনসাফ-ন্যায়ানুগতা এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ কাজ। তদুপরি আক্ষেপ! আমি যদি জানতে পারতাম, আল্লাহর উপর কোনও জিনিস অনিবার্য হওয়ার অর্থ কি ? কেননা এর অর্থ তো "তা বর্জনকারী নিন্দা ও শাস্তিযোগ্য হতে পারে না।" আর তা সুস্পষ্ট। তদ্রুপ আল্লাহ তা'আলা থেকে এমনভাবে আবশ্যকীয়রূপে সম্পাদিত হওয়াও হতে পারে না যে, কোন প্রতিবন্ধকতা যেমন- নির্বুদ্ধতা, অজ্ঞতা, নিরর্থক বা কার্পন্যতা প্রভৃতি অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণে তিনি তা বর্জন করতে সক্ষম নন। কেননা তা ইচ্ছা-স্বাধীনতার নীতিমালা লঙ্ঘন বা পরিহার করা এবং সে দর্শনের দিকে ঝুকে পড়ার নামান্তর। যার ত্রুটি সুস্পষ্ট।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : لَعَمْرِىْ ঃ এর লাম ও আইনে যবর এবং মীমে সাকিন দিয়ে পড়তে হবে। বস্তুতঃ আইনে যবর-পেশ যাই হোক অর্থ হবে, জীবন। অবশ্য শপথের স্থানে আইনে যবর দিয়ে ব্যবহারই প্রসিদ্ধ। এখানে لَعَمْرِىْ মুবতাদা। তার খবর উহ্য। পরোক্ষ বাক্য হবে لَعَمْرِىْ مُقْسَمٌ بِهٖ অর্থাৎ আমার জীবনের শপথ !

অলিক যুক্তির ফাঁদে মু'তাযিলা

ব্যাখ্যাতা বলেন- اَصْلَحُ لِلْعَبْدِ তথা বান্দার উপকারীতা আল্লাহর উপর অনিবার্য হওয়ার বিষয়ই নয় বরং মু'তাযিলার অধিকাংশ মূলনীতির ভ্রান্তি ও ক্ষতি অগণিত। তাদের এসব ভ্রান্তির কারণ হল, আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্য সত্তাকে দৃশ্যজগতে কল্পনা ও অনুমান করার ভূত তাদের মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হয়ে আছে। ফলে তারা যখন দেখল, দাস-দাসীর জন্য কল্যাণকর জিনিস মনিবের পক্ষ থেকে না দেওয়া যুক্তির নিরিখে নিন্দনীয় ও খারাপ, তখন বলল- আল্লাহর পক্ষ থেকেও বান্দার উপকারী জিনিস না দেওয়া খারাপ কথা। কাজেই اَصْلَحُ لِلْعَبْدِ আল্লাহর উপর ওয়াজিব এবং অনিবার্য। তাদের চূঁড়ান্ত প্রমাণ হল, অমুক জিনিস বান্দার জন্য কল্যাণকর জানা সত্ত্বেও তা না দেওয়া (اَصْلَحُ لِلْعَبْدِ পরিত্যাগ করা) কার্পন্যতা। আর না জানলে তা হবে মূর্খতা ও অজ্ঞতা। অথচ আল্লাহ তা'আলা কার্পন্যতা এবং মূর্খতা দুটো থেকেই পুতঃপবিত্র। কাজেই তিনি اَصْلَحُ لِلْعَبْدِ পরিত্যাগকারী হতে পারেন না বরং তার উপর তা দেওয়া অনিবার্য।

ব্যাখ্যা এর জবাবে বলেন- অকাট্য প্রমাণের আলোকে যখন আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহশীল, প্রজ্ঞাময় এবং

সকল কাজের পরিণতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া প্রমাণিত সত্য, তখন যে জিনিস বান্দার নয় বরং আল্লাহর অধিকার, তা বান্দাকে না দেওয়া একমাত্র ন্যায়ানুগতা, প্রজ্ঞা এবং হেকমতেরই প্রমাণ।

আল্লাহর কোন জিনিস ওয়াজিব হওয়ার কি অর্থ

قَوْلُهُ : ثُمَّ لَيْتَ شَعْرِىْ الخ এখানে شَعْر এর শীনে যবর দিয়ে। অর্থ ইল্ম-জ্ঞান। لَيْتَ এর খবর উহ্য। পরোক্ষ বাক্য হচ্ছে, لَيْتَ عِلْمِىْ حَاصِلٌ অর্থাৎ আক্ষেপ! আমিও যদি জানতে পারতাম– অবশেষ আল্লাহর উপর কোন জিনিস অনিবার্য হওয়ার অর্থ কি ? প্রশ্নটি অস্বীকার মূলক। অর্থাৎ আল্লাহর উপর কোনও জিনিস অনিবার্য হওয়ার কোন অর্থ নেই। কেননা এখানে وُجُوْب বা অনিবার্যতার অর্থ যে "তা পরিত্যাগকারী নিন্দাও শাস্তিযোগ্য হওয়া' হতে পারে না, তা সুস্পষ্ট। কারণ, এ অর্থ শরঈ অনিবার্যতার। আর শরঈ অনিবার্যতা (বাধ্য-বাধকতা) দায়িত্ব অর্পনের নামান্তর। অথচ আল্লাহ পাক কোন ব্যাপারে মুকাল্লাফ বা আদিষ্ট নন। আবার তার উপর অনিবার্যতার অর্থ "সে জিনিস আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন আবশ্যকীয়রূপে সম্পাদিত হওয়া" হতে পারে না যে, তিনি তা বর্জন করতে সক্ষমই নন। কেননা তখন আল্লাহ তা'আলা স্বাধীন কর্তা না হয়ে বাধ্য কর্তা তথা আদিষ্ট বা অস্বাধীন কর্তা হওয়া অবশ্যম্ভাবী হবে। তদ্রুপ এটি ইখতিয়ার বা স্বাধীনতার নীতি তথা হকপন্থীদের মতানুসারে আল্লাহ তা'আলার স্বাধীন কর্তা হওয়াকে পরিহার করা এবং সুস্পষ্ট ভ্রান্ত ও অলীক দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার নামান্তর। কারণ, আল্লাহ তা'আলা অনিবার্য কর্তা হওয়া দার্শনিকদের মাযহাব।

وَعَذَابُ الْقَبْرِ لِلْكَافِرِيْنَ وَلِبَعْضِ عُصَاةِ الْمُؤْمِنِيْنَ خَصَّ الْبَعْضَ لِاَنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَايُرِيْدُ اللّٰهُ تَعَالٰى تَعْذِيْبَهُ فَلَا يُعَذَّبُ وَتَنْعِيْمُ اَهْلِ الطَّاعَةِ فِى الْقَبْرِ بِمَا يَعْلَمُهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَيُرِيْدُهُ وَهٰذَا اَوْلٰى مِمَّا وَقَعَ فِىْ عَامَّةِ الْكُتُبِ مِنَ الْاِقْتِصَارِ عَلٰى اِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ دُوْنَ تَنْعِيْمِهِ بِنَاءً عَلٰى اَنَّ النُّصُوْصَ الْوَارِدَةَ فِيْهِ اَكْثَرُ. وَعَلٰى اَنَّ عَامَّةَ اَهْلِ الْقُبُوْرِ كُفَّارٌ وَعُصَاةٌ. فَالتَّعْذِيْبُ بِالذِّكْرِ اَجْدَرُ وَ سُوَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ وَهُمَا مَلَكَانِ يَدْخُلَانِ الْقَبْرَ فَيَسْأَلَانِ الْعَبْدَ عَنْ رَبِّهِ وَعَنْ دِيْنِهِ وَعَنْ نَبِيِّهِ. قَالَ السَّيِّدُ اَبُو الشُّجَاعِ اِنَّ لِلصِّبْيَانِ سُوَالًا وَكَذَا لِلْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَعْضِ ثَابِتٌ كُلٌّ مِنْ هٰذِهِ الْاُمُوْرِ بِالدَّلَائِلِ السَّمْعِيَّةِ. لِاَنَّهَا اُمُوْرٌ مُمْكِنَةٌ اَخْبَرَ بِهَا الصَّادِقُ عَلٰى مَا نَطَقَتْ بِهِ النُّصُوْصُ. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اُدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ. وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ. نَزَلَتْ فِىْ عَذَابِ الْقَبْرِ اِذَا قِيْلَ لَهُ مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِيْنُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ. فَيَقُوْلُ رَبِّىَ اللّٰهُ وَدِيْنِىَ الْاِسْلَامُ وَنَبِيِّىْ مُحَمَّدٌ ﷺ. وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا اُقْبِرَ الْمَيِّتُ اَتَاهُ مَلَكَانِ اَسْوَدَانِ اَزْرَقَانِ يُقَالُ لِاَحَدِهِمَا اَلْمُنْكَرُ وَلِلْاٰخَرِ اَلنَّكِيْرُ اِلٰى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ. وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النِّيْرَانِ وَبِالْجُمْلَةِ الْاَحَادِيْثُ فِىْ هٰذَا الْمَعْنٰى وَفِىْ كَثِيْرٍ مِنْ اَحْوَالِ الْاٰخِرَةِ مُتَوَاتِرَةُ الْمَعْنٰى وَاِنْ لَمْ يَبْلُغْ اٰحَادُهَا حَدَّ التَّوَاتُرِ.

সহজ তরজমা

কাফির এবং কতিপয় পাপিষ্ঠ মুমিন বান্দার কবরে শাস্তি হওয়া (সত্য)। (আযাবে কবরকে) কতিপয় (পাপিষ্ঠ মুমিন বান্দার সাথে বিশেষিত করার কারণ হল, কতিপয় মুমিন বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা (কবরে) আযাব দিতে চাইবেন না। বিধায় তাদের (কবরে) আযাব হবে না। আর করবে নেককার-পূণ্যবান বান্দাকে ঐ নেয়ামত দান করা, যার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অবগত এবং তিনি যা দিতে চাইবেন (তা সত্য)। আর তা (নেককার বান্দাদের নেয়ামত দানের আলোচনা) অপেক্ষাকৃতভাবে (ইলমে কালামের) সাধারণ বই-পুস্তকে গ্রন্থিত প্রতিপাদ্য থেকে অর্থাৎ শুধুমাত্র আযাবে কবরের বিবরণের উপর নিবৃত থাকা থেকে উত্তম। কেননা এ সংক্রান্ত নছ প্রচুর। বেশির ভাগ কবরবাসী কাফির এবং নাফরমান-অবাধ্য। কাজেই শাস্তিদানের আলোচনাই অধিক উল্লেখযোগ্য। এবং মুনকার নাকীবের জিজ্ঞাসাবাদ। তারা হলেন দুজন ফিরিশতা, যারা কবরে এসে বান্দাকে তার প্রতিপালক, দ্বীন-ধর্ম এবং নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সাইয়িদ আবুশ্ শুজা বলেন– শিশুদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তদ্রুপ কারও কারও মতে পয়গাম্বরদেরও। (এসব) শ্রুত প্রমাণাদির আলোকে প্রমাণিত। কেননা সবই বাস্তবিক পক্ষে সম্ভব। সৎ সাংবাদিক এ সংবাদ দিয়েছেন। যেমন, প্রচুর নছ (নীরব) সাক্ষ্য দেয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন– তাদেরকে (ফিরাউন সম্প্রদায়কে) সকাল-সন্ধ্যা আগুনের সামনে পেশ করা হয়। আর কিয়ামত দিবসে (ফিরিস্তাদেরকে হুকুম করা হবে,) ফেরাউন সম্প্রদায়কে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ কর। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন– তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে। অতঃপর তৎক্ষণাত আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, পেশাব (প্রস্রাবের ফোঁটা) থেকে বেঁচে থাক! কেননা বেশির ভাগ কবরের আযাব এ কারণেই হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দাদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত কথায় সুদৃঢ় রাখবেন। এ আয়াতে কারীমা আযাবে কবরের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে– যখন বান্দাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমার প্রতিপালক কে ? তোমার দ্বীন-ধর্ম কি ? তোমার নবী কে ? তখন সে বলবে– আল্লাহ আমার প্রতিপালক, ইসলাম আমার ধর্ম, মুহাম্মদ ﷺ আমার নবী। নবীজি ইরশাদ করেছেন– মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর তার নিকট দুজন ফিরিশতা আসেন। যাদের নয়ন কালো ও পীত বর্ণের। তাদের একজনকে মনুকার; অপরজনকে নাকীর বলা হয়। (হাদীসের শেষ পর্যন্ত) নবীজী আরও বলেন– কবর জান্নাতের বাগিচাসমূহের একটি অথবা জাহান্নামের কূপ বা গর্তসমূহের একটি।

মোটকথা, এ ব্যাপারে এবং পরকালের বহু অবস্থা সম্পর্কে হাদীসসমূহ অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির। যদিও তা এককভাবে মুতাত্তায়াতিরের পর্যায়ে পৌছেনি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

বরযখ পরকালের একাংশ

পরকালীন জগতের দুটি অংশ। এক. প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত আসা পর্যন্ত। শরী'আতের পরিভাষায় একে আলমে বরযখ বলে। দুই. কিয়ামতের পর থেকে অনন্তকাল। যাকে আলমে হাশর বলে।

'কবর' বস্তুতঃ একটি গর্ত বা কূপের নাম নয়, যাতে মানুষের মৃতদেহ রাখা হয় বরং ঐ আলমে বরযখের নাম, যা মানুষের মৃত্যুর পর থেকে কিয়াম্‌ত আসা পর্যন্ত সময়ের সমষ্টি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ

"আর তাদের সামনে রয়েছে বরযখ জগত, যাতে তারা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।"

এ বরযখ জগতেই মুনকার-নকীর খ্যাত দুই ফিরিস্তা এসে একাত্ববাদ ও রিসালাত সম্পর্কে মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আর পরিপূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে কিয়ামত এবং হিসাব নিকাশের পর। অবশ্য প্রতিদান ও সাজার ক্রমধারা এখান থেকেই কিছুটা আরম্ভ হয়ে যায়। এ হিসেবেই হাদীসের পাকে ইরশাদ হয়েছে,

مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهٗ

অর্থ্যাৎ যে ব্যক্তি মরে গেল, তার কিয়ামত কায়েম হয়ে গেল। কাজেই কাফির সম্প্রদায় এবং পাপিষ্ট কিছু মুসলমানেরও এ বরযখ জগতেই আযাব হয়। যার নাম আযাবে কবর। পক্ষান্তরে নেককার বান্দারা কিছু আরাম-আয়েসের ব্যবস্থা পায়।

কবরের আযাবও নেয়ামতরাজি সত্য

এ কবরের আযাব ও নেয়ামত এবং মুনকার-নকীরের জিজ্ঞাসাবাদ সত্য। বহু শ্রুত নস তথা আয়াতে কারীমা ও হাদীস শরীফের আকাট্য প্রমাণাদি আলোকে সাব্যস্ত। এর উপর ঈমান আনা, বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয। কেননা

এসব বিষয়ই সত্ত্বাগতভাবে সম্ভব। সত্যবাদি সংবাদদাতা এসবের সংবাদ দিয়েছেন। আর এমন সংবাদদাতা যে সম্ভাব্য বিষয়ের সংবাদ দেন, তা সঠিক ও নিখুঁত। কোন প্রকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও ইতঃস্ততা ছাড়াই তা স্বীকার করা এবং তার উপর ঈমান আনা ফরয। কবর বা বরযখের আযাবের ব্যাপারে কুরআনের প্রমাণাদির মধ্যে একটি হল, ফিরাউন সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতে কারীমা। যথা–

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ

প্রমাণ বিশ্লেষণঃ এখানে يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ এর আতফ হয়েছে غُدُوًّا وَعَشِيًّا এর ওপর। আর আতফ মা'তূফ আলাই এবং মা'তূফের মধ্যে ভিন্নতা দাবী করে। কাজেই غُدُوًّ ও عَشِيًّ দ্বারা কিয়ামত দিবসের পূর্বের সকাল-সন্ধ্যা উদ্দেশ্য। আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে, কিয়ামতের পূর্বে তথা রবযখ জগতে সকাল-সন্ধ্যা ফেরাউন ও তার দলবলকে সাজা দেওয়া হচ্ছে। আর কিয়ামত দিবসে (ফিরিস্তাদের বলা হবে) ফেরাউন গোষ্ঠীকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো। অনুরূপভাবে আল্লাহপাক অন্যত্র ইরশাদ করেছেন– أُغْرِقُوْا فَادْخِلُوْا نَارًا এ আয়াতে কারীমা দ্বারা প্রমাণ দানের কারণ হল, আরবী ভাষায় "ফা" অব্যয়টি تَعْقِيْب بِلَا مُهْلَت বা নিরবিচ্ছিন্ন পরবর্তী সময় বুঝানোর জন্য আসে। অর্থাৎ "ফা" মা'তূফ আলাইহির পরক্ষণেই মা'তূফের অস্তিত্ব লাভের কথা নির্দেশ করে। কাজেই এখন মর্মার্থ দাঁড়াবে, তাদেরকে (নূহ-সম্প্রদায়কে) পানিতে নিমজ্জিত করার পর তৎক্ষণাত আযাবে নিক্ষেপ করা হয়েছে। আর সুস্পষ্টতই ডুবিয়ে দেওয়ার পর তারা এখনও বরযখ জগতেই রয়েছে। এতে বুঝা গেল, বরযখ জগতে শাস্তি হয়।

অনুরূপভাবে নবীজীর শাশ্বত বাণী اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ ... الخ এর মধ্যে আযাবে কবরের কথা পরিস্কার উল্লেখ রয়েছে। অদ্রূপ اَلْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ (কবর জান্নাতের বাগিচাসমূহের একটি বাগিচা অথবা জাহান্নামের খাদসমূহের একটি খাদ।) হাদীস শরীফেও আযাবে কবর এবং নাঈমে কবর (কবরের শাস্তি ও নেয়ামত) উভয় সংবাদ বিদ্যমান। কেননা হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে, কবর কারও জন্য জান্নাতের বাগান। তথায় সে জান্নাতের নেয়ামত পায়। আবার কারও জন্য জাহান্নামের খাদ বা গর্ত। তথায় রয়েছে তার শাস্তির উপকরণ। অনুরূপভাবে শহীদদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, بَلْ اَحْيَاءٌ يُرْزَقُوْنَ (বরং তারা জীবিত)। এটি নাঈমে কবর তথা কবরে নেয়ামতপ্রাপ্তীর প্রমাণ।

মুনকার-নকীরের জিজ্ঞাসাবাদ সত্য

আর একাধিক হাদীসে পাকে মুনকার-নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। মুনকার-নকীরের জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে একটি সংশয় বা আপত্তি জাগে অর্থাৎ দুজন ফিরিস্তা একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে সকল মৃত ব্যক্তিকে কিভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন ? এ আপত্তির জবাব হল, হয়তবা উক্ত ফিরিশ্‌তা মহোদ্বয় একই সময়ে এক দিকের সকল মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং সেদিকে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিই নিজেকে সম্বোধিত ব্যক্তি ভেবে জবাব দেবে। অতঃপর ঐ ফিরিস্তা স্বীয় আল্লাহ প্রদত্ত পার্থক্য শক্তির মাধ্যমে প্রত্যেক মুর্দারের জবাব পৃথকভাবে জেনে নিবেন।

قَوْلُهُ: وَعَذَابُ الْقَبْرِ ঃ অর্থাৎ ঐ আযাব, যা মৃত্যুর পর হাশরের পূর্বে হবে। লাশ কবরে দাফন করা হোক চাই না হোক। তবে আসমানী ধর্মে বিশ্বাসী সকলেই লাশ সাধারণতঃ কবরেই সমাহিত করে বলে আযাবের সম্বন্ধ করা হয়েছে কবরের সাথে।

قَوْلُهُ: وَهٰذَا اَوْلٰى ... الخ ঃ অর্থাৎ শুধুমাত্র কবরের আযাবের কথা আলোচনার উপর ক্ষ্যান্ত না হয়ে মূল লেখকের তদসঙ্গে নেয়ামতে কবর ও আনন্দ-হাসি উভয়টির কথা উল্লেখ করাই উত্তম। কেননা শরী'আতের নীতি হল, উৎসাহ দান এবং ভীতিপ্রদর্শন উভয়টি একই সাথে করা। তাছাড়া কবরের নেয়ামত ও আনন্দ নবীগণ এবং নেককার বান্দাদের জন্য। কাজেই তা পরিত্যাগ করা অনুচিৎ।

قَوْلُهُ: وَهُمَا مَلَكَانِ ...الخ ঃ কেউ কেউ বলেন, সুনির্দিষ্টভাবে দুজন ফিরিশ্‌তাই জিজ্ঞাসাবাদের কাজে নিয়োজিত। কেউ কেউ বলেন, জিজ্ঞাসাবাদকারী ফিরিশ্‌তা অনেক। তন্মধ্যে কারও নাম মুনকার আর কারও নাম নকীর। প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির নিকটেই তাদের থেকে দুজন ফিরিশ্‌তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঠানো হয়। যেরূপভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির আমালনামা লেখার কাজে দু'জন ফিরিশ্‌তা নিয়োজিত।

قَوْلُهُ : قَالَ السَّيِّدُ اَبُوالشُّجَاعِ ...الخ ঃ বিশুদ্ধ কথা হল, ঈমানদারদের নাবালক সন্তানদের কবরের আযাব নেই; মুনকার-নকীরের জিজ্ঞাসাবাদও নেই। অনুরূপভাবে বিশুদ্ধ কথা মতে নবীগণকে মুনকার-নকীর প্রশ্ন করবে না। কেননা হাদীসের আলোকে বুঝা যায়, উম্মতের মধ্য হতে কতিপয় নেককারকে মুনকার-নকীরের প্রশ্ন হবে না। সুতরাং আরও উত্তমরূপে এ প্রশ্ন নবীগণকে করা হবে।

قَوْلُهُ: اُنْزِلَتْ فِى عَذَابِ الْقَبْرِ ... الخ ঃ আযাবে কবর দ্বারা খাছ বলে আম বা ব্যাপকতার ইচ্ছা হিসেবে কবরের অবস্থা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ: يُقَالُ لِاَحَدِهِمَا اَلْمُنْكَرُ ...الخ ঃ এখানে مُنْكَر এর ك বর্ণে যবর দিয়ে ইসমে মাফউলের সীগা। انكره থেকে গৃহীত। অর্থ, না চেনা। مُنْكَرا অর্থ অচেনা। আর نَكِير শব্দটি فَعِيل ওযনে ইসমে মাফউলেরই অর্থে ব্যবহৃত। অতএব উভয় শব্দের অর্থ, হবে– অচেনা, অপরিচিত। কেননা তাদের জন্ম-সৃষ্টি মানুষ ও প্রাণীজগতের কারও সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। এ কারণে তাদেরকে চেনা যায় না।

وَاَنْكَرَ عَذَابَ الْقَبْرِ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّوَافِضِ. لِاَنَّ الْمَيِّتَ جَمَادٌ لَاحَيٰوةَ لَهُ ـ وَلَااِدْرَاكَ فَتَعْذِيْبُهُ مُحَالٌ ـ وَالْجَوَابُ اَنَّهُ يَجُوْزُ اَنْ يَخْلُقَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ جَمِيْعِ الْاَجْزَاءِ اَوْفِى بَعْضِهَا نَوْعًا مِنَ الْحَيٰوةِ قَدْرَمَا يُدْرِكُ اَلَمَ الْعَذَابِ اَوْ لَذَّةَ التَّنْعِيْمِ وَهٰذَا لَايَسْتَلْزِمُ اِعَادَةَ الرُّوْحِ اِلٰى بَدَنِهِ وَلَا اَنْ يَتَحَرَّكَ وَيَضْطَرِبَ اَوْ يُرٰى اَثَرُ الْعَذَابِ عَلَيْهِ حَتّٰى اَنَّ الْغَرِيْقَ فِى الْمَاءِ وَالْمَاكُوْلَ فِىْ بُطُوْنِ الْحَيَوَانَاتِ وَالْمَصْلُوْبَ فِى الْهَوَاءِ يُعَذَّبُ وَاِنْ لَمْ نَطَّلِعْ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَمَّلَ فِىْ عَجَائِبِ مُلْكِهِ وَمَلَكُوْتِهِ وَغَرَائِبِ قُدْرَتِهِ وَجَبَرُوْتِهِ لَمْ يَسْتَبْعِدْ اَمْثَالَ ذٰلِكَ فَضْلًا عَنِ الْاِسْتِحَالَةِ

সহজ তরজমা

কতিপয় মু'তাযিলা এবং রাফেযী আযাবে কবর অস্বীকার করেছে। কেননা মূর্দা বা মৃত ব্যক্তি প্রাণহীন এবং অনুভূতি শক্তিহীন একটি দেহ (লাশ)। তার মধ্যে প্রাণও নেই; কোনও প্রকার অনুভূতি জ্ঞানও নেই। কাজেই তাকে আযাব বা শাস্তি দেওয়া অসম্ভব। (এর) জবাব হল, হয়তবা আল্লাহ তা'আলা সকল অঙ্গে কিংবা কোনও কোনও অঙ্গে এক বিশেষ ধরনের প্রাণ সঞ্চার করবেন (জীবন দান করবেন)। ফলে সে (মুর্দা) আযাবের যন্ত্রণাদাহ কিংবা নেয়ামতের স্বাদ উপলব্ধি (আনন্দ উপভোগ) করতে পারবে। এতে জড় দেহে প্রাণ পুনঃসঞ্চার (পুনর্জীবন দান) আবশ্যম্ভাবী হয় না। আবার তার নাড়াচড়া করা, ছটফট করা কিংবা তার উপর আযাবের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাওয়াকেও আবশ্যক করে না। এমনকি পানিতে নিমজ্জিত, জীব-জন্তুর পেটে হজম হওয়া ব্যক্তি এবং শূন্যে শূলিতে ঝুলন্ত ব্যক্তিরও আযাব হয়। যদিও আমরা সে সম্পর্কে অবগত নই। যে ব্যক্তি আল্লাহর তা'আলার রাজত্ব, তাঁর সাম্রাজের বিস্ময়কর সৃষ্টি এবং তার অনুপম কুদরত ও মাহাত্ম নিয়ে গবেষণা করবে, সে এসব বিষয়কে অসম্ভব ভাবা তো দূরের কথা, অযৌক্তিকও মনে করবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মু'তাযিলা ও রাফেযীদের আপত্তি

কতিপয় মুতাযিলা ও রাফেযী কবরের আযাব ও নেয়ামতকে অস্বীকার করে। কেননা তাদের মতে মৃত লাশ একটি নিষ্প্রাণ অনুভূতিহীন জড়দেহ মাত্র। তার ভেতরে আত্মা বা প্রাণও নেই; অনুভূতি জ্ঞানও নেই। কেননা জ্ঞান ও অনুভূতি শক্তি প্রাণীর বৈশিষ্ট্য। সুতরাং তাদের যন্ত্রনা-দাহ, ব্যথা-বেদনা কিংবা স্বাদ-আহলাদ ও আরাম-আয়েস কিছুই অনুভূত হয় না। কাজেই তাদেরকে শাস্তি এবং নেয়ামত দান অসম্ভব। এ প্রশ্নের একাধিক জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রথম জবাব ঃ শাস্তি কিংবা নেয়ামত প্রদান উভয়ই সম্ভাব্য বিষয়। সত্যবাদী বার্তাবাহক এ ব্যাপারে একাধিক হাদীসে অবহিত করেছেন। আর সত্যবাদী বার্তাবাহক যে সম্ভাব্য ব্যাপারে অবহিত করেন, তা বিশুদ্ধ। কোন প্রকার

ব্যাখ্যার আশ্রয় ছাড়া তাতে ঈমান আনা ফরয। তবে যদি মুখ্বিরে সাদিক (সত্যবাদী বার্তবাহক) এমন কোন বিষয়ের সংবাদ দেন, যা অসম্ভব, তাহলে বিষয়টির অসম্ভাব্যতাই প্রমাণ করে যে, প্রকাশ্য মর্ম উদ্দেশ্য নয়। এমতাবস্থায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবকাশ থাকবে। তাছাড়া বড়জোর এতটুকু বলা যাবে যে, কবরের আযাব অলৌকিক বিষয়। কিন্তু অলৌকিক বিষয়ও সম্ভাব্য। তা অস্বীকার করা যায় না।

নিষ্প্রাণ জড়দেহ কি আনন্দ-বেদনা অনুভব করে ?

অবশ্য অস্বীকারকারীরা বলে, মৃত লাশ নিষ্প্রাণ জড়দেহ। তার মধ্যে আযাবের ব্যথা-বেদনা কিংবা নেয়ামতের স্বাদ অনুভব করার শক্তি নেই। এর জবাবে বলা হবে, আল্লাহ তা'আলা সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনি হয়তবা মৃতের সকল অঙ্গে কিংবা কোন কোন অঙ্গে এক বিশেষ ধরনের এতটুকু প্রাণ সঞ্চার করে দিবেন, যাতে সে আযাবের যন্ত্রণাদাহ কিংবা নেয়ামতের স্বাদ অনুভব করতে পারে। যেমন, শহীদদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, بَلْ اَحْيَاءٌ (বরং তারা জীবীত)। এ আয়াতে কারীমায় ঐ বিশেষ ধরনের জীবনই উদ্দেশ্য। আর এ বিশেষ জীবন দানের জন্য দেহে আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক নয় যে, তাকে হাশরের পূর্বে আরেকটি মৃত্যুর মুখোমুখী হতে হবে। যারপর হাশর কায়েম হবে। কেননা আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া পূর্ণাঙ্গ জীবনের জন্য জরুরী। বিশেষ জীবনের জন্য নয় বরং তার রূপরেখা এমনও হতে পারে যে, আত্মা দেহ থেকে দূরে আরেক জগতে থেকেও দেহের সাথে তার সম্পর্ক থাকবে। ফলে বান্দার শরীরে বিশেষ এক জীবন এতটুকু পরিমাণ বর্তমান থাকবে, যার দ্বারা সে স্বাদ ও যন্ত্রণা অনুভব করতে পারবে।

পানিতে শূলিতে প্রাণীর পেটে আযাব হয় কিভাবে ?

অবশ্য এখানে অস্বীকারকারীদের একটি সংশয় আছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি পানিতে ডুবে মরে গেল এবং পানিতেই রয়ে গেল, তাকে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেওয়া অসম্ভব। কেননা আগুন পানিতে নিভে যাবে। 'অনুরূপভাবে যাকে কোন হিংস্র প্রাণী খেয়ে ফেলল, তাকেও আগুনে শাস্তি দেওয়া অসম্ভব। অন্যথায় হিংস্র প্রাণীর পেট পুড়ে যেত। তদ্রুপভাবে যাকে শূন্যে শূলিতে চড়ানো হয়েছে, তার যদি শাস্তি হত তাহলে সে নড়াচড়া করত, ছটফট করত এবং আযাবের কোন প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে প্রকাশ পেত। অথচ তার মধ্যে এসব কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। এর জবাব হচ্ছে, কোন কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর না হওয়া, তা অবাস্তব হওয়াকে প্রমাণ করে না। যেমন, জ্বীনে ধরা ব্যক্তি জ্বীন দেখে। অথচ আমরা দেখি না। নবী কারীম ﷺ জিবরাইল আমীনকে দেখতেন। কিন্তু উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম দেখতেন না। ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নযোগে বিভিন্ন জিনিস দেখে। ওসব দেখে সে হাসে, কাঁদে, চিৎকার করে, পলায়ণ করে। অথচ তার পাশের লোক এসবের কিছুই জানে না। অনুরূপভাবে মৃতের আযাব হওয়ার জন্য তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হওয়া জরুরী নয়। কেননা এ আযাবের সম্পর্ক অদৃশ্য জগতের সাথে। তা উপলব্ধি করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি এবং এ পার্থিব জগতের ইন্দ্রিয়শক্তি যথেষ্ট অযোগ্য। তা জানার একমাত্র অবলম্বন আল্লাহপাকের অহী। আল্লাহর অপার অনুপম কুদরতের উপর যার পূর্ণ বিশ্বাস থাকবে, সে কখনও এগুলোকে অযৌক্তিক ভাববে না; অসম্ভব মনে করা তো আরও দূরের ব্যাপার।

وَاعْلَمْ اَنَّهُ لَمَّا كَانَ اَحْوَالُ الْقَبْرِ مِمَّا هُوَ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ اُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ . ثُمَّ اِشْتَغَلَ بِبَيَانِ حَقِّيَّةِ الْحَشْرِ وَتَفَاصِيْلِ مَا يَتَعَلَّقُ بِاُمُوْرِ الْاٰخِرَةِ . وَدَلِيْلُ الْكُلِّ اَنَّهَا اُمُوْرٌ مُمْكِنَةٌ اَخْبَرَ بِهَا الصَّادِقُ وَنَطَقَ بِهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فَتَكُوْنُ ثَابِتَةً وَصَرَّحَ بِحَقِّيَّةِ كُلٍّ مِنْهَا تَحْقِيْقًا وَتَاكِيْدًا وَاعْتِنَاءً بِشَانِهِ فَقَالَ وَالْبَعْثُ وَهُوَ اَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ تَعَالٰى الْمَوْتٰى مِنَ الْقُبُوْرِ بِاَنْ يَجْمَعَ اَجْزَاءَهُمُ الْاَصْلِيَّةَ وَيُعِيْدَ الْاَرْوَاحَ اِلَيْهَا حَقٌّ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُوْنَ . وَقَوْلِهِ تَعَالٰى قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ اِلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ النُّصُوْصِ الْقَاطِعَةِ النَّاطِقَةِ بِحَشْرِ الْاَجْسَادِ .

সহজ তরজমা

আখেরাতের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদির বিবরণ

জেনে রেখ, কবরের অবস্থা দুনিয়া ও পরকালের মধ্যবর্তী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বিধায় একে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর হাশরের সত্যতা এবং সে সব বিষয়ের বিশাদ বিবরণ দানে নিমগ্ন হয়েছেন, যেগুলো

পরকালের সাথে সম্পৃক্ত। আর সব কটির প্রমাণ হল, এসব বিষয় এমন সম্ভাবনাময়, যে সম্পর্কে সত্যবাদী বার্তাবাহক অবহিত করেছেন এবং যেগুলো কুরআন-হাদীস বর্ণনা করেছে। কাজেই এসব বিষয় সত্য প্রমাণিত।

নিশ্চয়তা, তাকিদ গুরুত্ববহ করার মানসে প্রতিটি বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন। কাজেই তিনি (মূলগ্রন্থকার) বলেছেন এবং পুনরোত্থান অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মৃতদেরকে তাদের মৌলিক অঙ্গগুলো জড়ো করে এবং তাতে তাদের আত্মাগুলো ফিরিয়ে দিয়ে কবর থেকে পুনরোত্থিত করা সত্য ও প্রমাণিত। আল্লাহ পাকের ইরশাদ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (অতঃপর নিশ্চয় তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে পুনরোত্থিত করা হবে) এবং قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ (বলুন! একে তিনি পুনঃসৃষ্টি করবেন, যিনি প্রথমবার তাকে সৃষ্টি করেছিলেন) প্রভৃতি এমন অকাট্য প্রমাণাদির কারণে, যেগুলো দেহকে জমায়েত করার সাক্ষ্য দেয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হিসাব নিকাশ ও জান্নাত-জাহান্নাম

একজন সত্য-নিষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রপ্রধানের ন্যায়-নিষ্ঠার দাবী হল, তিনি স্বীয় প্রজাদের জন্য একটি নীতি নির্ধারণ বা আইন প্রনয়ণ করে তাদেরকে সে মুতাবিক চলতে বাধ্য করবেন। যাতে কেউ অন্য কারও হক নষ্ট না করে। কেউ কারও উপর অনধিকার চর্চা, অবিচার এবং বাড়াবাড়ি করতে না পারে। উপরন্তু জালেম-মাজলুমের মামলার শুনানির জন্য একটি দিন ধার্য হয় এবং ঐ নির্দিষ্ট দিন বাদী-বিবাদী এবং তাদের স্বাক্ষীগণের বক্তব্য শুনে সঠিক রায় হয়। আর অপরাধিকে পুলিশ হেফাযতে হাতকড়া ও বেড়ি পরিয়ে কারাগারে বন্দি করা হয়। যেখানে থাকে তার অপরাধের শাস্তির যাবতীয় ব্যবস্থা।

অনুরূপভাবে প্রকৃত সম্রাট ইনসাফ ও ন্যায়-নিষ্ঠার উৎস মূল আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় বান্দাদের জন্য একাধিক আইনগ্রন্থ প্রেরণ করেছেন। যাতে করে মানুষ সত্য-মিথ্যা, সঠিকপথ ও ভ্রষ্টতা, হেদায়াত ও গোমরাহীর মাঝে পার্থক্য বিধান করতে পারে এবং আল্লাহর বাণী ও নির্দেশ মনে প্রাণে পালন করে। তার নিষেধ ও অপছন্দীয় কাজ থেকে বেঁচে থাকে। আল্লাহর দরবার থেকে আদিষ্ট প্রতিনিধি নবী-রাসূলগণ আল্লাহর আইন এবং অপরাধ ও তার ধারা সম্পর্কে বান্দাকে অবহিত করছেন। তৎসঙ্গে আরও ঘোষণা করেছেন, মৃত্যুর পর আহকামুল হাকিমীন তোমাদের প্রতিদান ও শাস্তিদানের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। যে দিন এসে গেলে তিনি তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করে কবর থেকে পুনরোত্থিত করবেন। তারপর তোমাদের ভাল-মন্দ যাবতীয় আমলের হিসাব-নিকাশ করে উপযুক্ত ফয়সালা হবে। সুতরাং শরী'আতের ভাষায় হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান ও শাস্তিদানের উদ্দেশ্য মৃতদেরকে পুনর্জীবিত করার নাম بَعْث বা পুনরোত্থান। যার রূপরেখা হবে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক দেহের মৌলিক অঙ্গগুলো জড়ো করবেন। সে দেহে দুনিয়ায় যে রূহ বা আত্মা ছিল, তাতে ঐ আত্মা ফিরিয়ে দিবেন। পুনরোত্থানের এ ধরন যদিও সম্ভাব্য, তথাপি বস্তুতঃ পুনরোত্থান এমন অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত, যাতে কোন প্রকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কোন অবকাশ নেই।

সে মতে আকীদায়ে বা'আছ তথা পুররোত্থানের আকীদার উপর ঈমান আনা, বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয; তা অস্বীকার করা কুফরী। আল্লাহ তা'আলার বাণী– ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (অতঃপর তোমরা কিয়ামত দিবসে পুনরোত্থিত হবে।) অনুরূপভাবে আছ ইবনে ওয়ায়েল নিজ হাতে কুড়িয়ে পুরনো হাড্ডি নিয়ে এসে যখন বলল– مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (এ পুরনো হাড়কে কে জীবিত করবে ?) তখন তার উত্তরে নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হল, قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ (হে নবী ! আপনি বলে দিন, এ পুরনো হাড়কে ঐ সত্ত্বাই জীবিত করবেন, যিনি একে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন)। তদ্রুপ অসংখ্য আয়াতে কারীমা রয়েছে, যেগুলো মৃত্যুর পর পুনররোত্থানের সাক্ষ্য দেয়।

وَانْكَرَهُ الْفَلَاسِفَةُ بِنَاءً عَلٰى اِمْتِنَاعِ اِعَادَةِ الْمَعْدُوْمِ بِعَيْنِهٖ وَهُوَ مَعَ اَنَّهٗ لَادَلِيْلَ لَهُمْ عَلَيْهِ يُعْتَدُّبِهٖ غَيْرُ مُضِرٍّ بِالْمَقْصُوْدِ . لِاَنَّ مُرَادَنَا اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَجْمَعُ الْاَجْزَاءَ الْاَصْلِيَّةَ لِلْاِنْسَانِ وَيُعِيْدُ رُوْحَهٗ اِلَيْهِ . سَوَاءٌ سُمِّىَ ذَالِكَ اِعَادَةَ الْمَعْدُوْمِ بِعَيْنِهٖ اَوْ لَمْ يُسَمَّ . وَبِهٰذَا يَسْقُطُ مَا قَالُوْا اِنَّهٗ لَوْاَكَلَ اِنْسَانٌ اِنْسَانًا بِحَيْثُ صَارَ جُزْءًامِنْهُ . فَتِلْكَ الْاَجْزَاءُ اِمَّا اَنْ تُعَادَ فِيْهِمَا . وَهُوَ مُحَالٌ . اَوْفِىْ اَحَدِهِمَا فَلَا يَكُوْنُ الْاٰخَرُ مُعَادًا بِجَمِيْعِ اَجْزَائِهٖ وَذَالِكَ لِاَنَّ الْمُعَادَ اِنَّمَا هُوَ الْاَجْزَاءُ الْاَصْلِيَّةُ الْبَاقِيَةُ مِنْ اَوَّلِ الْعُمُرِ اِلٰى اٰخِرِهٖ وَالْاَجْزَاءُ الْمَاكُوْلَةُ فُضْلَةٌ فِى الْاٰكِلِ لَا اَصْلِيَّةٌ . فَاِنْ قِيْلَ هٰذَا قَوْلٌ بِالتَّنَاسُخِ . لِاَنَّ الْبَدَنَ الثَّانِىَ لَيْسَ هُوَ الْاَوَّلُ . لِمَا وَرَدَ فِى الْحَدِيْثِ مِنْ اَنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ . وَاَنَّ الْجَهَنَّمِىَّ ضِرْسُهٗ مِثْلُ اُحُدٍ . وَمِنْ هٰهُنَا قَالَ مَنْ قَالَ مَامِنْ مَذْهَبٍ اِلَّا وَلِلتَّنَاسُخِ فِيْهِ قَدَمٌ رَاسِخٌ . قُلْنَا اِنَّمَا يَلْزَمُ التَّنَاسُخُ لَوْلَمْ يَكُنِ الْبَدَنُ الثَّانِىْ مَخْلُوْقًا مِنَ الْاَجْزَاءِ الْاَصْلِيَّةِ لِلْبَدَنِ الْاَوَّلِ . وَاِنْ سُمِّىَ مِثْلُ ذَالِكَ تَنَاسُخًا كَانَ نِزَاعًا فِىْ مُجَرَّدِ الْاِسْمِ وَلَا دَلِيْلَ عَلٰى اِسْتِحَالَةِ اِعَادَةِ الرُّوْحِ اِلٰى مِثْلِ هٰذَا الْبَدَنِ . بَلِ الْاَدِلَّةُ قَائِمَةٌ عَلٰى حَقِّيَّتِهٖ سَوَاءٌ سُمِّىَ ذَالِكَ تَنَاسُخًا اَمْ لَا .

সহজ তরজমা

অস্তিত্বহীন জিনিসকে হুবহু পুনরায় ফিরিয়ে আনা অসম্ভব হওয়ার কারণে দার্শনিকরা দৈহিক হাশর (দেহকে জমায়েত করা) অস্বীকার করেন। অথচ এর উপর তাদের নিকট নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ নেই। বিধায় আমাদের উদ্দেশ্য বিঘ্নিত করবে না। কেননা আমাদের উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলা মানুষের মৌলিক অঙ্গগুলোকে জড়ো করে তাতে তার প্রাণবায়ূ ফিরিয়ে দেবেন। একে অস্তিত্বহীন জিনিসকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা নাম দেওয়া হোক চাই না হোক (তাতে কিছু যায় আসে না)। এতে পুনরাত্থান অস্বীকারকারীদের প্রশ্নেরও অবসান ঘটে। তারা বলেছে, যদি এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে খেয়ে ফেলে অর্থাৎ সে (ভূক্ত মানুষটি) তার (ভক্ষণকারীর) অংশ হয়ে যায়, তাহলে উক্ত অংশ হয়ত উভয়ের মধ্যে ফিরিয়ে আনা হবে, আর তা অসম্ভব। অথবা উভয়ের কোন একজনের মধ্যে ফিরিয়ে আনা হবে। তাহলে (এমতাবস্থায়) দ্বিতীয়জনকে তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ পুনর্জীবিত করা হবে না। (প্রশ্নটি অবসান হওয়ার) কারণ, পুনর্জীবিত করা হবে শুধুমাত্র তার মৌলিক অঙ্গগুলো, যেগুলো শুরু জীবন থেকে তার শেষ জীবন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। আর ভুক্ত অংশ ভক্ষণকারীর অতিরিক্ত ও বাড়তি অংশ, মৌলিক নয়। সুতরাং যদি প্রশ্ন করা হয়, এ তো জন্মান্তরবাদের স্বীকৃতি হল। কেননা দ্বিতীয় দেহ হুবহু প্রথম দেহ নয়। কারণ, হাদীস শরীফে এসেছে, জান্নাতবাসীরা অবাঞ্ছিত পশম মুক্ত এবং শশ্রুবিহীন বালক হবে। হাদীসে আরও এসেছে, জাহান্নামীর চোয়ালের দাঁত উহুদ পাহাড় সমান হবে। এজন্যই কোনও প্রবক্তা বলেছেন, এমন কোন ধর্ম নেই, যাতে জন্মান্তরবাদের অবস্থান দৃঢ় নয়। আমরা বলব, জন্মান্তরবাদ তখনই আবশ্যক হবে, যখন দ্বিতীয় দেহকে প্রথম দেহের মৌলিক অঙ্গগুলো দ্বারা সৃষ্টি করা না হবে। আর এরই নাম যদি পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদ হয় তাহলে কেবলমাত্র নাম নিয়ে বিতর্ক হল। অথচ এরূপ দেহে আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া অসম্ভব হওয়ার উপর কোন প্রমাণ নেই বরং তার সত্যতার উপর বহু প্রমাণ সুপ্রতিষ্ঠিত। একে পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদ বলা হোক চাই না হোক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

দার্শনিকদের মতে দৈহিক হাশর

দার্শনিকরা পুনরোত্থান এবং দৈহিক হাশরকে অস্বীকার করেছে। কেননা তাদের মতে এতে অস্তিত্বহীন বস্তুর পুনরায় অস্তিত্বদান বা ফিরিয়ে আনা আবশ্যক হয়। আর যে জিনিসের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে, তাকে হুবহু ফিরিয়ে আনা অর্থাৎ পুনরায় অস্তিত্বে আনা অসম্ভব।

শারেহ রহ.বলেন– দার্শনিকদের উক্তি "অস্তিত্বহীন বস্তু ফিরিয়ে আনা বা পুনরায় অস্তিত্বদান অসম্ভব"–নিছক একটি দাবী মাত্র। এর স্বপক্ষে তাদের নিকট আদৌ কোনও প্রমাণ নেই বরং প্রমাণ রয়েছে এর সম্ভাব্যতার ওপর। কেননা অস্তিত্বহীন বস্তুকে প্রথমবার যখন অস্তিত্বে আনা সম্ভব বরং বাস্তবও বটে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ (তোমরা ছিলে অস্তিত্বহীন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে জীবন দান করেছি।) তাহলে অস্তিত্বহীন জিনিসকে ফিরিয়ে আনা অর্থাৎ বিদ্যমান জিনিস অস্তিত্বহীন হওয়ার পর পুনরায় অস্তিত্ব দান করা বিশেষতঃ যখন সম্পূর্ণরূপে তার অস্তিত্ব বিলীন হবে না বরং তার মৌলিক অঙ্গগুলো অবশিষ্ট থাকবে, তখন আরও ভালমত সম্ভব হবে। আর দৈহিক হাশর বলতে আমাদের উদ্দেশ্য তা-ই অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষের মৌলিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যেসব জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বহাল থাকে সেগুলোকে জমা করে তাতে পুনরায় রূহ বা আত্মা ফিরিয়ে দিবেন। এখন তোমরা ইচ্ছে হলে একে অস্তিত্বহীন জিনিসের পুনরোত্থান (পুনরায় অস্তিত্বদান) বল নতুবা অন্য কিছু বল। নামকরণ নিয়ে আমাদের কোন মাথা ব্যথা নেই।

আমরা উপরে শারীরিক পুনরোত্থানের যে অর্থ বর্ণনা করলাম তথা মানুষে জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্তমান অঙ্গগুলোকে একত্রিত করে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক স্বীয় কুদরতে তাতে আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া –এর মাধ্যমে অস্বীকারকারীদের নিম্নোক্ত প্রশ্নের অবসান হয়ে যায় অর্থাৎ যদি এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে খেয়ে ফেলে এবং ভুক্ত মানুষ ভক্ষণকারীর অঙ্গে পরিণত হয়ে যায়, তাহলে ভুক্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ দু'অবস্থা থেকে মুক্ত হবে না। হয়ত ভুক্ত মানুষ এবং ভক্ষণকারী উভয়ের মধ্যেই তার পুররোত্থান হবে কিংবা তাদের কোন একজনের মধ্যে হবে। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় জনের পুনরোত্থান সর্বসাকূল্যে (সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ) হবে না।

এ ছিল শারীরিক পুনরোত্থান অস্বীকার কারীদের প্রশ্ন। বাকী রইল, বিবৃত এ অর্থের আলোকে উক্ত প্রশ্নের অবসান হয় কিভাবে ? তার বিবরণ হল, প্রতিটি মানুষের পুনরোত্থান হবে তার মৌলিক অঙ্গগুলো জমা করে, যেগুলো জীবনের শুরু তথা জন্মলগ্ন থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। অথচ ভুক্ত অঙ্গগুলো ভক্ষণকারীর মৌলিক অঙ্গ নয় বরং অতিরিক্ত অংশ। কেননা সে অংশ তার জীবনের শুরু এবং জন্মলগ্ন থেকে ছিল না বরং ভুক্ত মানুষকে খাওয়ার পর হয়েছে। কাজেই হয়তবা ভুক্ত মানুষটির মৌলিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সে অণুগুলোই হবে, যেগুলোকে অণু আকারে সমস্ত মানুষকে একত্রিত করে আল্লাহ তা'আলা "আমি কি তোমাদের প্রভূ নই" অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। সেগুলোকে ভুক্ত মানুষের অংশ হওয়া থেকে সুরক্ষিত রেখেছেন এবং ভুক্ত মানুষের মধ্যেই তার পুনরোত্থান হবে। এমতাবস্থায় প্রত্যেকের পুনরোত্থানই সর্বসার্কূল্যে বা তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ হবে।

আরেকটি প্রশ্নের অবসান

শারীরিক পুনরোত্থানের উপর আরেকটি প্রশ্ন জাগে অর্থাৎ দুনিয়ায় প্রতিটি মানুষের আত্মা যে দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে, পরকালে সে দেহ হবে না বরং এতদভিন্ন আরেকটি দেহ হবে। যেমন, দুনিয়ায় তার শরীরে পশম ছিল। পরকালে সেই পশমভরা শরীর থাকবে না। যেমন, হাদীস শরীফে এসেছে, জান্নাতীরা অবাঞ্ছিত পশমমুক্ত যুবক হবে। সুতরাং যদি শারীরিক পুনরোত্থান সঠিক মেনে নেওয়া হয়, তাহলে আত্মা এক দেহে থেকে আরেক দেহে স্থানান্তরিত হওয়া আবশ্যক হয়। আর এর নাম জন্মান্তরবাদ বা পুনর্জন্ম।

জবাব ঃ পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদ তখনই আবশ্যক হবে, যখন পরকালের দ্বিতীয় দেহ জাগতিক প্রথম দেহের মৌলিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা গঠিত না হবে। কিন্তু দ্বিতীয় দেহ প্রথম দেহের মৌলিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারাই তৈরি করা হবে এবং তাতেই আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। সুতরাং এতে জন্মান্তরবাদ বা পুনর্জন্ম আবশ্যক হবে না। যদি তা-ই হয় তবে এ হবে কেবল নাম নিয়ে বিতর্ক। যাকে তোমরা বল পুনর্জন্ম; আমরা সে কথা বলি না। আর নামকরণের বিতর্ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। অথচ তোমাদের এ ব্যাপারে অর্থাৎ প্রথম দেহের মৌলিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে এরূপ দেহ সৃজন এবং আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া অসম্ভব হওয়ার পিছনে কোনও প্রমাণ নেই বরং তার সত্যতার ব্যাপারে বহু প্রমাণ সুপ্রতিষ্ঠিত। একে জন্মান্তরবাদ বা পুর্নজন্ম বলা হোক চাই না হোক।

জন্মান্তর্বাদের আকীদা ভ্রান্ত

قَوْلُهُ : وَمِنْ هٰهُنَا ... الخ ঃ অর্থাৎ দ্বিতীয় দেহ প্রথম দেহ থেকে ভিন্ন হওয়ার উপর ভিত্তি করে কেউ কেউ বলেন- প্রত্যেক ধর্মেই জন্মান্তরবাদ ও পুনর্জন্মের অবস্থান সুদৃঢ়। উদ্দেশ্য শাইখ জালালুদ্দীন রূমী (এ উক্তিকারক)। অথচ কথাটি সঠিক নয়। তিনি আদৌ জন্মান্তরবাদের প্রবক্তা নন বরং তাদের উদ্দেশ্য, ঐসব লোকদের সমালোচনা করা, যারা শারীরিক পুনরোত্থানকে দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করার পরিবর্তে তাতে নানা ধরনের জটিল-কুটিল প্রশ্নবিদ্ধ করে। যদ্দরুন মনের মধ্যে জন্মান্তরবাদের ভাবনা জাগে।

বস্তুতঃ জন্মান্তরবাদ যাকে অভাগন বলে, এটি আর্য সমাজের একটি আকীদা ও ধ্যান-ধারণা। যার বাস্তবতা হল, (সকল) আত্মা তার পূর্ব জীবনের ভাল-মন্দ কর্মের প্রতিদান এবং শাস্তি পাওয়ার জন্য বরাবর এই মর্ত জগতে পরিবর্তিত রূপে জন্মগ্রহণ করে। (অর্থাৎ তার পূর্বের রূপ বদলিয়ে নতুন রূপে বরাবর জন্ম নেয়)। এ ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস শারীরিক পুনরোত্থানের অস্বীকৃতি আবশ্যম্ভাবী করে (অর্থাৎ শারীরিক পুনরোত্থানের সাথে সাংঘর্ষিক) বিধায় তা সুস্পষ্ট কুফরী ও ইসলাম বিরোধী। তাছাড়া জন্মন্তরবাদ একটি ভ্রান্ত বিশ্বাসও বটে। কেননা পূর্ব জীবনের কর্মের প্রতিদান বা শাস্তি পাওয়ার জন্য আত্মা ভিন্নরূপে বরাবর জন্ম নিতে থাকলে প্রশ্ন হবে, প্রথমবার যখন দেহের সাথে আত্মার সম্পর্ক হয়েছিল এবং উদাহরণতঃ তার সুস্থতা ও ধন-সম্পদ লাভ হয়েছিল, তখন সেসব তার কোন কাজের প্রতিফল ছিল ? কেননা এতো দেহের সাথে আত্মার প্রথম সম্পর্ক। ইতোপূর্বে দেহ ভাল-মন্দা কোনও আমলই করেনি। তাছাড়া আর্য সমাজের মতাদর্শ অনুযায়ী প্রতিদান কিংবা শাস্তি পাওয়ার জন্য আত্মা যদি বারবার এ দুনিয়ায় তথা দারুল আমল বা কর্মশালায় ফিরে আসে, তাহলে এটিই (দারুল আমল) দারুল জাযা তথা প্রতিদানস্থল হওয়া আবশ্যক হবে। তখন এ মর্ত জগত আর আমলের স্থান থাকবে না বরং প্রতিদান ও শাস্তি দানের স্থান হয়ে যাবে।

وَالْوَزْنُ حَقٌّ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ . وَالْمِيْزَانُ عِبَارَةٌ عَمَّا يُعْرَفُ بِهٖ مَقَادِيْرُ الْاَعْمَالِ وَالْعَقْلُ قَاصِرٌ عَنْ اِدْرَاكِ كَيْفِيَّتِهٖ . وَاَنْكَرَتْهُ الْمُعْتَزِلَةُ لِاَنَّ الْاَعْمَالَ اَعْرَاضٌ . اِنْ اَمْكَنَ اِعَادَتُهَا لَمْ يُمْكِنْ وَزْنُهَا . وَلِاَنَّهَا مَعْلُوْمَةٌ لِلّٰهِ تَعَالٰى فَوَزْنُهَا عَبَثٌ . وَالْجَوَابُ اَنَّهٗ قَدْ وَرَدَ فِى الْحَدِيْثِ اَنَّ كُتُبَ الْاَعْمَالِ هِىَ الَّتِىْ تُوْزَنُ . فَلَا اِشْكَالَ وَعَلٰى تَقْدِيْرِ تَسْلِيْمِ كَوْنِ اَفْعَالِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُعَلَّلَةً بِالْاَغْرَاضِ لَعَلَّ فِى الْوَزْنِ حِكْمَةً لَانَطَّلِعُ عَلَيْهَا وَعَدَمُ اِطِّلَاعِنَا عَلَى الْحِكْمَةِ لَايُوْجِبُ الْعَبَثَ .

সহজ তরজমা

আমলের পরিমাপ করা সত্য। কারণ, আল্লাহ তা'আলার বলেছেন– وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ মীযান বা পরিমাক যন্ত্র বলে উদ্দেশ্য এমন জিনিস, যা দ্বারা আমল পরিমাপ করা হবে। পরিমাপের পদ্ধতি-জ্ঞান অর্জনে বিবেক অক্ষম। মুতাযিলারা আমলের পরিমাপকে অস্বীকার করেছে। কেননা (তাদের মতে) আমল আরয। পুনরায় তার অস্তিত্ব দান সম্ভব হলেও পরিমাপ করা অসম্ভব। আরেকটি কারণ হল, আমল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সম্যক অবগত। কাজেই তা পরিমাপ করা অনর্থক কাজ। (এর) জবাব হল, হাদীস শরীফে এসেছে, আমলনামা পরিমাপ করা হবে। অতএব আর কোন প্রশ্ন থাকে না। আল্লাহ পাকের কাজকর্ম مُعَلَّلٌ بِالْاَغْرَاضِ তথা উদ্দেশ্যমূলক ধরে নিলেও (বলব) সম্ভবতঃ আমলসমূহ পরিমাপ করার মধ্যে এমন কোন রহস্য রয়েছে, যার সম্পর্কে আমরা ওয়াকিহাল নই। আর রহস্য সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা তার নিরর্থকতা এবং অহীতকর হওয়াকে আবশ্যক করে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আমলের পরিমাপ সত্য ঃ ইসলামের আরেকটি মৌলিক আকীদা হল, কিয়ামত দিবসে মীযান তথা দাড়িপাল্লা প্রতিষ্ঠা করা হবে। এর মাধ্যমে বান্দার কথা ও কাজ পরিমাপ করা হবে। যাতে করে আল্লাহ পাকের ন্যায়-নিষ্ঠা ও ইনসাফ ফুটে ওঠে। মুতাযিলা তা বিবিধ কারণে অস্বীকার করেছে।

প্রথমতঃ পরকালে আমাল তথা কর্মক্রিয়াগুলা পুনরায় অস্তিত্বে আনা সম্ভব নয়। আর সম্ভব বলে মেনে নিলেও এগুলো পরিমাপের মত জিনিস নয় বরং সবই গুণ ও আরযের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তা'আলা পরিমাপ ছাড়াই বান্দার যাবতীয় আমালের কথা জানেন। এমতাবস্থায় পরিমাপ করা নিরর্থক ও অযথা কাজ। ব্যাখ্যাকার তাদের প্রথম প্রমাণের দুটি এবং দ্বিতীয় প্রমাণের একটি জবাব দিয়েছেন। ক্রমান্বয়ে তিনটি জবাব উল্লেখ করা হচ্ছে। যথা–

প্রথম প্রমাণের জবাব

এক. হাদীস শরীফে এসেছে, আমলনামা পরিমাপ করা হবে। অথচ তা দেহের অন্তর্ভুক্ত।

দুই. প্রতিটি জিনিসের ওযন ও পরিমাপ জানার জন্য পৃথক পৃথক পরিমাপ যন্ত্র বা পরিমাপক রয়েছে। শস্য মাপার জন্য পাল্লা, স্বর্ণ-রূপা, মনি-মানিক্য মাপার জন্য বিশেষ কাঁটা, চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্রের গতি পরিমাপের জন্য স্বতন্ত্র পরিমাপক, মৌসুমীর তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য বিশেষ পরিমাপ যন্ত্র, এমনকি যানবাহন ও গাড়ির গতি পরিমাপের জন্য রয়েছে মিটার। কাজেই আল্লাহর অপার কুদরতে এটি অসম্ভব কিছু নয় যে, কিয়ামত দিবসে তিনি এমন কোন পরিমাপক সৃষ্টি করে দিবেন, যার দ্বারা ভাল-মন্দ সব কিছুর নিখুঁত ও সঠিক পরিমাপ জানা যাবে।

দ্বিতীয় প্রমাণের জবাব

আল্লাহর কর্মক্রিয়া কোনও স্বার্থের অনুগামী হয় না যে, কাজটি সে উদ্দেশ্যে না হলে, তা নিরর্থক হবে। আমরা যদি আল্লাহর কাজকর্মকে উদ্দেশ্যমূলক বলে মেনেও নেই, তদুপরি বলব– আমলগুলোর পরিমাপ জানা থাকা সত্ত্বেও ওজন করার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার এমন কোনও হিকমত থাকতে পারে, যা আমরা অবগত নই। আর আমাদের এ অজ্ঞতা আল্লাহর কাজের নিরর্থকতাকে আবশ্যক করে না।

وَالْكِتَابُ الْمُثْبَتُ فِيْهِ طَاعَاتُ الْعِبَادِ وَمَعَاصِيْهِمْ يُؤْتٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ بِاَيْمَانِهِمْ وَالْكُفَّارِ بِشَمَائِلِهِمْ وَوَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ حَقٌّ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُوْرًا وَقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتَابَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا ـ وَسَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الْحِسَابِ اِكْتِفَاءً بِالْكِتَابِ وَاَنْكَرَتْهُ الْمُعْتَزِلَةُ زَعْمًا مِنْهُمْ اَنَّهٗ عَبَثٌ وَالْجَوَابُ عَنْهُ مَامَرَّ ـ

সহজ তরজমা

আমলনামা যাতে বান্দার ইবাদত-আনুগত্য এবং পাপাচার লিপিবদ্ধ থাকবে, ঈমানদারদেরকে ডান হাতে আর কাফিরদেরকে বাম হাতে এবং পেছন দিক থেকে দেওয়া হবে, তা সত্য ও প্রমাণিত। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আমি কিয়ামত দিবসে তার সামনে একটি কিতাব (নথিপত্র) পেশ করব, যা সে উন্মুক্ত পাবে। তিনি আরও ইরশাদ করেছেন, ডান হাতে যার আমলনামা দেওয়া হবে, তার হিসাব সহজ করা হবে। আর (গ্রন্থকার) কিতাব তথা আমলনামার আলোচনাকে যথেষ্ট ভেবে হিসাবের আলোচনা থেকে নীরব (বিরত) থেকেছেন। পক্ষান্তরে মুতাযিলা আমলনামা লিপিবদ্ধ করাকে নিরর্থক মনে করে তা অস্বীকার করেছে। এর জবাব ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আমলনামা সত্য ঃ

কিয়ামত কায়েমের দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য, তার ন্যায়-নিষ্ঠা ও ইনসাফের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো। নেককারদের প্রতিদান এবং গুনাহ গারদের শাস্তি দেওয়া। বিধায় দুনিয়াতে তাদের ভাল-মন্দ যাবতীয় কাজকর্ম, যার উপর পরকালে পুরস্কার ও শাস্তি দেওয়া হবে, তা লিপিবদ্ধ করা এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা অনিবার্য। কাজেই তিনি প্রতিটি মানুষের সাথে কিরামান কাতিবীন খ্যাত ফিরিশতাদের নিযুক্ত করেছেন। তারা বান্দার ভাল-মন্দ যাবতীয় আমল লিপিবদ্ধ করেছেন। তা-ই বান্দার আমলনামা। বস্তুতঃ বান্দার সারা জীবনের কথাবার্তা, কাজকর্ম, উঠা-বসা, গতিস্থিতি যে আমলনামায় আল্লাহর গুপ্ত পুলিশ তথা কিরামান কাতিবীন সঙ্গোপনে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, কিয়ামত দিবসে উক্ত আমলনামা বান্দার সামনে উন্মুক্ত প্রকাশ করা হবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَ نُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَّلْقَاهُ مَنْشُوْرًا ـ اِقْرَءْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ـ

"কিয়ামত দিবসে আমি (তার) আমলনামা তার সামনে পেশ করব। যাকে সে উন্মুক্ত পাবে। (তাকে বলব–) তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর! আজ তুমিই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।"(সূরা বনী ইসরাঈলঃ ১৩, ১৪)

قَوْلُهٗ: وَسَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الْحِسَابِ الخ ঃ গ্রন্থকার কিতাব তথা আমলনামার আলোচনার পর হিসাবের আলোচনাকে জরুরী মনে করেন নি। কেননা বান্দা স্বীয় আমলনামা পড়ে স্বয়ং নিজের হিসাব কষে নিবে। যেমন, উপরিউক্ত আয়াতে বর্ণিত রয়েছে, তুমি স্বীয় আমলনামা পাঠ কর; আজ তোমার হিসাব-নিকাষের জন্য তুমিই যথেষ্ট।

মু'তাযিলারা আমলনামাকে অস্বীকার করে

قَوْلُهٗ: وَاَنْكَرَتْهُ الْمُعْتَزِلَةُ الخ ঃ অর্থাৎ মুতাযিলা যেভাবে আল্লাহ তা'আলা বান্দার যাবতীয় আমল সম্পর্কে পরিজ্ঞাত থাকার কারণে আমলের পরিমাপকে নিরর্থক মনে করে অস্বীকার করেছে, তদ্রুপ কিতাব তথা আমলনামাকে নিরর্থক মনে করে অস্বীকার করেছে। সুতরাং আমলসমূহের পরিমাপ এবং আমলনামা অস্বীকার করার পেছনে কারণ যখন এক ও অভিন্ন, তখন উভয়টির জবাবও একই হবে। অর্থাৎ আল্লাহর তা'আলার কোন কাজই উদ্দেশ্যমূলক নয় যে, তা না হলে পরে আল্লাহর কাজ নিরর্থক হবে। আর যদি আল্লাহর কাজকে স্বার্থের অনুগামী বা উদ্দেশ্যমূলক বলে ধরেও নেওয়া হয় তাহলে আমরা বলব, কোন কিতাব (আমলনামা) এবং লিপিবদ্ধ করা ব্যতিত বান্দার আমলগুলো আল্লাহ তা'আলা পরিজ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও কিতাব প্রস্তুত করার পেছনে এমন কোন হিকমত ও রহস্য থাকতে পারে, যা আমরা জানি না। আর আমাদের এ অজ্ঞতা কিতাব প্রস্তুত করার পেছনে কোন হিকমত না থাকাকে আবশ্যক করে না।

وَالسُّؤَالُ حَقٌّ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ يُدْنِى الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهٗ وَيَسْتُرُهٗ فَيَقُوْلُ اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا ـ اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا. فَيَقُوْلُ نَعَمْ يَا رَبِّ حَتّٰى اِذَا قَرَّرَهٗ بِذُنُوْبِهٖ وَرَاٰى فِىْ نَفْسِهٖ اَنَّهٗ قَدْ هَلَكَ ـ قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا ـ وَاَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطٰى كِتَابَ حَسَنَاتِهٖ ـ وَاَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُوْنَ ـ فَيُنَادٰى بِهِمْ عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ ـ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ـ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ ـ

সহজ তরজমা

জিজ্ঞাসাবাদ (প্রমাণিত) সত্য। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দাকে নিজের কাছে টেনে নিবেন। তাকে স্বীয় নূরের পর্দা দিয়ে (অন্যর দৃষ্টির) আড়াল করে নিবেন। (যেন সে লজ্জিত না হয়) এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন– তুমি কি তোমার অমুক অমুক গুনাহের কথা জান? তখন সে (প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে) বলবে– হ্যা, হে আমার প্রতিপালক! (আমি জানি) এমনকি আল্লাহপাক যখন তার মুখ থেকে তার যাবতীয় গুনাহের স্বীকারোক্তি নিয়ে নিবেন আর সে (লোক) মনে মনে ভাববে– এবার সে নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে গেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন– দুনিয়ায় আমি তোমার গুনাহ গোপন রেখেছিলাম; আজ আমি সেগুলো ক্ষমা করে দিচ্ছি। তারপর তার নেককাজের কিতাব (গচ্ছিত নথিপত্র) তাকে দিয়ে দেওয়া হবে। অবশ্য কাফির ও মুনাফিকদের কথা ভিন্ন। সুতরাং তামাম মানুষের সামনে তাদের নাম ধরে ধরে ডাকা হবে– এরা ঐ সব লোক, যারা দুনিয়ায় স্বীয় প্রতিপালকের উপর মিথ্যা আরোপ (প্রতিপালককে মিথ্যা প্রতিপন্ন) করত। শুনে রাখ! এসব জালিমদের উপর আল্লাহর লা'নত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আমলনামা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ

ইসলামের আরও একটি মৌলিক আকীদা হল, কিয়ামত দিবসে হাশরের ময়দানে বান্দাকে তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ব্যাখ্যাতার উল্লেখিত হাদীস ছাড়াও বহু আয়াতে কারীমা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ (তাদেরকে থামাও; তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।) অন্যত্র বলেন– فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ (অবশ্যই আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ

করব, যাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে এবং রাসূলগণকেও অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব।) এখানে অবশ্য প্রশ্ন জাগে রাসূলগণের নিকট আবার কি জিজ্ঞাসা করা হবে ? কাজেই কুরআনে কারীম তা-ও বলে দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ

"কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা রাসূলদেরকে উম্মতের সাথে সমবেত করবেন। এরপর রাসূলগণকে জিজ্ঞাসা করবেন- আপনারা (আপন উম্মতের পক্ষ থেকে) কি উত্তর পেয়েছিলেন ? তারা আরয করবেন- (বাহ্যিক জবাব তো জানা আছে কিন্তু) বাস্তব প্রকৃতি আমাদের জানা নেই; অদৃশ্য ব্যাপারে আপনিই সম্যক অবগত।

قَوْلُهُ : فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ ...الخ ঃ كَنَف অর্থ, পাখির ডানা। পাখির স্বভাব, বাচ্চাদেরকে তার ডানা দিয়ে ঢেকে নেওয়া। এখানে রূপকার্থে আল্লাহ তা'আলার নূরানী পর্দা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ : وَكَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ...الخ ঃ আল্লাহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মর্ম হল, তারা নিজেদের মনগড়া রুসম-রেওয়াজ এবং ভ্রান্ত অলিক দ্বীন-ধর্মকে আল্লাহর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছে। অধিকন্তু সেগুলোকে আল্লাহর দ্বীন ও জীবন ব্যবস্থা আখ্যা দিয়েছে।

وَالْحَوْضُ حَقٌّ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ - وَلِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَوْضِىْ مَسِيْرَةُ شَهْرٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ - مَاءُهٗ اَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ - وَرِيْحُهٗ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ - وَكِيْزَانُهٗ اَكْثَرُ مِنْ نُجُوْمِ السَّمَاءِ - مَنْ يَّشْرَبُ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ اَبَدًا وَالْاَحَادِيْثُ فِيْهَا كَثِيْرَةٌ -

সহজ তরজমা

এবং হাউজ (হাউজে কাউসার) সত্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– إنا اعطيناك الكوثر "আমি আপনাকে 'কাউসার' দান করেছি।" আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– আমার হাউজের দৈর্ঘ্য এক মাসের পথ। তার চার পাশ সমান। এর পানি দুধ অপেক্ষা সাদা। ঘ্রাণ মেশক অপেক্ষা অধিক পবিত্র। এর পানপত্র সংখ্যা আকাশের তারকারাজি অপেক্ষা বেশি। একবার যে এ হাউজ থেকে পান করে নেবে, সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। এ সংক্রান্ত হাদীস প্রচুর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাউজে কাউসার সত্য

আল্লাহ তা'আলা রাসূলে কারীম ﷺ কে জান্নাতে একটি নহর দান করেছেন। তার নাম কাউসার। এর এক প্রান্ত হাশরের মাঠেও থাকবে। আবার হাশরের ময়দানেও একটি হাউজ থাকবে। জান্নাতের "কাউসার" খ্যাত নহরের পানি এনে সেখানে জমা করা হবে। একেও কাউসার বলে। আল্লাহর বাণী اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ এর মধ্যেও 'কাউসার' দ্বারা উক্ত হাউজই উদ্দেশ্য। বহু হাদীসে পাকে যার বিস্ময়কর বিরল গুণাবলির কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন, তার দৈর্ঘ্য হবে এক মাসের পথ। এর পানি হবে দুধের চেয়েও সাদা, মেশকের চেয়েও সুঘ্রাণযুক্ত, মধুর চেয়েও মিষ্টি, বরফ থেকেও ঠাণ্ডা। এ হাউজের পাড়ে রাখা পানপাত্রগুলোর সংখ্যা আকাশের তারকারাজি থেকেও বেশি এবং নক্ষত্র অপেক্ষা অধিক উজ্জল। একবার যে এ হাউজ থেকে পান করবে, তারপর সে আর কখনও পিপাসিত হবে না। মানুষ কবর থেকে তৃষ্ণাকাতর অবস্থায় উঠবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পিপাসিত উম্মতদেরকে এ হাউজ থেকেই পানি পান করাবেন। এজন্যই তাঁকে (নবীজীকে) সাকীয়ে কাউসার (হাউজে কাউসার থেকে পরিতৃপ্তকারী) বলা হয়।

قَوْلُهُ : زَوَايَاهُ سَوَاءٌ ...الخ ঃ زَوَايَا শব্দটি زَاوِيَة এর বহুবচন। অর্থ– পার্শ্ব, পাশ, দিক। চতুর্পাশ সমান হওয়ার অর্থ, হাউজটি চতুর্ভূজ আকৃতির বা চারকোণ বিশিষ্ট হবে।

وَالصِّرَاطُ حَقٌّ وَهُوَ جِسْرٌ مَمْدُودٌ عَلٰى مَتْنِ جَهَنَّمَ ـ اَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ يَعْبُرُهُ اَهْلُ الْجَنَّةِ ـ وَتَزِلُّ بِهِ اَقْدَامُ اَهْلِ النَّارِ ـ وَاَنْكَرَهُ اَكْثَرُ الْمُعْتَزِلَةِ ـ لِاَنَّهُ لَايُمْكِنُ الْعُبُوْرُ عَلَيْهِ وَاِنْ اَمْكَنَ فَهُوَ تَعْذِيْبٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ـ وَالْجَوَابُ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُمَكِّنَ مِنَ الْعُبُوْرِ عَلَيْهِ وَيُسَهِّلَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ـ حَتّٰى اِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَجُوْزُهُ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ ـ وَمِنْهُمْ كَالرِّيْحِ الْهَابَّةِ ـ وَمِنْهُمْ كَالْجَوَادِ الْمُسْرِعِ اِلٰى غَيْرِ ذَالِكَ مِمَّا وَرَدَ فِى الْحَدِيْثِ ـ

সহজ তরজমা

পুলসিরাত সত্য। এটি জাহান্নামের উপর প্রলম্বিত একটি পুল। চুলের চেয়ে সরু এবং তরবারী অপেক্ষা শাণিত। জান্নাতীর পলকেই তা পার হয়ে যাবে আর জাহান্নীরা পা পিছলে পড়ে যাবে। অধিকাংশ মুতাযিলা পুলসিরাত অস্বীকার করেছে। কেননা পুল অতিক্রম করা সম্ভব নয়। যদি সম্ভবও হয় তথাপি তা অতিক্রম করা মুমিনদের জন্য আযাব। এর জবাব হল, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা এমন ক্ষমতাবান যে, তিনি পুলসিরাত অতিক্রম করার শক্তি দিতে এবং মুমিনদের জন্য তা অতি সহজ করে দিতে পারেন। এমনকি কেউ কেউ তা বিদ্যুৎ গতিতে পার হয়ে যাবে। কেউ প্রবল বাতাসের মত আবার কেউ দ্রুতগামী অশ্বের মত পার হয়ে যাবে। তাছাড়া হাদীসে বর্ণিত আরও অনেকভাবে মুমিনগণ পুলসিরাত পার হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

পুলসিরাত সত্য

ইসলামী আকীদায় আরও আছে, জাহান্নামের উপর একটি প্রলম্বিত পুল থাকবে। সেটি হবে চুলের চেয়েও সরু এবং তরবারীর চেয়েও ধারালো। সমস্ত মানুষকে তা অতিক্রম করার নির্দেশ দেওয়া হবে। শুরুতে নবী-রাসূলদের মধ্য হতে সর্বপ্রথম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ অতিক্রান্ত হবেন। তারপর অন্যান্য নবী-রাসূলগণ। অতঃপর অন্যান্য ঈমানদার নিজ নিজ শ্রেণী হিসেবে কেউ বিদ্যুৎ বেগে, কেউ প্রবল বাতাসের মত, কেউ অশ্বের গতিতে, কেউ দ্রুতগামী উটের গতিতে সর্বপরি প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমল ও মর্যাদা মাফিক গতিতে পুলসিরাত পার হবে। পক্ষান্তরে জাহান্নামীরা কেটে কেটে নিচে জাহান্নামে পড়ে যাবে। সেদিন ঈমানের নূর এবং কুফরের অন্ধকার প্রস্ফুটিত হবে। যখন পুলসিরাত অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে; ঈমানের আলো ছাড়া ভিন্ন কোনও আলো থাকবে না, তখন ঈমানদারগণ নিজ নিজ ঈমানের আলোতে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

يَوْمَ لَايُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ ـ

"যেদিন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীকে এবং তার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী (তার সাথে ঈমান আনয়নকারী) কে লাঞ্ছিত করবেন না। তাদের আলো তাদের সামনে এবং ডান দিকে (তাদেরকে পথ প্রদর্শনের জন্য) দৌড়াতে থাকবে। (সূরা তাহরীম)

অনেক মু'তাযিলা পুলসিরাত অস্বীকার করে। আল্লাহ পাকের অপার ও পরিপূর্ণ কুদরতের উপর তাদের ঈমানের কমতি ও ঘাটতিরই ফল এটি। নতুবা সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষে কোনও কাজই অসম্ভব বা অযৌক্তিক নয়।

وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ لِاَنَّ الْاٰيَاتِ وَالْاَحَادِيْثَ الْوَارِدَةَ فِىْ اِثْبَاتِهِمَا اَشْهَرُ مِنْ اَنْ تُخْفٰى وَاَكْثَرُ مِنْ اَنْ تُحْصٰى ـ تَمَسَّكَ الْمُنْكِرُوْنَ بِاَنَّ الْجَنَّةَ مَوْصُوْفَةٌ بِاَنَّ عَرْضَهَا كَعَرْضِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ وَهٰذَا فِىْ عَالَمِ الْعَنَاصِرِ مُحَالٌ ـ وَفِىْ عَالَمِ الْاَفْلَاكِ اَوْ فِىْ عَالَمٍ اٰخَرَ خَارِجٍ عَنْهُ مُسْتَلْزِمٌ لِجَوَازِ الْخَرْقِ وَالْاِلْتِيَامِ ـ وَهُوَ بَاطِلٌ قُلْنَا هٰذَا مَبْنِىٌّ عَلٰى اَصْلِكُمُ الْفَاسِدِ ـ وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ فِىْ مَوْضِعِهٖ ـ

সহজ তরজমা

জান্নাত-জাহান্নাম সত্য

এবং জান্নাত সত্য, দোযখ সত্য। কেননা এ দুটির প্রমাণ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ আয়াতে কারীম ও হাদীস শরীফগুলো সুপ্রসিদ্ধ এবং প্রচুর। অস্বীকার কারীরা প্রমাণ স্বরূপ বলেছে– জান্নাতের অবস্থা প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, এর প্রশস্ততা আসমান-যমীনের প্রশস্ততা সমান। আর তা পার্থিব জগতে অসম্ভব এবং উর্ধ্ব জগতে কিংবা উর্ধ্ব জগতের বাইরে অন্য কোন জগতে (আসমানসমূহের) বিদীর্ণতা এবং সংযোগের বৈধতাকে আবশ্যক করে। অথচ তা বাতিল। আমরা জবাবে বলব– এ (বিদীর্ণতা ও সংযোগের অসম্ভাব্যতা) তোমাদের একটি ভ্রান্ত মূলনীতির উপর নির্ভরশীল। এ ব্যাপারে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করেছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

পার্থিব সুখ-শান্তির নামই কি জান্নাত-জাহান্নাম ?

জান্নাত-জাহান্নামের প্রমাণে অসংখ্য আয়াতে কারীমা এবং হাদীস নীরব সাক্ষী। এগুলোকে অলিক-অবান্তর মনে করা এবং পরকালে জান্নাত-জান্নাত বলতে কিছু নেই বরং পার্থিব আরাম ও সুখ-শান্তির নামই জান্নাত; পার্থিব দুঃখ-কষ্ট ও মেহনত-পরিশ্রমের নামই জাহান্নাম –এরূপ অপব্যাখ্যা করা সুস্পষ্ট কুফরী ও নাস্তিকতা। অস্বীকারকারী তথা দার্শনিকদের প্রমাণ হল, কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ

এ আয়াতে কারীমায় জান্নাতের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তার প্রশস্ততা আসমান-যমীন উভয়ের প্রশস্তার সমান। অথচ এমন জান্নাত পার্থিব জগতে অসম্ভব। কেননা যার প্রশস্ততা পার্থিব জগৎ তথা আসমান-যমীনের সমান, তা কিভাবে একটি জগতে সংকুলান হতে পারে ? অনুরূপভাবে উর্ধ্ব জগতেও এমন জান্নাত হতে পারে না, উপরিউক্ত প্রমাণের ভিত্তিতেই। অধিকন্তু উর্ধ্ব জগতে কিংবা তার বাইরে অন্য কোনও জগতে এরূপ জান্নাতের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া হলেও আসমানগুলো বিদীর্ণ বা দ্বিখণ্ডিত হওয়া ব্যতীত ঈমানদারদের পক্ষে সেখানে পৌঁছা সম্ভব হবে না। এমতাবস্থায় নিশ্চিত আসমানগুলোর ভাঙা-গড়া (বিদীর্ণতা ও জোড়াতালি) গ্রহণ করা আবশ্যক হবে। অথচ আসমানে ভাঙা-গড়া অসম্ভব।

এর জবাব হল, আসমানে ভাঙা-গড়ার অসম্ভাব্যতা তোমাদের ভ্রান্ত ও অলিক মূলনীতির উপর নির্ভরশীল। আমরা তা স্বীকার করি না। আমাদের মতে আসমানের মধ্যে ভাঙা-গড়া সম্ভব। কিয়ামত দিবসে জনসমক্ষে এর বহিঃপ্রকাশও ঘটবে। যেমন–

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ـ وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ـ

(অর্থঃ যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে, যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে। {সূরা যথাক্রমে (ক) ইনশিরাক-১, ২ (খ) ইনফিতার-১} ইত্যাদি আয়াতে কারীমা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত।

وَهُمَا أَيِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوْقَتَانِ الْآنَ مَوْجُوْدَتَانِ تَكْرِيْرٌ وَتَاكِيْدٌ ـ وَزَعَمَ أَكْثَرُ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّهُمَا تُخْلَقَانِ يَوْمَ الْجَزَاءِ ـ وَلَنَا قِصَّةُ آدَمَ وَحَوَاءَ وَاِسْكَانُهُمَا الْجَنَّةَ وَالْآيَاتُ الظَّاهِرَةُ فِى إِعْدَادِهِمَا مِثْلُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ ـ إِذْلَا ضُرُوْرَةَ فِى الْعُدُوْلِ عَنِ الظَّاهِرِ ـ فَإِنْ عُوْرِضَ بِمِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالٰى تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَايُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ـ قُلْنَا يَحْتَمِلُ الْحَالَ وَالْاِسْتِمْرَارَ وَلَوْ سُلِّمَ فَقِصَّةُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَبْقٰى سَالِمَةً عَنِ الْمُعَارَضَةِ

সহজ তরজমা

এবং এতদুভয় অর্থাৎ জান্নাত-জাহান্নাম এখন সৃষ্ট অবস্থায় বিদ্যমান। এটা পুনরাবৃত্তি ও সমর্থন। অধিকাংশ মু'তাযিলা মনে করে, এ দুটিকে বিনিময় দিবসে সৃষ্টি করা হবে। আর আমাদের প্রমাণ হল, হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) এর ঘটনা। জান্নাতে তাদেরকে থাকতে দেওয়া এবং এতদুভয়ের সৃষ্টি সম্পর্কে অবতীর্ণ সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ। যেমন, اعدت للمتقين (জান্নাত মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।) এবং وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ (জাহান্নাম কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।) কেননা বাহ্যিক অর্থ থেকে সরে আসার কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং উপরিক্ত প্রমাণাদির বিরুদ্ধে যদি আল্লাহর বাণী تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ...الخ (পরকালে ঐ বাসস্থান আমি সেসব লোকদের জন্য তৈরি করব, যারা ভূ-পৃষ্ঠে গর্ব-অহংকার এবং ফিতনা-ফাসাদ ও দ্বন্দ-কলহের ইচ্ছা করে না।) জাতীয় আয়াতে কারীমা পেশ করে, তাহলে আমরা বলব, ফেলে মুযারে (نَجْعَلُهَا) বর্তমান এবং চলমান কালেরও সম্ভাবনা রাখে। যদি মেনেও নেওয়া হয়, এখানে ভবিষ্যকাল উদ্দেশ্য, তথাপি আদম (আ.) এর ঘটনা দ্বন্দমুক্ত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

জান্নাত জাহান্নাম প্রস্তুত অবস্থায় আছে

হকপন্থীদের নিকট জান্নাত-জাহান্নাম প্রস্তুত অবস্থায় বর্তমানে বিদ্যমান। অধিকাংশ মু'তাযিলার মতে জান্নাত-জাহান্নাম অদ্যাবধি প্রস্তুত হয়নি। এখনও তা সৃষ্টি করা হয়নি বরং কিয়ামত দিবসে সৃষ্টি করা হবে। আমাদের প্রমাণ হল, প্রথমতঃ সেসব নছ, যাতে জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্ট অবস্থায় প্রস্তুত থাকার ব্যাপারে অতীতকালীন ক্রিয়া যোগে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। যেমন, জান্নাতের ব্যাপারে অবতীর্ণ আয়াতে কারীমা أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ (জান্নাত মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।) এবং জাহান্নামের ব্যাপারে অবতীর্ণ আয়াতে কারীমা أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ (জাহান্নাম কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।) অনুরূপভাবে হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) এর ঘটনা এবং তাদেরকে জান্নাতে বসবাস করতে দেওয়াও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, জান্নাত সৃষ্ট ও প্রস্তুত আছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا

অর্থাৎ এবং আমি বললাম, হে আদম ! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং দুজনেই এখানে যথেচ্ছ আহার কর। সূরা বাকারা-৩৫।

মু'তাযিলাদের আপত্তি ও তার জবাব ঃ যদি মু'তাযিলার পক্ষ থেকে বলা হয়, আল্লাহর বাণী–

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَايُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا

উপরিউক্ত আয়াতে কারীমা, যেগুলোতে অতীতকালীন ক্রিয়া যোগে জান্নাত প্রস্তুত থাকার সংবাদ দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর বিপরীত। কেননা এ আয়াতে কারীমায় نَجْعَلُهَا ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়া। কাজেই আয়াতের মর্মার্থ হবে, এটি পরকালের বাসস্থান। যাকে আমি ঐসব লোকদের জন্য নির্মাণ করব, যারা পৃথিবীতে দম্ভ-অহংকার এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামার ইচ্ছা করে না।

আমরা এর জবাবে বলব, মুযারের সীগা কেবল ভবিষ্যতকালের জন্য সুনির্দিষ্ট নয় বরং তা যেভাবে ভবিষ্যতকালের মত বর্তমান এবং চলমান কালেরও সম্ভাবনা রাখে। কাজেই এ আয়াতে কারীমা সেসব আয়াত বিরোধী হবে না, যাতে অতীতকালীন ক্রিয়া যোগে জান্নাত প্রস্তুত থাকার সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

আর যদি মেনেও নেওয়া হয়, উপরিউক্ত আয়াতে কারীমায় মুযারের সীগা ভবিষ্যতকালের জন্য ব্যবহৃত। তাহলে আমরা বলব- উপরিউক্ত আয়াতে نَجْعَلُهَا ক্রিয়াটি تَمْلِيك ও تَخْصِيص তথা মালিক বানানো এবং বিশেষিত করার অর্থে ব্যবহৃত। আয়াতের মর্মার্থ হল, আমি তাকে এর মালিক বানাব। আর যদি ধরে নেওয়া হয়, جَعْل অর্থ خَلْق সৃষ্টি করা। আর এ হিসেবেই এ আয়াত উপরিউক্ত আয়াত বিরোধী, যাতে অতীতকালীন ক্রিয়া যোগে জান্নাত প্রস্তুত থাকার সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তাহলে আমরা বলব, হযরত আদম (আ.) এর ঘটনা তো বিরোধ মুক্ত। কাজেই আমরা এটিকেই প্রমাণ ধরে বলি, জান্নাত পূর্বসৃষ্ট এবং বর্তমানে বিদ্যমান।

قَوْلُهُ: اِذْلَا ضَرُوْرَةَ ...الخ ঃ শারেহ রহ.যখন 'জান্নাত-জাহান্নাম পূর্ব থেকে বিদ্যমান থাকা'র উপর অতীতকালীন ক্রিয়া সম্বলিত আয়াতে কারীমা দ্বারা প্রমাণ পেশ করলেন, তখন কেউ কেউ (এর উপর আপত্তি করে) বলতে পারে- এখানে মাযীর সীগা (অতীতকালীন ক্রিয়া) ভবিষ্যতকালের অর্থে ব্যবহৃত। আর ভবিষ্যতে জান্নাত-জাহান্নাম প্রস্তুত করা যেহেতু সুনিশ্চিত, বিধায় তার নিশ্চয়তা প্রকাশের জন্য (কোথাও কোথাও) অতীতকালীন ক্রিয়া যোগে বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ (সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ হবে)।

শারেহ রহ.এর জবাবে বলেন, এটি সরাসরি বাহ্যিক অর্থ বিকৃতি যার আদৌ প্রয়োজন নেই। অকারণে এরূপ ব্যবহার সম্পূর্ণ নাজায়েয।

قَالُوا لَوْ كَانَتَا مَوْجُوْدَتَيْنِ الْاٰنَ لَمَا جَازَ هَلَاكُ اُكُلِ الْجَنَّةِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى اُكُلُهَا دَائِمٌ لٰكِنَّ اللَّازِمَ بَاطِلٌ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ـ فَكَذَا الْمَلْزُوْمُ ـ قُلْنَا لَاخَفَاءَ فِىْ اَنَّهٗ لَا يُمْكِنُ دَوَامُ اُكُلِ الْجَنَّةِ بِعَيْنِهٖ ـ وَاِنَّمَا الْمُرَادُ بِالدَّوَامِ اَنَّهٗ اِذَا فَنِىَ مِنْهُ شَيْءٌ جِيْءَ بِبَدَلِهٖ ـ وَهٰذَا لَايُنَافِى الْهَلَاكَ لَحْظَةً فَاِنَّ الْهَلَاكَ لَايَسْتَلْزِمُ الْفَنَاءَ بَلْ يَكْفِىْ الْخُرُوْجُ عَنِ الْاِنْتِفَاعِ بِهٖ ـ وَلَوْ سُلِّمَ فَيَجُوْزُ اَنْ يَّكُوْنَ الْمُرَادُ اَنَّ كُلَّ مُمْكِنٍ فَهُوَ هَالِكٌ فِىْ حَدِّ ذَاتِهٖ بِمَعْنٰى اَنَّ الْوُجُوْدَ الْاِمْكَانِىَّ بِالنَّظَرِ اِلَى الْوُجُوْدِ الْوَاجِبِىِّ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ ـ

সহজ তরজমা

মু'তাযিলা বলেছে- জান্নাত-জাহান্নাম এখন বিদ্যমান থাকলে জান্নাতের ফলফলাদি বিনষ্ট হওয়া সম্ভব হত না। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- জান্নাতের ফলফলাদি অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী। অথচ লাযিম ও তালী বাতিল। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- একমাত্র তার সত্ত্বা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে (অর্থাৎ তিনি ব্যতীত সব কিছুরই ধ্বংস অবধারিত)। সুতরাং অনুরূপভাবে মালযুম এবং মুকদ্দামও ভ্রান্ত।

আমরা (এর জবাবে) বলব- এ ব্যাপারে কোনও অস্পষ্টতা নেই যে, জান্নাতের ফলফলাদির চিরস্থায়ীত্ব সত্ত্বাগত সম্ভব নয়। চিরস্থায়ীত্ব দ্বারা উদ্দেশ্য হল, একটি বিনষ্ট হলে তৎক্ষণাত এর পরিবর্তে আরেকটি ফল তৈরি করে দেওয়া হবে। আর এ অর্থে চিরস্থায়ীত্ব ক্ষণিকের জন্য ধ্বংস বা বিনষ্ট হওয়ার পরিপন্থী নয়। কেননা বিনষ্ট হওয়া فَنَاء বা নির্মূল হওয়াকে আবশ্যক করে না বরং উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা হারানোই যথেষ্ট। আর যদি মেনেও নেওয়া হয় (যে, বিনষ্টতা নির্মূল হওয়াকে আবশ্যক করে) তাহলে সম্ভবতঃ (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ) দ্বারা উদ্দেশ্য, প্রতিটি সম্ভাব্য বস্তু সত্ত্বাগতভাবে ধ্বংসোন্মুক্ত বা বিনষ্ট হওয়ার যোগ্য অর্থাৎ সম্ভাব্য অস্তিত্ব (আল্লাহ তা'আলার) অনিবার্য অস্তিত্বের বিপরীত (তুলনায়) নাস্তির পর্যায়ে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

জান্নাত কিভাবে বর্তমানে বিদ্যমান ?

মু'তাযিলারা বলে- জান্নাত বর্তমানে বিদ্যমান থাকলে জান্নাতের ফলফলাদি বিনষ্ট হওয়া সম্ভব ছিল না। কেননা তা আল্লাহর বাণী أُكُلُهَا دَائِمٌ এর পরিপন্থী। কিন্তু ল্যাযেম ও তালী তথা জান্নাতের ফলগুলো বিনষ্ট হওয়ার অসম্ভাব্যতা আরেকটি আয়াতে কারীমা كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ এর কারণে ভ্রান্ত।

অনুরূপভাবে মালযুম ও মুকাদ্দাম তথা জান্নাত-জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান থাকাও ভ্রান্ত এবং অলিক কথা। প্রমাণটি ভিন্নভাবেও উপস্থাপন করা যেতে পারে অর্থাৎ জান্নাত যেথায় যাবতীয় নেয়ামত থাকবে, তা সমকালে বিদ্যমান ধরে নিলে প্রশ্ন জাগে যে, জান্নাতের ফলগুলো কিয়ামতের সময় ধ্বংস হবে কি না ? প্রশ্নের প্রথম অংশ আয়াতে কারীমা أُكُلُهَا دَائِمٌ এর কারণে ভ্রান্ত। তাতে (أُكُلُهَا دَائِمٌ এর মধ্যে) জান্নাতের ফলগুলোকে চিরস্থায়ী বলা হয়েছে। আর প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ আরেকটি আয়াতে কারীমা كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ এর কারণে ভ্রান্ত। তাতে (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ এর মধ্যে) কিয়ামতের সময় যাবতীয় বস্তু (সমূলে) ধ্বংস হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়েছে। কাজেই প্রশ্নের উভয় অংশ যখন ভ্রান্ত প্রমাণিত হল, তখন জান্নাত সমকালে বিদ্যমান থাকাও ভ্রান্ত।

সুতরাং প্রমাণিত হয়ে গেল যে, জান্নাত-জাহান্নাম বিনিময় দিবসে সৃষ্টি করা হবে। এমতাবস্থায় উভয় আয়াত নিজ নিজ বাহ্যিক অর্থে যথার্থ থাকবে অর্থাৎ যে মুহূর্তে আল্লাহর বাণী كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ প্রকশ পাবে, সে মুহূর্ত অতিক্রান্ত হওয়ার পর জান্নাত সৃষ্টি করা হবে। এরপর أُكُلُهَا دَائِمٌ আয়াত মাফিক চিরস্থায়ী থাকবে।

* সারকথা, আমরা লাযিম ও তালী তথা জান্নাতের ফলগুলো ধ্বংসের অসম্ভাব্যতা বরং أُكُلُهَا دَائِمٌ আয়াত মুতাবিক সেগুলোর চিরস্থায়ীত্ব অপর একটি আয়াতে কারীমা كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ এর বিরোধী হওয়ার কারণে ভ্রান্ত বলে স্বীকার করি না (অর্থাৎ লাযিম ও তালী তথা জান্নাতের ফল বিনষ্ট হওয়া সম্ভব নয় বরং أُكُلُهَا دَائِمٌ অনুযায়ী তা চিরস্থায়ী একথা কুরআনের অপর আয়াত كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ এর সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে ভ্রান্ত বলে আমরা স্বীকার করি না। কেননা চিরস্থায়ীত্ব দুই ধরনে। **এক.** বস্তুটি হুবহু অবশিষ্ট থাকবে। এর নাম دَوَامٌ شَخْصِيٌّ বা সত্ত্বাগত পর্যায়ের চিরস্থায়ীত্ব। **দুই.** أَفْرَاد তথা বস্তুটির একক ধ্বংস হতে থাকবে আর প্রতিটি এককের স্থলে তদনুরূপ আরেকটি একক বা বস্তু অস্তিত্ব লাভ করবে। যেমন, কোন জান্নাতী যখন গাছ থেকে একটি ফল পাড়বে, তৎক্ষণাত আল্লাহ তা'আলা তদস্থলে আরেকটি ফল তৈরী করে দিবেন। এর নাম دَوَامٌ نَوْعِيٌّ বা শ্রেণীগত স্থায়িত্ব।

সুতরাং أُكُلُهَا دَائِمٌ এর মধ্যে دَوَام شَخْصِي উদ্দেশ্য হতে পারে না। কেননা জান্নাতী যে ফল খেয়ে ফেলবে, তা তো নিশ্চিত নিঃশেষ হয়ে গেল। এখানে বরং دَوَام نَوْعِي উদ্দেশ্য অর্থাৎ জান্নাতী যে ফল খেয়ে ফেলবে, তৎক্ষণাত তদস্থলে ঐ জাতের আরেকটি ফল সৃষ্টি করে দেওয়া হবে। আর كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ এর মধ্যে ধ্বংস বা বিনষ্ট হওয়ার দ্বারা চিরস্থায়ী ধ্বংস উদ্দশ্য নয় বরং সাময়িক ও ক্ষণিকের জন্য ধ্বংস হওয়া উদ্দেশ্য। আর دَوَام نَوْعِي (জাতগত স্থায়ীত্ব) চিরস্থায়ী ধ্বংসের পরিপন্থী; ক্ষণিকের জন্য ধ্বংস হওয়ার পরিপন্থী নয়।

তাছাড়া আরেকটি জবাব হল, أُكُلُهَا دَائِم এর মধ্যে دَوَام شَخْصِي উদ্দেশ্য হলেও আমরা বলব- كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ এর মধ্যে ধ্বংস অর্থ নির্মূল ও বিলীন হওয়া নয় বরং ধ্বংস হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য উপকারযোগ্য না থাকা অর্থাৎ মূল বস্তু রইল বটে কিন্তু তার আকৃতি ও স্বাদ বদলে গেল। অতএব اكلها دائم এর মর্ম দাঁড়াবে- জান্নাতের প্রতিটি ফল চিরস্থায়ী হবে মূল হিসাবে। আর كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ এর নিমিত্ত তা ধ্বংস হওয়া মানে ক্ষণিকের জন্য উপকার অযোগ্য হবে। সুতরাং এখন উভয় আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ রইল না।

আর যদি ধরেও নেওয়া হয়, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ এর মধ্যে হালাক ও ধ্বংস মানে নির্মূল ও বিলীন হয়ে যাওয়া, তাহলে আমরা বলব- আল্লাহ তা'আলা অনিবার্য সত্ত্বা। তার অনিবার্য অস্তিত্বের বিপরীত সম্ভাব্য বস্তুর অস্তিত্বের কোনও স্থান বা মর্যাদাই নেই। এ হিসেবে كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ এর মর্ম হবে, প্রতিটি সম্ভাব্য বস্তু আল্লাহ পাকের অনিবার্য অস্তিত্বের বিপরীতে বিলীন ও নাস্তির পর্যায়ভুক্ত।

بَاقِيَتَانِ لَا تَفْنَيَانِ وَلَا يَفْنَى أَهْلُهُمَا أَيْ دَائِمَتَانِ لَا يَطْرَءُ عَلَيْهِمَا عَدَمٌ مُسْتَمِرٌّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِيْ حَقِّ الْفَرِيْقَيْنِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا. وَأَمَّا مَا قِيْلَ مِنْ أَنَّهُمَا تَهْلِكَانِ وَلَوْ لَحْظَةً تَحْقِيْقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ فَلَا يُنَافِي الْبَقَاءَ بِهٰذَا الْمَعْنَى. لِأَنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِي الْآيَةِ عَلَى الْفَنَاءِ. وَذَهَبَتِ الْجَهْمِيَّةُ إِلَى أَنَّهُمَا تَفْنَيَانِ وَيَفْنَى أَهْلُهَا وَهُوَ قَوْلٌ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شُبْهَةٌ فَضْلًا عَنْ حُجَّةٍ.

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

(জান্নাত-জাহান্নাম) দুটোই চিরকাল থাকবে, কখনও ধ্বংস হবে না। এতদুভয়ের অধিবাসীরাও বিলীন হবে না। অর্থাৎ উভয়টিই (জান্নাত-জাহান্নাম) চিরকাল থাকবে। এতদুভয়ের উপর চিরস্থায়িত্বের বিলুপ্তী আবর্তিত হবে না। কেননা উভয় সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– জান্নাতী জান্নাতে আর কাফির জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। আর যা হোক, আল্লাহর বাণী هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ কে প্রমাণের জন্য জান্নাত-জাহান্নাম ক্ষণিকের তরে হলেও ধ্বংস হওয়ার যে কথা বলা হয়েছে, তা এ অর্থে চিরস্থায়ীত্ব বিরোধী নয়। কেননা আপনি নিশ্চিত জেনেছেন যে, আয়াতে কারীমায় ধ্বংস বা বিলীন হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। পক্ষান্তরে জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়ের অভিমত হল, জান্নাত-জাহান্নাম এবং এতদুভয়ের অধিবাসীরা বিলীন হয়ে যাবে। এটি কুরআন-হাদীস ও ইজমা পরিপন্থী। যার স্বপক্ষে অকাট্য প্রমাণ তো দূরে থাক, দুর্বল প্রমাণও নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

জান্নাত-জাহান্নাম অবিনশ্বর

কুরআন-হাদীস ও ইজমায়ে উম্মতের আলোকে চূড়ান্ত হয়েছে, জান্নাত-জাহান্নাম চিরকাল থাকবে। কখনও বিলীন হবে না। সেখানকার পুণ্য-পুরস্কার ও শাস্তি হবে চিরস্থায়ী; কখনও সেসবের যবনিকাপাত হবে না। ঈমানদার জান্নাতে আর কাফির জাহান্নামে অনন্তকাল জীবিত থাকবে। কারও মৃত্যু হবে না। বহু হাদীসের বর্ণনা মতে সেখানে মৃত্যুকে ভেড়ার আকৃতিতে যবাই করে দেওয়া হবে। এক ঘোষক ঘোষণা করবে– হে জান্নাতবাসী! চিরদিনের জন্য আনন্দ-আপ্লুত হও; তোমাদের আর মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামী! অনন্তকালের জন্য আযাব ভোগ কর; তোমাদের আর মৃত্যু হবে না। এ ঘোষণা শোনার পর জান্নাতবাসীর আনন্দের কোনও সীমা থাকবে না। থাকবে না জাহান্নামীর দুঃখের সীমা। কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে خٰلِدِيْنَ فِيْهَا শব্দ যোগে ঈমানাদর জান্নাতে আর কাফির জাহান্নামে চিরকাল স্থায়ী থাকবে বলে সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ : أَيْ دَائِمَتَانِ ...الخ : যেহেতু كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ এর আলোকে এক সময় প্রত্যেকটি জিনিস অস্তিত্বহীন ও বিলীন হয়ে যাবে, তা জান্নাত-জাহান্নামের চিরস্থায়ীত্ব পরিপন্থী –এ সন্দেহ নিরসনের জন্য শারেহ রহ.বলেন, জান্নাত-জাহান্নামের চিরস্থায়ীত্ব ও অনিবশ্বরতা বা বিলীন না হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এতদুভয়ের উপর চিরস্থায়ীত্ব হীনতা আবর্তিত হবে না অর্থাৎ অনন্তকালের জন্য অস্তিত্বহীন বা বিলীন হয়ে যাওয়ার অর্থে অবশ্য ক্ষণিকের জন্য হলেও ধ্বংস হবে। যেন আল্লাহ তা'আলার বাণী كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ এর মর্ম বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কাজেই আয়াত দুটিতে এখন আর কোন বিরোধ রইল না।

তাছাড়া আরও একটি জবাব হল, উপরিউক্ত আয়াতে হালাক শব্দটির অর্থ "ফানা বা বিলীন" হওয়ার পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। কেননা সম্ভাবনা আছে, হালাক বা বিলীন হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার অনিবার্য ও অস্তিত্বের বিপরীতে এসবের সম্ভাব্য অস্তিত্বের কোন মর্যদা নেই বরং তা নাস্তির পর্যায়ভুক্ত। তাহলে এমতাবস্থায় জান্নাত-জাহান্নামের চিরস্থায়ীত্ব كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ পরিপন্থী হবে না। কেননা উভয়ের (জান্নাত-জাহান্নাম) অস্তিত্ব চিরস্থায়ী হওয়া সত্ত্বেও তা সম্ভব। আর সম্ভাব্য বস্তুর অস্তিত্ব অনিবার্য সত্ত্বার অস্তিত্বের বিপরীতে বিলীন ও নাস্তির পর্যায়ভুক্ত তথা ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে।

وَالْكَبِيْرَةُ قَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِيْهَا فَرَوٰى اِبْنُ عُمَرَ رض. اَنَّهَا تِسْعَةٌ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ . وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَالزِّنَا وَالْفِرَارُ عَنِ الزَّحْفِ وَالسِّحْرُ وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ وَالْاِلْحَادُ فِي الْحَرَمِ . وَزَادَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رض. اَكْلَ الرِّبٰو . وَزَادَ عَلِيٌّ رض. اَلسَّرِقَةُ وَشُرْبُ الْخَمْرِ. وَقِيْلَ كُلُّ مَا كَانَ مَفْسَدَتُهُ مِثْلَ مَفْسَدَةِ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ اَوْ اَكْثَرَ مِنْهُ وَقِيْلَ كُلَّمَا تَوَعَّدَ عَلَيْهِ الشَّارِعُ بِخُصُوْصِهِ . وَكُلُّ مَعْصِيَةٍ اَصَرَّ عَلَيْهَا الْعَبْدُ فَهِيَ كَبِيْرَةٌ . وَكُلُّ مَا اسْتَغْفَرَ عَنْهَا فَهِيَ صَغِيْرَةٌ . وَقَالَ صَاحِبُ الْكِفَايَةِ وَالْحَقُّ اَنَّهُمَا اِسْمَانِ اِضَافِيَّانِ لَايُعْرَفَانِ بِذَاتَيْهِمَا . فَكُلُّ مَعْصِيَةٍ اُضِيْفَتْ اِلٰى مَا فَوْقَهَا فَهِيَ صَغِيْرَةٌ . وَاِنْ اُضِيْفَتْ اِلٰى مَادُوْنَهَا فَهِيَ كَبِيْرَةٌ . وَالْكَبِيْرَةُ الْمُطْلَقَةُ هِيَ الْكُفْرُ . اِذْلَا ذَنْبَ اَكْبَرُ مِنْهُ وَبِالْجُمْلَةِ الْمُرَادُ هٰهُنَا اَنَّ الْكَبِيْرَةَ الَّتِيْ هِيَ غَيْرُ الْكُفْرِ لَاتُخْرِجُ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْاِيْمَانِ لِبَقَاءِ التَّصْدِيْقِ الَّذِيْ هُوَ حَقِيْقَةُ الْاِيْمَانِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ حَيْثُ زَعَمُوْا اَنَّ مُرْتَكِبَ الْكَبِيْرَةِ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَلَا كَافِرٍ . وَهٰذَا هُوَ الْمَنْزِلَةُ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ بِنَاءً عَلٰى اَنَّ الْاَعْمَالَ عِنْدَهُمْ جُزْءٌ مِنْ حَقِيْقَةِ الْاِيْمَانِ . وَلَاتُدْخِلُهُ اَيِ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ فِي الْكُفْرِ خِلَافًا لِلْخَوَارِجِ فَاِنَّهُمْ ذَهَبُوْا اِلٰى اَنَّ مُرْتَكِبَ الْكَبِيْرَةِ بَلِ الصَّغِيْرَةِ اَيْضًا كَافِرٌ . وَاَنَّهُ لَاوَاسِطَةَ بَيْنَ الْاِيْمَانِ وَالْكُفْرِ .

সহজ তরজমা

এবং কবীরা গুনাহ .... এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. বর্ণনা করেন– কবীরা গুনাহ নয়টি। ১) আল্লাহর সাথে শরীক করা। ২) কাউকে অন্যায়ভাবে হত্য করা। ৩) সত্বী-সাধবী নারীকে ব্যাভিচারের অপবাদ দেওয়া। ৪) যেনা-ব্যাভিচার করা। ৫) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ণ করা। ৬) যাদু করা। ৭) এতিমের মাল ভক্ষণ করা। ৮) মুসলমান পিতা-মাতার নাফরমানি করা। ৯) হেরেম শরীফে গুনাহর কাজ করা। হযরত আবু হুরাইরা রাযি. সুদ খাওয়া বৃদ্ধি করেছেন। হযরত আলী রাযি. চুরি এবং মদ্যপান বৃদ্ধি করেছেন। আরও বর্ণিত আছে, যে গুনাহর ক্ষতি উপরিউক্ত গুনাহগুলোর কোন একটির সমান অথবা তার চেয়ে বেশী হবে, তা-ই কবীরা গুনাহ গণ্য হবে। কেউ কেউ বলেন, যেসব গুনাহের ব্যাপারে শরী'আত প্রণেতা বিশেষভাবে ভীতি প্রদর্শন করেছেন, সেগুলো কবীরা গুনাহ। আবার কেউ কেউ বলেন, যেসব গুনাহে বান্দা বাড়াবাড়ি করে (অভ্যস্ত হয়ে পড়ে) তা কবীরা গুনাহ। আর যে গুনাহ থেকে তওবা-ইস্তেগফার করে তা ছগীরা গুনাহ। কিফায়া গ্রন্থাকার বলেন– প্রকৃত কথা হল, ছগীরা এবং কবীরা গুনাহ আপেক্ষিক একটি নাম। এর মৌলিক কোন পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং প্রতিটি গুনাহ যাকে তদপেক্ষা বড় গুনাহের সাথে তুলনা করা হবে, তা ছোট গুনাহ; আর যদি তদপেক্ষা ছোট গুনাহ এর সাথে তুলনা করা হয়, তা হবে কবীরা গুনাহ। মুতলাক কবীরা গুনাহ কুফরী। কেননা তদপেক্ষা বড় কোন গুনাহ নেই। মোটকথা, এখানে (মূলপাঠে কবীরা দ্বারা) কুফর ভিন্ন অন্য কবীরা গুনাহ উদ্দেশ্য। সে গুনাহ মুমিন বন্দাকে ঈমান থেকে বের করে দেয় না। কেননা তখনও তাসদীক তথা ঈমানের হাকিকত বলবৎ থাকে। প্রক্ষান্তরে মুতাযিলা বলে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মুমিন নয় এবং কাফিরও নয়। এরই নাম مَنْزِلَةٌ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ বা দুটি স্তরের মধ্যস্তর। এ হিসাবে তাদের মতে আমলগুলো ঈমানের হাকিকতের অংশ নয়। কবীরা গুনাহ মুমিন বান্দাকে কুফরে প্রবিষ্ট করে না। পক্ষান্তরে খারেজী সম্প্রদায়ের মতে কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি, এমনকি ছগীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিও কাফির। আর ঈমান ও কুফরীর মাঝামাঝি বলতে কিছু নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মুল গ্রন্থকারের উক্তি اَلْكَبِيْرَةُ মুবতাদা আর لَاتُخْرِجُ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْاِيْمَانِ খবর। কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি ঈমান থেকে বেরিয়ে যাওয়া এবং না যাওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন মাযহাবের মতানৈক বর্ণনা করার পূর্বে কবীরা গুনাহ কাকে বলে ? জানা দরকার।

কবীরা গুণাহের পরিচয়

শারেহ রহ.বলেন– কবীরা গুনাহ নির্ণয় এবং তার পরিচয়ের ব্যাপারে একাধিক রিওয়ায়েত রয়েছে। কবীরা গুনাহ ৯টি। ১) একাত্ববাদ এবং ইবাদতের যোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর পাকের সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করা। ২) স্বাধীন, বিবেকবান পরিণিতা বয়সের কোন সত্বী মুমিন নারীকে যেনার অপবাদ দেওয়া। ৩) অন্যায় হত্যা। চাই অপর কাউকে হোক কিংবা নিজেকেই হোক, যাকে বলে আত্মহনন। ৪) যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। ৫) যুদ্ধ-জিহাদের ময়দান থেকে কাফিরদের সাথে লড়াই ছেড়ে পলায়ণ করা। ৬) কারও উপর যাদু করা। ৭) ইয়াতীমের সম্পদ নষ্ট করা তথা নাজায়েয পদ্ধতিতে ব্যবহার করা। ৮) জায়েয কর্ম-কথায় মুসলমান পিতামাতার নাফরমানী করা। ৯) হেরেম শরীফের সীমানায় কোন গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া।

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. উপরিউক্ত নয়টি কবীরা গুনাহের সাথে সুদ খাওয়া বাড়িয়েছেন। আর হযরত আলী রাযি. তৎসঙ্গে চুরি করা এবং মদ্যপান বাড়িয়েছেন। এভাবে কবীরা গুনাহের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২টি। কেউ কেউ বলেন– যেসব গুনাহের জঘন্যতা এবং ক্ষতি উপরিউক্ত গুনাহগুলোর কোনটির সমান কিংবা বেশি হবে, তা-ও কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। সমান হওয়ার দৃষ্টান্ত হল, মদ্যপান ছাড়া অপর কোন নেশাজাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করা, যা নেশা উদ্রেকের ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের হবে। আর অধিক হওয়ার দৃষ্টান্ত হল, ডাকাতি তথা ধন-সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য গতিরোধ করা। এটি চুরি অপেক্ষাও জঘন্য। কেউ কেউ বলেন– যেসব গুনাহের উপর বিশেষভাবে ধমক দেওয়া হয়েছে এবং ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, সেগুলো কবীরা গুনাহ। যেমন, প্রাণীর প্রতিচিত্র ও ফটো তৈরি করা। কেননা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষভাবে ধমকী ও ভীতি প্রদর্শন করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, كُلُّ مُصَوِّرٍ فِى النَّارِ। (প্রত্যেক ফট্রোগ্রাফার ও ছবি নির্মাতা জাহান্নামে যাবে)।

আবার কেউ কেউ বলেন– বান্দা যে গুনাহকে গৌণ মনে করে তাতে নিরন্তর লিপ্ত থাকে, তা কবীরা গুনাহ। বস্তুতঃ যদিও তা সত্ত্বাগতভাবে গৌণ হোক না কেন। আর যে গুনাহ করার পর তাওবা-ইস্তিগফার করে নেয়, তা ছগীরা গুনাহ। বস্তুতঃ যদিও তা সত্ত্বাগতভাবে কবীরা হোক না কেন। মোটকথা, ছগীরা গুনাহের উপর বাড়াবাড়ির ও লেগে থাকা ঐ গুনাহকে কবীরা বানিয়ে দেয়। আর কবীরা গুনাহ থেকে তাওবা-ইস্তিগফার সে গুনাহকে ছগীরা বানিয়ে দেয়। সম্ভবতঃ এ অভিমতের উৎস হযরত উমর রাযি. এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এর উক্তি لَاصَغِيْرَةَ مَعَ الْاِصْرَارِ وَلَا كَبِيْرَةَ مَعَ الْاِسْتِغْفَارِ অর্থাৎ গুনাহে অটল থাকলে সেগুনাহ ছগীরা থাকে না এবং গুনাহ থেকে তাওবা-ইস্তিগফার করার পর তা আর কবীরা থাকে না।

কিফায়া গ্রন্থকার বলেন– সগীরা ও দুটি আপেক্ষিক নাম। এগুলোর মৌলিক কোন সংজ্ঞা হতে পারে না। একই গুনাহ তার চেয়ে বড় গুনাহের বিপরীতে কবীরা গুনাহ। যেমন, অন্যায়ভাবে কারও মাথা ফাটানো বা বিদীর্ণ করা, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার তুলনা ছগীরা গুনাহ; কিন্তু চপোটাঘাতের তুলনায় কবীরা গুনাহ। ফলকথা, কবীরা গুনাহের উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো থেকে যে কোনও একটি গ্রহণ করা যাবে।

কবীরা গুণাহে লিপ্ত ব্যক্তি কি ঈমান থেকে খারেজ

এখানে মূলপাঠে কবীরা গুনাহ বলতে কুফর ভিন্ন অন্যান্য কবীরা গুনাহ উদ্দেশ্য। হকপন্থীদের মতে এমন গুনাহ বান্দাকে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের করে দেয় না এবং কুফরের গণ্ডিতেও প্রবিষ্ট করে না বরং কবীরা গুনাহে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও বান্দা মুমিন থাকে। এর পরিপন্থী মুতাযিলা ও খারেজীরা। মুতাযিলার মতে কবীরা গুনাহ বান্দাকে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। তবে কুফরের গণ্ডিতে প্রবিষ্ট করে না। কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মুমিন থাকে না; আবার কাফিরও হয় না বরং ঈমান ও কুফরের মাঝামাঝি স্তরে থাকে। কবীরা গুনাহ সম্পর্কে মুতাযিলার এ মাতাদর্শ আকীদা শাস্ত্রবিদদের নিকট مَنْزِلَةٌ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ (দুটি স্তরের মাঝামাঝি স্তর) নামে স্বীকৃত। আর খারেজী সম্প্রদায়ের নিকট কবীরা গুনাহ বান্দাকে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের করে কুফরের গণ্ডিতে প্রবিষ্ট করে দেয়। সুতরাং কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফির। বস্তুতঃ এ মতপার্থক্য ঈমানের সংজ্ঞা নির্ণয়ের উপর নির্ভরশীল।

ঈমান কি ?

হকপন্থীদের মতে কেবল আন্তরিক বিশ্বাসের নাম ঈমান। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আনিত বিষয়াবলিকে সত্য জেনে অন্তর থেকে সত্য বলে স্বীকার করর নাম ঈমান। আমল ঈমানের মৌলিক অংশভুক্ত নয় যে, আমল ছুটে গেলে ঈমানও অবশ্যই নষ্ট হয়ে যাবে। আবার কবীরা গুনাহে লিপ্ত হলেও আন্তরিক বিশ্বাস ও সত্যায়ণ তথা ঈমানের হাকীকত বা মৌলিক ঈমান নষ্ট হয়ে যায় না। যেমন, কেউ কামাতুর ও যৌন উত্তেজনায় বাধ্য হয়ে কারও সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হল। এতে যেনা হারাম হওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তার সত্যায়ণ না করা অবশ্যম্ভাবী হয় না।

সুতরাং কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও যখন আন্তরিক বিশ্বাস তথা ঈমানের হাকীকত বলবৎ থাকে তখন কবীরা গুনহে আক্রান্ত ব্যক্তি মুমিনই থাকবে; কাফির হবে না।

পক্ষান্তরে মুতাযিলা ও খারেজী সম্প্রদায়ের নিকট আমলও ঈমানের হাকীকতের অংশ। কাজেই যখন সে কবীরা গুনাহে আক্রান্ত হল, তখন এই কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার আমল, যে ব্যাপারে সে আদিষ্ট ছিল তা ছুটে গেল। আর আংশিক ছুটে যাওয়া পূর্ণাঙ্গ বস্তু ছুটে যাওয়াকে আবশ্যক করে। কাজেই তার ঈমান নষ্ট হয়ে গেল। কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মুতাযিলা ও খারেজী উভয়ের নিকট ঈমান থেকে বের হয়ে গেল। অধিকন্তু মুতাযিলার নিকট কুফরের হাকীত جُحُوْد তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আনিত বিষয়গুলোকে প্রকাশ্যভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, অস্বীকার করা। কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য সে গুনাহের নিষিদ্ধতা ও অবৈধতাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা কিংবা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আনিত কোনও বিষয় অস্বীকার করা আবশ্যক নয়। সুতরাং যখন কুফরের হাকীকত جُحُوْد তথা অস্বীকৃতি ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা পাওয়া গেল না, তখন সে কুফরে প্রবিষ্ট হবে না।

আর খারেজীদের নিকট কুফরের হাকীকত হল ঈমান না থাকা। কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে ঈমান থেকে বের হওয়া মানেই ঈমান না থাকা। কাজেই কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ঈমান থেকে বের হয়ে কুফরে প্রবিষ্ট হওয়া সুনিশ্চিত।

وَلَنَا وُجُوْهٌ اَلْاَوَّلُ مَاسَيَجِئُ مِنْ اَنَّ حَقِيْقَةَ الْاِيْمَانِ هُوَ التَّصْدِيْقُ الْقَلْبِيُّ فَلَا يَخْرُجُ الْمُؤْمِنُ عَنِ الْاِتِّصَافِ بِهٖ اِلَّا بِمَايُنَافِيْهِ . وَمُجَرَّدُ الْاِقْدَامِ عَلَى الْكَبِيْرَةِ لِغَلْبَةِ شَهْوَةٍ اَوْ حَمِيَّةٍ اَوْ اَنَفَةٍ اَوْكَسَلٍ خُصُوْصًا اِذَا اقْتَرَنَ بِهٖ خَوْفُ الْعِقَابِ وَرَجَاءُ الْعَفْوِ وَالْعَزْمُ عَلَى التَّوْبَةِ لَايُنَافِيْهِ . نَعَمْ اِذَا كَانَ بِطَرِيْقِ الْاِسْتِحْلَالِ وَالْاِسْتِخْفَافِ كَانَ كُفْرًا لِكَوْنِهٖ عَلَامَةً لِلتَّكْذِيْبِ . وَلَانِزَاعَ فِىْ اَنَّ مِنَ الْمَعَاصِىْ مَا جَعَلَهُ الشَّارِعُ اَمَارَةً لِلتَّكْذِيْبِ . وَعُلِمَ كَوْنُهٗ كَذَالِكَ بِالْاَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ كَسُجُوْدِ الصَّنَمِ وَاِلْقَاءِ الْمُصْحَفِ فِى الْقَاذُوْرَاتِ وَالتَّلَفُّظِ بِكَلِمَاتِ الْكُفْرِ وَنَحْوِ ذَالِكَ مِمَّا ثَبَتَ بِالْاَدِلَّةِ اَنَّهٗ كُفْرٌ . وَبِهٰذَا يَنْحَلُّ مَا يُقَالُ اِنَّ الْاِيْمَانَ اِذَا كَانَ عِبَارَةً عَنِ التَّصْدِيْقِ وَالْاِقْرَارِ يَنْبَغِىْ اَنْ لَايَصِيْرَ الْمُؤْمِنُ الْمُقِرُّ الْمُصَدِّقُ كَافِرًا بِشَئٍ مِنْ اَفْعَالِ الْكُفْرِ وَاَلْفَاظِهٖ مَالَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْهُ التَّكْذِيْبُ اَوِالشَّكُّ

সহজ তরজমা

কবীরা গুণাহ কারীর ঈমান থাকে

আমাদের (এ সংক্রান্ত) প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। প্রথম প্রমাণ শীঘ্রই (ঈমানের-আলোচনায়) আসেছ অর্থাৎ ঈমানের হাকীকত (বাস্তব-প্রকৃতি) কেবলই আন্তরিক বিশ্বাস। কাজেই মুমিন বান্দা আন্তরিক বিশ্বাস বা সত্যায়ণের পরিপন্থী কোনও বিষয়ে লিপ্ত হওয়া ব্যতীত ঈমান তথা আন্তরিক সত্যায়ণের গুণে গুণন্বিত থাকা থেকে বের হবে না। আর যৌন উত্তেজনা, আত্মসম্মানবোধ, অহমিকা কিংবা উদাসীনতার কারণে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া বিশেষতঃ যখন কবীরা গুণাহ করার মুহূর্তে আযাবের ভয় ও ক্ষমার আশা এবং তাওবা করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকবে, তখন তা আন্তরিক সত্যায়ণের পরিপন্থী নয়। অবশ্য যখন সেটিকে হালাল (বৈধ) কিংবা গৌণ মনে করে কবীরা

গুনাহে লিপ্ত হবে, তখন কুফর হবে। কেননা তা মিথ্যা প্রতিপন্নতার লক্ষণ। আর কিছু গুনাহ এমন, যেগুলোকে শরী'আত (প্রবর্তক) মিথ্যা প্রতিপন্ন করার লক্ষণ সণাক্ত করেছে– এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই এবং তা জানা গেছে শরঈ প্রমাণের আলোকে। যেমন, প্রতিমাকে সিজদা করা, কুরআনে কারীমাকে নোংরা-নাপাক স্থানে নিক্ষেপ করা, কুফরী কালাম উচ্চারণ করা এবং এ জাতীয় যেসব বিষয় কুফর হওয়ার কথা (শরঈ) প্রমাণাদির আলোকে চূড়ান্ত হয়েছে। এতে কথিত ঐ প্রশ্নের অবসান ঘটে যে, ঈমান যখন সত্যায়ণ ও স্বীকারোক্তির নাম, তখন সত্যায়ণকারী ও স্বীকৃতিদানকারী মুমিন বান্দা কোন কুফরী কাজ এবং কুফরী কথার কারণে কাফির না হওয়া উচিৎ যাবৎ না তার থেকে মিথ্যায়ণ করা কিংবা সংশয়-সন্দেহ প্রমাণিত হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হকপন্থীদের প্রমাণ

কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি ঈমানাদার হওয়া ব্যাপারে হকপন্থীদের পক্ষ থেকে শারেহ রহ.একাধিক প্রমাণ পেশ করেছেন। যথা–

এক. প্রথম প্রমাণের সারকথা, বস্তুতঃ ঈমান আন্তরিক বিশ্বাস তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক আনিত যাবতীয় বিষয়কে সত্যায়ণ করার নাম। সুতরাং এই আন্তরিক বিশ্বাসের পরিপন্থী কোন বিষয় তথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সে ঈমানদার থাকবে। আর নিছক কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া, সে ব্যাপারে অবতীর্ণ সতর্কবাণী বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়। চাই যৌন উত্তেজনার বশে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হোক। যেমন, যেনা-ব্যভিচার। কিংবা ক্রোধজনিত কারণে হোক। যেমন, কোন গালমন্দকারীকে হত্যা করা। অথবা ক্রোধমুক্ত লজ্জার কারণে হোক। যেমন, কন্যাসন্তানকে জীবন্ত প্রোথিক করণ। কিংবা অলসতা ও উদাসীনতার কারণে হোক। যেমন, নামায ছেড়ে দেওয়া। বিশেষতঃ যখন কবীরা গুনাহ করার সময় পরকালে শাস্তির ভয়, আল্লাহপাকের ক্ষমার আশা এবং তাওবা-ইস্তিগফারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকবে। কেননা উপরিউক্ত কারণসমূহ তথা যৌন উত্তেজনা, আত্মমর্যাদাবোধ, দম্ভ-অহংকার কিংবা অলসতার কারণে বান্দা কবীরা গুনাহে লিপ্ত হচ্ছে, কবীরা গুনাহের ব্যাপারে অবতীর্ণ সতর্কবাণী অস্বীকার এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে নয়। আর কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সময় পরকালের শাস্তির ভয় এবং আগামীর জন্য তাওবা-ইস্তিগফারের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা থাকায় প্রতীয়মান হয় যে, তার মনে ঐ কবীরা গুনাহের ব্যাপারে অবতীর্ণ সতর্কবাণীর বিশ্বাস রয়েছে।

কোন কোন কবীরা গুণাহ কুফরী

قَوْلُهُ: نَعَمْ الخ ঃ এটি একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন হল, কিছু কিছু কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়াকে শরী'আত প্রবর্তক কুফর সাব্যস্ত করেছেন। তদুপরি আপনি কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়াকে আন্তরিক বিশ্বাসের পরিপন্থী নয় বলেন কিভাবে ?

জবাব ঃ শারেহ রহ.কোন কোন গুনাহকে তাস্‌দীক পরিপন্থী তাক্‌যীব বা বিশ্বাসের পরিপন্থী মিথ্যা প্রতিপন্নতার লক্ষণ আখ্যা দিয়েছেন। আর তা (সেগুলো মিথ্যা প্রতিপন্নতার লক্ষণ হওয়া) শরঈ দলীল দ্বারা পরিজ্ঞাত। যেমন– প্রতিমাকে সিজদা করা, কুরআনে কারীমকে (মা'আযাল্লাহ) নাপাক স্থান বা আবর্জনায় ফেলা, কুফরী কথা বলা কিংবা এমন কাজ করা, যার কুফর হওয়া দলীল-প্রমাণ দ্বারা স্বীকৃত। কেননা উপরিউক্ত কাজগুলো ইজমায়ে উম্মত ও স্বতঃসিদ্ধভাবে কুফর বলে প্রমাণিত। আর যে বিধান ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হয়, তা শরীআত প্রবর্তকের পক্ষ থেকে হয়। কারণ, স্বয়ং শরীআত প্রবর্তক হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শাশ্বত বাণী– لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ দ্বারা ইজমায়ে উম্মত শরঈ দলীল বলে প্রমাণিত। এজন্যই আমরা বলি, কবীরা গুনাহ যদি এমন ভঙ্গিতে হয়, যাতে বুঝা যায়, সে (আক্রান্ত ব্যক্তি) ঐ গুনাহ হালাল হওয়ার বিশ্বাস রাখে কিংবা গৌন মনে করে, তবে তা হবে কুফর। এর কারণ এই নয় যে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া তাসদীক তথা হাকীকতে ঈমান বা মৌলিক ঈমান পরিপন্থী বরং এর কারণ হল, উপরিউক্ত ভঙ্গিতে ও ধ্যান-ধারণায় কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া তাকযীব তথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার লক্ষণ।

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা কথিত সে প্রশ্নের অবসান ঘটে যে, যখন বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তির নাম ঈমান তখন বিশ্বাস স্থাপনকারী ও স্বীকৃতিদাতা কোন মুমিন ব্যক্তি কোন কুফরী কাজ বা কুফরী কথার কারণে কাফির না হওয়া চাই, যাবৎ না তা তার পক্ষ থেকে আন্তরিক বিশ্বাস বিরোধী তাকযীব বা মিথ্যা প্রতিপন্নতা ও সংশয়-সন্দেহ প্রমাণিত হবে। উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা এ সন্দেহ নিরসনের কারণ হল, কুফরী কাজ করা কিংবা কুফরী কথা উচ্চারণ করাকে শরী'আত প্রবর্তক তাকযীব তথা মিথ্যা প্রতিপন্নতার লক্ষণ আখ্যা দিয়েছেন, যা তাসদীক তথা বিশ্বাস বিরোধী। এ লক্ষণের ভিত্তিতেই আমরা তাকে কাফির বলব।

اَلثَّانِى اَلْاٰيَاتُ وَالْاَحَادِيْثُ اَلنَّاطِقَةُ بِاِطْلَاقِ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْعَاصِى كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى وَقَوْلِهٖ تَعَالٰى يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ـ وَقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا اَلْاٰيَةَ وَهِىَ كَثِيْرَةٌ ـ وَالثَّالِثُ اِجْمَاعُ الْاُمَّةِ مِنْ عَصْرِ النَّبِىِّ ﷺ اِلٰى يَوْمِنَا هٰذَا بِالصَّلٰوةِ عَلٰى مَنْ مَاتَ مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ وَالدُّعَاءِ وَ الْاِسْتِغْفَارِ لَهُمْ مَعَ الْعِلْمِ بِارْتِكَابِهِمُ الْكَبَائِرَ بَعْدَ الْاِتِّفَاقِ عَلٰى اَنَّ ذٰلِكَ لَايَجُوْزُ لِغَيْرِ الْمُؤْمِنِ

সহজ তরজমা

দ্বিতীয় প্রমাণ সে সব আয়াতে কারীমা ও হাদীস, যেগুলো গুনাহগারের ক্ষেত্রে মুমিন শব্দ প্রয়োগের স্বাক্ষী। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী, হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের উপর নিহতদের ব্যাপারে কিসাস ফরয করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর দরবারে খাটিভাবে তাওবা কর। অদ্রুপ আল্লাহর বাণী, 'যদি দুটি মুমনি সম্প্রদায় পরস্পর লড়াই করে......। এবং এ ধরনের আয়াতে কারীমা প্রচুর। তৃতীয় প্রমাণ– রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পবিত্র যুগ থেকে অদ্যাবধি যেসব মুসলমান তাওবা ছাড়া মৃত্যু বরণ করেছে, তাদের জানাযার নামায পড়া এবং তারা কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়েছে জেনেও তাদের জন্য দু'আ-ইস্তিগফির (গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা) করার ব্যাপারে সকল উম্মতের মতৈক্য রয়েছে। অথচ গাইরে মুমিন তথা মুমিন নয় এমন ব্যক্তির জন্য এসব নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারেও উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

দুই. কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মুমিন হওয়ার পক্ষে দ্বিতীয় প্রমাণ সেসব আয়াতে কারীমা এবং একাধিক হাদীস শরীফ, সেগুলোতে তার উপর "মুমিন" শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী–

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى (سورة بقر ١٧٨)

প্রমাণের বিশ্লেষণঃ এ আয়াতে কারীমায় বলা হয়েছে, অন্যায়ভাবে হত্যাকারীর উপর কিসাস ওয়াজিব। আর অন্যায়ভাবে হত্যাকারী কবীরা গুনাহে লিপ্ত। তদুপরি আল্লাহ তা'আলা তাকে يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (হে ঈমানদার!) বলে সম্বোধন করেছেন। এতে বুঝা যায়, কবীরা গুনাহ বান্দাকে ঈমান (এর গণ্ডি) থেকে বের করে দেয় না। অনুরূপভাবে يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا (হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট খালেস তাওবা কর। সূরা তাহরীম-৮)

প্রমাণের বিশ্লেষণঃ সগীরা গুনাহ তো اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (নেককাজ সগীরা গুনাহসমূহ মোচন করে দেয়) এর আওতায় তাওবা ছাড়াই মাফ হয়ে যায়। বুঝা গেল, উপরিউক্ত আয়াতে কারীমায় তাওবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কবীরা গুনাহে লিপ্তদেরকে। তদুপরি يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এতেও প্রতীয়মান হয়, কবীরা গুনাহ বান্দাকে ঈমান থেকে বের করে দেয় না।

অনুরূপভাবে মুমিনদের জন্য পরস্পর লড়াই করা কবীরা গুনাহ। পরস্পর লড়াইকারী মুমিন দু'পক্ষই কবীরা গুনাহে লিপ্ত। তদুপরি আল্লাহ তা'আলা وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِقْتَتَلُوْا আয়াতে কারীমায় উভয় পক্ষকে মুমিন বলেছেন। এতেও বুঝা গেল, কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে বান্দা ঈমান থেকে বের হয় না।

তিন. কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি যদি মুমিন না হত, তাহলে তাওবা ছাড়া মৃত্যু বরণকারী কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়া এবং তার জন্য দু'আ-ইস্তিগফার করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগ থেকে অদ্যাবধি সকল উম্মতের ইজমা হত না। কেননা গাইরে মুমিন তথা বেঈমানের জানাযার নামায পড়া এবং তার জন্য দু'আ-ইস্তিগফার করা নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। অথচ উম্মতের কিবলাপন্থী তথা মুসলমানদর মধ্যে থেকে তাওবা ছাড়া মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়া এবং তার জন্য দু'আ-ইস্তিগফার করার ব্যাপারে গোটা উম্মতের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত। বুঝা গেল, কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে বান্দা ঈমান থেকে বের হয় না। সে আমাদের দু'আ-ইস্তিগফার পাওয়ার যোগ্য।

وَاحْتَجَّتِ الْمُعْتَزِلَةُ بِوَجْهَيْنِ ـ اَلْاَوَّلُ اَنَّ الْاُمَّةَ بَعْدَ اِتِّفَاقِهِمْ عَلٰى اَنَّ مُرْتَكِبَ الْكَبِيْرَةِ فَاسِقٌ اِخْتَلَفُوْا فِىْ اَنَّهٗ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مَذْهَبُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اَوْ كَافِرٌ وَهُوَ قَوْلُ الْخَوَارِجِ اَوْ مُنَافِقٌ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ فَاَخَذْنَا بِالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَتَرَكْنَا الْمُخْتَلَفَ فِيْهِ وَقُلْنَا هُوَ فَاسِقٌ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَلَاكَافِرٍ وَلَا مُنَافِقٍ ـ وَالْجَوَابُ اَنَّ هٰذَا اِحْدَاثٌ لِلْقَوْلِ الْمُخَالِفِ لِمَا اَجْمَعَ عَلَيْهِ السَّلَفُ مِنْ عَدَمِ الْمَنْزِلَةِ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ فَيَكُوْنُ بَاطِلًا

সহজ তরজমা

মুতাযিলা দুটি প্রমাণ পেশ করেছে। প্রথম প্রমাণ– কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি ফাসিক হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার পর তারা এ ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন যে, সে লোক কি মুমিন। এটি (মুমিন হওয়া) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মত। নাকি সে লোক কাফির ? এটি (কাফির হওয়া) খারেজীদের মত। নাকি সে লোক মুনাফিক ? এটি (মুনাফিক হওয়া) হযরত হাসান বসরী (রহ.) এর অভিমত। সুতরাং আমরা সর্বসম্মত মত গ্রহণ করেছি; পরিত্যাগ করেছি বিতর্কিত মতবাদ। বলেছি, সে লোক ফাসিক। মুমিনও নয়; কাফিরও নয়। আবার মুনাফিকও নয়। (এর) জবাব হল, নিশ্চিত এটি এমন একটি উদ্ভট কথার আবিস্কার, যা প্রবীণদের (সালফে সালেহীনের) সর্বসম্মত মতাদর্শ তথা ঈমান ও কুফরের মাঝে কোন স্তর না থাকা -এর পরিপন্থী। কাজেই তা ভ্রান্ত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মু'তাযিলার দলীল

মুতাযিলারা দাবী করে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মুমিনও নয়; কাফিরও নয়। এর উপর তারা দুটি প্রমাণ পেশ করে থাকে। এক. কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কে চারটি অভিমত রয়েছে। (১) সে ফাসিক। (২) সে মুমিন। (৩) সে কাফির। (৪) সে মুনাফিক। তন্মধ্যে প্রথম অভিমত অর্থাৎ কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ফাসিক হওয়া সর্বসম্মত মত। আর বাকীগুলো বিতর্কিত। যেমন, মুমিন হওয়ার প্রবক্তা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। অন্যান্যরা এর বিরোধিতা করেন। কাফির হওয়ার প্রবক্তা খারেজী সম্প্রদায়, বাকীরা এর বিরোধীতা করেন। মুনাফিক হওয়ার প্রবক্ত হাসান বসরী। বাকীরা এর বিরোধীতা করেন। কাজেই আমরা সর্বসম্মত বিষয়টি গ্রহণ করে বিতর্কিত বিষয়টি পরিহার করেছি। বলেছি, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি ফাসিক। মুমিনও নয়, কাফিরও এবং মুনাফিকও নয়।

ব্যাখ্যাতা মুতাযিলার এ প্রমাণের জবাবে বলেন– কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মুমিন বা কাফির কোনটিই না হওয়া; তদ্রুপ ঈমান ও কুফরের মাঝে কোন স্তর থাকার মতাদর্শ সালফে সালেহীনের ঐকমতের বিপরীত। আর যেসব উক্তি ও মতাদর্শ সলফে সালেহীনের পরিপন্থী হবে, তা ভ্রান্ত। কাজেই "কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মুমিনও নয়, কাফিরও নয়" উক্তিটি ভ্রান্ত। তদ্রুপ ঈমান ও কুফরের মাঝে কোন স্তর থাকার উক্তিও ভ্রান্ত হবে।

.হাসান বসরী রহ. কি ঈমান ও কুফরের মধ্যস্তরের প্রবক্তা ?

قَوْلُهٗ: اِنَّ هٰذَا اِحْدَاثٌ لِلْقَوْلِ الْمُخَالِفِ الخ ঃ এখানে هٰذَا এর মুশারুন ইলাইহি "মুমিনও নয়, কাফিরও নয়।" প্রশ্ন হল, হাসান বসরীও সালফ (প্রবীণ) এর অন্তর্ভুক্ত। অথচ তিনি ঈমান ও কুফরের মাঝে স্তর থাকার প্রবক্তা। কেননা তিনি কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে মুমিনও নয়; কাফিরও নয় বরং মুনাফিক বলেছেন। এতে বুঝা যায়, নিফাক ঈমান ও কুফরের মাঝামাঝি জিনিস অর্থাৎ ঈমান ও কুফরের মধ্যস্তর হল নিফাক।

জবাব ঃ (ক) কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মুনাফিক হওয়া সত্ত্বেও তার মতে সে মুমিন। যেন নিফাক দ্বারা তার উদ্দেশ্য নিফাকে আমলী তথা আমলের কপটতা; নিফাকে ইতিকাদী বা বিশ্বাসজনিত কপটতা নয়।

(খ) কেউ কেউ এর জবাবে বলেন, ঈমান এবং মুতলাক বা শর্তমুক্ত কুফরের মাঝে স্তর না থাকার ব্যাপারে ইজমা (ঐক্যমত) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর হাসান বসরী ঈমান ও মুতলাক কুফরের মাঝে স্তর থাকার কথা বলেন না বরং ঈমান ও প্রকাশ্য কুফরের মাঝে স্তর থাকার কথা বলেন। অর্থাৎ লোকটি প্রাকশ্য কুফরীতে লিপ্ত নয় যে,

তার মুমিন না হওয়া (বেঈমানি) জানা যাবে; আবার ঈমানের সকল দাবীও পূরণ করে না যে, তার মুমিন হওয়া (ঈমানদারি) জানা যাবে। অর্থাৎ তার বাহ্যিক কাজকর্মে স্পষ্ট কুফরী কিংবা ঈমানদারী কোনটিই পরিস্কার ফুটে ওঠে না। বিধায় তার মুমিন হওয়া-না হওয়া অস্পষ্ট।

اَلثَّانِىْ اَنَّهٗ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ـ جَعَلَ الْمُؤْمِنَ مُقَابِلًا لِلْفَاسِقِ ـ وَقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَايَزْنِىْ الزَّانِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَقَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ ـ وَلَا كَافِرٍ لِمَا تَوَاتَرَتْ مِنْ اَنَّ الْاُمَّةَ كَانُوْا لَايَقْتُلُوْنَهٗ وَلَا يُجْرُوْنَ عَلَيْهِ اَحْكَامَ الْمُرْتَدِّيْنَ وَيَدْفِنُوْنَهٗ فِىْ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ ـ وَالْجَوَابُ اَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَاسِقِ فِى الْاٰيَةِ هُوَ الْكَافِرُ فَاِنَّ الْكُفْرَ مِنْ اَعْظَمِ الْفُسُوْقِ وَالْحَدِيْثُ وَارِدٌ عَلٰى سَبِيْلِ التَّغْلِيْظِ وَالْمُبَالَغَةِ فِى الزَّجْرِ عَنِ الْمَعَاصِىْ بِدَلِيْلِ الْاٰيَاتِ وَالْاَحَادِيْثِ الدَّالَّةِ عَلٰى اَنَّ الْفَاسِقَ مُؤْمِنٌ حَتّٰى قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِاَبِىْ ذَرٍّ لَمَّا بَالَغَ فِى السُّؤَالِ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ عَلٰى رَغْمِ اَنْفِ اَبِىْ ذَرٍّ

সহজ তরজমা

দ্বিতীয় প্রমাণ- সে লোকটি মুমিন নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-أفمن كان مؤمنا ...الخ (এ আয়াতে) আল্লাহ তা'আলা মুমিনকে ফাসিক আখ্যা দিয়েছেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- لَايَزْنِىْ الزَّانِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ (ব্যভিচারী মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করতে পারে না) এবং لا ايمان لمن لا امانه له (যার মধ্যে আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই।) এবং সে কাফিরও নয়। কেননা হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, উম্মতের সদস্যরা তাকে হত্যা করত না; তার মুরতাদ হওয়ার হুকুমও জারী করত না এবং তাকে মুসলমানদের কবরস্থানেও দাফন করত না। এর জবাব হল, এ আয়াতে কারীমায় ফাসিক বলে কাফির উদ্দশ্য। আর হাদীসখানা হুকুমের মধ্যে কঠোরতা আরোপ (সৃষ্টি) এবং গুনাহ থেকে বারণ করার ক্ষেত্রে জোরাল তাগিদ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিবৃত। কেননা কিছু সংখ্যক আয়াতে কারীমা ও হাদীস এমন আছে, যার দ্বারা বুঝা যায়, ফাসিক ব্যক্তি মুমিন। এমনকি হযরত আবু যর রাযি. যখন বারবার প্রশ্ন করছিলেন, (তখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এ বিশ্বাসী ব্যক্তি জান্নাতে যাবে) তার অপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেছিলেন, যদিও সে যিনা করে, যদিও সে চুরি করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

দুই. কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মুমিনও নয়; কাফিরও নয়- এ প্রসঙ্গে মুতাযিলার দ্বিতীয় প্রমাণ হল, সে ব্যক্তি সর্বসম্মতভাবে ফাসিক, তাই সে মুমিন নয়। আল্লাহ তা'আলা اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا আয়াতে কারীমায় মুমিনকে ফাসিকের প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করেছেন। আর বৈপরিত্ব পার্থক্য কামনা করে। কাজেই ফাসিক কবীরা গুনাহে লিপ্ত বলে মুমিনের প্রতিপক্ষ হল। সুতরাং সে মুমিন হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় বাণী- لَايَزْنِىْ الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ এর মধ্যে যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত ব্যক্তি থেকে ঈমানের নফী করেছেন (অর্থাৎ যেনাকারীর ঈমান নেই বলেছেন)। অনুরূপভাবে لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ এর মধ্যে আমানতের খিয়ানতকারী অর্থাৎ কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ঈমান না থাকার কথা বলেছেন। এতেও কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি "মুমিনও নয়, কাফিরও নয়" একথাই প্রতীয়মান হয়। কেননা সে কাফির হলে তাকে মুরতাদ বলে হত্যা করা হত এবং মুসলমানের কবরস্থানে দাফন করা হত না। অথচ তেমনটি হয়নি। উম্মত তাকে হত্যাও করেনি; মুরতাদ হওয়ার হুকুমও জারী করেনি। এতে বুঝা গেল, কবীরা গুনাহে লিপ্ত বক্তি কাফির না হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের কার্যত ইজমা রয়েছে। কাজেই প্রমাণিত হয়ে গেল যে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মুমিনও নয়; কাফিরও নয়।

আমাদের জবাব

শারেহ রহ. তাদের আয়াতে কারীমা দ্বারা প্রদত্ত প্রমাণের জবাবে বলেন– এ আয়াতে ফাসিক ব্যক্তিকে যে মুমিনের প্রতিপক্ষ সনাক্ত করা হয়েছে, এর দ্বারা কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি উদ্দেশ্য নয়। কেননা কোন শব্দ মুতলাক বা শর্তহীনভাবে বলা হলে তার ফরদে কামেল বা পূর্ণ একক উদ্দেশ্য হয়। কাজেই এখানে ফাসিক দ্বারা পূর্ণাঙ্গ ফাসিক উদ্দেশ্য হবে। আর পূর্ণাঙ্গ ফাসিক হল কাফির। কেননা সর্বাপেক্ষা বড় ফিকস (পাপ) একমাত্র কুফর। অবশ্য প্রশ্ন থেকে যায় যে, হাদীস কি কঠোরতা ও শাসনের অর্থে প্রযোজ্য নাকি পূর্ণাঙ্গ ঈমান না থাকা কিংবা ঈমানের নূর (আলো) না থাকা উদ্দেশ্য ? নাকি حِيْنَ يَزْنِى দ্বারা হাদীসে পাকে হালাল ও গৌণ মনে করে যিনা করা উদ্দেশ্য, যা নিশ্চিত কুফর ?

উপরিউক্ত জবাবে অযথাই এ সংশয় করবে না যে, এখানে প্রমাণ ছাড়া (ভিত্তিহীনভাবে) নছগুলোর বাহ্যিক অর্থের বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। অথচ তা নাজায়েয। কেননা এসব নছের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য না হওয়ার পক্ষে সেসব আয়াতে কারীমা ও হাদীসগুলো স্বাক্ষ্য, যেগুলো ফাসিক ও কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মুমিন হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এমনকি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ তে বিশ্বাসী ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে। হযরত আবু যর রাযি. নবীজির দরবারে প্রশ্ন করলেন, যদিও সে যিনা-ব্যভিচার করে; যদিও সে চুরি করে। তখন চতুর্থবার (প্রশ্নের উত্তরে) আবু যর রাযি. -এর অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও নবীজী বললেন– হ্যা, যদিও সে যেনা-ব্যভিচার এবং চুরি করে, তবু সে জান্নাতে যাবে। অথচ এটি তার মনঃপূর্ত হচ্ছিল না। এ হাদীসের আলোকে পরিষ্কার বুঝা যায়, যিনা-ব্যভিচারের কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিও মুমিন।

وَاحْتَجَّتِ الْخَوَارِجُ بِالنُّصُوْصِ الظَّاهِرَةِ فِىْ اَنَّ الْفَاسِقَ كَافِرٌ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ وَقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ـ وَكَقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ ـ وَفِىْ اَنَّ الْعَذَابَ مُخْتَصٌّ بِالْكَافِرِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ، لَايَصْلٰـهَا اِلَّا الْاَشْقٰى الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ـ وَقَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّ الْخِزْىَ الْيَوْمَ وَالسُّوْءَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ اِلٰى غَيْرِ ذَالِكَ وَالْجَوَابُ اَنَّهَا مَتْرُوْكَةُ الظَّاهِرِ لِلنُّصُوْصِ الْقَاطِعَةِ عَلٰى اَنَّ مُرْتَكِبَ الْكَبِيْرَةِ لَيْسَ بِكَافِرٍ وَالْاِجْمَاعِ الْمُنْعَقِدِ عَلٰى ذٰلِكَ عَلٰى مَا مَرَّ ـ وَالْخَوَارِجُ خَوَارِجُ عَمَّا انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْاِجْمَاعُ فَلَا اِعْتِدَادَ بِهِمْ ـ

সহজ তরজমা

আর খারেজীরা সে সব নছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছে, যেগুলো ফাসিক ব্যক্তি কাফির হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী– যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-নিষেধের উপর আমল করবে না সে-ই কাফির। তিনি আরও ইরশাদ করেন– এতদসত্ত্বেও যারা কুফরে লিপ্ত হবে, তারাই ফাসিক। এবং যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দিল, সে কুফরী করল (তদ্রুপ সেসব আয়াতে কারীমা ও হাদীস দ্বারা খারেজীরা প্রমাণ পেশ করেছে, যেগুলো এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট যে) আযাব কাফিরের সাথেই সংশ্লিষ্ট। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– আযাব তার উপরই হবে, যে (সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ঐ হতভাগাই জাহান্নামে প্রবেশ করবে, যে সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং তা থেকে বিমুখ হবে। আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন, লাঞ্ছনা ও আযাব কেবল কাফিরদেরই হবে। ইত্যাদি।

জবাব হল, (উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসের) বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়; পরিত্যাজ্য। কারণ, প্রচুর অকাট্য নছ প্রমাণ করে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফির নয়। তদ্রুপ এ ব্যাপারে ইজমায়ে উম্মত রয়েছে। যেমন, পূর্বে আলোচিত হয়েছে। আর খারেজীরা সে বিষয় থেকে বহির্ভূত যার উপর ইজমা হয়েছে। কাজেই তাদের কোন গুরুত্বই নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

খারেজীদের দলীল ও তার জবাব

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, খারেজীদের নিকট কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফির। তারা স্বপক্ষে **প্রথমতঃ** সে সব নছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছে, যেগুলোতে বাহ্যতঃ বুঝা যায়, ফাসিক ব্যক্তি কাফির। **দ্বিতীয়তঃ** সে সব নছা দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেছে, যাতে বুঝা যায়, আযাব কাফিরের সাথেই খাস।

যেসব নছ দ্বারা ফাসিক ব্যক্তি কাফির বলে জানা যায় তন্মধ্যে একটি নিম্নরূপ। যথা–

(১) আল্লাহর বাণী, وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ

প্রমাণের বিশ্লেষণ ঃ কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি সর্বসম্মতভাবে ফাসিক। সে আল্লাহ তা'আলার অবতীর্ণ আহকামের উপর আমলব্রতী নয়। উপরিউক্ত আয়াতের দৃষ্টিতে এ ধরনের ব্যক্তি কাফির। কাজেই কবীরা গুনাহগার কাফির।

২. আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন, وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ

প্রমাণ বিশ্লেষণ ঃ কবীরা গুনাহগার সর্বসম্মতভাবে কাফির। আর এ আয়াতে কারীমায় اَلْفَاسِقُوْنَ খবরকে مُعَرَّف بِاللَّام এনে বুঝানো হয়েছে, একমাত্র ফাসিকই কাফির হয়। বুঝা গেল, কবীরা গুনাহগার কাফিরই।

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ

প্রথম বিশ্লেষণ ঃ জেনে বুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিত্যাগকারী কবীরা গুনাহগারকে হাদীস শরীফে সরাসরি কাফির বলা হয়েছে। তাছাড়া যেসব নছ বাহ্যতঃ আযাব কাফিরদের সাথে খাছ হওয়ার সাক্ষ্য দেয়, তা হল– اِنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى এ জাতীয় আয়াতে কারীমা। এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে, কবীরা গুনাহগারকে আযাব দেওয়া হবে। আর উক্ত আয়াতের দৃষ্টিতে আযাব দেওয়া সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কারীর সাথে খাছ। সে নিশ্চিত কাফির। কাজেই কবীরা গুনাহগারও কাফির।

জবাব ঃ কবীরা গুনাহগার ব্যক্তি কাফির নয়। বহু অকাট্য নছ এর প্রমাণ বহন করে। সাথে সাথে উম্মতের ঐকমত্যও এর উপরই প্রতিষ্ঠিত। যেমন– পিছনে গেছে, নবুওয়াতের যুগ থেকে অদ্যাবধি সকল উম্মতের ইজমা (মতৈক্য), কবীরা গুনাহগারের জানাযার নামায পড়া এবং তার জন্য দু'আ-ইস্তিগফার করার পক্ষে রয়েছে। অবশ্য প্রশ্ন থাকে যে, খারেজী সম্প্রদায় তো কবীরা গুনাহগারকে কাফির বলে। সুতরাং তাদের কাফির না হওয়ার উপর ইজমা প্রযোজ্য হয় কিভাবে? এর জবাব হল, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইজমা ধর্তব্য; অন্যের নয়। তারা এ দলের বাইরে। কাজেই তাদের বিরোধীতা ইজমা প্রতিষ্ঠার মধ্যে অন্তরায় হবে না।

وَاللّٰهُ تَعَالٰى لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ بِاِجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ لٰكِنَّهُمْ اخْتَلَفُوْا فِىْ اَنَّهٗ هَلْ يَجُوْزُ عَقْلًا اَمْ لَا ـ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ اِلٰى اَنَّهٗ يَجُوْزُ عَقْلًا ـ وَاِنَّمَا عُلِمَ عَدَمُهٗ بِدَلِيْلِ السَّمْعِ وَبَعْضُهُمْ اِلٰى اَنَّهٗ يَمْتَنِعُ عَقْلًا لِاَنَّ قَضِيَّةَ الْحِكْمَةِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْمُسِيْئِ وَالْمُحْسِنِ وَالْكُفْرُ نِهَايَةٌ فِى الْجِنَايَةِ لَايَحْتَمِلُ الْاِبَاحَةَ وَرَفْعَ الْحُرْمَةِ اَصْلًا ـ فَلَا يَحْتَمِلُ الْعَفْوَ وَرَفْعَ الْغَرَامَةِ وَاَيْضًا اَلْكَافِرُ يَعْتَقِدُهٗ حَقًّا ـ وَلَايَطْلُبُ لَهٗ عَفْوًا اَوْ مَغْفِرَةً فَلَمْ يَكُنِ الْعَفْوُ عَنْهُ حِكْمَةً ـ وَاَيْضًا هُوَ اِعْتِقَادُ الْاَبَدِ ـ فَيُوْجِبُ جَزَاءَ الْاَبَدِ ـ وَهٰذَا بِخِلَافِ سَائِرِ الذَّنْبِ ـ

সহজ তরজমা

শিরক ক্ষমাযোগ্য নয় ঃ সকল মুসলমানের স্বতঃসিদ্ধ মতে আল্লাহ তা'আলা তার সাথে কাউকে (প্রভূত্ব ও ইবাদতের যোগ্যতায়) অংশীদার করা হলে ক্ষমা করবেন না। অবশ্য যৌক্তির নিরিখে শিরক ক্ষমযোগ্য কি না –এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মতভেদ রয়েছে। কারও কারও মতে শিরক যৌক্তির নিরিখে ক্ষমাযোগ্য এবং তা শ্রুত

প্রমাণ দ্বারা বিধিত। আবার কারও কারও মতে তা যৌক্তিকভাবে অসম্ভব। কেননা হেকমতের দাবী হল, নেককার ও গুনাহগারের মাঝে পার্থক্য বিধান করা। আর কুফর চরম পর্যায়ের অপরাধ। বৈধতা ও হুরমত বা নিষিদ্ধতার যবনিকাপাত সম্ভাব্য নয়। কাজেই ক্ষমা করা এবং শাস্তির পরিসমাপ্তীও সম্ভাব্য নয়। তাছাড়া কাফির শিরককে যথার্থ মনে করে এবং সে জন্য ক্ষমা-ইস্তিগফারের প্রত্যাশী হয় না। কাজেই তাকে ক্ষমা করা হিকমত-কৌশল ও বুদ্ধিদীপ্ত নয়। তদ্রুপ কুফর তার চিরন্তন বিশ্বাস। কাজেই সে চিরস্থায়ী শাস্তিকে আবশ্যক করবে। অবশ্য তা (শিরক) অন্যান্য গুনাহের পরিপন্থী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

যুক্তির নিরিখে শিরক কি ক্ষমাযোগ্য ?

সকল মুসলমান এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহ তাআলা শিরক ও কুফর ক্ষমা করবেন না। অবশ্য তা যৌক্তিকভাবে জায়েয এবং সম্ভব কি না –এ নিয়ে উলামায়ে কিরামের মতভেদ রয়েছে। সুতরাং আশ'আরী যারা সকল বিষয়ে ভাল-মন্দকে যৌক্তিক বলে স্বীকার করেন না, তাদের দাবী হল, কুফর-শিরক ক্ষমা করা যৌক্তিকভাবে সম্ভব। কেননা ক্ষমা করা আল্লাহর কাজ। আর তার কোন কাজ মন্দ নয়। কাজেই আল্লাহ পাক কাফির-মুশরিককে ক্ষমা করে জান্নাতে দেবেন এবং অনুগত মুমিনকে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে দেবেন –যৌক্তিকভাবে এটি সম্ভব। অবশ্য শ্রুত প্রমাণাদির আলোকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, তিনি কুফর ও শিরককে ক্ষমা করবেন না। আর যে সব নছে কাফির-মুশরিকদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামে নিক্ষেপের সংবাদ দেওয়া হয়েছে, সেগুলোই শ্রুত বা ঐতিহ্যগত প্রমাণ। এর বিপরীত মুতাযিলা এবং কতিপয় মাতুরিদী, যারা ভাল-মন্দ যৌক্তিক হওয়ার পক্ষপাতি তারা বলেন– কুফর ও শিরক ক্ষমা করা যৌক্তিকভাবে সম্ভব নয়। শারেহ রহ. তাদের চারটি প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

(১) আল্লাহ তা'আলা হাকীম ও প্রজ্ঞাময়। তার প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিদ্বীপ্তির দাবী হল, তিনি নেককার এবং গুনাহগারের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখবেন। সুতরাং কাফির-মুশরিককে ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশ করালে নেককার ও পাপিষ্ঠ গুনাহগারের মধ্যে কোন তফাত থাকে না। অথচ তা হিকমত ও প্রজ্ঞা পরিপন্থী। বিধায় যৌক্তির নিরিখে নাজায়েয। এ প্রমাণের একাধিক জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রথম জবাব ঃ এ প্রমাণ অলিক একটি বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ নেকার ও পাপিষ্ঠ গুনাহগারের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখা আল্লাহর উপর ওয়াজিব। আমরা বলি, আল্লাহর উপর কোন কিছুই ওয়াজিব নয়।

দ্বিতীয় জবাব ঃ পাপিষ্ঠ গুনাহগারকে ক্ষমা না করা এবং ক্ষমা করার মধ্যেই কেবল পার্থক্য নিহীত নয় বরং ভিন্নভাবেও তাদের (নেককার ও পাপিষ্ঠের) মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখা যেতে পারে। যেমন, উভয়কে জান্নাতে রেখে গুনাহগারকে আল্লাহর দর্শন লাভ কিংবা অন্যান্য নেয়ামত থেকে বঞ্চিত রাখা হল।

তৃতীয় জবাব ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞাময়। কিন্তু তার সকল হিকমত ও প্রজ্ঞাই আমাদের পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক নয়। কাজেই নেককার ও গুনাহগারের মধ্যে পার্থক্য না করার পেছনে এমনও কোন হিকমত থাকতে পারে, যা আমরা অবগত নই।

(২) মুতাযিলা প্রমুখের দ্বিতীয় প্রমাণ হল, কুফর এতই মারাত্মক অপরাধ, যা অবাধ্যতার চরম পর্যায়ে পৌছেছে। এর চেয়ে বড় কোনও অপরাধ নেই। কাজেই আদৌ তার বৈধতা এবং তার নিষিদ্ধতা উড্ড করার সম্ভবানা নেই। অন্যান্য গুনাহ এর বিপরীত। কোন কোন সময় সেগুলোর বৈধতা দেওয়া হয় এবং তার নিধিদ্ধতা বিলুপ্ত করা হয়। যেমন, জবরদস্তি অবস্থায়। তদ্রুপ চিকিৎসার উদ্দেশ্য মদ্যপান, যখন রোগের অন্য কোনও চিকিৎসা না থাকে। সুতরাং কুফর ও শিরক যখন অন্যান্য গুনাহের পরিপন্থী; কোন অবস্থাতেই বৈধতার যোগ্যতা রাখে না, তখন তা যৌক্তিকভাবেও ক্ষমাযোগ্য নয়।

(৩) কাফির যেহেতু তার কুফর ও শিরককে হক ও যথার্থ মনে করে। এজন্য সে মাফ ও ক্ষমা প্রত্যাশী হয় না। বিধায় তাকে ক্ষমা করা হিকমতের পরিপন্থী। আর আল্লাহর পক্ষে এরূপ কাজ করা যৌক্তিকভাবে অসম্ভব। কাজেই কুফর ও শিরককে ক্ষমা করা যৌক্তিকভাবে অসম্ভব।

এর জবাব হল, ক্ষমা প্রত্যাশী নয় এমন ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হিকমত বিরোধী হওয়ার দাবী অলিক ও ভিত্তিহীন। পক্ষান্তরে আমরা বলি, প্রার্থনাকারী নয় এমন ব্যক্তিকে দান করা (অর্থাৎ চাওয়া ছাড়াই কাউকে কিছু দেওয়া) আরও শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের অনুগ্রহ-অনুকম্পা।

(৪) কুফর চিরস্থায়ী বিশ্বাস। কেননা কাফিরের ইচ্ছা ছিল সব সময়ই কুফরী করা। যদি সে চিরকাল জীবিত থাকত। অর্থাৎ কাফির অনন্তকালই জীবিত থাকলে কুফরী করত। কাজেই তার শাস্তিও চিরন্তন-চিরস্থায়ী হওয়া

বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য গুনাহ এর পরিপন্থী। যেমন, গুনাহগার মুমিনের ঐ গুনাহ সব সময় করার ইচ্ছা থাকে না বরং তার তামান্না থাকে, তাওবার তাওফীক হোক; তার তাওবা নসীব হোক। এ প্রমাণের জবাব হল, কুফর চিরকালীন ও আজন্ম আকীদা-বিশ্বাস বলে আমরা স্বীকার করি না বরং মৃত্যু দ্বারা এর যবানিকাপাত হয়ে যাবে।

وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنَ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ مَعَ التَّوْبَةِ اَوْبِدُوْنِهَا خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ وَفِيْ تَقْرِيْرِ الْحُكْمِ مُلَاحَظَةٌ لِلْآيَةِ الدَّالَّةِ عَلٰى ثُبُوْتِهٖ وَالْآيَاتُ وَالْاَحَادِيْثُ فِىْ هٰذَا الْمَعْنٰى كَثِيْرَةٌ . وَالْمُعْتَزِلَةُ يَخُصِّصُوْنَهَا بِالصَّغَائِرِ وَبِالْكَبَائِرِ الْمَقْرُوْنَةِ بِالتَّوْبَةِ . وَتَمَسَّكُوْا بِوَجْهَيْنِ اَلْاَوَّلُ اَلْآيَاتُ وَالْاَحَادِيْثُ الْوَارِدَةُ فِىْ وَعِيْدِ الْعُصَاةِ . وَالْجَوَابُ اَنَّهَا عَلٰى تَقْدِيْرِ عُمُوْمِهَا اِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى الْوُقُوْعِ دُوْنَ الْوُجُوْبِ . وَقَدْ كَثُرَتِ النُّصُوْصُ فِى الْعَفْوِ فَيُخَصَّصُ الْمُذْنِبُ الْمَغْفُوْرُ عَنْ عُمُوْمَاتِ الْوَعِيْدِ . وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ اَنَّ الْخُلْفَ فِى الْوَعِيْدِ كَرَمٌ فَيَجُوْزُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْمُحَقِّقُوْنَ عَلٰى خِلَافِهٖ كَيْفَ وَهُوَ تَبْدِيْلٌ لِلْقَوْلِ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ .

সহজ তরজমা

আল্লাহ তা'আলা যার জন্য চাইবেন, শিরক ব্যতীত অন্য গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। চাই সগীরা গুনাহ হোক বা কবীরা গুনাহ হোক; তাওবা সহকারে হোক কিংবা তাওবা ছাড়া হোক। মুতাযিলা এর বিপরীত মত পোষণ করে। এখানে সে আয়াতে কারীমার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে, যেটি এ মাসয়ালার দৃঢ়তা বুঝায়। এ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীস প্রচুর। মুতাযিলা মাফ ও ক্ষমাকে সগীরা গুনাহের সাথে এবং সেসব কবীরা গুনাহের খাছ কর, যেগুলো তাওবা করার পর ক্ষমা হবে। তারা প্রমাণ দিয়েছে দুভাবে। এক. গুনাহগারের শাসন ও ধমকি হিসেবে অবতীর্ণ আয়াতে কারীমা ও হাদীসগুলো। এর জবাব হল, সেগুলোকে ব্যাপকার্থে ধরে নিলে (তা) কেবল বাস্তবে শাস্তি হওয়ার কথা বুঝায়; আবশ্যকতা প্রমাণ করে না। অথচ ক্ষমার ব্যাপার নছ প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। কাজেই ক্ষমাকৃত গুনাহগারকে এ সতর্কবাণীর ব্যাপকতা থেকে পৃথক ধরতে হবে। কেউ কেউ বলেন, সতর্কবাণীর বরখেলাফ করাই অনুগ্রহ। অতএব তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমোদিত। পক্ষান্তরে গবেষকগণ এর বিরোধী। এটা কিভাবে সম্ভব। অথচ তা কথার রদবদল মাত্র। আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমার কথায় রদবদল হয় না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ মাফ হতে পারে

কুফর-শিরক ক্ষমা না করা এবং এ ছাড়া অন্য গুনাহ ক্ষমা যোগ্য হওয়ার আলোচনায় মূলগ্রন্থকার যে বাক্য বিন্যাস করেছেন, তা এ মাসআলার প্রমাণ বহনকারী আয়াতে কারীমাগুলো থেকে চয়নকৃত। উদ্দেশ্য হল, এ বিষয়টি আয়াতে কারীমার আলোকে প্রমাণিত বলে ইংগিত করা। সে আয়াতটি হল,

اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

"আল্লাহ তা'আলা তার সাথে শরীক সাব্যস্ত করার গুনাহ নিশ্চিত ক্ষমা করবেন না, তাছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন।" (সূরা নিসা- ১১৬)

বলা বাহুল্য যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা শিরক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। চাই সগীরা গুনাহ হোক বা কবীরা গুনাহই হোক। আর কবীরা গুনাহের ক্ষেত্রে বান্দা চাই তাওবা করে থাকুক কিংবা তাওবা ছাড়াই মৃত্যুবরণ করুক।

উপরিউক্ত দাবীর প্রমাণ আয়াতে কারীমা। কেননা مَادُوْنَ ذَالِكَ এর মধ্যে مَا শব্দটি ব্যাপক হওয়ার কারণে উল্লেখিত যাবতীয় গুনাহই এর অন্তর্ভুক্ত। আর কুফর ছাড়া অন্যান্য গুনাহ ক্ষমা করার ক্ষেত্রে চাই তা সগীরা হোক

বা কবীরাই হোক। আবার কবীরা হওয়ার ক্ষেত্রে বান্দা চাই সে গুনাহ থেকে তাওবা করুক বা তাওবা ছাড়াই মৃত্যু বরণ করুক না কেন –এ ক্ষেত্রে আয়াতে কারীমা ও হাদীস শরীফ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

قُلْ يَاعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا

অর্থাৎ হে নবী ! আপনি বলেদিন– ওহে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের উপর অবিচার করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চিত আল্লাহ যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। সূরা যুমার–৫৩

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ

(নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক মানুষের জন্য তাদের কৃত অপরাধ মার্জনাকারী।)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিপন্থী মুতাযিলা উপরিউক্ত আয়াতে কারীমায় ক্ষমাকে সগীরা গুনাহের সাথে এবং সেসব কবীরা গুনাহের সাথে সুনির্দিষ্ট করে, যেসব কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পর বান্দা তা থেকে তাওবা করে নিয়েছে। কিন্তু যেসব কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পর বান্দা তাওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করেছে, সেগুলো মুতাযিলার নিকট কুফরের নামান্তর। কেননা কাফির এবং তাওবা ছাড়া মৃত কবীরা গুনাহগার উভয় চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

মু'তাযিলাদের দলীল

এক. মুতাযিলার প্রথম প্রমাণ সেসব আয়াত ও হাদীস, যাতে গুনাহগারের উপর আযাবের সতর্কবাণী এসেছে। যেমন– وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا (কেউ কোন মুমিন বান্দাকে ইচ্ছকৃতভাবে হত্যা করলে, তার শাস্তি জাহান্নাম। তথায় সে চিরস্থায়ী থাকবে।) সূরা নিসা– ৯৩

অনুরূপভাবে আল্লাহর বাণী اِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ এবং এ জাতীয় অন্যান্য আয়াতে কারীমা ও হাদীসসমূহ, যেগুলো বিভিন্ন শিরোনামে কবীরা গুনাহের উপর শাস্তির হুঁশিয়ারী ও সতর্কবাণী এসেছে।

প্রমাণ বিশ্লেষণ ঃ উপরিউক্ত নছগুলোতে কবীরা গুনাহের উপর সতর্কবাণী এবং আযাবের সংবাদ রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যদি কবীরা গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং শাস্তি না দেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ওয়াদা খেলাফীর নিসবত (সম্বন্ধ) কর এবং উক্ত আয়াতগুলো প্রদত্ত সংবাদের ক্ষেত্রে মিথ্যা হওয়া আবশ্যম্ভাবী হবে। আর তা ভ্রান্ত ও বাতিল। এ প্রমাণের কয়েকটি জবাব দেওয়া হয়। যথা–

(ক) গুনাহগারের হুঁশিয়ারী সংক্রান্ত নছগুলো যদি ব্যাপক এবং সকল কবীরা গুনাহগারকে অন্তর্ভুক্তকারী ধরেও নেওয়া হয়, তাহলে বড়জোর সে সব নছ দ্বারা বাস্তবে আযাব হওয়ার কথা জানা যায় অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কবীরা গুনাহকারীকে শাস্তি দিবেন বুঝা যায়। অথচ বিতর্কীত বিষয় "বাস্তবে আযাব হওয়া" নয় বরং শাস্তি দেওয়া ওয়াজিব কি না ? আমরা বলি, কবীরা গুনাহকারীকে শাস্তি দেওয়া আল্লাহর উপর ওয়াজিব নয়। যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে দেবেন। যদিও সে তাওবা ছাড়াই মরে যায়। কিন্তু মুতাযিলা বলে, যে কবীরা গুনাহগার তাওবা ছাড়া মরে গেল, তাকে শাস্তি দেওয়া আল্লাহর উপর ওয়াজিব।

(খ) উপরিউক্ত নছগুলো সেসব আয়াত বিরোধী, যেগুলো শিরক ব্যতীত অন্যান্য সকল গুনাহ ব্যাপকভাবে ক্ষমা করার প্রমাণ বহন করে। চাই কবীরা গুনাহ হোক কিংবা সগীরা গুনাহই হোক। উপরন্তু চাই এমন কবীরা গুনাহ হোক, যেগুলো থেকে বান্দা তাওবা করেছে কিংবা এমন কবীরা গুনাহই হোক, যার থেকে বান্দা তাওবা করা ছাড়াই মরে গেছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْمَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ এবং এ জাতীয় অন্যান্য আয়াতে কারীমা। সুতরাং এসব আয়াতে কারীমা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, যেসব গুনাহগারের ক্ষমা আল্লাহর ইচ্ছাধীন, যদিও সে কবীরা গুনাহ করে তাওবা ব্যতীত মারা যাক না কেন, তারা মুতাযিলার পেশকৃত নছগুলো থেকে পৃথক বা ব্যতিক্রম এবং ঐ নছগুলো عَامٌ مَخْصُوْصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ এর অন্তর্ভুক্ত হবে। এ জবাব অভিজ্ঞ প্রবীণ মাতুরীদিয়্যার মতানুসারে। যারা বলেন, আল্লাহ তা'আলা যেভাবে ওয়াদা খেলাফী করেন না, তদ্রূপ হুঁশিয়ারীর বিপরীত কাজও করেন না।

(গ) قَوْلُهُ: وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ এখানে بَعْضُهُمْ বলে আশায়েরা উদ্দেশ্য। তাদের মাযহাব মতে আল্লাহর জন্য হুঁশিয়ারীর বিপরীত কাজ করা নাজায়েয। তারা মুতাযিলার প্রমাণের জবাবে বলেন, যদিও তোমাদের উপস্থাপিত নছগুলোতে কবীরা গুনাহের উপর শাস্তির হুঁশিয়ারী রয়েছে, তথাপি আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন।

কেননা ওয়াদা খেলাফী নিন্দিত ও ঘৃণিত কাজ বটে। তবে হুঁশিয়ারীর বিপরীত করা ঘৃণিত নয় বরং উচ্চ পর্যায়ের অনুগ্রহ। যেমন, কোন শাসক কাউকে হত্যার হুমকি দিলেন। অতঃপর তাকে ক্ষমা করে দিলেন। তাহলে এ হুমকির বিপরীত করাকে ঘৃণিত নয় বরং শাসকের অনুগ্রহ মনে করা হয়। পক্ষান্তরে অভিজ্ঞ মাতুরীদিয়্যাহ এর বিপরীত। বিপরীত হবেই না কেন ? এতে তো নিজের কথায় রদবদল আবশ্যক হয়। অথচ আল্লাহ পাক পরিস্কার বলেছেন, مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ (আমার কথায় রদবদল হয় না) অর্থাৎ আমি যা বলি তা পূর্ণ করি। কিন্তু আয়াতটির আরেকটি ব্যাখ্যা হতে পারে অর্থাৎ অনুগ্রশীল ও দয়াবান যখন কোন হুঁশিয়ারীর সংবাদ দেন, তখন তার মর্যাদা হিসেবে সে সংবাদটি নিজ ইচ্ছার সাথে মওকুফও রাখতে পারেন। যদিও সুস্পষ্টভাবে ইচ্ছার কথা উল্লেখ না থাকে। কাজেই উদাহারণতঃ যখন বলবেন "আমি অমুক জালিমকে শাস্তি দেব" তখন এর অর্থ হবে, যদি মাফ না করি, তাহলে শাস্তি দেব। আবার ইচ্ছা হলে ক্ষমাও করে দিব। একটি হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন হয়। হাদীসটি ইমাম বায়হাকী রহ. হাশর-নশর অধ্যায়ে হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ وَعَدَهُ اللّٰهُ عَلٰى عَمَلٍ ثَوَابًا فَهُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ وَمَنْ اَوْعَدَهُ عَلٰى عَمَلٍ عِقَابًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা যদি কারও সাথে কোনও আমলের বদলায় সাওয়াব ও প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দেন, তবে তা পূরণ করবেন। আর কোন আমলের উপর শাস্তির হুমকি বা হুঁশিয়ারী দেন, তাহলে তাঁর স্বাধীনতা রয়েছে। ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন, ইচ্ছে হলে ক্ষমা করে দিবেন।

اَلثَّانِىْ اَنَّ الْمُذْنِبَ اِذَا عَلِمَ اَنَّهُ لَا يُعَاقَبُ عَلٰى ذَنْبِهٖ كَانَ ذَالِكَ تَقْرِيْرًا لَهُ عَلَى الذَّنْبِ وَاِغْرَاءً لِلْغَيْرِ عَلَيْهِ وَهٰذَا يُنَافِىْ حِكْمَةَ اِرْسَالِ الرُّسُلِ - وَالْجَوَابُ اَنَّ مُجَرَّدَ جَوَازِ الْعَفْوِ لَا يُوْجِبُ ظَنَّ عَدَمِ الْعِقَابِ فَضْلًا عَنِ الْعِلْمِ كَيْفَ وَالْعُمُوْمَاتُ الْوَارِدَةُ فِى الْوَعِيْدِ الْمَقْرُوْنَةِ بِغَايَةٍ مِّنَ التَّهْدِيْدِ تُرَجِّحُ جَانِبَ الْوُقُوْعِ بِالنِّسْبَةِ اِلٰى كُلِّ وَاحِدٍ وَكَفٰى بِهٖ زَاجِرًا

সহজ তরজমা

দ্বিতীয় প্রমাণঃ গুনাহগার যখন নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, তার গুনাহের দায়ে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না, তখন এটা তাকে গুনাহের উপর অটল রাখা এবং আরেক গুনাহের উপর অনুপ্রেরণা যোগানের কারণ হবে। অথচ তা নবী-রাসূল প্রেরণের হিকমত বিরোধী। জবাব হলঃ শুধুমাত্র ক্ষমার বৈধতা এবং শাস্তির সম্ভাব্যতা না হওয়ার ধারণাও সৃষ্টি করে না; দৃঢ় বিশ্বাস তো দূরের কথা। হবেই বা কিভাবে ? অথচ হুঁশিয়ারী সংক্রান্ত সাধারণ আয়াতগুলো চুঁড়ান্ত পর্যায়ের হুমকি সম্বলিত। সেগুলো প্রত্যেকের ক্ষেত্রে বাস্তবে শাস্তি হওয়ার দিকটাকে প্রাধান্য দিচ্ছে। আর সতর্ক করা ও শাসনের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

দুই. সগীরা গুনাহসমূহ এবং বান্দা যেসব কবীরা গুনাহ থেকে তাওবা করেছে, শুধুমাত্র সেগুলোর সাথেই ক্ষমা বিশেষিত হওয়ার উপর মুতাযিলার পক্ষে থেকে উপস্থাপিত দ্বিতীয় প্রমাণ হল, তাওবা ছাড়া মৃত কবীরা গুনাহেগার লোক যদি নিশ্চিতভাবে জানে, তাকে তার গুনাহের দায়ে শাস্তি দেওয়া হবে না; আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন, তাহলে তার এ বিশ্বাস ও আস্থা তাকে স্বীয় গুনাহে অটল-অবিচল থাকা বরং অন্যান্য গুনাহের উপর অনুপ্রেরণার কারণ হবে। অথচ এটি নবী-রাসূল প্রেরণের হিকমত বিরোধী। কেননা নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তারা বান্দাকে গুণাহ থেকে দমন করবেন এবং বারণ করবেন। কিন্তু রাসূল যখন বলে বেড়াবেন– ভয়ের কোনও কারণ নেই; আল্লাহ তা'আলা তোমাদের যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। সগীরা হোক বা কবীরাই হোক। তাওবা করে মারা যাও কিংবা তাওবা ছাড়া। তাহলে বান্দা কখনও গুনাহ থেকে নিবৃত হবে না। এতে

রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।

জবাব ঃ কুফর-শিরক ভিন্ন যাবতীয় গুনাহের ক্ষমাকে আমরা কেবল জায়েয ও সম্ভাব্য মনে করি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। যদিও সে ঐ কবীরা গুনাহ থেকে তাওবা ছাড়াই মৃত্যু বরণ করেছে। আর কেবল ক্ষমার বৈধতা ও সম্ভাবনা দ্বারা শাস্তি না হওয়ার বিশ্বাস তো দূরের কথা, ধারণাজ্ঞানও জরুরী নয়। বিশেষতঃ যখন শাস্তির হুঁশিয়ারী সংক্রান্ত সাধারণ নছগুলো এতোধিক হুমকিপূর্ণ যে, প্রত্যেক গুনাহগারকে বাস্তবে শাস্তি দেওয়ার দিকটিকেই প্রাধান্য দেয়। বস্তুতঃ গুনাহ থেকে বারণ করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

وَيَجُوْزُ الْعِقَابُ عَلَى الصَّغِيْرَةِ سَوَاءٌ اِجْتَنَبَ مُرْتَكِبُهَا الْكَبِيْرَةَ اَمْ لَا ـ لِدُخُوْلِهَا تَحْتَ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ـ وَلِقَوْلِهٖ تَعَالٰى لَايُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَاكَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا ـ وَالْاِحْصَاءُ اِنَّمَا يَكُوْنُ لِلسُّؤَالِ الْمُجَازَاةِ ـ اِلٰى غَيْرِ ذَالِكَ مِنَ الْاٰيَاتِ وَالْاَحَادِيْثِ ـ وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ اِلٰى اَنَّهٗ اِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ لَمْ يَجُزْ تَعْذِيْبُهٗ ـ لَابِمَعْنٰى اَنَّهٗ يَمْتَنِعُ عَقْلًا بَلْ بِمَعْنٰى اَنَّهٗ لَا يَجُوْزُ اَنْ يَّقَعَ لِقِيَامِ الْاَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ عَلٰى اَنَّهٗ لَايَقَعُ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ـ وَاُجِيْبَ بِاَنَّ الْكَبِيْرَةَ الْمُطْلَقَةَ هِىَ الْكُفْرُ لِاَنَّهُ الْكَامِلُ ـ وَجَمْعَ الْاِسْمِ بِالنَّظْرِ اِلٰى اَنْوَاعِ الْكُفْرِ وَاِنْ كَانَ الْكُلُّ مِلَّةً وَّاحِدَةً فِى الْحُكْمِ اَوْ اِلٰى اَفْرَادِهِ الْقَائِمَةِ بِاَفْرَادِ الْمُخَاطَبِيْنَ عَلٰى مَا تَمَهَّدَ مِنْ قَاعِدَةِ اَنَّ مُقَابَلَةَ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ يَقْتَضِى اِنْقِسَامَ الْاَحَادِ بِالْاَحَادِ كَقَوْلِنَا رَكِبَ الْقَوْمُ دَوَابَّهُمْ وَلَبِسُوْا ثِيَابَهُمْ ـ وَالْعَفْوُ عَنِ الْكَبِيْرَةِ هٰذَا مَذْكُوْرٌ فِيْمَا سَبَقَ اِلَّا اَنَّهٗ اَعَادَهٗ لِيُعْلَمَ اَنَّ تَرْكَ الْمُؤَاخَذَةِ عَلَى الذَّنْبِ يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْظُ الْعَفْوِ كَمَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْظُ الْمَغْفِرَةِ وَلِيَتَعَلَّقَ بِهٖ قَوْلُهٗ اِذَا لَمْ تَكُنْ عَنْ اِسْتِحْلَالٍ ـ وَالْاِسْتِحْلَالُ كُفْرٌ لِمَا فِيْهِ مِنَ التَّكْذِيْبِ الْمُنَافِىْ لِلتَّصْدِيْقِ ـ وَبِهٰذَا يُاَوَّلُ النُّصُوْصُ الدَّالَّةُ عَلٰى تَخْلِيْدِ الْعُصَاةِ فِى النَّارِ وَعَلٰى سَلْبِ الْاِيْمَانِ عَنْهُمْ ـ

সহজ তরজমা

সগীরা গুনাহের উপর শাস্তির হওয়া সম্ভাব্য। চাই তাতে লিপ্ত ব্যক্তি কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকুক বা না থাকুক। কেননা সগীরা গুনাহ আল্লাহর বাণী وَيَغْفِرُمَادُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ এর অন্তর্ভূক্ত। তদ্রুপ ঘটনা বিবরণের ভঙ্গিতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, একি! আমলনামা থেকে ছোট-বড় কোন গুনাহই তো ছুটে নি; সবই দেখছি লিপিবদ্ধ রয়েছে। বস্তুতঃ জিজ্ঞাসাবাদ ও শাস্তির জন্যই লিপিবদ্ধ করা হয়। এবং এছাড়া অন্যান্য আয়াতে কারীমা ও হাদীসসমূহ (এদের প্রমাণ।) কোন মুতাযিলার মাযহাব মতে সগীরা গুনাহকারী যদি কবীরা গুনাহ থেকে যথারীতি বেঁচে থাকে, তবে তাকে শাস্তি দেওয়া জায়েয নয় অর্থাৎ যৌক্তিকভাবে তা অসম্ভব হিসেবে নয় বরং বাস্তবে তা হবে না বলে। কেননা এ সংক্রান্ত প্রচুর শ্রুত প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "তোমরা যদি নিষিদ্ধ ঘোষিত কবীরা গুনাহ বেঁচে থাক, তাহলে আমি তোমাদের সগীরা গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেব।" এর জবাব হচ্ছে, মুতলাক কবীরা গুনাহ কুফর। কেননা তা-ই পূর্ণাঙ্গ। আর কুফরের শ্রেণী বিচারে বহুবচনের শব্দ চয়ন করা হয়েছে। যদিও হুকুমের দিক থেকে সবই সমান। কিংবা কুফরের সেসব এককের প্রতি লক্ষ্য করে كَبَائِر শব্দটি বহুবচন আনা হয়েছে, যেগুলো সম্বোধিত ব্যক্তির সাথে প্রতিষ্ঠিত। যেমন,

বহুবচনের বিপরীত বহুবচন আনা أَفْرَاد এর উপর أَفْرَاد এর বিভাজন দাবী করে বলে নিয়ম আছে। যেমন, আমরা বলি, "তারা (লোকেরা) নিজস্ব বাহনে আরোহন করেছে এবং তারা নিজস্ব কাপড় পরিধান করেছে।" আর কবীরা গুনাহ ক্ষমা করাও জায়েয এবং সম্ভব। এ আলোচনা পূর্বে উল্লেখ হওয়া সত্ত্বেও এখানে পুনরাবৃত্তির কারণ হল, যাতে অপরাধের শাস্তি না দেওয়ার ক্ষেত্রেও عَفْو শব্দ প্রয়োগের কথা জানা যায়। যেরূপভাবে (এক্ষেত্রে) مَغْفِرَت শব্দ প্রয়োগ হয়। এবং যাতে মূলগ্রন্থকারের উক্তি (কবীরা গুনাহ ক্ষমা করা সম্ভব) এর সাথে তার (আরেকটি) উক্তি "যখন তা হালাল মনে করে না হবে" এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। অথবা যাতে এর সাথে যুক্ত হয় যে, মূলগ্রন্থকারের উক্তি (কবীরা গুনাহ ক্ষমা করা সম্ভব) তখনই হবে, যখন ঐ কবীরা গুনাহ বৈধ মনে সম্পাদিত না হবে। আর তা হালাল মনে করে করা কুফর। কেননা এতে তাসদীক পরিপন্থী তাকযীব (মিথ্যা প্রতিপন্নতা) বিদ্যমান। এ মমার্থই ব্যক্ত করা হবে সেসব নছের ক্ষেত্রে, যেগুলো গুনাহগার ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার কিংবা তাদের থেকে ঈমান তুলে নেওয়ার প্রমাণ বহন করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সগীরা গুণাহেরও শাস্তি হতে পারে

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে আল্লাহ তা'আলার জন্য বান্দাকে তার সগীরা গুনাহের শাস্তি দেওয়া জায়েয ও সম্ভব। চাই সে লোক কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকুক বা না থাকুক। প্রমাণ নিম্নরূপ।

এক. আল্লাহ পাক وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ আয়াতে কারীমায় مَا دُوْنَ ذَالِكَ অর্থাৎ শিরক ভিন্ন সমুদয় গুনাহ ক্ষমা করাকে স্বীয় ইচ্ছার সাথে মওকুফ রেখেছেন। এতে সগীরা গুনাহও অন্তর্ভুক্ত। আর যখন সগীরাসহ যাবতীয় গুনাহের ক্ষমা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল; কোনও জরুরী বা অনিবার্য বিষয় নয়, তখন এর মমার্থ দাঁড়ায়– আল্লাহ তা'আলা শাস্তিও দিতে পারেন। যদিও এমন সগীরা হোক না কেন, যাতে লিপ্ত ব্যক্তি কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকত।

দুই. আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, لَايُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَاكَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا। এতে আমলনামার অবস্থা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তাতে (আমল নামায়) ছোট-বড় সব গুনাহ লিপিবদ্ধ থাকবে। আর শাস্তি দেওয়ার জন্যই তাতে সগীরা গুনাহ লিপিবদ্ধ করা হবে। কেননা যদি তার উপর শাস্তি না হত, তাহলে আমলনামায় এসব দেখে কাফিররা ভীতসন্ত্রস্ত হত না এবং হা-হুতাশ করত না। অথচ তারা এসব দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হবে। পূর্ণ আয়াতে কারীমাটি পড়লে তা-ই বুঝা যায়। যেমন,

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُ يَاوَيْلَتَنَا مَالِهٰذَا الْكِتَابِ لَايُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَاكَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصٰهَا وَوَجَدُوْا مَاعَمِلُوْا حَاضِرًا وَلَايَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا

এবং উপস্থিত করা হবে আমলনামা। অতঃপর তুমি অপরাধীদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত দেখতে পাবে; তাতে লিপিবদ্ধ যা আছে, সে কারণে। আর তারা বলবে– হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! এ কেমন আমলানামা! ছোট-বড় কোনও গুনাহই তো তা থেকে বাদ পড়েনি। সবই লিপিবদ্ধ করেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। আর তোমার প্রতিপালক কারও উপর অবিচার করেন না। (সূরা কাহফ- ৪৯)

মোটকথা, আমলনামায় ছোট-বড় বা সগীরা-কবীরা যাবতীয় গুনাহ দেখে অপরাধীদের আতংকগ্রস্থ হওয়াই প্রমাণ করে যে, সগীরা গুনাহও শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং শাস্তির কারণ। তার উপর শাস্তি দেওয়ার সম্ভাবনা আছে।

কতিপয় মু'তাযিলার অভিমত

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিপন্থী কোন কোন মুতাযিলার মাযহাব হল, সগীরা গুনাহকারী যদি কবীরা গুনাহ থেক বেঁচে থাকে, তবে তাকে শাস্তি দেওয়া না জায়েয। তবে তার মানে যৌক্তিকভাবে অসম্ভব নয় বরং তার অর্থ হল, বাস্তবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না। কেননা এ ধরনের সগীরা গুনাহকারীকে শাস্তি না দেওয়ার ব্যাপারে বহু শ্রুত ও ঐতিহ্যগত প্রমাণ বিদ্যমান। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী–

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَاتُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ

অর্থাৎ তোমরা যদি সে সব কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, যেগুলো থেকে তোমাদেরকে বারণ করা হয়েছে, তাহলে আমি তোমাদের সগীরা গুনাহগুলো ক্ষমা (মোচনা) করে দিব। (সূরা নিসা-৩১)

মোটকথা, এ আয়াতে سَيِّاٰت দ্বারা সগীরা গুনাহ উদ্দেশ্য। কেননা এটি كَبَائِر এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে।

* এ প্রমাণের জবাব হল, উক্ত আযাতে كَبَائِر দ্বারা কুফর উদ্দেশ্য। কেননা এ **শব্দটি মুতলাক**। **মুতলাক** শব্দ তার পূর্ণাঙ্গ অংশ বা সত্ত্বা বুঝায়। আর কবীরা গুনাহের পূর্ণাঙ্গ সত্ত্বা কুফর।

"কাবাইর" শব্দটি বহুবচন আনার কারণ

অবশ্য প্রশ্ন থেকে যায়, كَبَائِر শব্দটি তো বহুবচন আর كُفْر একবচন। সুতরাং বহুবচনের ব্যাখ্যায় একবচন আনা শুদ্ধ হয় কিভাবে? শারেহ রহ. এ প্রশ্নের দুটি জবাব দিয়েছেন। **এক.** কুফর বিভিন্ন ধরনের। যেমন, অগ্নিপূজারী হওয়া, ইয়াহুদী হওয়া, খৃস্টান হওয়া, পৌত্তলিকতা ইত্যাদি। সুতরাং কুফরের শ্রেণী হিসেবে كَبَائِر শব্দটি বহুবচন আনা হয়েছে।

দুই. সম্বোধিত ব্যক্তি বা শ্রোতার সাথে কুফরের যে اَفْرَاد (একক) প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তার প্রতি লক্ষ্য করে كَبَائِر শব্দটি বহুবচন আনা হয়েছে। যেমন, আবু জাহালের কুফর, আবু লাহাবের কুফর, উমাইয়ার কুফর প্রভৃতি। আর প্রত্যেকের কুফরই কবীরা। সে হিসেবে كَبَائِر বহুচবন আনা বিশুদ্ধ। যেমন, একটি মূলনীতি আছে- যখন বহুচবনের বিপরীতে বহুবচনের শব্দ আসে তখন একটির اَفْرَاد অপরটির اَفْرَاد এর উপর বিভাজন দাবী করে। যেমন, বলা হল, তারা বাহনগুলোর উপর আরোহন করল অথবা বলা হল, তারা কাপড় পরিধান করল। তখন এর অর্থ "প্রত্যেকেই বহু বাহনে সওয়ার হয়েছে কিংবা প্রত্যেকেই অনেক কাপড় পড়েছে" হয় না। বরং এর মর্ম দাঁড়ায়, প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাহনে চড়েছে এবং নিজ নিজ কাপড় পড়েছে। এ মূলনীতি অনুযায়ী اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِر এর অর্থ হবে, اِنْ يَجْتَنِبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ كَبِيْرَتَهٗ অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে।

সকল কুফর একজাত কিভাবে ?

قَوْلُهٗ: وَاِنْ كَانَ الْكُلُّ مِلَّةً وَّاحِدَةً فِى الْحُكْمِ الخ ইতোপূর্বে শারেহ রহ. বললেন- কুফরের শ্রেণী হিসেবে كَبَائِر শব্দটি বহুবচনা আনা হয়েছে। কুফরের শ্রেণী অনেক। শারেহ রহ. -এর এ দাবীর উপর আপত্তি উঠে যে, ফকীহগণ বলেন, اَلْكُفْرُ مِلَّةٌ وَّاحِدَةٌ (সকল কুফর একজাত)। অধিকন্তু ফকীহগণ এ সূত্রে খ্রিস্টানকে তার ইয়াহুদি ভ্রাতার উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করেন। অথচ দু' ধর্মের পার্থক্য উত্তরাধিকার সত্ত্বের প্রতিবন্ধক।

শারেহ রহ. এ প্রশ্নের জবাবের প্রতি ইংগিত করে বলেন- হুকুমের দিক থেকে সকল কুফর একজাত হলেও বাস্তব প্রকৃতির দিক থেকে সকল শ্রেণীর কুফর ভিন্ন ভিন্ন হওয়া বা সকল কুফরের ভিন্নতার পরিপন্থী নয়।

"عَفْو" শব্দের ব্যবহার নিয়ে প্রশ্নোত্তর

قَوْلُهٗ: وَالْعَفْوُ عَنِ الْكَبِيْرَةِ الخ এর আতফ হয়েছে মূলগন্থকারের পূর্বের উক্তি اَلْعِقَابُ عَلَى الصَّغِيْرَةِ এর ওপর। সেটি يَجُوْز এর ফায়েল (কর্মকারক)। অর্থ, কবীরা গুনাহ ক্ষমা করা সম্ভব। এখানেও একটি প্রশ্ন উঠে অর্থাৎ মূলগ্রন্থকারের উক্তি وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ দ্বারা তো সে কথা জানা গেছে। কেননা مَادُوْنَ ذَالِكَ এর মধ্যে কবীরা গুনাহ অন্তর্ভূক্ত। তাহলে এখানে আবার সে কথার পুর্নারাবৃত্তি করা হল কেন?

শারেহ রহ. মূলগ্রন্থকারের পক্ষ থেকে একটি আপত্তিমূলক জবাবে বলেন, সে কথার পুনরাবৃত্তির কারণ হল, যাতে জানা যায়- অপরাধের দায়ে ধর-পাকড় বা অভিযুক্ত না করার ক্ষেত্রে যেভাবে مَغْفِرَت শব্দটি ব্যবহৃত হয় তদ্রূপ عَفْو শব্দটিও ব্যবহৃত হয়। কাজেই ইতোপূর্বে مَغْفِرَت শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর এখানে হয়েছে عَفْو শব্দটি। কিন্তু এ উত্তরটি সুবিধাজনক নয়।

দ্বিতীয় জবাব ঃ এখানে পুনরাবৃত্তির কারণ হল, যাতে মূলগ্রন্থকারের পরবর্তী উক্তি اِذَا لَمْ تَكُنْ عَنْ اِسْتِحْلَال তার সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে।

কোন গুণাহকে হালাল মনে করা কুফর

মোটকথা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে যেভাবে সগীরা গুনাহের উপর শাস্তি দেওয়া সম্ভব, তদ্রূপ কবীরা গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়াও সম্ভব। তবে শর্ত হল, কবীরা গুনাহকে বৈধ বা হালাল মনে করে সম্পাদিত না হতে হবে। কারণ, অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত যে কোনও সগীরা কিংবা কবীরা গুণাহকে হালাল মনে করে সম্পাদন করা কুফর। কেননা এতে শরী'আত প্রবর্তককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়। অথচ তিনি এটিকে হারাম

সাব্যস্ত করেছেন। মূলতঃ তাক্‌যীব (মিথ্যা প্রতিপন্নতা) ঐ তাসদীকের (বিশ্বাসের) পরিপন্থী, যা ঈমানের হাকীকত। আর কোন বস্তু তার বিপরীত জিনিসের সাথে অক্ষুণ্ন থাকে না। কাজেই কোনও গুনাহকে হালাল মনে করার সাথে তাসদীক ও ঈমান অক্ষুণ্ন থাকতে পারে না।

যেসব নছ গুনাহগারের চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়র ব্যাপারে কিংবা ঈমান তুলে নেওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ বহন করে, সে সব নছ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, বান্দা সে গুনাহ হালাল মনে করে সম্পাদন করেছে। যেমন, مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا এর মর্মার্থ হবে, যে ব্যক্তি হালাল ভেবে কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম। তথায় সে চিরস্থায়ী থাকবে।

অনুরূপভাবে لَا يَزْنِى الزَّانِى حِيْنَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ হাদীসটির মর্মার্থ হবে, যে ব্যক্তি যিনা-ব্যভিচারকে হালাল ভেবে তাতে লিপ্ত হবে, সে ব্যক্তি মুমিন নয়। যেভাবে خُلُوْد শব্দটি সুদীর্ঘ সময় এবং কঠোরতা আরোপের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তদ্রুপ কিছু কিছু গুনাহের কারণে ঈমান তুলে নেওয়ার হুমকি ও কঠোরতা আরোপের নিমিত্ত হতে পারে। আর যখন গুনাহগারদের চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়া এবং তাদের থেকে ঈমান তুলে নেওয়ার পক্ষে প্রামাণ্য নছগুলোকে 'হালাল মনে করার' উপর প্রয়োগ করা ছাড়াও বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব, তখন শারেহ রহ. -এর يَأَوَّلُ وَبِهٰذَا বলা তথা وَبِهٰذَا কে পূর্বে আনা বিশুদ্ধ মনে হচ্ছে না। কেননা এতে হালাল মনে করার ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাকে প্রয়োগ করা সীমাবদ্ধ বুঝা যায়। অবশ্য শারেহ রহ. -এর উদ্দেশ্য তা (সীমাবদ্ধ করা) নয় বরং অন্যান্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বিপরীতে এ ব্যাখ্যার গুরুত্ব প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। কেননা যেভাবে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টির লক্ষ্যে فِعْل আগে আনা হয়, তদ্রুপ গুরুত্বারোপ তথা পূর্বোল্লেখিত বিষয়টির গুরুত্ব বুঝানোর জন্যও فِعْل আগে আনা হয়।

وَالشَّفَاعَةُ ثَابِتَةٌ لِلرُّسُلِ وَالْأَخْيَارِ فِى حَقِّ أَهْلِ الْكَبَائِرِ بِالْمُسْتَفِيْضِ مِنَ الْأَخْبَارِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ وَهٰذَا مَبْنِىٌّ عَلٰى مَاسَبَقَ مِنْ جَوَازِ الْعَفْوِ وَالْمَغْفِرَةِ بِدُوْنِ الشَّفَاعَةِ فَبِالشَّفَاعَةِ أَوْلٰى وَعِنْدَهُمْ لَمَّا لَمْ تَجُزْ لَمْ يَجُزْ . لَنَا قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَقَوْلُهُ تَعَالٰى فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ . فَإِنَّ أُسْلُوْبَ هٰذَا الْكَلَامِ يَدُلُّ عَلٰى ثُبُوْتِ الشَّفَاعَةِ فِى الْجُمْلَةِ وَإِلَّا لَمَا كَانَ لِنَفْىِ نَفْعِهَا عَنِ الْكَافِرِيْنَ عِنْدَ الْقَصْدِ إِلٰى تَقْبِيْحِ حَالِهِمْ وَتَحْقِيْقِ يَاسِهِمْ مَعْنًى . لِأَنَّ مِثْلَ هٰذَا الْمَقَامِ يَقْتَضِىْ أَنْ يُوَسَّمُوْا بِمَا يَخُصُّهُمْ لَا بِمَا يَعُمُّهُمْ وَغَيْرَهُمْ . وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ تَعْلِيْقَ الْحُكْمِ بِالْكَافِرِ يَدُلُّ عَلٰى نَفْيِهِ عَمَّا عَدَاهُ حَتّٰى يَرِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَقُوْمُ حُجَّةً عَلٰى مَنْ يَقُوْلُ بِمَفْهُوْمِ الْمُخَالَفَةِ . وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَفَاعَتِىْ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِىْ . وَهُوَ مَشْهُوْرٌ بَلِ الْأَحَادِيْثُ فِىْ بَابِ الشَّفَاعَةِ مُتَوَاتِرَةُ الْمَعْنٰى .

সহজ তরজমা

কবীরা গুনাহকারীদের জন্য নবী-রাসূল এবং নেক বান্দাদের শাফা'আত অর্থাৎ গুনাহ মাফের সুপারিশ মশহূর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে নেক ও সাওয়ার বাড়ানোর জন্য সুপারিশ হবে; গুনাহ মাফের জন্য নয়। এ মতানৈক্য পূর্বোক্ত (আরেকটি) মতবিরোধের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ আমাদের মতে সুপারিশ ছাড়া গুনাহ মাফ করা সম্ভব। সুতরাং সুপারিশের ফলে মাফ করা আরও ভালভাবে সম্ভব হবে। আর মুতাযিলার মতে যেহেতু কবীরা গুনাহ ক্ষমা করা সম্ভব নয়, তাই সেজন্য সুপারিশ করাও সম্ভব নয়। আমাদের প্রমাণ (নবীর উদ্দেশ্যে) আল্লাহর বাণী– হে নবী! আপনি নিজের কসূর এবং মুমিন নারী-পুরুষের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আর (কাফিরদের সম্পর্কে) আল্লাহর বাণী– (তাদের পক্ষে) সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনও

কাজে আসবে না। কেননা এ বাক্যটির বাগধারা সমষ্টিগতভাবে সুপারিশ প্রমাণ করে। নতুবা তাদের শোচনীয়তা, দুরাবস্থায় এবং বিষণ্ণতা বর্ণনার সময় "কাফিরদের পক্ষে সুপারিশ উপকারী হবে না" বলার কোন অর্থ থাকে না। কারণ, এ জাতীয় স্থানের দাবী হল, তাদের সাথে খাছ ও বিশেষিত অবস্থা বর্ণনা করা; এরূপ অবস্থার বিবরণ নয়, যা তাদের এবং অন্যদের মাঝে সমানভাবে বিদ্যমান। উদ্দেশ্য এই নয় যে, হুকুম তথা সুপারিশ উপকারী না হওয়াকে কাফিরদের উপর ঝুলিয়ে রাখা তারা (কাফিররা) ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে হুকুম না হওয়া বুঝায়। যাতে এরূপ প্রশ্ন করা যায় যে, দলীলটি তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হবে, যারা মাফহুমে মুখালিফ বা বিপরীত অর্থের প্রবক্তা। আর (আমাদের আরেকটি দলীল) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস "আমার সুপারিশ হবে আমার উম্মতের কবীরা গুনাহকারীদের জন্য।" এটি মশহূর বরং সুপারিশ সংক্রান্ত হাদীসগুলো অর্থের দিক থেকে মুতাওয়াতির।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

গুণাহ মাফের জন্য সুপারিশ হবে কি না ?

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হল, কবীরা গুনাহগারদের জন্য নবী-রাসূলগণ এবং উম্মতের নেককার বান্দাদের পক্ষ থেকে শাফা'আত তথা গুনাহ মাফের সুপারিশ হবে। আল্লাহ তাদের সুপারিশ গ্রহণও করবেন। ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত উসমান রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– কিয়ামত দিবসে তিন ব্যক্তি সুপারিশ করবেন। প্রথম নবী-রাসূলগণ, দ্বিতীয় উলামায়ে কিরাম, তৃতীয় আল্লাহর পথে শহীদ। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিপন্থী মুতাযিলা তো মূল সুপারিশের প্রবক্তা, তবে তারা বলে– গুনাহ মাফের জন্য এবং গুনাহগারকে আযাব থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সুপারিশ হবে না বরং নেককার বান্দাদের সাওয়াব ও পুরস্কার বাড়ানোর জন্য হবে।

শারেহ রহ. বলেন– এ মতবিরোধ পূর্বোল্লেখিত আরেকটি মতবিরোধের উপর নির্ভরশীল। আমাদের মতে وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ এর নিমত্ত সুপারিশ ছাড়াই কবীরা গুনাহ ক্ষমা করা সম্ভব। কাজেই সুপারিশ সহকারে আরও ভালভাবে সম্ভব হবে। আর মুতাযিলাদের মতে সুপারিশ ছাড়া কবীরা গুনাহ ক্ষমা করা নাজায়েয। বিধায় সুপারিশ সহকারেও নাজায়েয হবে। অবশ্য এতদুভয়ের মধ্যে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কাজেই শারেহ রহ. -এর পক্ষ থেকে একে মতবিরোধের ভিত্তি সাব্যস্ত করা যথোচিত মনে হয় না।

সুপারিশের সত্যতা সম্পর্কে আমাদের দলীল

এক. গুনাহ মাফের জন্য সুপারিশের ভূমিকা থাকার স্বপক্ষে আমাদের দলীল প্রথমতঃ আল্লাহর বাণী – وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ মূলতঃ আল্লাহর কাছে মুমিন বান্দাদের গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনাই সুপারিশ। অতএব সুপারিশ প্রমাণিত হয়ে গেল। অধিকন্তু আয়াতে কারীমায় ذَنْب শব্দে সগীরা-কবীরা উভয় গুনাহই অন্তর্ভুক্ত। অতএব যাবতীয় গুনাহের ব্যাপার সুপারিশ প্রমাণিত হয়ে গেল। অবশ্য নবীগণ নিষ্পাপ বলে তার ক্ষেত্রে ذَنْب শব্দটি সাধারণ অর্থে প্রযোজ্য হওয়া অসম্ভব। কাজেই বলা হবে, নবীজির ক্ষেত্রে ذَنْب শব্দটির উত্তম পরিত্যাগ করা কিংবা ভুলবশতঃ সগীরা গুনাহ করা অর্থে প্রযোজ্য। কেননা নবীগণ তা থেকে (সাধারণ কসুর থেকে) মুক্ত নন।

দুই. আল্লাহর বাণী– فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ (কাফিরদেরকে (তাদের পক্ষে) সুপারিশকারীদের সুপারিশ কোন উপকার দেবে না।) এ আয়াতে কারীমায় কাফিরদের দুরাবস্থা এবং কিয়ামত দিবসে তাদের হতাশা ও বিষণ্ণতার বিবরণ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন– সুপারিশকারীর সুপারিশ তাদের কোন কাজ দেবে না। আর যখন কারও দুরাবস্থার বিবরণ দেওয়া হয় তখন তার সাথে খাছ অবস্থাই বর্ণনা করা হয়। অর্থাৎ সুপারিশ কাজে না আসা বা উপকার না দেওয়া কাফিরদের সাথেই খাছ। তবে মুমিনদের কথা ভিন্ন। তাদের ক্ষেত্রে সুপারিশ উপকারী ও কল্যাণকর হবে।

এ প্রমাণটি কি মাফহূমে মুখালিফ দ্বারা হল ?

قَوْلُهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الخ ঃ এটি একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। তার পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ একটি বিষয় বুঝা দরকার। অর্থাৎ মাফহূমে মুখালিফ বা বিপরীত অর্থ বলে, উল্লেখিত বিষয়ের জন্য সাব্যস্ত হুকুমের পরিপন্থী একটি হুকুমকে যা অনুল্লেখিত জিনিসের জন্য প্রমাণিত। যেমন, হাদীস শরীফে আছে– فِى الْغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكٰوةٌ অর্থাৎ

বিচরণশীল বকরীতে যাকাত রয়েছে। এতে অনুল্লেখিত জিনিস তথা বিচরণশীল নয় এমন বকরীর হুকুম জানা হয়ে গেল অর্থাৎ তাতে যাকাত নেই। সুতরাং অনুল্লেখিত জিনিস অর্থাৎ অবিচরণশীল বকরীতে যাকাত না হওয়াই মাফহূমে মখালিফ, যা শাফিয়াদের মতে হুজ্জত ও প্রমাণ। পক্ষান্তরে হানাফী ও মুতাযিলারা মাফহূমে মূলালিফকে অস্বীকার করে বলেন– অবিচরণশীল বকরীর হুকুম উক্ত হাদীসে উল্লেখ নেই বরং অন্য নছের আলোকে তা জানা গেছে।

উক্ত ভূমিকার পর এখন উহ্য প্রশ্নটি শুনুন। শারেহ রহ. বলেন– উপরিউক্ত আয়াতে কারীমায় কাফিরদের ক্ষেত্রে সুপারিশ উপকারে না আসার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মুমিনদের ক্ষেত্রে সুপারিশ উপকারী হওয়া-না হওয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে আয়তটি নীরব। অথচ আপনারা উক্ত আয়াতের আলোকেই মুমিনদের ক্ষেত্রে সুপারিশ উপকারী বলে প্রমাণ করেন। এতো মাফহূমে মূখালিফ বা বিপরীত অর্থের আলোকে প্রমাণ দেওয়া হল। অথচ মুতাযিলারা তা অস্বীকার করে। সুতরাং এটি মুতাযিলার বিরুদ্ধে প্রমাণ গণ্য হবে না।

সারকথা হল, প্রথমতঃ আমরা মাফহূমে মূখালিফ দ্বারা প্রমাণ পেশ করি না বরং বাক্যের বাগধারার আলোকে প্রমাণ দেই। তাছাড়া সুপারিশ প্রমাণের দ্বিতীয় দলীল নবীজীর বাণী– شَفَاعَتِى لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِى অর্থাৎ আমার সুপারিশ হবে কবীরা গুনাহকারী আমার উম্মতের জন্য। হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ (রহ) ও বর্ণনা করেছে। এটি মশহূর হাদীস। এধরনের হাদীস সুনিশ্চিত জ্ঞানের ফায়দা দেয়।

وَاحْتَجَّتِ الْمُعْتَزِلَةُ بِمِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَاتَّقُوا يَوْمًا لَاتَجْزِى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَاشَفِيْعٍ يُّطَاعُ ـ وَالْجَوَابُ بَعْدَ تَسْلِيْمِ دَلَالَتِهَا عَلَى ـ الْعُمُوْمِ فِى الْاَشْخَاصِ وَالْاَزْمَانِ وَالْاَحْوَالِ أَنَّهُ يَجِبُ تَخْصِيْصُهَا بِالْكُفَّارِ جَمْعًا بَيْنَ الْاَدِلَّةِ ـ وَلَمَّا كَانَ اَصْلُ الْعَفْوِ وَالشَّفَاعَةِ ثَابِتًا بِالْاَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْاِجْمَاعِ قَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ بِالْعَفْوِ عَنِ الصَّغَائِرِ مُطْلَقًا وَعَنِ الْكَبَائِرِ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَبِالشَّفَاعَةِ لِزِيَادَةِ الثَّوَابِ وَكِلَاهُمَا فَاسِدٌ ـ اَمَّا الْاَوَّلُ فَلِاَنَّ التَّائِبَ وَمُرْتَكِبَ الصَّغِيْرَةِ الْمُجْتَنِبَ عَنِ الْكَبِيْرَةِ لَايَسْتَحِقَّانِ الْعَذَابَ عِنْدَهُمْ فَلَا مَعْنَى لِلْعَفْوِ وَاَمَّا الثَّانِى فَلِاَنَّ النُّصُوْصَ دَالَّةٌ عَلَى الشَّفَاعَةِ بِمَعْنَى طَلَبِ الْعَفْوِ مِنَ الْجِنَايَةِ ـ

সহজ তরজমা

মুতাযিলারা وَاتَّقُوا يَوْمًا لَاتُجْزِىْ الخ (তোমরা এমন দিনকে ভয় কর! যেদিন কেউ কারও উপকারে আসবে না এবং কারও কোন সুপারিশও কবুল করা হবে না।) এবং وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ ... الخ (জালিমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না এবং কোন সুপারিশকারীও থাকবে না।) জাতীয় আয়াতে কারীমা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছে। সকল ব্যক্তি, কাল ও অবস্থার ক্ষেত্রে আম হওয়ার উপর এসব আয়াত ইংগিতবহ বলে মেনে নেওয়ার পর জবাব হল, (অর্থাৎ আয়াতগুলো সকল ব্যক্তি সময়-কাল এবং অবস্থা আমভাবে বুঝায় বলেই আমরা মেনে নিলাম। তারপরও জবাবে বলব,) তামাম দলীলের মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে এসব আয়াতকে কাফিরদের সাথে খাছ করা জরুরী। আর মূল ক্ষমা ও শাফাআত কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূল ও ইজমার অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত, বিধায় মুতাযিলারা বলেছে, সগীরা গুনাহ সাধারণভাবে এবং কবীরা গুনাহ তাওবার পরে ক্ষমা করা হবে। আর সুপারিশ হবে প্রতিদান বাড়ানোর জন্য।

বস্তুতঃ উভয় উক্তি অবান্তর। প্রথমটি এজন্য ভ্রান্ত যে, তাওবাকারী ও কবীরা গুনাহ পরিহারকারী সগীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি তাদের মতে শাস্তিযোগ্যই নয়। কাজেই তাকে ক্ষমা করার কোন অর্থ নেই। দ্বিতীয়টি এজন্য ভ্রান্ত যে, নছগুলো শাফা'আত তথা অপরাধ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করার প্রমাণ বহন করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সুপারিশ না হওয়ার পক্ষে মুতাযিলাদের প্রমাণ

মুতাযিলারা গুনাহ মাফ করা এবং আযাব থেকে নিস্কৃতি দানের জন্য সুপারিশ অর্থে শাফা'আত না হওয়ার ব্যাপারে সেসব আয়াতে কারীমা দ্বারা প্রমাণ পেশ করে, যেগুলোতে সরাসরি শাফা'আত বা সুপারিশ গ্রহণ করার ঘোষণা এসেছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ

"তোমরা সেদিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারও পক্ষ থেকে কোন হক আদায় করতে পারবে না এবং কারও পক্ষ থেকে কোন সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না।"

অনুরূপভাবে আল্লাহর বাণী– وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ

"জালিমদের জন্য না কোন একান্ত (অন্তরঙ্গ) বন্ধু হবে, না হবে এমন কোনও সুপারিশকারী, যার কথা গ্রহণ করা হবে (গ্রাহ্য হবে)।"

মু'তাযিলার প্রমাণের জবাব

শারেহ রহ. মুতাযিলাদের প্রদত্ত প্রমাণের চারটি জবাব দিয়েছেন। যথা–

(১) উপরিউক্ত আয়াতটি প্রত্যেক ব্যক্তি থেকে প্রতিদান এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে সুপারিশ গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ বলে আমরা মানি না বরং আমরা বলি, এর দ্বারা বিশেষভাবে কাফিররা উদ্দেশ্য। আয়াতের মর্মার্থ হল, কোনও ব্যক্তি কোনও কাফিরদের পক্ষ থেকে কোন হক আদায় করতে পারবে না। কারও পক্ষ থেকে কাফিরদের জন্য সুপারিশও গ্রহণযোগ্য হবে না।

(২) আর যদি সুপারিশের অগ্রহণযোগ্যতা সকল ব্যক্তির জন্য আম হওয়ার ব্যাপারে উপরিউক্ত আয়াতের নির্দেশনাকে আমরা মেনেও নেই, তাহলে দ্বিতীয় জবাব হবে, উপরিউক্ত আয়াত সর্বকালে সুপারিশ গৃহীত না হওয়ার কথা প্রমাণ করে না বরং সুপারিশ গ্রহণ না করার জন্য বিশেষ কোন সময় নির্দিষ্ট থাকতে পারে। যে সময় কারও ব্যাপারে সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না। উদাহরণতঃ যখন কারও সুপারিশ করার অনুমতি থাকবে না (তখন কারও সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না)। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

(৩) ধরে নিলাম– আয়াতের ভাষ্য হল, সুপারিশ গ্রহণযোগ্য না হওয়ার বিষয়টি সর্বযুগে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থাৎ কখনও কারও পক্ষে সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না, তাহলে তৃতীয় জবাব হচ্ছে, সর্বাবস্থায় সুপারিশ গ্রহণযোগ্য না হওয়ার উপর আয়াতে কারীমা ইঙ্গিতাবহ বলে আমরা স্বীকার করি না বরং সুপারিশ উপকারে না আসা এবং গ্রহণযোগ্য না হওয়া বিশেষ কিছু অবস্থার সাথে খাছ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। উদাহরণতঃ কারও ব্যাপারে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে, তখন তার ব্যাপারে কারও সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন, হাদীসে পাকে এসেছে একবার হযরত আয়েশা রাযি. নবী কারীম ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন– আপনি কি কিয়ামত দিবসেও আপনার পরিবারের লোকদের কথা স্মরণ করবেন? উত্তরে নবীজী বললেন– তিনটি স্থানে কেউ কাউকে স্মরণ রাখবে না। (ক) আমলসমূহ পরিমাপের সময়। (খ) আমলনামা হস্তান্তরের সময়। (গ) পুলসিরাত পার হওয়ার সময়। বুঝা গেল, পরকালে এমনও কিছু পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে, যখন অন্যের ব্যাপারে সুপারিশ করা তো দূরের কথা, অন্যকে এমনকি নিজের পরিবারের লোকদের কথাও স্মরণ থাকবে না।

(৪) তথাপি ধরে নিলাম– সর্বকালে সর্বাবস্থায় সর্বলোকের জন্যই সুপারিশ উপকারে না আসা এবং গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ব্যাপারটি আম। তাহলে চতুর্থ জবাব হচ্ছে, অপরদিকে যেহেতু সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হওয়ার স্বপক্ষে বহু দলীল বিদ্যমান, তাই ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের দলীলগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সামঞ্জস্যতা বিধান করতে হবে। এজন্য সুতাযিলাদের প্রদত্ত, সুপারিশ অগ্রহণযোগ্যতা প্রমাণকারী নছগুলোকে কাফিরদের সাথে বিশেষিত ও খাছ করা জরুরী। এমতাবস্থায় উক্ত নছগুলো আম মাখসূস মিনাহুল বা'আয এর আওতাভুক্ত হবে।

মু'তাযিলার মাযহাবের ভ্রান্তি

قَوْلُهُ: وَلَمَّا كَانَ اَصْلُ الْعَفْوِ الخ ঃ এখান থেকে শারেহ রহ. গুনাহ মাফ করা এবং সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে মুতাযিলাদের মতাদর্শ ও মাযহারের সারকথা এবং সংক্ষিপ্ত রদ বা প্রতিবাদ করছেন। সুতরাং তিনি বলেন, যেহেতু মূল ক্ষমা ও শাফা'আত অকাট্য প্রমাণাদি তথা কিতাবুল্লাহ সুন্নাত ও ইজমার আলোকে প্রমাণিত, বিধায় মুতাযিলাদের পক্ষে আমভাবে গুনাহের ক্ষমা ও শাফা'আতের বিষয়ই অস্বীকার করার দুঃসাহস হয়নি। কাজেই তারা ক্ষমার পক্ষপাতি হয়েছে বটে; তবে যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করা সম্ভব বলে স্বীকৃতি দেয় নি বরং তারা বলেছে, সগীরা গুনাহগুলো তো সকলেরই মাফ করা হবে। এর জন্য না কোনও মুমিনকে আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দিবেন; না কাফিরকে। আর না তাওবা ছাড়া মৃত কোন কবীরা গুনাহগারকে।

মুমিন বান্দাকে সগীরা গুনাহের জন্য শাস্তি না দেওয়ার কারণ হল, আল্লাহর বাণী إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ অনুযায়ী কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার কারণে তার সে গুণাহ কর্তন হয়ে গেছে। আর কাফির ও কবীরা গুনাহগারকে সগীরার শাস্তি না দেওয়ার কারণ হল, কাফির তার কুফরের আর কবীরা গুনাহগার তার কবীরা গুনাহের শাস্তি আসাদনে ব্যস্ত। উভয় চিরস্থায়ী জাহান্নামী। তারা কখনও স্বীয় কুফর ও কবীরা গুনাহের শাস্তি থেকে এতটুকু অব্যাহতি পাবে না যে, তাদেরকে সগীরা গুনাহের সাজা দেওয়া যাবে। তাছাড়া সগীরা গুনাহের কারণে তাদের শাস্তিতে কাঠিন্যতা বা কঠোরতাও সৃষ্টি করা যায় না, যাতে এক সঙ্গে উভয় গুনাহের শাস্তি পেয়ে যাবে। কেননা কুফর ও কবীরা গুনাহের শাস্তি চরম পর্যায়ের শাস্তি। যার উপর আর শাস্তি বাড়ানো সম্ভব নয়।

অনুরূপভাবে তারা সেসব কবীরা গুনাহের ক্ষমারও দাবীদার, যেগুলো থেকে বান্দা তাওবা করে নিয়েছে। আবার তারা শাফা'আতেরও প্রবক্তা। তবে তারা সেই সঙ্গে আরও বলে, গুনাহ মাফ করানোর জন্য এবং আযাব থেকে পরিত্রাণের জন্য নয় বরং নেককারের সাওয়াব ও প্রতিদান এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য হবে সুপারিশ।

শারেহ রহ. বলেন, মুতাযিলারা যে দৃষ্টিকোণ থেকে মাফ ও ক্ষমা এবং যে অর্থে সুপারিশের প্রবক্তা, দুটোই অবান্তর। প্রথমটি তো এজন্য যে, সে কবীরা গুনাহগার যে তাওবা করে নিয়েছে এবং যে সগীরা গুনাহগার কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, মুতাযিলার মতে আযাবের উপযুক্ত বা শাস্তিযোগ্যই নয়। তাহলে তাদেরকে মাফ করার মানে কি ? অবশ্যই নিরর্থক। কেননা ক্ষমা করার অর্থ শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিকে ছাড় দেওয়া এবং তাকে শাস্তি না দেওয়া।

আর দ্বিতীয়টি অবান্তর এজন্য যে, নছগুলো শাফা'আত অর্থাৎ গুনাহ মাফ করার সুপারিশ বুঝায়। কাজেই এগুলোকে প্রতিদান বাড়ানোর অর্থে প্রয়োগ করা নছগুলোর পরিপন্থী; তা আদৌ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বুখারী ও মুসলিম শরীফে স্ববিস্তর হাদীসটি বিদ্যমান। সেখানে বর্ণিত আছে, কিয়ামত দিবসে নবীজী আরশের সন্নিকটে সিজদায় পতিত হবেন এবং জাহান্নামীদের জন্য মুক্তির সুপারিশ করবেন। আল্লাহ তা'আলা নবীজীর সুপারিশ গ্রহণ করবেন এবং অসংখ্য জাহান্নামীকে মুক্তির নির্দেশ দিবেন। এভাবে নবী কারীম ﷺ লোকদেরকে তার সুপারিশের মাধ্যমে মুক্তি দিতে থাকবেন। এমনকি অবশেষে সেসব লোক ব্যতিত আর কেউ জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে না, যাদের ব্যাপারে কুরআনে কারীম চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার চুঁড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।

وَاَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا يُخَلَّدُوْنَ فِى النَّارِ وَاِنْ مَاتُوْا مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَنَفْسُ الْاِيْمَانِ عَمَلُ خَيْرٍ وَلَا يُمْكِنُ اَنْ يَّرٰى جَزَاءَهُ قَبْلَ دُخُوْلِ النَّارِ ثُمَّ يَدْخُلُ النَّارَ لِاَنَّهُ بَاطِلٌ بِالْاِجْمَاعِ فَتَعَيَّنَ الْخُرُوْجُ مِنَ النَّارِ وَلِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ ـ وَقَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا اِلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ النُّصُوْصِ

الدَّالَّةِ عَلٰى كَوْنِ الْمُؤْمِنِ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ مَعَ مَا سَبَقَ مِنَ الْأَدِلَّةِ الْقَاطِعَةِ الدَّالَّةِ عَلٰى اَنَّ الْعَبْدَ لَايَخْرُجُ بِالْمَعْصِيَةِ عَنِ الْاِيْمَانِ ـ وَاَيْضًا اَلْخُلُوْدُ فِى النَّارِ مِنْ اَعْظَمِ الْعُقُوْبَاتِ وَقَدْ جُعِلَ جَزَاءُ الْكُفْرِ الَّذِىْ هُوَ اَعْظَمُ الْجِنَايَاتِ فَلَوْ جُوْزِىَ بِهٖ غَيْرُ الْكَافِرِ لَكَانَتْ زِيَادَةً عَلٰى قَدْرِالْجِنَايَةِ فَلَايَكُوْنُ عَدْلاً ـ

সহজ তরজমা

এবং কবীরা গুনাহকারী মুমিন জাহান্নামে চিরস্থায়ী থাকবে না। যদিও সে তাওবা ছাড়া মারা যায়। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ নেক কাজ করবে, সে তার প্রতিদান পাবে। মূল ঈমানও নেক কাজ। জাহান্নামে প্রবেশের পূর্বে এর প্রতিদান পাওয়া অতঃপর জাহান্নামে প্রবিষ্ট হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। কেননা সর্বসম্মতভাবে তা ভ্রান্ত। অতএব জাহান্নাম থেকে বের হওয়া সুনির্দিষ্ট। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– আল্লাহ তা'আলা মুমিন নারী-পুরুষের সাথে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। তদ্রুপ আল্লাহর বাণী– নিশ্চয় যারা ঈমান আনয়ণ করবে এবং ভালভাল কাজ করবে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস........। এছাড়াও বহু নছ রয়েছে, যেগুলো মুমিনের জান্নাতবাসী হওয়া প্রমাণ করে। সাথে সাথে পূর্ব আলোচিত সেসব অকাট্য প্রমাণাদিও রয়েছে, যেগুলো প্রমাণ করে, গুনাহের কারণে বান্দা ঈমান থেকে বের হয় না। অনুরূপভাবে জাহান্নামে চিরস্থায়ীত্ব সর্বাধিক কঠোর শাস্তি। সর্বাপেক্ষা বড় অপরাধ কুফরের জন্য নির্ধারিত। সুতরাং এ শাস্তি যদি কাফির ভিন্ন অন্য কাউকে দেওয়া হয় (যার অপরাধ নিশ্চিত কুফর থেকে নগণ্য) তাহলে সে শাস্তি অপরাধের পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে। ফলে তা ন্যায়বিচার হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তাওবা ছাড়া মৃত ঈমানদার কি চিরস্থায়ী জাহান্নামী ?

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হল, কবীরা গুনাহকারী মুমিন বান্দা কবীরা গুনাহ থেকে তাওবা করা ছাড়া মারা গেলেও সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না।

(১) এ সংক্রান্ত প্রথম প্রমাণ হল, আল্লাহর বাণী– فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ অর্থাৎ যে ব্যক্তি যথসামান্য বা বিন্দু পরিমাণও নেক কাজ করবে, সে তার প্রতিদান পাবে। (সূরা যিলযাল-৭) আর মূল ঈমানও নেক আমল। যেমন, মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে–

سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْاَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন আমলটি সর্বোত্তম ? জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান। সুতরাং যেহেতু এ হাদীসের আলোকে মূল ঈমানও একটি নেক কাজ এবং উপরিউক্ত আয়াতে কারীমার আলোকে প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় অবশ্যই প্রাপ্য। তাই যৌক্তিকভাবে এখানে তিনটি সম্ভাবন রয়েছে।

ক. ঈমানের প্রতিদান দুনিয়ায় নেয়ামতরূপে কিংবা পরকালে কবীরাহ গুনাহের শাস্তিতে লঘুত্বের রূপে দেওয়া হবে। এ সম্ভাবনা ভ্রান্ত। কারণ, নছগুলো প্রমাণ করে যে, ঈমানের প্রতিদান জান্নাত। যেমন, মুসলিম শরীফের হাদীসে উল্লেখ আছে, مَنْ مَاتَ وَهُوَيَعْلَمُ اَنَّهٗ لَاۤاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস নিয়ে মারা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, সে জান্নাতে যাবে।"

খ. ঈমানের প্রতিদান দেওয়ার জন্য তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। আর যখন সে ঈমানের প্রতিদান পেয়ে যাবে তখন তাকে জান্নাত থেকে বের করে কবীরাহ গুনাহের শাস্তি দেওয়ার জন্য চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এ সম্ভাবনা সর্বসম্মতভাবে ভ্রান্ত। কেননা এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা রয়েছে, যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে তথায় চিরকাল থাকবে। কখনও সেখান থেকে বের হবে না। এ ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণাদিও বিদ্যমান।

গ. কবীরাহ গুনাহের শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রথমে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। অথচ সে তার ঈমানের প্রতিদান পাবে জান্নাতে। অতএব ঈমানের বদলা জান্নাতে পেতে হলে তার জাহান্নাম থেকে বের হওয়া নির্ধারিত হয়ে গেল। আর আমাদের দাবীও প্রমাণিত হয়ে গেল অর্থাৎ কবীরাহ গুনাহকারী মুমিন বান্দা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না।

(২) দ্বিতীয় প্রমাণ হল, ইতোপূর্বে অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা চূঁড়ান্ত হয়ে গেছে যে, কবীরাহ গুনাহ মুমিন বান্দাকে ঈমান থেকে বের করে না বরং কবীরাহ গুনাহকারী ব্যক্তি মুমিনই থাকে। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী–

(১) وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ

(২) إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

প্রভৃতি আয়াতে কারীমার আলোকে মুমিন বান্দা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই কবীরা গুনাহগার জান্নাতবাসীদের মধ্যে গণ্য। আর প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করানো অতঃপর কবীরা গুনাহের শাস্তি দেওয়ার জন্য জান্নাতে থেকে বের করে জাহান্নামে প্রবেশ করানো সর্বসম্মতভাবে ভ্রান্ত। কাজেই প্রথমে কবীরা গুনাহের শাস্তির জন্য তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। অতঃপর জাহান্নাম থেকে বের করে চিরদিনের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে বলে বিদিত হয়ে গেল। অতএব আমাদের দাবী তথা কবীরাহ গুনাহকারী মুমিন ব্যক্তি জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না প্রমাণিত হয়ে গেল।

(৩) তৃতীয় প্রমাণটি ইলযামী তথা বাধ্যতামূলক। কেননা এ প্রমাণটি ভালমন্দ যৌক্তিক হওয়ার উপর নির্ভরশীল। যার প্রবক্তা বিরোধী পক্ষ তথা মুতাযিলা। আশআরী এর প্রবক্তা নয়। এ প্রমাণের সারকথা হল, জাহান্নামে চিরস্থায়ীত্ব চরম পর্যায়ের শাস্তি। আল্লাহ তা'আলা একে চরম অপরাধ (চূঁড়ান্ত পর্যায়ের অপরাধ) তথা কুফরের বদলা সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং কাফির ব্যতীত অন্য কাউকে উদাহরণতঃ কবীরা গুনাহগারকে এ শাস্তি দেওয়া হলে, অপরাধ অপেক্ষা শাস্তির পরিমাণ বেশি হয়ে যাবে। কারণ, তার অপরাধ নিশ্চিত লঘু ও গৌণ। আর অপরাধের চেয়ে অধিক পরিমাণ শাস্তি দেওয়া যৌক্তিকভাবে নিকৃষ্ট ও জঘন্য। যে কাজ যৌক্তিকভাবে মন্দ ও জঘন্য হবে, তোমাদের মতে তা ন্যায়বিচার হতে পারে না। অতএব কবীরা গুনাহগারকে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া তোমাদের মুতাযিলার মাযহাবের দৃষ্টিতে ন্যায়বিচার হবে না।

وَذَهَبَتِ الْمُعْتَزِلَةُ إِلٰى اَنَّ مَنْ اُدْخِلَ النَّارَ فَهُوَ خَالِدٌ فِيْهَا لِاَنَّهُ إِمَّا كَافِرٌ اَوْصَاحِبُ كَبِيْرَةٍ مَاتَ بِلَا تَوْبَةٍ إِذَا الْمَعْصُوْمُ وَالتَّائِبُ وَصَاحِبُ الصَّغِيْرَةِ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ لَيْسُوْا مِنْ اَهْلِ النَّارِ عَلٰى مَا سَبَقَ مِنْ اُصُوْلِهِمْ ـ وَالْكَافِرُ مُخَلَّدٌ بِالْاِجْمَاعِ ـ وَكَذَا صَاحِبُ الْكَبِيْرَةِ مَاتَ بِلَا تَوْبَةٍ بِوَجْهَيْنِ ـ

اَلْاَوَّلُ اَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْعَذَابَ وَهُوَ مَضَرَّةٌ خَالِصَةٌ دَائِمَةٌ ـ فَيُنَافِى اِسْتِحْقَاقَ الثَّوَابِ الَّذِىْ هُوَ مَنْفَعَةٌ خَالِصَةٌ دَائِمَةٌ ـ وَالْجَوَابُ مَنْعُ قَيْدِ الدَّوَامِ بَلْ مَنْعُ الْاِسْتِحْقَاقِ بِالْمَعْنَى الَّذِىْ قَصَدُوْهُ وَهُوَ الْاِسْتِيْجَابُ ـ وَاِنَّمَا الثَّوَابُ فَضْلٌ مِنْهُ وَالْعَذَابُ عَدْلٌ ـ فَاِنْ شَاءَ عَفٰى وَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ مُدَّةً ثُمَّ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ ـ

اَلثَّانِىْ النُّصُوْصُ الدَّالَّةُ عَلَى الْخُلُوْدِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا ـ وَقَوْلُهٗ تَعَالٰى وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَقَوْلِهٖ تَعَالٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْئَتُهٗ فَاُولٰئِكَ

اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ـ وَالْجَوَابُ اَنَّ قَاتِلَ الْمُؤْمِنِ لِكَوْنِهٖ مُؤْمِنًا لَايَكُوْنُ اِلَّا كَافِرًا ـ وَكَذَا مَنْ تَعَدّٰى جَمِيْعَ الْحُدُوْدِ ـ وَكَذَا مَنْ اَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْئَتُهٗ وَشَمَلَتْهُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ـ وَلَوْ سُلِّمَ فَالْخُلُوْدُ قَدْ يُسْتَعْمَلُ فِى الْمَكْثِ الطَّوِيْلِ كَقَوْلِهِمْ سِجْنٌ مُخَلَّدٌ وَلَوْسُلِّمَ فَمُعَارَضٌ بِالنُّصُوْصِ الدَّالَّةِ عَلٰى عَدَمِ الْخُلُوْدِ كَمَا مَرَّ ـ

সহজ তরজমা

এবং মুতাযিলার অভিমত হল, যাকে জাহান্নামে একবার প্রবেশ করানো হবে, সে চিরকাল তথায় থাকবে। কেননা সে হয়ত কাফির হবে নতুবা তাওবা ছাড়া মৃত কবীরা গুনাহগার হবে। কারণ, নিষ্পাপ ব্যক্তি, তাওবাকারী এবং যে সগীরা গুনাহগার কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকত, তারা জাহান্নামীদের মধ্যে গণ্যই নয়। যেমন, এ সম্পর্কে তাদের মূলনীতি পেছনে গেছে। আর কাফির সর্বসম্মতভাবে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। অনুরূপভাবে তাওবা ছাড়া মৃত কবীরা গুনাহগারও দুটি কারণে (চিরস্থায়ী জাহান্নামী)।

প্রথমতঃ সে শাস্তিযোগ্য। আর শাস্তি বিশেষ ও স্থায়ী ক্ষতির নাম। সুতরাং তা খাঁটি ও স্থায়ী উপকারতূল্য প্রতিদানের যোগ্য হওয়ার পরিপন্থী। এর জবাব হল, স্থায়িত্বের শর্ত অস্বীকৃত বরং তারা যে অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছে, সে অর্থে যোগ্য হওয়াও অস্বীকৃত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার উপর আবশ্যক হওয়া। প্রতিদান কেবল আল্লাহর অনুগ্রহ; শাস্তি তার ন্যায়বিচার।

দ্বিতীয়তঃ (মুতাযিলার দ্বিতীয় দলীল) সেসব নছ, যেগুলো (কবীরা গুনাহকারীর) চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়া প্রমাণ করে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী, যে ব্যক্তি কোনও মুমিন বান্দাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে চিরস্থায়ী থাকবে। তদ্রূপ আল্লাহর বাণী, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফরমানী করবে (অবাধ্য হবে) এবং তার বিধানের পরিপন্থী মাতব্বরী করবে (সীমা লঙ্ঘন করবে) আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে চিরস্থায়ী থাকবে। অনুরূপ আল্লাহর বাণী, যারা বদআমল করবে এবং তাদের গুনাহগুলো তাদেরকে পরিবেষ্টন করে নিবে, তারাই জাহান্নামী; তারা তথায় চিরকাল থাকবে।

এর জবাব হল, মুমিন ব্যক্তিকে মুমিন হওয়ার কারণে হত্যাকারী লোক কাফিরই হতে পারে (অর্থাৎ কোন কাফির লোকই তাকে মুমিন বলে হত্যা করতে পারে)। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সমস্ত বিধানের পরিপন্থী কাজ করবে বা সীমা অতিক্রম করবে; তদ্রূপ তার গুনাহ তাকে পরিবেষ্টন করে নিবে এবং তাকে সব দিক থেকে ঘিরে নিবে (আক্রান্ত করবে) সে কাফিরই হবে। যদি ধরে নেওয়া হয়, তবে خُلُوْد শব্দটি দীর্ঘ অবস্থান অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, আরবদের উক্তি سِجْنٌ مُخَلَّدٌ (যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।) আর যদি মেনে নেওয়া হয়, তবে (মুতাযিলার) এ প্রমাণ সেসব নছ বিরোধী, যেগুলো অনস্থায়িত্ব প্রমাণ করে (অর্থাৎ চিরস্থায়ী নয় বুঝায়)। যেমন, পূর্বে বলা হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মু'তাযিলাদের মাযহাব ও প্রমাণ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিপন্থী মুতাযিলার মাযহার হল, তাওবা ছাড়া মৃত কবীরা গুনাহগার চিরস্থায়ী জাহান্নামী। তাদের মতে যে একবার জান্নাতে যাবে, সে চিরকালের জন্য যাবে (সেখানে চিরস্থায়ী থাকবে)। কেননা জাহান্নামে প্রবেশকারী হয়ত কাফির হবে নতুবা হবে তাওবা ছাড়া মৃত কবীরা গুনাহগার। কারণ, নিষ্পাপ ব্যক্তি যার থেকে সগীরা বা কবীরা কোনও গুনাহই হয়নি, তদ্রূপভাবে কবীরা গুনাহগার যে মারা যাওয়ার পূর্বে তাওবা করে নিয়েছে এবং সগীরা গুনাহগার যে কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকত, মুতাযিলার মূলনীতি মাফিক সে জাহান্নামের যোগ্যই নয়। কাজেই জাহান্নামে প্রবেশকারী হয়ত কাফির হবে নয়ত তাওবা ছাড়া মৃত কবীরা গুনাহগার হবে। কাফির সর্বসম্মতভাবে চিরস্থায়ী জাহান্নামী। আর কবীরা গুনাহগার যে তাওবা ছাড়া মৃত্যু বরণ করেছে, সেও দুটি দলীলের ভিত্তিতে জাহান্নামী।

১) সে শাস্তির যোগ্য। যা একান্ত ও চিরস্থায়ী ক্ষতির নাম। সুতরাং শাস্তির যোগ্য হওয়া ঐ প্রতিদান যোগ্য হওয়ার পরিপন্থী, যা একান্ত ও স্থায়ী কল্যাণের নাম।

এ দলীলের জবাব হল, আযাব ও প্রতিদানের অর্থে স্থায়িত্বের শর্ত স্বীকৃত নয় বরং তারা যে অর্থে বান্দাকে শাস্তি ও প্রতিদানের যোগ্য সাব্যস্ত করে অর্থাৎ প্রতিদান ও শাস্তি প্রদান আল্লাহর উপর ওয়াজিব –আমরা তাও স্বীকার করি না। আমরা বলি, প্রতিদান কেবলই আল্লাহ পাকের করুণা; শাস্তি তার ন্যায়বিচার। তিনি ইচ্ছা করলে কবীরা গুনাহগারকে মাফ করে দিবেন। তা হয়ত একান্তই নিজ করুনায় করবেন কিংবা কারও সুপারিশে করবেন। আবার ইচছা করলে নির্দিষ্ট মেয়াদে শাস্তিও দিতে পারেন এবং পুনরায় মুক্তি দিয়ে জান্নাতেও প্রবেশ করাতে পারেন। আযাব বা শাস্তি এবং প্রতিদান দুটির কোনটিই তার উপর আবশ্যক নয়।

২) মু'তাযিলার দ্বিতীয় প্রমাণ সেসব নছ, যেগুলো কবীরা গুনাহগারের চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়া প্রমাণ করে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ـ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ

يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ـ وَمَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْئَتُهٗ فَاُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ـ

✪ শারেহ রহ. এসব নছ দ্বারা মু'তাযিলার প্রদত্ত প্রমাণের প্রথম যে জবাব দিয়েছেন, তার সারকথা হল, উপরিউক্ত তিনটি নছই কাফিরদের ক্ষেত্রে; কবীরা গুনাহগারদের ক্ষেত্রে নয়। সুতরাং প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হবে– কোনও মুমিন ব্যক্তিকে মুমিন হওয়ার কারণে সে ব্যক্তিই হত্যা করতে পারে, যে ঈমানকে মন্দ ও খারাপ মনে করে। আর ঈমানকে খারাপ মনে করে নিশ্চিতভাবে কাফির লোকই। অথবা বলা যায়, উক্ত আয়াতে مُتَعَمِّدًا র অর্থ مُسْتَحِلًّا (হালাল মনেকারী) অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুমিন বান্দাকে হত্যা করা হালাল ভেবে তাকে হত্যা করবে। আর পূর্বেই বলা হয়েছে– وَالْاِسْتِحْلَالُ كُفْرٌ অর্থাৎ কোনও গুনাহকে চাই সগীরা হোক না কেন, হালাল মনে করা কুফর।

✪ দ্বিতীয় আয়াতও কাফিরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ এর মধ্যে حُدُوْد শব্দটি মুযাফ। যেভাবে لَام تَعْرِيْف ইস্তিগরাকের জন্য আসে, তদ্রুপ ইযাফতও ইসতিগরাকের জন্য আসে। এমতাবস্থায় وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ এর মর্মার্থ হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর আহকাম (বিধান) ছেড়ে দিবে। বস্তুতঃ সুমদয় আহকামের মধ্যে আল্লাহ-রাসূলের প্রতি বিশ্বাসও অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী নিশ্চিত কাফির।

✪ তৃতীয় আয়াতে পরিবেষ্টন দ্বারা উদ্দেশ্য হল, গুনাহ তার বাইর-ভিতর অর্থাৎ বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং অন্তর উভয়কে ঘিরে নেওয়া এবং পরিবেষ্টন করা। এমতাবস্থায় না তার অন্তরে বিশ্বাস (অবশিষ্ট) থাকবে, না তার মুখে থাকবে তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকৃতি। এমন ব্যক্তিও নিশ্চিত কাফিরই হবে।

মোটকথা, মুতাযিলার প্রদত্ত তিনটি আয়াতই কাফিরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তথাপি তাদের দাবী "উপরিউক্ত আয়াতে কারীমা কবীরা গুনাহগারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য" বলে যদি ধরেও নেওয়া হয়, তাহলে আমরা বলব– خُلُوْد শব্দটি সর্বদা স্থায়িত্ব অর্থেই ব্যবহৃত হয় না বরং কখনও কখনও 'দীর্ঘ অবস্থান' অর্থাৎ দীর্ঘ সময় থাকা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, প্রবাদ আছে, سِجْنٌ مُخَلَّدٌ তথা দীর্ঘ মেয়াদী জেল, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা خَلَّدَ اللّٰهُ مُلْكَهٗ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার রাজত্বকে দীর্ঘস্থায়ী করুন (চিরস্থায়ী নয়)। তা-ও যদি মেনে নেওয়া হয় অর্থাৎ خُلُوْد 'স্থায়িত্ব' অর্থেই ব্যবহৃত হয়, তাহলে আমরা বলব– তোমাদের পেশকৃত আয়াতে কারীমাগুলো কুরআনের সেসব আয়াত বিরোধী, যেগুলো কবীরা গুনাহগার চিরস্থায়ী জাহান্নামী না হওয়া প্রমাণ করে। যেমন, وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ এবং অনুরূপভাবে হযরত আবু যর রাযি. এর বর্ণিত হাদীস وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ عَلٰى رَغْمِ اَنْفِ اَبِىْ ذَرٍّ যেহেতু এসব আয়াত জাহান্নামে চিরস্থায়ী না থাকা প্রমাণকারী নছগুলোর পরিপন্থী, তাই সেসব আয়াত দ্বারা মুতাযিলার দলীল পেশ করা দুরস্ত নয়।

وَالْاِيْمَانُ فِى اللُّغَةِ اَلتَّصْدِيْقُ اَىْ اِذْعَانُ حُكْمِ الْمُخْبِرِ وَقُوْلُهٗ وَجَعْلُهٗ صَادِقًا اِفْعَالٌ مِنَ الْاَمْنِ ـ كَاَنَّ حَقِيْقَةَ اٰمَنَ بِهٖ اَمَّنَهُ التَّكْذِيْبَ وَالْمُخَالَفَةَ ـ يُعْدٰى بِاللَّامِ كَمَا فِى قَوْلِهٖ تَعَالٰى حِكَايَةً عَنْ اِخْوَةِ يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَااَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا اَىْ بِمُصَدِّقٍ ـ وَبِالْبَاءِ كَمَا فِى قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْاِيْمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ اَلْحَدِيْث ـ اَىْ تُصَدِّقَ ـ وَلَيْسَتْ حَقِيْقَةُ التَّصْدِيْقِ أَنْ تَقَعَ فِى الْقَلْبِ نِسْبَةُ الصِّدْقِ اِلَى الْخَبَرِ اَوِ الْمُخْبِرِ مِنْ غَيْرِ اِذْعَانٍ وَقَبُوْلٍ بَلْ هُوَ اِذْعَانٌ وَقَبُوْلٌ ذَالِكَ بِحَيْثُ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ التَّسْلِيْمِ عَلٰى مَا صَرَّحَ بِهِ الْاِمَامُ الْغَزَالِىُّ وَبِالْجُمْلَةِ اَلْمَعْنَى الَّذِىْ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْفَارِسِيَّةِ بگرويدن هُوَ مَعْنَى التَّصْدِيْقِ الْمُقَابِلِ لِلتَّصَوُّرِ حَيْثُ يُقَالُ فِىْ اَوَائِلِ عِلْمِ الْمِيْزَانِ : اَلْعِلْمُ إِمَّا تَصَوُّرٌ وَاِمَّا تَصْدِيْقٌ صَرَّحَ بِذَالِكَ رَئِيْسُهُمْ ابْنُ سِيْنَا فَلَوْحَصَلَ هٰذَا الْمَعْنٰى لِبَعْضِ الْكُفَّارِ كَانَ اِطْلَاقُ اِسْمِ الْكَافِرِ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ اَنَّ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ أَمَارَاتِ التَّكْذِيْبِ وَالْاِنْكَارِ كَمَا فَرَضْنَا أَنَّ اَحَدًا صَدَّقَ بِجَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَلَّمَهٗ وَاَقَرَّبِهٖ وَعَمِلَ وَمَعَ ذَالِكَ شَدَّ الزُّنَّارَ بِالْاِخْتِيَارِ أَوْ سَجَدَ لِلصَّنَمِ بِالْاِ خْتِيَارِ نَجْعَلُهٗ كَافِرًا لِمَا اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَعَلَ ذَالِكَ عَلَامَةَ التَّكْذِيْبِ وَالْاِنْكَارِ وَتَحْقِيْقُ هٰذَا الْمَقَامِ عَلٰى مَاذَكَرْتُ يُسَهِّلُ لَكَ الطَّرِيْقَ اِلٰى حَلِّ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاِشْكَالَاتِ الْمُوْرَدَةِ فِى مَسْئَلَةِ الْاِيْمَانِ

সহজ তরজমা

ঈমানের আলোচনা

ঈমান অভিধানে তাসদীক (বিশ্বাস করা) এর নাম। অর্থাৎ বার্তাবাহকের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা, তা মেনে নেওয়া এবং সত্য বলে স্বীকৃতি দেওয়া। اِيْمَان বাবে ইফ'আলের মাসদার বা ক্রিয়ামূল। اَمْن ধাতু থেকে নির্গত। (অতএব) اٰمَنَ بِهٖ এর প্রকৃত অর্থ হবে, اَمَّنَهُ التَّكْذِيْبَ وَالْمُخَالَفَةَ অর্থাৎ তাকে অস্বীকার বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং বিরোধীতা থেকে নিরাপদ করেছে। এটি لام (হরফ) দ্বারা মুতা'আদ্দী হয়। যেমন, হযরত ইউসুফ (আ.) এর ভ্রাতাদের উক্তির বিবরণস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا অর্থাৎ আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করছেন না! আবার কখনও কখনও باء (হরফ) দ্বারা মুতা'আদ্দী হয়। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, اَلْاِيْمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ (ঈমান হল, আল্লাহর প্রতি তোমার দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করার নাম)। এখানে تُؤْمِنَ অর্থ تُصَدِّقَ বা সত্যায়ণ করা, দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। অবশ্য দৃঢ় বিশ্বাস ও গ্রহণ করা ব্যতীত (কেবল) সংবাদটি অথবা সংবাদদাতাকে সত্য বলে অন্তরে স্থান দেওয়ার নামই প্রকৃত ঈমান নয়। বরং এমনভাবে অন্তরে বিশ্বাস ও গ্রহণ করে নেওয়ার নাম ঈমান, যাতে তার উপর تَسْلِيْم শব্দটি প্রযোজ্য হয় (তার মধ্যে আনুগত্যের ভাব যেন ফুটে ওঠে)। যেমন, ইমাম গাযালী রহ.এর সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন।

মোটকথা, ফার্সী ভাষায় گرويدن (অন্তরে বিশ্বাস করা) শব্দ দ্বারা যে অর্থ প্রকাশ করা হয়, তা-ই সে তাসদীকের (আন্তরিক বিশ্বাস এর) অর্থ, যা تَصَوُّر (উপলব্ধি) এর বিপরীত। যেমন, ইলমে মানতিকের প্রারম্ভে বলা হয়, ইল্ম হয়ত তাসাওউর হবে নয়ত তাসদীক। যুক্তিবিদ্যার ইমাম ইবনে সীনা এর সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন।

সুতরাং এ অর্থ যদি কোনও কাফিরের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহলে তার উপর কাফির শব্দ প্রয়োগের কারণ হল, তার মধ্যে মিথ্যা প্রতিপন্নতা ও অস্বীকৃতির কোন আলামত পরিদৃষ্ট। যেমন, আমরা ধরে নিলাম- কোন ব্যক্তি নবী কারীম ﷺ এর আনিত যাবতীয় বিষয় অন্তরে বিশ্বাস করল; সেগুলো স্বীকার করল এবং আমল করল। তদুপরি ইচ্ছাকৃতভাবে সে পৈতা বাঁধল এবং ইচ্ছা করে মুর্তিকে সিজদা করল, তাহলে আমরা তাকে কাফির আখ্যা দেব। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব বিষয়কে মিথ্যা ও অস্বীকৃতির আলামত সাব্যস্ত করেছেন। এখানে সংশ্লিষ্ট মাসআলার তাহকীক ও গবেষণা আমি যে ধাঁচে করেছি, তা ঈমানের মাসআলায় উত্থাপিত বহু অভিযোগ-অনুযোগ নিষ্পত্তির পথ সুগম করে দিবে। (অর্থাৎ আমার গবেষণামূলক আলোচনার ফলে ঈমান সংক্রান্ত বহু জটিলতা নিরসন সহজ হয়ে যাবে)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"ঈমান" -এর শাব্দিক বিশ্লেষণ

কারও কারও মতে اِيْمَان বাবে ইফ'আলের ক্রিয়ামূল। اِفْعَال এর হামযাটি تَعْدِيَه এর জন্য হলে এর অর্থ হবে, جَعَلَ الْغَيْرَ اٰمِنًا অর্থাৎ কাউকে নিরাপত্তা দেওয়া বা নিরাপদ করে দেওয়া। আর হামযাটি صَيْرُوْرَت এর জন্য হলে এর অর্থ হবে, নিরাপদ হয়ে যাওয়া। পরবর্তীতে শরী'আত এটিকে তাসদীক বা সত্যায়ণের অর্থে রূপান্তর করেছে। তাদের মাযহাব মতে তাসদীক অর্থে ব্যবহৃত ঈমানে শরঈ অভিধানিক অর্থ থেকে মানকুল ও স্থানান্তরিত হওয়া আবশ্যক। আর নকল আসলের পরিপন্থী। সে সূত্রে শারেহ রহ. তাদের বিরুদ্ধে বলেন, ঈমানের আভিধানিক অর্থ তাসদীক এবং এর আভিধানিক ও শরঈ অর্থের মধ্যে তফাত শুধু ব্যাপকতা ও শর্তযুক্ত হওয়ার অর্থাৎ অভিধানে যে কোনও বার্তবাহকের কথা বিশ্বাস করা এবং তা সত্য বলে মেনে নেওয়ার নাম ঈমান। চাই বার্তাবাহক নবী হোন কিংবা অপর কেউ হোক। শরী'আতের পরিভাষায় বিশেষভবে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আনিত যাবতীয় বিষয়কে তাসদীক ও বিশ্বাস করার নাম ঈমান। বস্তুতঃ প্রথম প্রনয়ন হিসেবে ঈমানের আভিধানিক অর্থ অন্যকে নিরাপদ করে দেওয়া আর দ্বিতীয় প্রণয়ন হিসেবে তাসদীক বা সত্যায়ণ। অতএব উভয়টিই আভিধানিক এবং মূল অর্থ। অর্থ দুটির মধ্যে সামঞ্জস্যতা হল, তাসদীকের মধ্যে অন্যকে নিরাপদ করে দেওয়ার অর্থ বিদ্যমান। কারণ, যখন কেউ কাউকে সত্যায়ণ করল, তখন সে নিজের পক্ষ হতে বিরোধীতা ও মিথ্যা প্রপিন্নতা থেকে তাকে অবমূক্ত করে দিল, তাকে নিরাপত্তা দিল এবং তাকে অভয় দিল। অধিকন্তু ঈমানের মধ্যে اِذْعَان তথা মেনে নেওয়ার অর্থ পাওয়া যায়, যা لَام যোগে মুতা'আদ্দী হয়। যেমন, বলা হয়, اَذْعَنَ لِاَمْرِ فُلَانٍ অর্থাৎ সে অমুকের কথা মেনে নিয়েছে। তাই اِيْمَان কখনও কখনও لَام যোগে মুতা'আদ্দী হয়। যেমন, হযরত ইউসুফ (আ.) ভ্রাতাগণ স্বীয় পিতা হযরত ইয়াকুব (আ.) এর নিকট বিনয়ভরে বলেছি, وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا আপনি আমাদের কথা বিশ্বাস করছেন না। আবার بَاء দ্বারা মুতা'আদ্দী হয় এ হিসেবে যে اِعْتِرَاف (স্বীকৃতি দেওয়া), ঈমানের মধ্যে স্বীকৃতির অর্থও বিদ্যমান। এজন্য ঈমানও কোন কোন সময় بَاء যোগে মুতা'আদ্দী হয়ে থাকে। যেমন, নবী কারীম ﷺ এর বাণী- اَلْاِيْمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ এর মধ্যে ঈমান بَاء যোগে মুতা'আদ্দী হয়েছে। এখানে تُؤْمِنَ অর্থ تُصَدِّقَ তথা সত্যায়ণ করা বা বিশ্বাস করা। মোটকথা, ঈমান শব্দের আভিধানিক এবং শরঈ অর্থ একই। অর্থাৎ সত্যায়ণ করা ও বিশ্বাস করা। পার্থক্য কেবল ব্যাপকতা ও শর্তযুক্ত হওয়ার (অর্থাৎ একটি ব্যাপক অপরটি শর্তযুক্ত)। যেমন পূর্বে বলা হয়েছে।

তাসদীক থাকলেই কি মুমিন বলা হবে ?

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, কোন কোন কাফির রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সত্যবাদী মনে করত এবং বলতও সে কথা। অতএব তাদের মধ্যেও তো সত্যায়ণ পাওয়া গেল। তদুপরি তাদেরকে মুমিন বলা হল না কেন? এতে বুঝা যায়, শরী'আতে কেবল তাসদীকেরই নাম ঈমান নয়।

* শারেহ রহ. এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন- মনে-প্রাণে বিশ্বাস ও গ্রহণ করা ব্যতীত শুধুমাত্র কোন সংবাদ কিংবা সংবাদ দাতার সত্যতাকে অন্তরে স্থান দেওয়ার নামই তাসদীকের হাকীকত বা প্রকৃত ঈমান নয় বরং সত্য জেনে তাকে সত্য হিসেবে মেনে নেওয়ার নাম প্রকৃত তাসদীক। যাকে আরবীতে تَسْلِيْم বলে। কাফিরদের মনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সত্যতার জ্ঞান তো ছিল বটে। কিন্তু تَسْلِيْم অর্থে تَصْدِيْق ছিল না (অর্থাৎ তারা নবীজীর সত্যবাদিতা মনে-প্রাণে স্বীকার করে নেয় নি)।

সারকথা, তাসদীক বলে মনের সে অবস্থা উদ্দেশ্য, ফার্সীতে যাকে گرویدن বলা হয়। এরই নাম তাসলীম বা স্বীকৃতি দান। এটিই تَصَوُّر এর বিপরীত تَصْدِيْق এর অর্থ। সুতরাং এ অবস্থা অর্থাৎ তাসলীম অর্থে তাসদীক যদি কোন কাফিরের মধ্যে পাওয়া যায়, তখনও তার উপর কাফির শব্দ প্রয়োগ হবে। তবে তার কারণ এই নয় যে, তাসদীক ঈমান নয় বরং তার কারণ হল, তার মধ্যে মিথ্যা প্রতিপন্নতা ও অস্বীকৃতির আলামত রয়েছে। যেমন, আমরা ধরে নিলাম, কোন ব্যক্তি নবীজীর আনিত যাবতীয় বিষয়কে তাসদীক বা সত্যায়ণ করে এবং তা স্বীকারও করে; তদনুযায়ী আমলও করে। মোটকথা, সকল মুসলমানের মতে তার মধ্যে ঈমানের রুকন ও শর্তাবলী বিদ্যমান। তাদের মতেও, যারা কেবল তাসদীককে ঈমান বলে। তাদের মতেও, যারা কেবল স্বীকৃতিকে ঈমান সাব্যস্ত করে এবং তাদের মতেও যারা তাসদীক ও স্বীকৃতি উভয়ের সমষ্টিকে ঈমান সাব্যস্ত করে। তদ্রুপ তাদের মতেও, যারা তাসদীক, স্বীকৃতি ও আমল তিনটির সমষ্টিকে ঈমান সাব্যস্ত করে। এতদসত্ত্বেও ঐ ব্যক্তি ইচ্ছা করে কাফিরদের ইউনিফর্ম অর্থাৎ গলায় পৈতা বেঁধে রাখে কিংবা ইচ্ছা করে মূর্তিকে সিজদা করে, তাহলে আমরা তাকে বাইর-ভিতর উভয় দিক থেকে কাফির সনাক্ত করব। কেননা জোরজবরদস্তি ছাড়া গলায় পৈতা বাঁধা তদ্রুপ মূর্তিকে সিজদা করা মিথ্যা প্রতিপন্নতা ও অস্বীকৃতির আলামত। যে তাসদীকের সাথে এ আলামত পাওয়া যাবে, সে তাসদীক যেন অনুপস্থিত; এর কোন কর্তব্য নেই।

ঈমানের যে অর্থ করা হল, এর উপকারীতা

قَوْلُهٗ: وَتَحْقِيْقُ هٰذَا الْكَلَامِ ...الخ অর্থাৎ যে ধাঁচে আমি ঈমানের আভিধানিক অর্থের তত্ত্ববিশ্লেষণ করলাম, এতে ঈমান সংক্রান্ত বহু জটিলতা নিরসন হয়ে যাবে এবং ঈমানের মাসআলায় উত্থাপিত বহু প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাবে। কেননা উপরিউক্ত গবেষণাকর্মের সারকথা হল, ঈমানের আভিধানিক অর্থ তাসদীক অর্থাৎ কোন বিষয়কে সত্য জেনে মেনে নেওয়া। অধিকন্তু তৎসঙ্গে যেন মিথ্যা প্রতিপন্নতা ও অস্বীকৃতির কোন আলামত না থাকে। আর এক্ষেত্রে যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় তন্মধ্যে **একটি** হল, ঈমান তাসদীকের নাম হলে আবু জাহলও মুমিন হত। কেননা সে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সত্যবাদী জানত। এ প্রশ্নের সমাধান হল, তাসদীকের হাকীকত তথা তাসলীম অর্থাৎ মেনে নেওয়া না পাওয়া যাওয়ার কারণে তার তাসদীককে ঈমান বলা যায় না।

দ্বিতীয় প্রশ্নঃ মনে করুন কোন ব্যক্তি তাসদীক বা সত্যায়ণ করে এবং স্বীকৃতি দিল। ফরয-ওয়াজিব অনুযায়ী আমলও করে। কিন্তু (সাথে সাথে) সে মূর্তিকে সিজদা করে কিংবা শরঈ কোন বিধান নিয়ে উপহাসও করে। ফুফাহায়ে কিরাম এমন ব্যক্তির উপর কুফরের হুকুম দেন এবং কাফির বলেন। অথচ সকল মুসলমানের মাযহাব মতে তার মধ্যে ঈমানের রুকনগুলো বিদ্যমান। এ প্রশ্নের সমাধান হল, মূর্তিকে সিজদা করা কিংবা শরী'আতের কোন হুকুম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা মিথ্যা প্রতিপন্নতার আলামত। আর যে ঈমানের সাথে মিথ্যা প্রতিপন্নতা ও অস্বীকৃতির আলামত বর্তমান থাকে, সে ঈমান না থাকার মত। অতএব যেন এ ব্যক্তির ঈমানই নেই।

وَاِذَا عَرَفْتَ حَقِيْقَةَ مَعْنَى التَّصْدِيْقِ فَاعْلَمْ اَنَّ الْاِيْمَانَ فِى الشَّرْعِ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ بِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَىْ تَصْدِيْقُ النَّبِىِّ بِالْقَلْبِ فِىْ جَمِيْعِ مَا عُلِمَ بِالضَّرُوْرَةِ مَجِيْئُهٗ بِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِجْمَالًا ـ فَاِنَّهٗ كَافٍ فِى الْخُرُوْجِ عَنْ عُهْدَةِ الْاِيْمَانِ ـ وَلَاتَنْحَطُّ دَرَجَتُهٗ عَنِ الْاِيْمَانِ التَّفْصِيْلِىِّ ـ فَالْمُشْرِكُ الْمُصَدِّقُ بِوُجُوْدِ الصَّانِعِ وَصِفَاتِهٖ لَايَكُوْنُ مُؤْمِنًا اِلَّا بِحَسَبِ اللُّغَةِ دُوْنَ الشَّرْعِ لِاِخْلَالِهٖ بِالتَّوْحِيْدِ ـ وَاِلَيْهِ الْاِشَارَةُ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ ـ وَالْاِقْرَارُ بِهٖ اَىْ بِاللِّسَانِ اِلَّا اَنَّ التَّصْدِيْقَ رُكْنٌ لَا يَحْتَمِلُ السُّقُوْطَ اَصْلًا وَالْاِقْرَارُ قَدْ يَحْتَمِلُهٗ كَمَا فِىْ حَالَةِ الْاِكْرَاهِ ـ فَاِنْ قِيْلَ قَدْ يَبْقَى التَّصْدِيْقُ كَمَا فِىْ حَالَةِ النَّوْمِ وَ الْغَفْلَةِ قُلْنَا اَلتَّصْدِيْقُ بَاقٍ فِى الْقَلْبِ وَالذُّهُوْلُ اِنَّمَا هُوَ عَنْ حُصُوْلِهٖ ـ وَلَوْ سُلِّمَ فَالشَّارِعُ جَعَلَ الْمُحَقَّقَ الَّذِىْ لَمْ يَطْرَءْ عَلَيْهِ مَايُضَادُّهٗ فِىْ حُكْمِ الْبَاقِىْ حَتّٰى كَانَ الْمُؤْمِنُ اِسْمًا لِمَنْ اٰمَنَ

فِى الْحَالِ اَوْ فِى الْمَاضِىْ وَلَمْ يَطْرَءْ عَلَيْهِ مَا هُوَ عَلَامَةُ التَّكْذِيْبِ . هٰذَا الَّذِىْ ذَكَرَهُ مِنْ اَنَّ الْاِيْمَانَ هُوَ التَّصْدِيْقُ وَالْاِقْرَارُ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ اِخْتِيَارُ الْاِمَامِ شَمْسِ الْاَئِمَّةِ وَفَخْرِ الْاِسْلَامِ .

সহজ তরজমা

আর যখন তুমি তাসদীকের প্রকৃত অর্থ জেনে নিয়েছ, তখন (অর্থাৎ তাসদীকের প্রকৃত অর্থ জানার পর) তুমি জেনে রাখ, শরী'আতের পরিভাষায় ঈমান সেসব বিষয়কে তাসদীক ও বিশ্বাস করার নাম, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যেগুলো নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ শুভাগমন করেছেন। অর্থাৎ সেসব বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আন্তরিকতার সাথে ইজমালীভাবে (সংক্ষেপে) তাসদীক করা (সত্য বলে মেনে নেওয়া এবং বিশ্বাস করা), যেগুলো তিনি আল্লাহর তরফ থেকে নিয়ে এসেছেন বলে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে। কেননা ঈমানের দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত ইজমালী ঈমানই যথেষ্ট এবং তার মর্যাদা বিস্তারিত ঈমান (গ্রহণকারী) থেকে কম নয়। সুতরাং স্রষ্টার অস্তিত্ব ও তার গুণাবলিতে বিশ্বাসী মুশরিক শুধুমাত্র আভিধানিক অর্থে মুমিন হতে পারে; শরঈ অর্থ মুমিন হবে না। কেননা সে একাত্ববাদের বিশ্বাসে ত্রুটি করেছে। আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ (তাদের অধিকাংশ লোকই কেবল মুশরিক অবস্থায় আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ণ করে) দ্বারা এর প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে। আর (দ্বিতীয় রুকন) তা মুখে স্বীকার করা। অবশ্য তাসদীক এমন রুকন (অর্থাৎ আন্তরিক বিশ্বাস ঈমানের এমন স্তম্ভ), যা আদৌ বাদ পড়ার সম্ভাবনা রাখে না। অথচ মৌখিক স্বীকৃতি কোন কোন সময় বাদ পড়ার সম্ভাবনা রাখে। যেমন, জোরজবদস্তির মুহূর্তে (মৌখিক স্বীকারোক্তি বাদ হয়ে যেতে পারে)।

সুতরাং যদি বলা হয়, কোন কোন সময় আন্তরিক বিশ্বাস অটুট থাকে না। যেমন, নিদ্রা ও উদাসীনতার মুহূর্তে থাকে না। আমরা জবাব দেব, তাসদীক অন্তরে যথানুরূপ অটুট থাকে। বিস্মৃতি ও উদাসীনতা কেবল তাসদীক অর্জনের ক্ষেত্রে হয়। সে কথা যদি মেনেও নেওয়া হয়, তথাপি শরী'আত ঐ প্রতিষ্ঠিত বস্তুকে অবশিষ্ট থাকার হুকুমে গণ্য করেছে, যার উপর তার বিপরীত বস্তু আবর্তিত হয়নি। এমনকি মুমিন ঐ ব্যক্তির নাম হবে, যে ব্যক্তি অতিসম্প্রতি কিংবা অতীতে ঈমান এনেছে এবং এর উপর এমন কোন বিষয় আবর্তিত হয়নি, যা মিথ্যা প্রতিপন্নতার আলামত গণ্য হবে (অর্থাৎ তার মধ্যে এধরনের কোনও আলামত পাওয়া যায় নি)। উপরিউক্ত এ আলোচনা অর্থাৎ তাসদীক বা আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতির নাম ঈমান সংখ্যা লঘু উলামায়ে কিরামে মাযহাব। ইমাম শামসুল আইম্মা ও ইমাম ফখরুল ইসলাম রহ. এর পছন্দীয় অভিমত এটিই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শরী'আতের দৃষ্টিতে ঈমান ঃ ঈমানের অভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণের পর শারেহ রহ. এখন তার শরঈ অর্থ বর্ণনা করছেন। শরঈ ঈমানের ব্যাপারে পাচটি মাযহাব রয়েছে।

(১) প্রথম মাযহাব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কতিপয় উলামায়ে কিরামের তথা শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. ও ইমাম ফখরুল ইসলাম বযদবী রহ. এর পছন্দীয় মত হল, তাসদীক ও মৌখিক স্বীকৃতির সমষ্টির নাম ঈমান।

(২) দ্বিতীয় মাযহাব জমহুরে মুহাক্কিকীনের। তন্মধ্যে ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. এবং শাইখ আবু মানসূর মাতুরিদী রহ. -ও রয়েছেন। তাদের পছন্দীয় মত হল, শুধুমাত্র আন্তরিক বিশ্বাসের নাম ঈমান। তবে দুনিয়াবী বিধান কার্যকর করার জন্য মৌখিক স্বীকারোক্তি শর্ত।

(৩) তৃতীয় মাযহাব কতিপয় কাদরিয়া মতাবলম্বীদের। তাদের মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আনিত বিষয়াবলির মা'রিফাত বা পরিচয় জ্ঞানের নাম ঈমান।

(৪) চতুর্থ মাযহাব কার‍্যামিয়্যাদের। তাদের মতে ঈমান শুধুমাত্র মৌখিক স্বীকৃতির নাম।

(৫) পঞ্চম মাযহাব জমহূরে মুহাদ্দিসীন, ফুকাহায়ে কিরাম ও মুতাকাল্লিমীন এবং মুতাযিলা ও খারেজী সম্প্রদায়ের মাযহাব। তাঁরা বলেন, ঈমান হল- আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং আমল বিল আরকানের সমষ্টির নাম।

প্রথম মাযহাবের বিবরণ

উপরিউক্ত সম্পূর্ণ ইবারতে প্রথম মাযহাবের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এ মাযহাব অধিকাংশ হানাফিয়ার এবং শামসুল আইম্মা সারাখসী ও ইমাম ফখরুল ইসলাম বযদভী রহ. এর পছন্দীয়। এ মাযহাবের মূল কথা হল, শরঈ ঈমানের রুকন বা স্তম্ভ দুটি।

(১) তাসদীকে কলবী তথা আন্তরিক বিশ্বাস অর্থাৎ ইজমালীভাবে সেসব বিষয়কে অন্তরে সত্য জেনে মেনে নেওয়া, যেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক আল্লাহর তরফত নিয়ে আসা জরুরীভাবে অর্থাৎ অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত।

(২) সে সব বিষয় সত্য ও খাটি হওয়ার কথা মুখে স্বীকার করা। তবে মৌখিক স্বীকৃতি ঈমানের আসল রুকন নয় যে, কোন অবস্থায়ই তা বাদ পড়ার সম্ভাবনা রাখে না বরং এটি অতিরিক্ত রুকন। কেননা অনেক সময় তা বাদ হয়ে যায়। যেমন, জোর-যবরদস্তির অবস্থায় বাদ হয়ে যায়। যেহেতু শরঈ ঈমানের প্রথম রুকন রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক আনিত যাবতীয় বিষয়াবলির উপর আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করা, যাতে তাওহীদও অন্তর্ভুক্ত; সেহেতু স্রষ্টার অস্তিত্ব ও গুণাবলিতে বিশ্বাসী মুশরিক কেবল আভিধানিক অর্থে মুমিন অর্থাৎ শুধুমাত্র স্রষ্টার অস্তিত্ব ও গুণাবলিতে বিশ্বাস স্থাপনকারী। শরী'আতের দৃষ্টিতে সে মুমিন গণ্য হবে না। কেননা সে তাওহীদে বিশ্বাসী নয়। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আনিত বিষয়গুলোতে তাওহীদও অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া মৌখিক স্বীকৃতি ঈমানের রুকনভুক্ত হওয়ায় নিম্নোক্ত শাখা মাসআলা নির্গত হয়।

মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি দ্বীন-ধর্মের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে। কিন্তু গোটা জীবনে একবারও এর সত্যতা স্বীকারের অবকাশ না পায়, তাহলে আল্লাহর নিকট সে মুমিন গণ্য হবে না। সে জান্নাতেও প্রবেশ করবে না। এমনকি চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ ও মুক্তি পাওয়ার যোগ্যও হবে না।

قَوْلُهُ : فَاِنَّهُ كَافٍ . الخ ঃ অর্থাৎ ঈমান গ্রহণের ফলে অর্পিত দায়িত্ব ইজমালীভাবে সমস্ত জরুরীয়াতে দ্বীনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার দ্বারা আদায় হয়ে যাবে। আর মূল ঈমান বা শুধু ঈমানের গুণে গুণান্বিত হওয়ার ক্ষেত্রে এ ইজমালী তাসদীক ও বিশ্বাস বিস্তারিত বিশ্বাসের স্তর থেকে নিম্নমানের নয়।

নিদ্রাও উদাসীন অবস্থায়ও কি বান্দা মুমিন থাকে ?

قَوْلُهُ : فَاِنْ قِيْلَ قَدْ لَايَبْقَى التَّصْدِيْقُ ঃ এখানে বর্ণিত প্রশ্নের সারকথা হল, ঈমান যদি আন্তরিক বিশ্বাসের নাম হয়, তাহলে নিদ্রাবস্থায় এবং উদাসীনবস্থায় মানুষের মুমিন না থাকার কথা। কেননা এমতাবস্থায় আন্তরিক বিশ্বাস অবশিষ্ট ও অটুট থাকে না।

জবাবের সারকথা, নিদ্রাবস্থায় এবং উদাসীনবস্থায়ও আন্তরিক বিশ্বাস অক্ষুণ্ন থাকে; দূরীভূত হয় না। তবে এমতাবস্থায় তার অস্তিত্বের জ্ঞান থাকে না। আর যদি মেনেও নেওয়া হয় "নিদ্রাবস্থায় আন্তরিক বিশ্বাস অক্ষুণ্ন থাকে না" তাহলে আমরা দ্বিতীয় জবাব দেব, যে আন্তরিক বিশ্বাস একবার অস্তিত্ব লাভ করেছে, সেটিকে শরী'আত প্রবর্তক ততক্ষণ পর্যন্ত অবশিষ্টের হুকুমে ধরেছেন, যাবৎ না তার বিপরীত তথা মিথ্যা প্রতিপন্নতা পাওয়া যাবে। যেরূপভাবে কেউ যখন সমস্ত জরুরীয়াতে দ্বীনকে একবার সত্য বলে স্বীকার করে নিল, তখন তার এ স্বীকারোক্তি ততক্ষণ বলবৎ ও বহাল আছে গণ্য করা হবে, যাবৎ না এর বিপরীত তথা অস্বীকৃতি বাস্তবে পাওয়া যাবে।

وَذَهَبَ جُمْهُوْرُ الْمُحَقِّقِيْنَ اِلٰى اَنَّهُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِالْقَلْبِ وَاِنَّمَا الْاِقْرَارُ شَرْطٌ لِاِجْرَاءِ الْاَحْكَامِ فِى الدُّنْيَا لِمَا اَنَّ تَصْدِيْقَ الْقَلْبِ اَمْرٌ بَاطِنٌ لَابُدَّ لَهٗ مِنْ عَلَامَةٍ فَمَنْ صَدَّقَ بِقَلْبِهٖ وَلَمْ يُقِرَّ بِلِسَانِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا فِىْ اَحْكَامِ الدُّنْيَا وَمَنْ اَقَرَّ بِلِسَانِهٖ وَلَمْ يُصَدِّقْ بِقَلْبِهٖ كَالْمُنَافِقِ فَبِالْعَكْسِ ـ وَهٰذَا هُوَ اِخْتِيَارُ الشَّيْخِ اَبِىْ مَنْصُوْرٍ وَالنُّصُوْصُ مُعَاضِدَةٌ لِذٰلِكَ ـ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اُولٰئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ

اَلْاِيْمَانَ ـ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ ـ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ ـ وَقَالَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ ـ وَقَالَ لِاُسَامَةَ حِيْنَ قَتَلَ مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ هَلَّا شَقَقْتَ قَلْبَهٗ ـ

সহজ তরজমা

আর জমহূরে মুহাককিকীন এর মাযহাব হল, ঈমান কেবল আন্তরিক বিশ্বাসের নাম। স্বীকারোক্তি শুধু দুনিয়াতে বিধি-বিধান কার্যকর করার জন্য শর্ত। কেননা আন্তরিক বিশ্বাস একটি গোপনীয় বিষয়। এর জন্য কোন আলামত থাকা আবশ্যক। সুতরাং যে ব্যক্তি অন্তর থেকে তাসদীক বা বিশ্বাস করবে; মুখে স্বীকার করবে না, সে আল্লাহর নিকট মুমিন; যদিও দুনিয়াবী হুকুমের ক্ষেত্রে সে মুমিন নয়। আর যে ব্যক্তি মুখে স্বীকার করল অথচ অন্তরে বা বিশ্বাস করল না। যেমন– মুনাফিক, তার হুকুম ঐ ব্যক্তির বিপরীত হবে। (অর্থাৎ সে দুনিয়াবী হুকুমে মুমিন বটে; কিন্তু আল্লাহর নিকট মুমিন নয়)। এমতই শাইখ আবু মানসুর মাতুরিদী এর পছন্দীয় মত। একাধিক নছ এ মতের সমর্থন করে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– এরাই সেই লোক, যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা ঈমানকে সুদৃঢ় করে দিয়েছেন। তিনি আরও ইরশাদ করেছেন– তোমাদের অন্তরে এখনও ঈমান প্রবেশ করেনি। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– হে আল্লাহ ! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর সুদৃঢ় রাখুন। তদ্রূপ হযরত উসামা রাযি. যখন একজন 'লা ইলাহা ইল্লাহ' পাঠকারীকে হত্যা করলেন, তখন তার উদ্দেশ্যে নবীজী বললেন– তুমি কেন তার অন্তর বিদীর্ণ করে দেখলে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

দ্বিতীয় মাযহাবের বিবরণ

এটি শরঈ ঈমানের হাকীকত সম্পর্কে দ্বিতীয় মাযহাবের বিবরণ। এ মাযহাবের সারকথা হল, ঈমান কেবল আন্তরিক বিশ্বাসের নাম। তবে যেহেতু আন্তরিক বিশ্বাস একটি বাতেনী বা ভিতরগত বিষয়। এ সম্পর্কে বান্দা সম্যক পরিজ্ঞাত হতে পারে না। কাজেই তাকে মুমিন ভেবে তার উপর দুনিয়াবী হুকুম প্রয়োগ জারী করবে কিভাবে ? যেমন, তার পেছনে নামায পড়া, তার মৃত্যুর পর যানাজার নামায পড়া, মুসলিম কবরস্থানে তাকে দবফন করা, তার থেকে যাকাত উশর উসূল করা ইত্যাদি। কাজেই তার আন্তরিক বিশ্বাস সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায়, এমন কোন আলামত থাকা আবশ্যক। আর সে আলামত হল, মৌখিক স্বীকৃতি। এ মৌখিক স্বীকৃতিই দুনিয়ায় আহকাম বা বিধানগুলো কার্যকর করার জন্য শর্ত। অতএব যে ব্যক্তি অন্তর থেকে জরুরিয়াতে দ্বীনকে বিশ্বাস করবে; মুখে স্বীকার করবে না, সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে মুমিন গণ্য হবে; মানুষের নিকট মুমিন গণ্য হবে না এবং তার উপর ঈমানের দুনিয়াবী বিধান কার্যকর হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শুধু মুখে স্বীকার করবে; অন্তরে বিশ্বাস করবে না, তার উপর দুনিয়াবী বিধান কার্যকর হবে। কিন্তু আল্লাহর নিকট মুমিন গণ্য কবে না।

বস্তুতঃ মৌখিক স্বীকৃতি ঈমানের হাকীকতভুক্ত অংশ নয় বরং দুনিয়ার মানুষ যাতে তার ঈমান গ্রহণ সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারে এবং তাকে মুমিন জেনে তার উপর ঈমানের দুনিয়াবী বিধান কার্যকর করতে পারে। এজন্য মৌখিক স্বীকৃতিকে ঈমানের শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং এ স্বীকারোক্তি ঘোষণা স্বরূপ হওয়াই বাঞ্চনীয়। পক্ষান্তরে যারা মৌখিক স্বীকারোক্তিকে ঈমানের রুকন সাব্যস্ত করেন, তাদের মাযহাব মতে এ স্বীকারোক্তি ঘোষণা স্বরূপ হওয়া জরুরী নয়। স্মরণ রাখতে হবে, যে ব্যক্তি যাবতীয় জরুরীয়াতে দ্বীনের উপর বিশ্বাস রাখে কিন্তু মৌখিক স্বীকারোক্তি প্রদানে অক্ষম। যেমন, বোবা। উপরিউক্ত উভয় মাযহাব মতে সে মুমিন। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি যাবতীয় জরুরীয়ত দ্বীনের উপর বিশ্বাস রাখে এবং মৌখিক স্বীকারোক্তি প্রদানে সক্ষম। তদুপরি সে গোটা জীবনে একবারও সে কথা স্বীকার করল না, তাহলে তার কাছে স্বীকারোক্তি দাবী করা সত্ত্বেও তার স্বীকারোক্তি না দেওয়াকে অস্বিকৃতি ধরা হবে। সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফির হবে। অবশ্য এ ধরনের জরুরিয়াতের দ্বীনে বিশ্বাসী স্বীকারোক্তি প্রদানে সক্ষম ব্যক্তি, যে গোটা জীবনে একবারও স্বীকার করে নি এবং কেউ তার কাছে স্বীকারোক্তি দাবীও করেনি, প্রথম মাযহাবপন্থীদের মতে স্বীকারোক্তি প্রদান ঈমানের রুকন হওয়ার দরুন সে ব্যক্তি কাফির গণ্য হবে। আর দ্বিতীয় মাযহাবপন্থীদের মতে আন্তরিক বিশ্বাস বলবৎ থাকায় সে ব্যক্তি

আল্লাহর নিকট মুমিন হবে। তবে যে মৌখিক স্বীকারোক্তি ঈমানের দুনিয়াবী বিধান কার্যকর করার জন্য এবং আন্তরিক বশ্বিাসের বাহ্যিক নিদর্শন, তার থেকে এ স্বীকারোক্ত না পাওয়া যাওয়ার কারণে সে ব্যক্তি মানুষের নিকট মুমিন হবে না। তার উপর ঈমানের দুনিয়াবী বিধান কার্যকর হবে না।

এ মাযহাবপন্থীদের প্রমাণ হল, ঐসব নছ যেগুলো দ্বারা বুঝা যায় ঈমানের মূল স্থান অন্তর। আন্তরিক ক্রিয়ার নাম ঈমান। আর সুস্পষ্টতই অন্তরের কার্যক্রিয়া মানে কেবল তাসদীক বা আন্তরিক বিশ্বাস। বুঝা গেল, ঈমান শুধু আন্তরিক বিশ্বাসের নাম। আর যে সব নছে ঈমানের মূলস্থান অন্তর সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেগুলো নিম্নরূপ। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

(১) أُولٰئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْإِيْمَانَ "তারাই ঐসব লোক, যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা ঈমানকে সুদৃঢ় করে দিয়েছেন।" অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ হরেছেন–

(২) مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ
যে ব্যক্তি ঈমান গ্রহণের পর কুফরী করবে তার উপর আল্লাহর আযাব ও গজব আসবে, সেসব লোক ব্যতিত। যাদেরকে কুফরীকে বাধ্য করা হবে এবং তাদের অন্তর ঈমানের উপর আস্থাবান (বিশ্বাসে অটল) থাকবে।''

(৩) তদ্রুপ অন্যত্র তিনি বলেন, قَالَتِ الْأَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلٰكِنْ قُوْلُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ "বেদঈনরা বলে– আমরা ঈমান আনয়ণ করেছি। (হে নবী) আপনি তাদেরকে বলুন! তোমরা ঈমান আনয়ণ করনি। বরং তোমরা বল, বাহ্যতঃ আনুগত্য বা নতি স্বীকার করেছি। আর এখানো ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি।

(৪) অনুরূপভাবে হাদীস শরীফে উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায় সময় দু'আয় বলতেন– اَللّٰهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ "হে আল্লাহ! হে মনের কারিগর (পরিবর্তনকারী) আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর অটল-অবিচল রাখুন।'' এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ দেওয়ার কারণ হল, এখানে দ্বীন দ্বারা إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ আয়াত মাফিক ইসলাম উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ ইসলাম ও ঈমান দুটোই এক ও অভিন্ন। সুতরাং হাদীসের মর্ম হবে, আমার অন্তরকে ইসলামের উপর মযবুত ও অটল রাখুন।

মোটকথা, চারটি নছ দ্বারাই প্রতীয়মাণ হয়, ঈমানের স্থান অন্তর। সুতরাং বুঝা গেল, ঈমান অন্তরের কাজ। আর সে কাজ হল বিশ্বাস স্থাপন করা।

(৫) পঞ্চম প্রমাণ হচ্ছে, এক যুদ্ধে শত্রুপক্ষের এক লোক মুসলিম-সীমানার ভিতরে এসে পড়ল। তখন সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়ে নিল। তদুপরি হযরত উসামা রাযি. তাকে হত্যা করে ফেললেন। নবীজী এ কথা জানতে পেরে অসন্তোষ প্রকাশ করে হযরত উসামা রাযি. কে বললেন, তুমি কেন তার অন্তর ফেঁড়ে দেখলে না! এ অসন্তোষের কারণ হল, মৌখিক স্বীকারোক্তির কারণে তার উপর দুনিয়াবী বিধান কার্যকর করার যোগ্য হয়ে গিয়েছিল। তন্মধ্যে তার জীবনের নিরাপত্তাও একটি। অথচ হযরত উসামা রাযি. এর ভুল হয়ে গেল। তিনি তার জীবনের নিরাপত্তা দিলেন না। কাজেই বুঝা যায়, মৌখিক স্বীকারোক্তি দুনিয়াবী বিধান ও আহকাম কার্যকর করার জন্য শর্ত।

فَإِنْ قُلْتَ نَعَمْ! اَلْإِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ لٰكِنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ لَا يَعْرِفُوْنَ مِنْهُ إِلَّا التَّصْدِيْقَ بِاللِّسَانِ وَالنَّبِيُّ وَأَصْحَابُهُ كَانُوا يَقْنَعُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِ بِكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ ـ وَيَحْكُمُوْنَ بِإِيْمَانِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِفْسَارٍ عَمَّا فِىْ قَلْبِهِ ـ قُلْتُ لَا خَفَاءَ فِىْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِى التَّصْدِيْقِ عَمَلُ الْقَلْبِ ـ حَتّٰى لَوْ فَرَضْنَا عَدَمَ وَضْعِ لَفْظِ التَّصْدِيْقِ لِمَعْنًى أَوْ وَضْعَهُ لِمَعْنًى غَيْرِ التَّصْدِيْقِ الْقَلْبِيِّ لَمْ يَحْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْعُرْفِ بِأَنَّ الْمُتَلَفِّظَ بِكَلِمَةٍ صَدَّقْتُ مُصَدِّقُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُؤْمِنٌ بِهِ وَلِهٰذَا صَحَّ نَفْيُ الْإِيْمَانِ عَنْ

بَعْضِ الْمُقِرِّيْنَ بِاللِّسَانِ ـ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ـ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ـ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا ـ وَاَمَّا الْمُقِرُّ بِاللِّسَانِ وَحْدَهٗ فَلَا نِزَاعَ فِىْ اَنَّهٗ يُسَمّٰى مُؤْمِنًا لُغَةً وَتَجْرِىْ عَلَيْهِ اَحْكَامُ الْاِيْمَانِ ظَاهِرًا وَاِنَّمَا النِّزَاعُ فِىْ كَوْنِهٖ مُؤْمِنًا فِيْمَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ وَالنَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَنْ بَعْدَهٗ كَمَا كَانُوْا يَحْكُمُوْنَ بِاِيْمَانِ مَنْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ كَانُوْا يَحْكُمُوْنَ بِكُفْرِ الْمُنَافِقِ ـ فَدَلَّ عَلٰى اَنَّهٗ لَا يَكْفِىْ فِى الْاِيْمَانِ فِعْلُ اللِّسَانِ ـ وَاَيْضًا اَلْاِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلٰى اِيْمَانِ مَنْ صَدَّقَ بِقَلْبِهٖ وَقَصَدَ الْاِقْرَارَ بِاللِّسَانِ وَمَنَعَهٗ مِنْهُ مَانِعٌ مِنْ خَرَسٍ وَنَحْوِهٖ ـ فَظَهَرَ اَنْ لَيْسَتْ حَقِيْقَةُ الْاِيْمَانِ مُجَرَّدَ كَلِمَتَىِ الشَّهَادَةِ عَلٰى مَازَعَمَتِ الْكَرَّامِيَّةُ

সহজ তরজমা

সুতরাং তুমি যদি বল– হ্যাঁ, ঈমান শুধু তাসদীক বা আন্তরিক বিশ্বাসের নাম। কিন্তু আভিধানিকগণ এর দ্বারা কেবল তাসদীক বিল্‌লিসান বা মৌখিক স্বীকারোক্তি বুঝে থাকেন। নবী কারীম ﷺ এবং তাঁর সাথীবর্গ সাহাবায়ে কিরাম ঈমান গ্রহণকারীর পক্ষ থেকে কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে নেওয়াই যথেষ্ট মনে করতেন। তার মনের অবস্থায় পরখ করা ছাড়াই তাকে মুমিন বলতেন। কাজেই আমি বলব, এতো অস্পষ্ট কিছু নয় যে, তাসদীক (বিশ্বাস) এর ক্ষেত্রে ধর্তব্য অন্তরের কাজ। এমনকি আমরা ধরেই নিলাম, তাসদীক শব্দটি কোনও অর্থের জন্য প্রণীত হয়নি কিংবা আন্তরিক বিশ্বাস ভিন্ন অন্য অর্থে প্রণীত হয়েছে, তাহলে অভিধানবেত্তা ও ওরফবিদগণের কেউ تصدقت শব্দ উচ্চারণকারীকে, রাসূল ﷺ এর সত্যায়ণকারী এবং তার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী মুমিন বলে সিদ্ধান্ত দিবেন না। কাজেই কোন কোন মৌখিক স্বীকৃতি দাতার ঈমান না থাকার কথা বলা যথার্থ। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন– "মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে, যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান এনেছি। অথচ তারা মুমিন নয়।" আল্লাহ তা'আলার বাণী– বেদুঈনরা বলেছে, আমরা ঈমান আনয়ণ করেছি। (রাসূল) আপনি বলে দিন, তোমরা ঈমান আনয়ণ কর নি বরং তোমরা বল, আমরা বাহ্যিক আনুগত্য স্বীকার করেছি। অবশ্য কেবল মৌখিক স্বীকৃতিদাতার কথা ভিন্ন। সুতরাং তাকে আভিধানিক অর্থে মুমিন বলা নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। তার উপর ঈমানের বাহ্যিক বিধান কার্যকর হবে। বিতর্ক শুধু আল্লাহর নিকট তার মুমিন হওয়া নিয়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তৎপরবর্তী প্রবীণ উলামায়ে কিরাম যেভাবে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠকারী ব্যক্তি মুমিন হওয়ার হুকুম দিতেন, তদ্রুপ মুনাফিকের কুফরেরও হুকুম লাগাতেন। সুতরাং বুঝা গেল, মুমিন হওয়ার জন্য কেবল মৌখিক স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট নয়। যে ব্যক্তি অন্তর থেকে বিশ্বাস করবে এবং মৌখিক স্বীকারোক্তি দিবে, তার মুমিন হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্যও প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য স্বীকারোক্তির অন্তরায় থাকলে ভিন্ন কথা। যেমন, লোকটি বোবা প্রভৃতি হওয়া। সুতরাং প্রমাণিত হয়ে গেল, ঈমানের হাকীকত কেবল শাহাদাতের কালেমা দুটি পড়া নয়। যেমনটি বলে কার্‌রামিয়ারা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তৃতীয় মাযহাবের বিবরণ

তৃতীয় মাযহাব কাররামিয়াদের। তারা বলে– ঈমান কেবল মৌখিক স্বীকারোক্তির নাম। শারেহ রহ. উপরিউক্ত ইবারতে পূর্বোক্ত তত্ত্বগবেষণা তথা অভিধান ও শারী'আত দুটোতেই ঈমান দ্বারা আন্তরিক বিশ্বাস উদ্দেশ্য হওয়ার উপর প্রশ্ন আকারে তাদের দুটি প্রমাণ পেশ করেছেন। অতঃপর তা খণ্ডন করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন, ঈমান মুখের কাজ নয় বরং অন্তরের কাজ।

এক. সুতরাং কাররামিয়া প্রথমতঃ আপত্তি করে বলে, ঈমানের আভিধানিক অর্থ তাসদীক বা আন্তরিক বিশ্বাস। কিন্তু আভিধানবেত্তাগণ তাসদীক বলতে তাসদীক বিল-লিসান তথা মৌখিক বিশ্বাসই বুঝেন। যাকে বলে اقرار বা স্বীকারোক্তি। সুতরাং বুঝা গেল, অভিধানে ঈমানের অর্থ স্বীকারোক্তি। আর আপনি পূর্বেই বলেছেন, ঈমানে শরঈ ঈমানে লুগাবী (আভিধানিক ঈমান) থেকে গৃহীত নয় বরং উভয়ের অর্থ এক ও অভিন্ন। পার্থক্য শুধু শর্তযুক্ত হওয়ার। অতএব শরঈ ঈমানও স্বীকারোক্তিরই নাম। তবে আভিধানিক ঈমান মুতলাক (নিঃশর্ত) স্বীকৃতির নাম। তা যে কোন বিষয়েরই স্বীকারোক্তি হতে পারে। আর শরঈ ঈমান হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনিত যাবতীয় বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করার নাম। **দুই.** কাররামিয়ার দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, রাসূল ﷺ এর যুগে কোন ব্যক্তি কালিমায়ে শাহাদাত পড়ে নিলে, তিনি ﷺ এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরাম ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করতেন না– "তোমার অন্তরে কী বিশ্বাস আছে না কি নেই?" বরং তাঁর মৌখিক স্বীকারোক্তিকেই যথেষ্ট মনে করতেন এবং তাকে মুমিন বলে সিদ্ধান্ত দিতেন। এতেও বুঝা যায়, ঈমান শুধু স্বীকারোক্তির নাম।

✪ শারেহ রহ. প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলেন, তাসদীক যদি মুখের কাজ হত তাহলে صَدَّقْتُ শব্দটি উচ্চারণকারী নবীজীকে সত্যয়ণকারী (বিশ্বাসকারী) এবং মুমিন হত। এ শব্দটি অর্থহীন হোক কিংবা 'অন্তর থেকে মেনে নেওয়া ছাড়া' অন্য কোন অর্থেই প্রণীত হোক না কেন। অথচ অভিধানবেত্তা এবং ওরফবিদগণের ঐকমত্যে صَدَّقْتُ শব্দ উচ্চারণকারী ব্যক্তি রেসালতে বিশ্বাসী এবং মুমিন হওয়া ভ্রান্ত। কাজেই তাসদীক মুখের কাজ হওয়াও ভ্রান্ত। এজন্যই ঈমান অন্তরের কাজ; মুখের কাজ অর্থাৎ স্বীকারোক্তি নয়। তাছাড়া কোন কোন স্বীকারোক্তি দাতার ঈমান না থাকা সুস্পষ্ট প্রমাণিত। যেমন, কতিপয় মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ

বলা বাহুল্য, এ আয়াতে কারীমায় (মুনাফিকদের) মৌখিক স্বীকারোক্তি থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র তারা আন্তরিক বিশ্বাস শূন্য থাকার কারণে وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ (অর্থাৎ তারা মুমিন নয়) বলে তাদের ঈমান অস্বীকার করা হয়েছে। এতে বুঝা গেল, ঈমান মুখের কাজ অর্থাৎ স্বীকারোক্তি নয় বরং অন্তরের কাজ ও মনের বিশ্বাসের নাম ঈমান। অনুরূপভাবে قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا আয়াতে কারীমায় মৌখিক স্বীকারোক্তি থাকা সত্ত্বেও। لَمْ تُؤْمِنُوْا বলে বেদুঈনদের ঈমান নেই বলেছেন এবং কারণও বর্ণনা করে দিয়েছেন অর্থাৎ এখনও ঈমান তোমাদের অন্তরমূলে পৌছেনি। বুঝা গেল, ঈমানের স্থান অন্তর এবং ঈমান অন্তরের কাজ; মুখের কাজ নয়।

✪ কাররামিয়ার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে শারেহ রহ. বলেছেন– শুধুমাত্র মৌখিক স্বীকারোক্তি দাতার উপর নবীজী এবং সাহাবায়ে কিরাম বাহ্যিক ঈমানের হুকুম লাগাতেন। ফলে তারা প্রার্থিব জীবনে নিরাপত্তা লাভ করত। তাদের উপর চিরস্থায়ী আযাব থেকে মুক্তি দানকারী হাকীকী ও প্রকৃত ঈমানের হুকুম লাগাতেন না।

✪ শারেহ রহ. কার্রামিয়াদের দ্বিতীয় প্রশ্নের দ্বিতীয় জবাবে অভিযোগের স্বরে বলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কিরাম যেরূপভাবে কালেমায়ে শাহাদাত পড়া ব্যক্তিকে মুমনি বলতেন, তদ্রূপ তাকে মুনাফিক বা কাফিরও বলতেন, যে মুখে স্বীকার করত ঠিক কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করত না। সুতরাং প্রমাণিত হল, ঈমান কেবল মৌখিক স্বীকারোক্তির নাম নয়।

✪ এর তৃতীয় জবাব হল, যে ব্যক্তি অন্তরে বিশ্বাস করল এবং মুখে স্বীকৃতি দেওয়ার ইচ্ছা করল কিন্তু বোবা হওয়া বা অন্য কোন প্রতিবন্ধকতার কারণে সে স্বীকার করতে পারল না। তাহলে উম্মতের ঐক্যমতে সে মুমিন। এতেও প্রমাণিত হল, ঈমান মুখের কাজ কিংবা মৌখিক স্বীকারোক্তির নাম নয়, যেমনটি কার্রামিয়া বলে থাকে। নতুবা তাকে মুমিন বলা হত না। কেননা তার মৌখিক স্বীকারোক্তি নেই।

وَلَمَّا كَانَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْمُحَدِّثِيْنَ وَالْمُتَكَلِّمِيْنَ وَالْفُقَهَاءِ اَنَّ الْاِيْمَانَ تَصْدِيْقٌ بِالْجَنَانِ وَاِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْاَرْكَانِ اَشَارَ اِلٰى نَفْيِ ذَالِكَ بِقَوْلِهٖ فَاَمَّا الْاَعْمَالُ اَيِ الطَّاعَاتُ فَهِيَ تَتَزَايَدُ فِيْ نَفْسِهَا وَالْاِيْمَانُ لَايَزِيْدُ وَلَا يَنْقُصُ فَهٰهُنَا مَقَامَانِ . اَلْاَوَّلُ اَنَّ الْاَعْمَالَ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي الْاِيْمَانِ . لِمَا مَرَّ مِنْ اَنَّ حَقِيْقَةَ الْاِيْمَانِ هُوَ التَّصْدِيْقُ . وَلِاَنَّهٗ قَدْ وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَطْفُ الْاَعْمَالِ عَلَى الْاِيْمَانِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَعَ الْقَطْعِ بِاَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ وَعَدَمَ دُخُوْلِ الْمَعْطُوْفِ فِي الْمَعْطُوْفِ عَلَيْهِ وَوَرَدَ اَيْضًا جَعْلُ الْاِيْمَانِ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْاَعْمَالِ كَمَا فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ مَعَ الْقَطْعِ بِاَنَّ الْمَشْرُوْطَ لَايَدْخُلُ فِي الشَّرْطِ لِامْتِنَاعِ اِشْتِرَاطِ الشَّيْئِ لِنَفْسِهٖ . وَوَرَدَ اَيْضًا اِثْبَاتُ الْاِيْمَانِ لِمَنْ تَرَكَ بَعْضَ الْاَعْمَالِ كَمَا فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِقْتَتَلُوْا عَلٰى مَا مَرَّ مَعَ الْقَطْعِ بِاَنَّهٗ لَاتَحَقُّقَ لِلشَّيْئِ بِدُوْنِ رُكْنِهٖ وَلَا يَخْفٰى اَنَّ هٰذِهِ الْوُجُوْهَ اِنَّمَا تَقُوْمُ حُجَّةً عَلٰى مَنْ يَّجْعَلُ الطَّاعَاتِ رُكْنًا مِنْ حَقِيْقَةِ الْاِيْمَانِ بِحَيْثُ اِنَّ تَارِكَهَا لَايَكُوْنُ مُؤْمِنًا كَمَا هُوَ رَأْيُ الْمُعْتَزِلَةِ لَا عَلٰى مَنْ ذَهَبَ اِلٰى اَنَّهَا رُكْنٌ مِنَ الْاِيْمَانِ الْكَامِلِ بِحَيْثُ لَايَخْرُجُ تَارِكُهَا مِنْ حَقِيْقَةِ الْاِيْمَانِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ سَبَقَتْ تَمَسُّكَاتُ الْمُعْتَزِلَةِ بِاَجْوِبَتِهَا فِيْمَا سَبَقَ .

সহজ তরজমা

যেহেতু অধিকাংশ মুহাদ্দিস, মুতাকাল্লিম ও ফুকাহায়ে কিরামের মাযহাব হল, অন্তরে বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা বিধি-বিধানের উপর আমলের সমষ্টির নাম ঈমান, তাই মুসান্নিফ রহ. তাদের মাযহাব প্রত্যাখ্যানের প্রতি ইংগিত করে বলেন, অতঃপর আমলগুলো অর্থাৎ বস্তুগতভাবে ইবাদত কমবেশী হয়ে থাকে আর ঈমান বাড়েও না, কমেও না। সুতরাং এখানে মাসআলা দুটি।

(১) আমলসমূহ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা পূর্বে বলা হয়েছে– ঈমানের হাকীকত তাসদীক বা আন্তরিক বিশ্বাস। তাছাড়া কুরআন-হাদীসে আমলের আত্ফ করা হয়েছে ঈমানের ওপর। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী– اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ অথচ নিশ্চিত সত্য যে, আত্ফ (মা'তূফ-মা'তূফ আলাইহির মধ্যে) ভিন্নতা এবং মা'তূফ ও مَعْطُوْف عَلَيْهِ এর মধ্যে দাখিল না হওয়া দাবী করে। আবার আমল কবূলের জন্য ঈমানকে শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহর বাণী – وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ এর মধ্যে রয়েছে। অথচ নিঃসন্দেহে কোন বস্তু নিজের জন্য শর্ত হওয়া অসম্ভব। বিধায় مَشْرُوْط (শর্তযুক্ত বস্তু) শর্তের অন্তর্ভূক্ত হয় না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি দু- চারটি আমল ছেড়ে দিয়েছে, তার ঈমান আছে বলে প্রমাণিত। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِقْتَتَلُوْا এর মধ্যে রয়েছে। ইতোপূর্বে যেমনটি আলোচনা করা হয়েছে। অথচ নিশ্চিত কোন বস্তু তার রুকন বা মৌলিক উপাদান ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বলা বহুল্য, এ প্রমাণগুলো সে সব লোকের বিরুদ্ধে হুজ্জত, যারা ইবাদত-বন্দেগীকে এমনভাবে মৌলিক ঈমানের রুকন সাব্যস্ত করে যে, তা বর্জনকারী মুমিন থাকবে না। যেমনটি মুতাযিলার

অভিমত। সে সব লোকের বিরুদ্ধে হুজ্জত হবে না, যারা বলে– ইবাদত-আনুগত্য পরিপূর্ণ ঈমানের রুকন অর্থাৎ সেগুলো বর্জনকারী ঈমানের হাকীকত থেকে বের হবে না। যেমনটি ঈমাম শাফেঈ রহ. এর মাযহাব। আর মুতাযিলীদের প্রমাণাদি ও জবাবগুলো পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

চতুর্থ মাযহাবের বিবরণ

শরঈ ঈমানের ব্যাপারে চতুর্থ মাযহাব অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরাম আশ'আরী ব্যতীত অন্যান্য মুতাকাল্লিমীন তথা মুতাযিলা ও খারেজী সম্প্রদায় এবং আহনাফ ব্যতীত অন্যান্য ফুকাহায়ে কিরাম তথা মালেকী, শাফিঈ ও হাম্বলী মতাবলম্বীদের। তারা বলেন– ঈমান আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল করা এ তিনটির সমষ্টি। অবশ্য মুতাযিলি ও খারেজী সম্প্রদায় আমলকে ঈমানের প্রকৃত রুকন বা অঙ্গ মনে করে অর্থাৎ আমল ত্যাগ করলে তাদের মতে বান্দা ঈমান থেকে বেরিয়ে যাবে। আর অন্যনা আমলকে কামিল (পরিপূর্ণ) ঈমানের অংশ মনে করেন অর্থাৎ আমল ছেড়ে দিলে বান্দা মূল ঈমান থেকে বের হবে না বরং সে মুমিনই থাকবে। তবে কামিল মুমিন থাকবে না। যেমন– হাত, পা, নাক, কান ইত্যাদি মানুষের শারীরিক অঙ্গ। এগুলোর কোন একটি না থাকলে কোন ব্যক্তি মানুষ থকে খারিজ হয় না; তাকে মানুষই বলা হয়।

মুসান্নিফ রহ. এ চতুর্থ মাযহাব অর্থাৎ আমল ঈমানের অংশ হওয়াকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার প্রতি ইংগিত করে বলেন– বস্তুতঃ আমল কম বেশী হতে পারে। যেমন, এক ব্যক্তি সারাদিন পঞ্চাশ রাকাত নামায পড়ল। আরেকজন পড়ল মাত্র বিশ রাকাত। কিন্তু ঈমান এর বিপরীত। একজনের ঈমান আরেকজনের ঈমান থেকে কমবেশী হয় না। সুতরাং কমবেশী হওয়ার দিক দিয়ে যেহেতু ঈমান ও আমলের মধ্যে বৈপরিত্ব রয়েছে, তাই আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ঈমানের অংশ হতে পারে না। কেননা কোন বস্তু তার বিপরীত বস্তুর অংশ হয় না।

শারেহ রহ. বিষয়টির গবেষণামূলক জবাবে বলেন– এখানে মাসআলা দুটি। যেগুলো প্রমাণ সাপেক্ষ।

প্রথম মাসআলা ঃ আমল ঈমানের হাকীকতভুক্ত নয় এবং ঈমানের মৌলিক অংশও নয়। এর স্বপক্ষে শারেহ রহ. চারটি প্রমাণ পেশ করেছেন।

(১) আমল দ্বারা উদ্দেশ্য, শারীরিক (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের) কাজকর্ম আর ঈমানের হাকীকত হল, (পূর্ব বর্ণনা মাফিক) তাসদীক বা সত্যায়ণ। এটি অন্তরের কাজ। অতএব ঈমান-আমলের মধ্যে ভিন্নতা ও বিরোধ এসে গেল। আর কোন বস্তু তার বিপরীত ও বিরোধী বস্তুর হাকীকতভুক্ত এবং তার অংশ হয় না।

(২) একাধিক নছের মধ্যে ঈমানের উপর আমলের আত্‌ফ করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী – إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ এর মধ্যে আছে। আর আত্‌ফ مَعْطُوْف عَلَيْهِ ও مَعْطُوْف এর মধ্যে ভিন্নতা চায় এবং مَعْطُوْف عَلَيْه এর মধ্যে مَعْطُوْف দাখিল না হওয়া দাবী করে। বুঝা গেল, আমল তথা মা'তূফ ঈমান তথা মা'তূফ আলাইহি এর মধ্যে দাখিল (অন্তর্ভুক্ত) নয়।

(৩) ঈমানকে আমলের শুদ্ধতা এবং কবূলের জন্য শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ

"যে ব্যক্তি নেক আমল করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী– সে মুমিন। সুতরাং তার প্রচেষ্টা বৃথা যাবে না।" অর্থাৎ তার আমল আল্লাহর নিকট কবুল হবে; তার প্রতিদান দেওয়া হবে।

এ আয়াতে কারীমায় وَهُوَ مُؤْمِنٌ বাক্যটি তার আমেল يَعْمَلْ এর যমীরে ফায়েল থেকে হাল হয়েছে। আর হাল তার আমেলের শর্ত হয়। বুঝা গেল, ঈমান আমল কবুলের জন্য শর্ত এবং আমল মাশ্‌রূত। আর নিশ্চিত মাশ্‌রূত শর্তভুক্ত হয় না। কেননা যদি মাশ্‌রুত তথা আমল তার শর্ত তথা ঈমানের মধ্যে দাখিল থাকত, তাহলে (আমলের জন্য ঈমান শর্ত হওয়ায়) ঈমানের মধ্যে দাখিল আমলেরও শর্ত হওয়া আবশ্যক হত। অথচ কোন বস্তু স্বয়ং তার জন্য শর্ত হওয়া অসম্ভব। কাজেই মাশরূত (আমল) শর্ত অর্থাৎ ঈমানের মধ্যে দাখিল হওয়া এবং ঈমানের অংশ হওয়াও অসম্ভব।

(৪) আমল যদি ঈমমানের হাকীকভুক্ত হয়ে ঈমানের অংশ হত, তাহলে কোন আমল পরিত্যাগকারী মুমিন থাকত না। কেননা অংশ ছুটে যাওয়া পুরোটাই ছুটে যাওয়ার নামান্তর। (جُزْء ফওত হয়ে গেলে كُل ও ফওত হয়ে

যায়) কিন্তু তালী অর্থাৎ আমল পরিত্যাগকারী মুমিন না থাকা ভ্রান্ত। কেননা নছগুলোতে কোন কোন আমল পরিত্যাগকারী লোকের জন্য ঈমান সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا

এ আয়াতে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বিরত থাকার আমল বর্জনকারী এবং পরস্পর বিবাদে লিপ্ত ব্যক্তিকে মুমিন বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে মুকাদ্দমা তথা আমল ঈমানের হাকীকতভুক্ত হওয়া এবং ঈমানের মৌলিক অংশ হওয়াও ভ্রান্ত।

জ্ঞাতব্যঃ উপরিউক্ত চারটি দলীলই আমল মূল ঈমান বা হাকীকতে ঈমানের অংশ নয় বলে প্রমাণ করে। কাজেই এগুলো নিছক মু'তাযিলা এবং খারেজী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রমাণ ও হুজ্জত হবে। এরাই আমলকে ঈমানের হাকীকতভুক্ত ধরে আমল পরিত্যাগকারীকে ঈমান থেকে খারেজ বলে। কিন্তু যেসব মুহাদ্দিসীন ও কুফাহায়ে কিরাম আমলকে কামেল ঈমানের অংশ মনে করেন, এ দলীলগুলো আদৌ তাদের বিরুদ্ধে হুজ্জত হবে না। অর্থাৎ আমল ছেড়ে দেওয়ার কারণে বান্দা হাকীকতে ঈমান থেকে বেরিয়ে যায় না; যার উপর চিরস্থায়ী আযাব থেকে মুক্তি নির্ভরশীল বরং কামেল ঈমান থেকে বেরিয়ে যাবে। ফলে প্রথম পর্যায়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

قَوْلُهُ: فَهٰهُنَا مَقَامَانِ الخ ঃ এখানে مَقَام শব্দের প্রথম মীমে পেশ হলে বাবে ইফ'আল থেকে ইসমে যরফের সীগা। তার অর্থ, مَا يُقَامُ عَلَيْهِ الدَّلِيْلُ –যার উপর দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর যবর হলে ثُلَاثِىْ مُجَرَّد এর মাসদার হিসেবে অর্থ হবে, مَا يَقُوْمُ عَلَيْهِ الدَّلِيْلُ (যার উপর দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়।) উভয় সূরতেই মাসআলা উদ্দেশ্য হবে। যার উপর দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

قَوْلُهُ وَقَدْ سَبَقَتْ تَمَسُّكَاتُ الْمُعْتَزِلَةِ الخ ঃ ইতোপূর্বে মুসান্নিফ রহ. এর উক্তি– وَالْكَبِيْرَةُ لَاتُخْرِجُ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْاِيْمَانِ এর আওতায় আমল ঈমানের অংশ হওয়ার ব্যাপারে মুতাযিলীর দুটি দলীল ও তার জবাব বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু শারেহ রহ. রূপকভাবে দ্বিবচনের উপর تَمَسُّكَات বহুচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন।

اَلْمَقَامُ الثَّانِىْ اَنَّ حَقِيْقَةَ الْاِيْمَانِ لَا تَزِيْدُ وَلَا تَنْقُصُ لِمَا مَرَّ اَنَّهُ التَّصْدِيْقُ الْقَلْبِىُّ الَّذِىْ بَلَغَ حَدَّ الْجَزْمِ وَالْاِذْعَانِ . وَهٰذَا لَا يُتَصَوَّرُ فِيْهِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ حَتّٰى اِنَّ مَنْ حَصَلَ لَهُ حَقِيْقَةُ التَّصْدِيْقِ فَسَوَاءٌ اَتٰى بِالطَّاعَاتِ اَوِ ارْتَكَبَ الْمَعَاصِىْ فَتَصْدِيْقُهُ بَاقٍ عَلٰى حَالِهِ لَاتَغَيُّرَ فِيْهِ اَصْلًا . وَالْاٰيَاتُ الدَّالَّةُ عَلٰى زِيَادَةِ الْاِيْمَانِ مَحْمُوْلَةٌ عَلٰى مَا ذَكَرَهُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رح اَنَّهُمْ كَانُوْا اٰمَنُوْا فِى الْجُمْلَةِ ثُمَّ يَاْتِىْ فَرْضٌ بَعْدَ فَرْضٍ وَكَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِكُلِّ فَرْضٍ خَاصٍّ وَحَاصِلُهُ اَنَّهُ كَانَ يَزِيْدُ بِزِيَادَةِ مَا يَجِبُ بِهِ الْاِيْمَانُ . وَهٰذَا لَا يُتَصَوَّرُ فِىْ غَيْرِ عَصْرِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِيْهِ نَظَرٌ لِاَنَّ الْاِطِّلَاعَ عَلٰى تَفَاصِيْلِ الْفَرَائِضِ مُمْكِنٌ فِىْ غَيْرِ عَصْرِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْاِيْمَانُ وَاجِبٌ اِجْمَالًا فِيْمَا عُلِمَ اِجْمَالًا وَتَفْصِيْلًا فِيْمَا عُلِمَ تَفْصِيْلًا . وَلَا خَفَاءَ فِىْ اَنَّ التَّفْصِيْلِىَّ اَزْيَدُ بَلْ اَكْمَلُ . وَمَا ذُكِرَ مِنْ اَنَّ الْاِجْمَالِىَّ لَا يَنْحَطُّ عَنْ دَرَجَتِهِ فَاِنَّمَا هُوَ فِى الْاِتِّصَافِ بِاَصْلِ الْاِيْمَانِ وَقِيْلَ اِنَّ الثَّبَاتَ وَالدَّوَامَ عَلَى الْاِيْمَانِ زِيَادَةٌ عَلَيْهِ فِىْ كُلِّ سَاعَةٍ وَحَاصِلُهُ اَنَّهُ يَزِيْدُ بِزِيَادَةِ الْاَزْمَانِ لِمَا اَنَّهُ عَرَضٌ لَا يَبْقٰى اِلَّا بِتَجَدُّدِ الْاَمْثَالِ . وَفِيْهِ نَظَرٌ لِاَنَّ حُصُوْلَ الْمِثْلِ بَعْدَ اِنْعِدَامِ الشَّيْءِ لَايَكُوْنُ مِنَ الزِّيَادَةِ فِىْ شَيْءٍ كَمَا فِىْ سَوَادِ الْجِسْمِ مَثَلًا . وَقِيْلَ الْمُرَادُ

زِيَادَةُ ثَمَرَتِهِ وَاِشْرَاقُ نُوْرِهِ وَضِيَائُهُ فِى الْقَلْبِ ـ فَاِنَّهُ يَزِيْدُ بِالْاَعْمَالِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعَاصِىْ وَمَنْ ذَهَبَ اِلٰى اَنَّ الْاَعْمَالَ جُزْءٌ مِنَ الْاِيْمَانِ فَقَبُوْلُهُ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ ظَاهِرٌ وَلِهٰذَا قِيْلَ اِنَّ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةَ فَرْعُ مَسْأَلَةِ كَوْنِ الطَّاعَاتِ جُزْءً مِنَ الْاِيْمَانِ وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِيْنَ لَانُسَلِّمُ اَنَّ حَقِيْقَةَ التَّصْدِيْقِ لَاتَقْبَلُ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ بَلْ تَتَفَاوَتُ قُوَّةً وَضَعْفًا لِلْقَطْعِ بِاَنَّ تَصْدِيْقَ اٰحَادِ الْاُمَّةِ لَيْسَ كَتَصْدِيْقِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلِهٰذَا قَالَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ ـ

সহজ তরজমা

দ্বিতীয় মাসআলাঃ প্রকৃত ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধি গ্রহণ করে না। (অর্থাৎ প্রকৃত ঈমান কমবেশি হয় না; বাড়েও না কমেও না)। কেননা পূর্বে বলা হয়েছে, ঈমান ঐ আন্তরিক বিশ্বাসের নাম, যা দৃঢ়তা ও চূঁড়ান্ত বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌছেছে। আর তাতে হ্রাস-বৃদ্ধির কল্পনা করা যায় না। এমনকি যার প্রকৃত আন্তরিক বিশ্বাস অর্জিত হয়েছে, সে ব্যক্তি ইবাদত করুক চাই না করুক, তার আন্তরিক বিশ্বাস বহাল তবিয়তে থাকে। তাতে মোটেও পরিবর্তন আসে না। আর যে সব আয়াতে কারীমা ঈমান বৃদ্ধি পায় বলে প্রমাণ করে, সেগুলো ইমাম আবু হানীফা রহ. -এর বর্ণনা মাফিক "তারা (সাহাবায়ে কিরাম) প্রথমে ইজমালীভাবে ঈমান আনতেন। অতঃপর একটি ফরযের পর আরেকটি ফরয অবতীর্ণ হত এবং তারা বিশেষভাবে প্রতিটি ফরযের উপর ঈমান আনতেন"–এর উপর প্রযোজ্য। মোটকথা, যেসব বিষয়ের উপর ঈমান আনা আবশ্যক ছিল, সেগুলো বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ঈমানও বৃদ্ধি পেত। নবীজির যুগের পরে এর কল্পনা করা যায় না। আর এতে আপত্তি আছে। কেননা নবীজীর যুগের পরেও ফরযসমূহের উপর অবগতি লাভ করা যেতে পারে। আর যেসব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত জ্ঞান লাভ হয়, তার উপর সংক্ষিপ্তভাবে এবং যেসব বিষয়ে বিশদভাবে জ্ঞান লাভ হয, সেগুলোতে বিশদভাবে ঈমান আনয়ণ করা আবশ্যক। আর স্পষ্টতঃ বিশদ ঈমান (সংক্ষিপ্ত ঈমানের বিপরীতে) অধিক বরং পূর্ণাঙ্গতর।

ইতোপূর্বে যে বলা হয়েছে, ইজমালী (সংক্ষিপ্ত) ঈমান তাফসীলী (বিশদ) ঈমান অপেক্ষা নিম্নস্তরের নয় –তা মূল ঈমানের সাথে বিশেষিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আবার কেউ কেউ বলেন, ঈমানের উপর দৃঢ়তা ও অটলতা মানে প্রতিনিয়ত ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া। সারকথা, সময় বৃদ্ধির কারণে ঈমান বৃদ্ধি পায়। কেননা ঈমান আরয, যা অবশিষ্ট বা বহাল থাকে না। অবশ্য নতুন সদৃশ বস্তু সৃষ্টি হলে বহাল থাকে। তবে এতে আপত্তি রয়েছে। কেননা কোন বস্তু অস্তিত্বহীন হয়ে যাওয়ার পর (তার) নতুন সদৃশ বস্তুর অস্তিত্ব লাভ ঐ (পূর্ব) বস্তুর মধ্যে কিছু বৃদ্ধি পাওয়ার অন্তর্ভুক্ত হয় না (অর্থাৎ বিলীন হয়ে যাওয়া বস্তুর সদৃশ তৈরি হলে, বিলুপ্ত বস্তুতে কিছু বৃদ্ধি পায় না)। যেমন, দেহের কালো রং। কেউ কেউ বলেন, ঈমান বৃদ্ধি পাওয়ার উদ্দেশ্য, ঈমানের ফল এবং অন্তরে ঈমানী নূরের দ্বীপ্তি ও উজ্জলতা বৃদ্ধি পাওয়া। কেননা সে উজ্জলতা ও দ্বীপ্তি আমলের দ্বারা বৃদ্ধি পায়। আর গুনাহের কারণে হ্রাস হয়। যাদের মাযহাব মতে আমল ঈমানের অংশ, তাদের মতানুসারে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি পাওয়া সুস্পষ্ট। কাজেই কথিত আছে, এটি "আমলসমূহ ঈমানের অংশ" মাসআলা থেকে শাখা মাসআলা। আর কোন কোন প্রবীণ আলেম বলেন, মূল ঈমান (তাসদীকের হাকীকত) হ্রাস-বৃদ্ধি গ্রহণ করে বলে আমরা মানি না বরং শক্তি ও দুর্বলতার দৃষ্টিকোণ থেকে তাতে পার্থক্য হয়। কেননা নিশ্চিতভাবে সাধারণ উম্মতের সদস্যদের বিশ্বাস নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিশ্বাসতূল্য বা সমান হয় না। তাছাড়া হযরত ইবরাহীম (আ.) বলেছেন, وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ "তবে আমার অন্তরে যেন প্রশান্তি ও স্থিরতা আসে"।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ঈমানে কি হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে মুসান্নিফ রহ. এর উক্তি اَلْاِيْمَانُ لَايَزِيْدُ وَلَايَنْقُصُ দ্বারা বুঝা যায়, মূল ঈমান ইবাদত-বন্দেগী দ্বারা বৃদ্ধি পায় না এবং গুনাহের কারণে কমেও না। এটিই ইমাম আবু হানীফা রহ. মুতাকাল্লিমীন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাযহাব। কেননা ঈমান ঐ আন্তরিক বিশ্বাসের নাম, যা দৃঢ়তা ও চূঁড়ান্ত

বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আর এ চূঁড়ান্ত বিশ্বাস তথা ইয়াকীনের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। তা তো কেবল ধারণাজ্ঞানে হয়ে থাকে অর্থাৎ ধারণা কম-বেশি হওয়ার অবকাশ রাখে। এমনকি যদি কেউ আবশ্যকীয় দ্বীনি বিষয়ের উপর আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহলে সে ইবাদত-বন্দেগী করুক চাই গুনাহ করুক, তার আন্তরিক বিশ্বাস অক্ষুণ্ন থাকে। তাতে কোন প্রকার পরিবর্তন হয় না। না ইবাদত বাড়ার ফলে তাতে কিছু বৃদ্ধি পায়, না গুনাহের কারণে তাতে কিছু খোয়া যায়।

যারা বলেন ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তাদের প্রমাণ

যারা ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়ার প্রবক্তা, তারা সেসব আয়াতে কারীমা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন, যেগুলোতে বলা হয়েছে ঈমান বাড়ে-কমে। শারেহ রহ. স্বীয় উক্তি اَلْاٰيَاتُ الدَّالَّةُ عَلٰى زِيَادَةِ الْاِيْمَانِ الخ বলে এর তিনটি জবাব দিয়েছেন। যথা–

আমাদের জবাব

(১) প্রথম জবাবটি ইমাম আবু হানীফা রহ. এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত। এতে বলা হয়েছে, ঈমানের বৃদ্ধি প্রমাণকারী আয়াতগুলোতে مُؤْمَنٌ بِهٖ হিসেবে ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া উদ্দেশ্য অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক আল্লাহর পক্ষ থেকে আনীত যাবতীয়ত বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে প্রথমে ইজমালীভাবে ঈমান আনতেন। এরপর পর্যায়ক্রমে এক একটি বিধান অবতীর্ণ হত। তখন তারা প্রতিটি বিধানের উপর তাফসীলিভাবে ঈমান আনতেন। যেমন, নামায ফরয বলে অবতীর্ণ হলে, তারা এর উপর ঈমান আনলেন। যাকাত ফরয বলে অবতীর্ণ হলে, তারা এর উপর ঈমান আনলেন। অনুরূপভাবে অন্যান্য বিধান। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর ফরয-ওয়াজিব ইত্যাদি বিধি-বিধান অবতীর্ণ হওয়া এবং অহী অবতরণের ক্রমধারা তাঁর ওফাতের সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই তার (নবীজীর) পরবর্তী যুগে مَا يَجِبُ بِهِ الْاِيْمَانُ অর্থাৎ مُؤْمَنٌ بِهٖ (যার উপর আনা আবশ্যক) এর মধ্যে বৃদ্ধি পাওয়ার কল্পনা করা যায় না। সুতরাং مُؤْمَنٌ بِهٖ হিসেবেও ঈমানের মধ্যে বৃদ্ধি পাওয়া কল্পনাতীত।

✪এর উপর শারেহ রহ. অভিযোগ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পরবর্তী যুগেও বিভিন্ন ফরয সম্পর্কে অবগতি লাভ করা সম্ভব। কেননা কোন ব্যক্তি একসঙ্গে যাবতীয় ফরযের উপর অবগতি লাভ করে না বরং কিছু ফরযের উপর অবগতি লাভ করে তার উপর ঈমান আনে। তারপর আরও কিছু সম্পর্কে তার অবগতি লাভ হয়, তখন তার উপরও সে ঈমান আনয়ণ করে।

✪ এখানে কারও সন্দেহ হতে পারে, যখন কোন ব্যক্তি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে নিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আনিত সব বিষয়ে সত্যবাদী, তখন তার ঈমানে সমস্ত ফরয ও আবশ্যকীয় দ্বীনি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এখন আর তাতে বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব নয়।

✪ শারেহ রহ. وَالْاِيْمَانُ يَجِبُ اِجْمَالًا বলে উক্ত সংশয় দূরীভূত করেছেন। তিনি বলেন, ইজমালীভাবে সমস্ত জরুরীবিয়াতে দ্বীনের ব্যাপারে নবী কারীমা ﷺ কে সত্যায়ণ করার পর সে যখন পর্যায়ক্রমে জানতে পারল, নামায ফরয, যাকাত ফরত, রোযা ফরয তখন প্রতিটির উপর বিস্তরিত ঈমান আনয়ণ করা এবং স্বতন্ত্রভাবে প্রতিটি বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। আর এরই নাম ঈমানের মধ্যে বৃদ্ধি পাওয়া। আর এ কথা বিদিত যে, ইজমালী (সংক্ষিপ্ত) ঈমানের বিপরীতে বিস্তারিত ঈমান বেশি এবং অধিকতর পূর্ণাঙ্গ। কেননা ইজমালী ঈমানের মু'আল্লাক একটি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক আনিত বিষয়াবলি। আর তাফসীলী (বিস্তারিত) ঈমানের মু'আল্লাক অনেক বিষয়। যেমন– নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি। (অর্থাৎ ইজমালী ঈমানের সম্পর্ক শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আনিত বিষয়গুলোর সাথে আর বিস্তারিত ঈমানের সম্পর্ক নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি বহু বিষয়ের সাথে।)

আর পূর্বে যে বলা হয়েছে, ইজমালী ঈমান তাফসীলী ঈমান থেকে নিম্নস্তরের নয়, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মূল ঈমানের সাথে গুণান্বিত হওয়ার ক্ষেত্রে উভয়ই সমান। অর্থাৎ যেভাবে এক একটি ফরযের উপর বিস্তারিতভাবে ঈমান আনয়ণকারী মুমিন, তদ্রুপ সংক্ষেপে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আনিত যাবতীয় বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনকারী বা ঈমান আনয়ণ কারীও মুমিন।

(২) দ্বিতীয় জবাব হল, যেসব আয়াত ঈমান বাড়ে বলে প্রমাণ করে, সেগুলোতে ঈমান বাড়ার দ্বারা তার (ঈমানের) নতুন সদৃশ বৃদ্ধি পাওয়া উদ্দেশ্য। আর নতুন নতুন সদৃশ বাড়ে, সময় বাড়ায় কারণে। কেননা ঈমান তাসদীক বা আন্তরিক বিশ্বাসের নাম। আর তাসদীক হল ইলম। ইলম হল, মানবীয় অবস্থা। আর অবস্থা আরয। কাজেই প্রকারান্তরে (এগুলোর মধ্যস্থতায়) ঈমানও আরয। আশ'আরীদের নিকট আরয অবশিষ্ট থাকে নতুন নতুন সদৃশ তৈরীর মাধ্যমে। অর্থাৎ আরয অস্তিত্ব লাভের পর বিলীন হয়ে যায়; পরক্ষণে তার নতুন সাদৃশ তৈরী হয়ে যায়। তারপর সেটিও বিলীন হয়ে যায়। পরক্ষণে আরেকটি সাদৃশ তৈরী হয়। অতঃপর সেটিও বিলীন হয়ে যায়। পরক্ষণে তৃতীয় আরেকটি সদৃশ তৈরী হয়ে যায়। এভাবেই একের পর এক আরয বিলীন হতে থাকে এবং নতুন সাদৃশ তৈরী হতে থাকে। সুতরাং যার ঈমান যতটুকু সময় দীর্ঘায়িত হবে এবং ঈমানের উপর তার যতটা দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব হবে, ততোটাই তার ঈমানের সদৃশ তৈরী হবে। মোটকথা, ঈমান বাড়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ঈমানের উপর দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব; যা ঈমানের সদৃশ বৃদ্ধিকে আবশ্যক করে।

✪ এ জবাবের উপর শারেহ রহ. আপত্তি করে বলেন, কোন বস্তু বিলীন হয়ে যাওয়ার পর তার নতুন সাদৃশ তৈরী হওয়াকে উক্ত বস্তুর বৃদ্ধি বলা যায় না। যেমন, শরীরের কাল রং-ও একটি আরয। নতুন সাদৃশ তৈরীর মধ্য দিয়ে রংটি বহাল থাকে। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে তার সাদৃশ তৈরীর কারণে কাল রঙে বা কৃষ্ণতায় কোন কিছু বাড়ে না। আরও জম কালো হয় না।

(৩) তৃতীয় জবাবের সারকথা হল, উপরিউক্ত আয়াতে কারীমায় ঈমান বাড়ে বলার অর্থ এমন তাসদীক বা বিশ্বাস বাড়া উদ্দেশ্য নয়, যা ঈমানের হাক্বীকত বা প্রকৃত ঈমান বরং তার ফল যেমন, অন্তরের কোমলতা, বিনয়, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য, অন্তরে ঈমানের নূর ও জ্যাতি বৃদ্ধি পাওয়া উদ্দেশ্য। কেননা নেক আমলের দ্বারা অন্তরের ঈমানের নূর বৃদ্ধি পায়। আর গুনাহের কারণে সে নূর হ্রাস পায়।

উপরিউক্ত তিনটি জবাব ছিল, ঈমান বৃদ্ধিকে গ্রহণকারী প্রমাণ করে আয়াতের আলোকে ঈমান বাড়ে-কমে না মাযহাবপন্থীদের পক্ষ থেকে। পক্ষান্তরে যারা আমলকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন, তাদের মতে আমল কম-বেশী হওয়ার দ্বারা ঈমানেও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এজন্যই ইমাম রাযী রহ. এবং কতিপয় মুতাকাল্লিমীন বলেন- ঈমানের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়া না হওয়া "আমল ঈমানের অংশ হওয়া-না হওয়া" এর উপর একটি শাখা মাসআলা। সুতরাং যাদের মতে আমল ঈমানের অংশভুক্ত নয় বরং ইয়াকীনের পর্যায়ে পৌঁছা আন্তরিক বিশ্বাসের নাম, তাদের মতে ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধি গ্রহণ করে না বা ঈমান বাড়ে-কমে না। কেননা কমবেশী বা হ্রাস-বৃদ্ধির পার্থক্য হয় ধারণায়, ইয়াকীনের নয়। পক্ষান্তরে যাদের মতে আমল ঈমানের অংশভুক্ত, তাদের মতে আমল কমবেশী হওয়ার কারণে ঈমানও কমবেশী হয়।

তৃতীয় মাযহাবের বিবরণ

তৃতীয় মাযহাব কতিপয় মুহাক্কিকীন অর্থাৎ মাওয়াকিফ গ্রন্থকার কাযী ইয্যুদ্দীন রহ. এর। তিনি তাসদীককে প্রকৃত ঈমান সাব্যস্ত করা সত্ত্বেও বলেন, ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়া গ্রহণ করে না বলে আমরা স্বীকার করি না। যেমনটি জমহূর বলে থাকেন। বরং তাসদীকের মধ্যে শক্তি ও দুর্বলতার দিক দিয়ে পার্থক্য হয়। কেননা নিশ্চিত সাধারণ উম্মতের তাসদীক নবী কারীম ﷺ এর তাসদীক সমতূল্য নয় বরং নবী কারীম ﷺ এর তাসদীক শক্তিশালী ও উচ্চ পর্যায়ের। পক্ষান্তরে সাধারণ উম্মতের তাসদীক দুর্বল। শক্তি ও দুর্বলতার দিক দিয়ে ব্যবধানের কারণে যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) মৃতকে জীবিত করার স্বরূপ দেখানোর দরখাস্ত করলেন এবং আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করলেন- أَوَلَمْ تُؤْمِنْ তুমি কি বিশ্বাস কর না? তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন- بَلٰى وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ অর্থাৎ বিশ্বাস (ঈমান ও তাসদীক) তো আছে। কিন্তু তারপরও দেখতে চাই, যাতে আমার প্রশান্তি আসে তথা ঈমান বৃদ্ধি পায়।

بَقِيَ هٰهُنَا بَحْثٌ اٰخَرُ وَهُوَ اَنَّ بَعْضَ الْقَدَرِيَّةِ ذَهَبَ اِلٰى اَنَّ الْاِيْمَانَ هُوَ الْمَعْرِفَةُ وَاَطْبَقَ عُلَمَاؤُنَا عَلٰى فَسَادِهٖ ـ لِاَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ كَانُوْا يَعْرِفُوْنَ نُبُوَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا كَانُوْا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاۤءَهُمْ مَعَ الْقَطْعِ بِكُفْرِهِمْ لِعَدَمِ التَّصْدِيْقِ وَلِاَنَّ مِنَ الْكُفَّارِ مَنْ كَانَ يَعْرِفُ الْحَقَّ يَقِيْنًا وَاِنَّمَا كَانَ يُنْكِرُ عِنَادًا وَاسْتِكْبَارًا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَعْرِفَةِ الْاَحْكَامِ وَاسْتِيْقَانِهَا وَبَيْنَ التَّصْدِيْقِ بِهَا وَاعْتِقَادِهَا لِيَصِحَّ كَوْنُ الثَّانِيْ اِيْمَانًا دُوْنَ الْاَوَّلِ وَالْمَذْكُوْرُ فِيْ كَلَامِ بَعْضِ الْمَشَائِخِ اَنَّ التَّصْدِيْقَ عِبَارَةٌ عَنْ رَبْطِ الْقَلْبِ عَلٰى مَا عُلِمَ مِنْ اَخْبَارِ الْمُخْبِرِ وَهُوَ اَمْرٌ كَسْبِيٌّ يَثْبُتُ بِاخْتِيَارِ الْمُصَدِّقِ ـ وَاِذَا يُثَابُ عَلَيْهِ وَيُجْعَلُ رَأْسَ الْعِبَادَاتِ بِخِلَافِ الْمَعْرِفَةِ فَاِنَّهُ رُبَّمَا يَحْصُلُ بِلَا كَسْبٍ كَمَنْ وَقَعَ بَصَرُهٗ عَلٰى جِسْمٍ فَحَصَلَ لَهٗ مَعْرِفَةُ اَنَّهٗ جِدَارٌ اَوْ حَجَرٌ ـ

وَهٰذَا مَا ذَكَرَهٗ بَعْضُ الْمُحَقِّقِيْنَ مِنْ اَنَّ التَّصْدِيْقَ هُوَ اَنْ تَنْسِبَ بِاخْتِيَارِكَ الصِّدْقَ اِلَى الْمُخْبِرِ حَتّٰى لَوْ وَقَعَ ذٰلِكَ فِي الْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ لَمْ يَكُنْ تَصْدِيْقًا وَاِنْ كَانَ مَعْرِفَةً ـ وَهٰذَا مُشْكِلٌ ـ لِاَنَّ التَّصْدِيْقَ مِنْ اَقْسَامِ الْعِلْمِ وَهُوَ مِنَ الْكَيْفِيَّاتِ النَّفْسَانِيَّةِ دُوْنَ الْاَفْعَالِ الْاِخْتِيَارِيَّةِ ـ لِاَنَّا اِذَا تَصَوَّرْنَا النِّسْبَةَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ وَشَكَكْنَا فِيْ اَنَّهَا بِالْاِثْبَاتِ اَوِ النَّفْيِ ـ ثُمَّ اُقِيْمَ الْبُرْهَانُ عَلٰى ثُبُوْتِهَا فَالَّذِيْ يَحْصُلُ لَنَا هُوَ الْاِذْعَانُ وَالْقَبُوْلُ لِتِلْكَ النِّسْبَةِ وَهُوَ مَعْنَى التَّصْدِيْقِ وَالْحُكْمِ وَالْاِثْبَاتِ وَالْاِيْقَاعِ ـ نَعَمْ تَحْصِيْلُ تِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ يَكُوْنُ بِالْاِخْتِيَارِ فِيْ مُبَاشَرَةِ الْاَسْبَابِ وَصَرْفِ النَّظْرِ وَرَفْعِ الْمَوَانِعِ وَنَحْوِ ذَالِكَ وَبِهٰذَا الْاِعْتِبَارِ يَقَعُ التَّكْلِيْفُ بِالْاِيْمَانِ وَكَانَ هٰذَا هُوَ الْمُرَادُ بِكَوْنِهٖ كَسْبِيًّا اِخْتِيَارِيًّا وَلَا يَكْفِيْ فِيْ حُصُوْلِ التَّصْدِيْقِ الْمَعْرِفَةُ لِاَنَّهَا قَدْ تَكُوْنُ بِدُوْنِ ذَالِكَ ـ نَعَمْ يَلْزَمُ اَنْ تَكُوْنَ الْمَعْرِفَةُ الْيَقِيْنِيَّةُ الْمُكْتَسَبَةُ بِالْاِخْتِيَارِ تَصْدِيْقًا وَلَا بَأْسَ بِذَالِكَ لِاَنَّهٗ حِيْنَئِذٍ يَحْصُلُ الْمَعْنَى الَّذِيْ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْفَارِسِيَّةِ بِگرويدن وَلَيْسَ الْاِيْمَانُ وَالتَّصْدِيْقُ سِوٰى ذَالِكَ ـ وَحُصُوْلُهٗ لِلْكُفَّارِ الْمُعَانِدِيْنَ مَمْنُوْعٌ وَعَلٰى تَقْدِيْرِ الْحُصُوْلِ فَتَكْفِيْرُهُمْ يَكُوْنُ بِاِنْكَارِهِمْ بِاللِّسَانِ وَاِصْرَارِهِمْ عَلَى الْعِنَادِ وَالْاِسْتِكْبَارِ وَمَاهُوَ مِنْ عَلَامَاتِ التَّكْذِيْبِ وَالْاِنْكَارِ ـ

সহজ তরজমা

এখানে আরেকটি আলোচনা রয়ে গেছে। তা হল, কতিপয় কাদ্‌রিয়ার মাযহাব হচ্ছে, ঈমান কেবল মা'আরিফতের নাম। এ মাযহাবের ভ্রান্তির ব্যাপারে আমাদের উলামায়ে কিরাম একমত। কারণ, আহলে কিতাব লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নবুওয়াত সম্পর্কে এমনভাবে জানত, যেরূপভাবে আপন সন্তানদেরকে চিনত। তদুপরি আন্তরিক বিশ্বাস না থাকায় তাদের কুফরী নিশ্চিত (অর্থাৎ তারা নিশ্চিত কাফির সনাক্ত হয়েছে।) তাছাড়া (এজন্য যে,) কাফিরদের অনেকেই সন্দেহাতীতভাবে সত্যকে জানত। কিন্তু নিছক ঐদ্ধত-অহংকারের দরুন সত্যকে স্বীকার করত না। আল্লাহ তা'আলার বাণী– তারা (মূসা আ. এর মু'জিযাগুলো) অস্বীকার করেছে। অথচ তারা অন্তরে এর দৃঢ় বিশ্বাস রাখত। সুতরাং আহকামের পরিচয় জানা ও আন্তরিক বিশ্বাস করা এবং আহকামকে সত্যায়ণ করার ই'তিকাদ রাখার ক্ষেত্রে পার্থক্য নিরূপণ করা আবশ্যক। যাতে বলা বিশুদ্ধ হয়– দ্বিতীয়টি ঈমান; প্রথমটি ঈমান নয়।

কোন কোন মাশাইখের বক্তব্যে উল্লেখ আছে, তাসদীক দ্বারা উদ্দেশ্য হল, বার্তাবাহকের সংবাদের মাধ্যমে যা জানা গেছে, তার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। আর তা অর্জিত জিনিস। অর্জিত হয় তাসদীককারীর ইচ্ছায়। এজন্যই এর উপর প্রতিদান দেওয়া হয় এবং একে ইবাতের গোড়া বলা হয়। মা'আরেফাত এর বিপরীত। তা অনেক সময় অর্জন ও ইচ্ছা করা ছাড়াই অর্জিত হয়ে যায়। যেমন, কোন দেহের উপর কারও দৃষ্টি পড়ল, তাহলে সে লোকের জ্ঞান হয়ে যাবে যে, সে বস্তুটি দেয়াল বা পাথর। এটিই কতিপয় বিশেষজ্ঞের উদ্‌ধৃত কথা অর্থাৎ তাসদীক হল, স্বেচ্ছায় বার্তাবাহকের প্রতি সত্যতার সম্বন্ধ করা। এমনকি তা যদি অনিচ্ছায় অন্তরে এসে যায়, তবে তা তাসদীক হবে না। যদিও মা'আরেফত (পরিচয়) লাভ হয়। অবশ্য এটি একটি জটিল বিষয়। কারণ, তাসদীক ইলমের প্রকারভুক্ত। আর ইলম আত্মিক একটি অবস্থা; ঐচ্ছিক কর্মভুক্ত নয়। কেননা যখন আমরা দুটি বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক অনুভব বা কল্পনা করি এবং সংশয় করি, এ সম্পর্ক ইতিবাচব নাকি নেতিবাচক ? অতঃপর সে বস্তুটির প্রমাণের জন্য দলীল পেশ করা হয়। তখন আমরা যা পাই তা হল, ঐ সম্বন্ধের দৃঢ় বিশ্বাস ও কবুল। আর তা-ই তাসদীক, হুকুম, ইসবাত (প্রমাণ করা) এবং ঈকা (বাস্তবে হওয়া) এর অর্থ। অবশ্য প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ কাজে লাগানো, চিন্তা-ভাবনা করা, প্রতিবন্ধকতা বিদূরীত করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছা থাকলে ঐ অবস্থা অর্জিত হবে। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকেই ঈমানের দ্বায়িত্বভার অর্পিত হয়। বস্তুতঃ তাসদীক অর্জিত ও ঐচ্ছিক হওয়ার দ্বারা (বোধ হয়) তা-ই উদ্দেশ্য। তাসদীক অর্জনে মা'আরিফত (পরিচয় জ্ঞান) যথেষ্ট নয়। কারণ, তা তো ইচ্ছা ছাড়াও অর্জিত হয়ে যায়। তবে ঐচ্ছিকভাবে যে ইয়াকীনি (পরিচয় জ্ঞান) অর্জিত হয়, তা তাসদীক হওয়া আবশ্যক। এতে দোষেরও কিছু নেই। কেননা তখন সে অর্থ অর্জিত হয়ে যাবে, ফার্সীতে যাকে گرویدن শব্দে ব্যক্ত করা হয়। ঈমান ও তাসদীক এছাড়া ভিন্ন কিছু নয়। সত্য অস্বীকারকারী দাম্ভিক কাফিরের পক্ষে এ তাসদীক অর্জন স্বীকৃত নয়। আর (এমন তাসদীক তাদের পক্ষে) অর্জিত হয় মেনে নিলে, তাদেরকে কাফির বলা হবে– তাদের মৌখিক অস্বীকৃতি, ঐদ্ধত-অহংকার এবং মিথ্যা প্রতিপন্নতা ও অস্বীকৃতির আলামতের উপর তাদের অটলতার কারণে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শরঈ ঈমানের হাকীকত সম্পর্কে এ পর্যন্ত পাঁচটি মাযহাবের আলোচনা করা হল। প্রথম মাযহাব ছিল, ঈমান আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতির সমষ্টি। দ্বিতীয় মাযহাব ছিল, ঈমান শুধু আন্তরিক বিশ্বাসের নাম। মৌখিক স্বীকারোক্তি ঈমানের দুনিয়াবী হুকুম কার্যকর করার জন্য শর্ত। এ দুটি মাযহাব মুতাকাল্লিমীন ও আহলে সুন্নতের ছিল। তৃতীয় মাযহাব ছিল, জমহূরে মুহাদ্দিসীন ও আহনাফ ব্যতীত মুতাযিলা ও খারেজী সম্প্রদায়ের ফকীহগণের। তাদের মতে আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি ও আমলের সমষ্টির নাম ঈমান। আর চতুর্থ মাযহাব ছিল, কার্‌রামিয়ার অর্থাৎ ঈমান শুধু মৌকিক স্বীকারোক্তির নাম। এ চারটি মাযহাবের আলোচনা শেষে শারেহ রহ. এখানে পঞ্চম মাযহাব আলোচনা করেছেন।

পঞ্চম মাযহাবের বিবরণ

এটি কতিপয় কাদরিয়ার মাযহাব। তাদের মতে ঈমান আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ কে চেনার নাম। শারেহ রহ. এ মাযহাবের ভ্রান্তির ব্যাপারে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ঐকমত্যের দাবী করেছেন এবং ভ্রান্তির উপর দুটি প্রমাণও পেশ করেছেন।

১. প্রথম প্রমাণের সারকথা, ঈমান যদি চিন-পরিচয়ের নাম হত, তাহলে আহলে কিতাব মুমিন হত। কেননা

তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে ভালভাবেই চিনত। তারা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে উল্লেখিত শেষ নবীর নিদর্শনের আলোকে জানত যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। যেমন, কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَائَهُمْ

তদুপরি তাদের আন্তরিক বিশ্বাস না থাকার কারণে আমরা তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী। বুঝা গেল, ঈমান মা'আরিফত বা চিন-পরিচয়ের নাম নয়।

২. অনেক কাফিরের নিশ্চিতরূপে হক ও সত্যের মা'রিফাত ছিল। অর্থাৎ তাদের অনেকেই সত্যকে নিশ্চিত জানত। কিন্তু অহংকার ও দাম্ভিকাতার কারণে তা অস্বীকার করত। যেমন, ফেরাউন সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ "ফেরাউন সম্প্রদায় মূসা (আ.) এর মু'জিযাগুলো অস্বীকার করল। অথচ তারা এসব মুযিজার সম্পর্কে অন্তর থেকে ইয়াকীন রাখত। কুরাইশ সম্প্রদায়ের কাফিররাও রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সত্য বলেই জানত। নিজস্ব বৈঠকে সে কথা স্বীকারও করত। কিন্তু দাম্ভিকতা ও অহংকারের কারণে মানত না। এতে বুঝা গেল, ঈমানের জন্য মা'রিফাত যথেষ্ট নয়; নিশ্চিত জ্ঞানও যথেষ্ট নয় বরং সত্যায়ণ ও আন্তরিক বিশ্বাস থাকা বা সত্য জেনে অন্তর থেকে তা মেনে নেওয়া আবশ্যক।

তাসদীক ও মা'রিফাতের পার্থক্য

قَوْلُهٗ: فَلَابُدَّ مِنْ بَيَانِ الْفَرْقِ ...الخ ঃ উপরে প্রমাণিত হয়েছে, ঈমানের জন্য মা'রিফাত ও নিশ্চত জ্ঞান যথেষ্ট নয় বরং সত্যায়ণ করা এবং সত্যকে জেনে অন্তর থেকে মেনে নেওয়া আবশ্যক। এখানে শারেহ রহ. মা'রিফত ও নিশ্চত জ্ঞান এবং সত্য জেনে সত্যকে মেনে নেওয়ার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। যাতে করে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ তাসদীক ও ইতিকাদ ঈমান হওয়া আর প্রথমটি অর্থাৎ মা'রিফত ও ইস্তিকান ঈমান না হওয়া প্রমাণিত হয়ে যায়। পার্থক্যের সারকথা হল, তাসদীক বা বিশ্বাস উপার্জিত ও ঐচ্ছিক বিষয়। ফলে বান্দা এর বিনিময়ে সাওয়াবের হকদার হয়। আর নিশ্চিত সওয়াবের যোগ্যতা ঐচ্ছিক কাজের উপরই নির্ভর করে। আবার তাসদীক ঐচ্ছিক কর্ম বলেই একে সর্বশেষ্ঠ ইবাদত সাব্যস্ত করা হয়। তাছাড়া ইবাদতও একটি ঐচ্ছিক কর্ম; নতুবা শরী'আত প্রবর্তক বান্দাকে এর দায়িত্ব অর্পণ করতেন না। মা'রিফাত এর বিপরীত। তা উপার্জন ও ইচ্ছা ছাড়াও অর্জিত হতে পারে। যেমন, অনিচ্ছাতেই কোন জিনিসের উপর দৃষ্টি পড়ল। ফলে সে জিনিসটি কাঠ বা পাথর প্রভৃতি হওয়ার জ্ঞান (মা'রিফত) অর্জিত হয়ে গেল।

قَوْلُهٗ: هٰذَا مَا ذَكَرَهٗ بَعْضُ الْمُحَقِّقِيْنَ ..الخ ঃ অর্থাৎ তাসদীক ও মা'রিফতের পার্থক্য প্রসঙ্গে আমার উপরিউক্ত বক্তব্য এবং কতিপয় মুহাক্কেকীনে কিরামের বক্তব্যের সারকথা এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ তাসদীক উপার্জিত ও ঐচ্ছিক বিষয়। মা'রিফত এর বিপরীত। তা কখনও কখনও অনিচ্ছা সত্ত্বেও অর্জিত হয়ে যায়।

তাসদীক কিভাবে ঐচ্ছিক কাজ হয়?

قَوْلُهٗ: وَهٰذَا مُشْكِلٌ ..الخ তাসদীককে ঐচ্ছিক বলায় শারেহ রহ. একটি আপত্তি তুলে বলেন– تَصْدِيْق اِيْمَانِى হুবহু تَصْدِيْق مَنْطِقِى আর তা (تَصْدِيْق مَنْطِقِى) । দু' প্রকার ইলমেরই একটি ইল্‌ম প্রকার। কাজেই তাসদীকে ঈমানীও এক প্রকার ইলম। আর ইলম আত্মিক একটি অবস্থার নাম। যা অনৈচ্ছিক একটি কর্ম; ঐচ্ছিক কর্মের অন্তর্ভূক্ত নয়। কেননা যখন দুটি জিনিস যেমন, বিশ্বজগত ও নশ্বরতার মধ্যকার নিসবত সম্পর্কে সন্দেহ করি যে, এটি ইতিবাচক এবং বিশ্বজগৎ নশ্বর ? না কি উভয়ের মাঝে সম্বন্ধ নেতিবাচক তথা বিশ্বজগৎ নশ্বর নয় ? অতঃপর যখন দলীল পেশ করা হয় যে– اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ ـ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ তখন এ দলীল দ্বারা বিশ্বজগৎ এবং নশ্বরতার মাঝে সম্বন্ধ ইতিবাচক হওয়ার নিশ্চিত জ্ঞান হয়। বস্তুত জ্ঞানী-গুণীগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যেসব জ্ঞান দলীল প্রমাণ দ্বারা অর্জিত হয়, সেটি অনৈচ্ছিক, যদিও প্রমাণ কায়েম করা একটি ঐচ্ছিক কাজ। যেমন– চোখে দর্শন করা একটি অনৈচ্ছিক কাজ যদিও চোখ খোলা এবং তাকে সঞ্চালন করা ঐচ্ছিক। মোটকথা, যখন প্রমাণের আলোকে اِذْعَان তথা দৃঢ় বিশ্বাস অনৈচ্ছিক কাজ বলে প্রমাণিত হল, তখন تَصْدِيْق ও অনৈচ্ছিক কাজ হল। কারণ, تَصْدِيْق ও حُكْم – اِيْقَاع ও اِثْبَات সবগুলো দ্বারা اِذْعَان ই উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ نَعَمْ تَحْصِيْلُ تِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ الخ দ্বারা উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। উত্তর হল– تَصْدِيْق ঐচ্ছিক কাজ হওয়ার অর্থ হল– এটা অর্জন করার যে সব আসবাব-উপকরণ রয়েছে সেগুলো বান্দার ইচ্ছাধীন। যেমন– ভূমিকাগুলোকে বিন্যস্ত করা, জ্ঞান অর্জনের শক্তিকে তা অর্জন করার জন্য নিবিষ্ট করা,

প্রতিবন্ধকতা দূর করা এবং شُكْل এর মাধ্যমে ফল অর্জন করা, যে সব শর্ত রয়েছে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা– এসব কাজ বান্দার ইচ্ছাধীন। এ হিসাবেই ঈমান অর্জনের পদ্ধতি ও মাধ্যম– উপকরণ অবলম্বন ঐচ্ছিক কাজ। বিধায় আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে ঈমান আনয়ণের দায়িত্ব অর্পন করেছেন।

قَوْلُهُ : وَلَاتَكْفِى الْمَعْرِفَةُ ...الخ ঃ তাসদীক অর্জনের বেলায় মা'রিফত যথেষ্ট নয়। এজন্যই মাশাইখগণ বলেন, যার অন্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সত্যবাদীতা অনিচ্ছায় এমনিতেই এসে যাবে, তাকে ঈমানদার বলা যাবে না বরং সে ঈমান অর্জনের জন্য আদিষ্ট হবে। যাতে তাসদীক যথার্থ হয়। কেননা মা'রিফত তো উপার্জন ও ইচ্ছা-ইখতিয়ার ছাড়াও অর্জিত হয়ে যায়। যেমন, পূর্বে বলা হয়েছে।

কোনও মা'রিফাতই কি ঈমান নয় ?

قَوْلُهُ : نَعَمْ يَلْزَمُ ..الخ ঃ এটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন হল, আপনারা মা'রিফত ঈমান হওয়াকে শুধুমাত্র একারণে অস্বীকার করেছেন যে, তা ইচ্ছা ছাড়াও অর্জিত হয়ে যায়। ফলে কারও যদি ঐচ্ছিকভাবে অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ এর মা'রিফত ও ইয়াকীন লাভ হয়, তাহলে সে মা'রিফতকে ঈমান বলা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। তদুপরি কাদরিয়াদের মত খণ্ডানো এবং আমভাবে মা'রিফত ঈমান নয় বলা কিভাবে বিশুদ্ধ হতে পারে ?

জবাবের সারকথা, যে ইয়াকীনী (সুদৃঢ়) মা'রিফত ইচ্ছাকৃতভাবে উপার্জনের দ্বারা অর্জিত হবে, সেটি তাসদীক হয়ে যাবে এবং তাকে ঈমান বলা হবে। এতে কোন দোষ নেই। কেননা তখন অন্তরে সে অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে, যাকে আরবীতে তাসলীম (মেনে নেওয়া) এবং ফার্সীতে گرويدن বলা হয়। আর তাসদীক ও ঈমান দ্বারা সে অবস্থাই উদ্দেশ্য। দাম্ভিক-অহংকারী কাফিরদের এমন মা'রিফাত অর্জিত হয় বলে স্বীকৃত নয়। তাদের মা'রিফাত ছিল বাধ্যতামূলক অর্জিত। বিধায় তাদের মা'রিফাতকে ঈমান সাব্যস্ত করা হয় নি। আর যদি মেনেও নেওয়া হয়, কাফিরদের এমন মা'রিফত আছে, যা উপার্জিত ও ঐচ্ছিক হওয়ার সুবাধে তাসদীক গণ্য হয়, তাহলে তারা মৌখিক অস্বীকৃতি, অহংবোধ, আত্মম্ভরিতা এবং মিথ্যা প্রতিপন্নতা ও অস্বীকৃতির আলামতের উপর অটল থাকার কারণে তাদেরকে কাফির বলা হয়েছে। কেননা যে তাসদীকের সাথে অস্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপন্নতার আলামত পাওয়া যাবে, ঈমানে ব্যাপারে এর কোন ধর্তব্য নেই।

وَالْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ وَاحِدٌ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ الْخُضُوعُ وَالْاِنْقِيَادُ بِمَعْنَى قَبُولِ الْأَحْكَامِ وَ
الْإِذْعَانِ بِهَا وَذَالِكَ حَقِيقَةُ التَّصْدِيقِ عَلَى مَا مَرَّ . وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ
فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . وَبِالْجُمْلَةِ لَا يَصِحُّ فِي
الشَّرْعِ أَنْ يُحْكَمَ عَلَى أَحَدٍ بِأَنَّهُ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ أَوْ مُسْلِمٌ وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَلَا نَعْنِي
بِوَحْدَتِهِمَا سِوَى ذَالِكَ . وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَشَائِخِ أَنَّهُمْ أَرَادُوا عَدَمَ تَغَايُرِهِمَا بِمَعْنَى أَنَّهُ
لَايَنْفَكُّ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ . لَا الْاِتِّحَادَ بِحَسَبِ الْمَفْهُومِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْكِفَايَةِ مِنْ أَنَّ
الْإِيمَانَ هُوَ تَصْدِيقُ اللّٰهِ تَعَالَى فِيمَا أَخْبَرَ مِنْ أَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ وَالْإِسْلَامُ هُوَ الْاِنْقِيَادُ
وَالْخُضُوعُ لِأُلُوهِيَّتِهِ وَذَا لَايَتَحَقَّقُ إِلَّا بِقَبُولِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فَالْإِيمَانُ لَايَنْفَكُّ عَنِ الْإِسْلَامِ
حُكْمًا . فَلَا يَتَغَايَرَانِ . وَمَنْ أَثْبَتَ التَّغَايُرَ يُقَالُ لَهُ مَا حُكْمُ مَنْ آمَنَ وَلَمْ يُسْلِمْ أَوْ
أَسْلَمَ وَلَمْ يُؤْمِنْ ؟ فَإِنْ أَثْبَتَ لِأَحَدِهِمَا حُكْمًا لَيْسَ بِثَابِتٍ لِلْآخَرِ فَبِهَا وَإِلَّا فَقَدْ ظَهَرَ
بُطْلَانُ قَوْلِهِ . فَإِنْ قِيلَ قَوْلُهُ تَعَالَى قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلٰكِنْ قُولُوا
أَسْلَمْنَا صَرِيحٌ فِي تَحْقِيقِ الْإِسْلَامِ بِدُونِ الْإِيمَانِ قُلْنَا الْمُرَادُ أَنَّ الْإِسْلَامَ الْمُعْتَبَرَ فِي

الشَّرْعِ لَا يُوجَدُ بِدُوْنِ الْاِيْمَانِ وَهُوَ فِى الْاٰيَةِ بِمَعْنٰى اِنْقِيَادِ الظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ اِنْقِيَادِ الْبَاطِنِ بِمَنْزِلَةِ التَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ مِنْ غَيْرِ تَصْدِيْقٍ فِىْ بَابِ الْاِيْمَانِ ـ فَاِنْ قِيْلَ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّ الْاِسْلَامَ هُوَ الْاَعْمَالُ بَلِ التَّصْدِيْقُ الْقَلْبِىُّ قُلْنَا اِنَّ الْمُرَادَ اَنَّ ثَمَرَاتِ الْاِسْلَامِ وَعَلَامَاتِهٖ ذَالِكَ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْمٍ وَفَدُوْا عَلَيْهِ أَتَدْرُوْنَ مَا الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ فَقَالُوا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَهَادَةُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَاَنْ تُعْطُوْا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ وَكَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً اَعْلَاهَا قَوْلُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ ـ

সহজ তরজমা

আর ঈমান ও ইসলাম এক-অভিন্ন। কেননা ইসলাম বিনয় ও ইনকিয়াদ তথা আহকামকে গ্রহণ করে নেওয়া এবং তা মেনে নেওয়ার নাম। এটিই প্রকৃত তাসদীক। যেমন– পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ও- এর সমর্থন করে। মোটকথা, শরী'আতের দৃষ্টিতে "সে মুমিন অথচ মুসলমান নয় অথবা সে মুসলমান; মুমিন নয়" কারও সম্পর্কে এ হুকুম লাগানো শুদ্ধ নয়। এ দুটি এক হওয়ার দ্বারা আমরা এ (উক্ত মর্ম) ছাড়া অন্য কিছু উদ্দেশ্য নেই না। মাশাইখের বক্তব্যে পরিষ্কার আছে, তারা এতদুভয়ের অভিন্নতা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। অর্থাৎ দুটির একটিও অপরটি থেকে পৃথক হবে না।

আভিধানিক অর্থে এক হওয়া উদ্দেশ্য নেন নি। যেমনটা কিফায়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে। অর্থাৎ ঈমান তো আল্লাহ পাকের সেসব আদেশ-নিষেধের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস রাখা, তিনি যেগুলোর সংবাদ দিয়েছেন। আর ইসলাম হল, তার প্রভুত্বের সামনে আত্মসমর্পণ করা এবং তার সম্মুখে মাথা নত করা। এটি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ গ্রহণ করা ছাড়া হবে না। ঈমান হুকুমের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম হতে পৃথক হবে না। অতএব দুটি পরস্পর বিরোধী হবে না। যে ব্যক্তি পরস্পর বিরোধী মনে করবে, তাকে বলা হবে, "যে ব্যক্তি মুমিন; মুসলমান নয় অথবা মুসলমান, মুমিন নয়" তার কি হুকুম? সুতরাং দু'জনের একজনের জন্য যদি এমন হুকুম সাব্যস্ত করে, যা অপরজনের জন্য প্রমাণিত নয় তাহলে তো ভাল; নতুবা তার কথার ভ্রান্তি সুস্পষ্ট। সুতরাং যদি বলা হয় আল্লাহ তা'আলার বাণী– قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا ইসলাম ব্যতীত ঈমান পাওয়া যাওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট। আমরা বলব– আমাদের উদ্দেশ্য হল, শরীআতে যে ইসলাম ধর্তব্য, তা ঈমান ছাড়া পাওয়া যাবে না। আর আয়াতে 'ইসলাম' বাতেনী আনুগত্য ব্যতীত শুধুমাত্র বাহ্যিক আনুগত্যের অর্থে ব্যবহৃত। ঈমানের ক্ষেত্রে আন্তরিক বিশ্বাস ব্যতীত কালেমায়ে শাহাদাত পড়ার নামান্তর। তারপর যদি বলা হয়– নবী কারীম ﷺ এর বাণী– ইসলাম হল, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার রাসূল, এ সাক্ষ্য দেওয়া– নামায পড়া, যাকাত দেওয়া, রমাযানের রোযা রাখা এবং সামর্থ হলে বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জ করা। এতে বুঝা যায়, ইসলাম শুধু আমলের নাম; আন্তরিক বিশ্বাসের নাম নয়।

আমরা জবাব দেব– উদ্দেশ্য হল, ইসলামের ফল ও আলামত এগুলো। যেমন, নবী কারীম ﷺ তার কাছে আগত লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন– তোমরা কি জান, ইসলাম কী? তারা বললেন, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল ﷺ ই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। তখন নবীজী বললেন– একথায় সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই; হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। নামায পড়া, যাকাত দেওয়া, রমযানের রোযা রাখা এবং গণীমতের মাল থেকে এক পঞ্চমাংশ প্রদান করা। যেমন– রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– ঈমানের সত্তরাধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ শাখা মুখে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা। আর সর্বনিম্ন শাখা রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ইমান ও ইসলাম এক

জমহূর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাযহাব হল, ঈমান ইসলাম উভয়টি এক। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে সাম্য (نِسْبَت تَسَاوِى) রয়েছে। প্রত্যেক মুমিনই মুসলমান; প্রত্যেক মুসলমানই মুমিন। এ দাবীর স্বপক্ষে ব্যাখ্যাতা প্রমাণ স্বরূপ বলেন,

(১) যে, ইসলাম অর্থ বিনয় তথা আত্মসমর্পণ করা বেং ইনকিয়াদ অর্থ, আহকামকে কবুল করা ও মেনে নেওয়া। এ বিনয়, আত্মসমর্পণ এবং ইনকিয়াদই তাসদীক। আর তাসদীক মূল ঈমান। কাজেই ইসলাম মূল ঈমান।

(২) ঈমান ও ইসলাম এক হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীও সমর্থন করে। তিনি ইরশাদ করেন–
فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"কওমে লূত্বের জনপদে যত মুমিন ছিল, আমি তাদেরকে বের করে দিয়েছি। অতঃপর আমি সে জনপদে একটি মুসলিম পরিবার ছাড়া আর কাউকে মুমিন পাইনি।"

প্রমাণ বিশ্লেষণঃ এ আয়াতের অর্থ হল–فَمَا وَجَدْنَا اَحَدًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ اَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

বস্তুতঃ ইসতিছনার মধ্যে ইসতিছনায়ে মুত্তাসিলই আসল। অর্থাৎ মুসতাছনাটি মুসতাছনা মিনহুর জাতভুক্ত বা একই ধরনের হওয়া। বুঝা গেল, মুসতাছনা তথা মুসলিম পরিবার মুসতাছনা মিনহু তথা মুমনিগণের অন্তর্ভুক্ত।

(৩) **قَوْلُهُ : وَبِالْجُمْلَةِ...الخ** ঃ এটিও ঈমান ও ইসলাম অভিন্ন হওয়ার প্রমাণ। এর সারকথা হল, শরী'আতের দৃষ্টিতে কারও সম্পর্কে একথা বলা শুদ্ধ নয় যে, সে মুমিন; কিন্তু মুসলমান নয় অথবা সে মুসলমান; কিন্তু মুমিন নয়। কাজেই প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির মুসলমান হওয়া এবং প্রত্যেক মুসলমানের মুমিন হওয়া অর্থাৎ ঈমান ও ইসলামের বাস্তব প্রয়োগ ক্ষেত্রে এক হওয়া আবশ্যক। আমরা এ দুটির অভিন্নতা দ্বারা বাস্তব প্রয়োগক্ষেত্র হিসেবে এক হওয়া, যাকে সমতা বা تَسَاوِى বলে– তাছাড়া অন্য কোন অর্থ উদ্দেশ্য নেই না। আমাদের উদ্দেশ্য অর্থ হিসেবে এক হওয়া নয়, যাকে প্রতিশব্দ বা تَرَادُف বলে। আর যারা প্রতিশব্দ হওয়ার প্রবক্তা, তারাও মাফহূম বা অর্থ হিসেবে এক হওয়া উদ্দেশ্য নেননি বরং প্রয়োগক্ষেত্র হিসেবে এক হওয়া অর্থাৎ সমতা বা تساوى উদ্দেশ্য নিয়েছেন। যেমন, "তাবসেরাহ"' গ্রন্থকার শাইখ আবূল মুঈন রহ. ঈমান ও ইসলামকে প্রতিশব্দ সাব্যস্ত করার পর প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক অর্থ বর্ণনা করেছেন। আর যখন প্রতিটির অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল, তখন প্রতিশব্দ রইল কোথায়? ترادف বা প্রতিশব্দ তো অর্থ হিসেবে এক হওয়ার নাম। এতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়ে গেল ترادف বা প্রতিশব্দ হওয়ার দ্বারা শাইখ আবুল মুঈন রহ. উদ্দেশ্য تَسَاوِى বা সমতা। মাশাইখের বক্তব্য দ্বারাও একথাই সুস্পষ্ট হয়ে যায়– ঈমান ও ইসলাম এক হওয়ার দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য এতদুভয়ের মধ্যে বৈপরিত্ব না হওয়া অর্থাৎ একটি অপরটি থেকে ভিন্ন ও পৃথক না হওয়া বরং কোথাও একটি প্রয়োগ হলে সেখানে অপরটিও প্রয়োগ হবে, যাকে বলে تَسَاوِى বা সমতা। তারা অর্থ হিসেবে অভিন্নতা উদ্দেশ্য নেননি, যাকে বলে تَرَادُف বা প্রতিশব্দ।

কিফায়া গ্রন্থকারের অভিমত

قَوْلُهُ: كَمَاذُكِرَفِى الْكِفَايَةِ ...الخ ঃ সেখানে اِنَّ الْاِيْمَانَ هُوَتَصْدِيْقُ اللّٰهِ تَعَالٰى থেকে নিয়ে ظَهَرَ بُطْلَانُهُ পর্যন্ত কিফায়াহ গ্রন্থকারের উক্তি। ইতোপূর্বে ব্যাখ্যাতা বলেছিলেন– মাশাইখগণের ভাষ্যে পরিস্কার বুঝা যায়, তারা ঈমান ও ইসলামের মধ্যে বৈপরিত্ব না হওয়া উদ্দেশ্য নিয়েছেন; অর্থ হিসেবে অভিন্নতা উদ্দেশ্য নেননি। যাকে تَرَادُف বলে। এবার কিফায়া গ্রন্থাকারের উক্তি দ্বারা তারই সমর্থন করেছেন। ফিকায়া গ্রন্থকার বলেন– ঈমান আল্লাহ

পাকের আদেশ নিষেধগুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করার নাম। ইসলাম তার প্রভুত্বের সামনে বিনীত হওয়া, আত্মসমর্পন করা ও নত শিকার করার নাম। আর তা আল্লাহ পাকের আদেশ-নিষেধগুলো মেনে নেওয়া ও তাসদীক (বিশ্বাস) করা ব্যতীত অর্জিত হবে না। বস্তুতঃ আদেশ-নিষেধের তাসদীকও বিশ্বাস স্থাপনের নামই ঈমান।

বুঝা গেল, ঈমান ছাড়া ইসলাম কার্যকর ও বাস্তবায়িত হবে না। এ কারণে এতদুভয়ের মধ্যে প্রয়োগ ক্ষেত্রের দিক থেকে বৈপরিত্ব ও হবে না। কেননা উলামায়ে আশায়েরার মতে দুটি বস্তুর মধ্যে বৈপরিত্বের মর্ম হল, তন্মধ্যে একটি অপরটি ছাড়া বাস্তবায়িত হতে পারে। মোটকথা, যেহেতু প্রয়োগক্ষেত্র হিসেবে এতদুভয়ের মধ্যে বৈপরিত্ব নেই, সেহেতু উভয়টিই প্রয়োগক্ষেত্র হিসেবে এক ও অভিন্ন হবে। যে ব্যক্তি মুমিন হবে;.সেই হবে মুসলমান এবং যে ব্যক্তি মুসলমান হবে; সেই হবে মুমিন। আর এরই নাম تَسَاوِىْ বা সমতা।

কেউ যদি এতদুভয়ের মধ্যে বৈপরিত্ব দাবী করে বলেন– ঈমান ইসলাম ছাড়া এবং ইসলাম ঈমান ছাড়া বাস্তবায়িত হতে পারে অর্থাৎ হতে পারে। কোন ব্যক্তি মুমিন কিন্তু মুসলমান নয় কিংবা মুসলমান কিন্তু মুমিন নয়, তাহলে আমার তাকে জিজ্ঞাসা করব– যে ব্যক্তি মুমিন অথচ মুসলমান নয় কিংবা মুসলমান অথচ মুমিন নয়, এমন ব্যক্তির বিধান কি? সুতরাং সে যদি একজনের জন্য এমন হুকুম সাব্যস্ত করে, যা অন্যের জন্য প্রমাণিত নয়, তাহলে তো ভাল কথা। কিন্তু সে এমন হকুম সাব্যস্ত করতে পারে না। আর যদি এমন হুকুম সাব্যস্ত করতে না পারে তাহলে এ বৈপরিত্বের দাবী ভ্রান্ত। এ পর্যন্ত কিফায়া গ্রন্থকারের বক্তব্য ছিল।

কিফায়া গ্রন্থকারের মতের উপর আপত্তি

فَاِنْ قِيْلَ قَوْلُهُ بَعْدَ قَالَتِ الْاَعْرَابُ ..الخ ঃ এখানে একটি আপত্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এ আপত্তিটি কিফায়া গ্রন্থকারের উক্তি فَلَايَتَغَايَرَان এর সাথে সংশ্লীষ্ট। অর্থাৎ উপরিউক্ত আয়াতে কারীমায় বনী আসাদ গোত্রের কিছু লোকের সম্পর্কে অবতীর্ণ। তারা দুর্ভিক্ষের সময় মদীনায় এসেছিল। অনুদানের লালচে কপটভাবে মুনাফিকের মত অর্থাৎ মনের ভিতর কুফর লকিয়ে রেখে তারা কালিমা পড়ে নিয়েছিল। এ আয়াতে তাদের ঈমান না থাকার কথা বলা হয়েছে এবং ইসলাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। ফলে মনে হয়েছে, ঈমান ছাড়া ইসলাম বাস্তবায়িত হতে পারে। আর দুটি বস্তুর একটি অপরটি ছাড়া বাস্তবায়িত হওয়ার নামই বৈপরিত্ব। কাজেই কিফায়া গ্রন্থাকারের পক্ষে "এ দুটি পরস্পর বিরোধী নয়" বলা কিভাবে বিশুদ্ধ হতে পারে?

জবাবের সারকথা হল, ঈমান ও ইসলাম পরস্পর বিরোধী না হওয়া এবং ঈমান ব্যতীত ইসলাম বাস্তবায়িত হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, শরী'আতে যে ইসলাম ধর্তব্য, তা ঈমান ছাড়া বাস্তবায়িত হবে না। আর আয়াতে কারীমায় ঈমান ছাড়া যে ইসলাম সাব্যস্ত রয়েছে, তা শরঈ ইসলাম নয় বরং আভিধানিক ইসলাম। যার অর্থ বাতেনী (আত্মিক) আনুগত্য ও আন্তরিক বিশ্বাস ব্যতীত বাহ্যিক আনুগত্য স্বীকার করা। আর সুস্পষ্টতঃ আত্মিক ও বাতেনী আনুগত্য ব্যতীত শুধুমাত্র বাহ্যিক আনুগত্যকে ঈমান বলে না। যেমন, আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত শুধুমাত্র কালেমায়ে শাহাদাত মুখে পড়ে নেওয়ার নাম ঈমান নয়। সুতরাং এখন আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে, "তোমাদের মধ্যে বাতেনী (আত্মিক) আনুগত্য ও বিশ্বাস অনুপস্থিত। হ্যাঁ, তোমরা বলতে পার যে, আমরা সম্পদের লোভে বাহ্যিক আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছি।

ঈমান ও ইসলামের অভিন্নতা নিয়ে আরেকটি প্রশ্নোত্তর

قَوْلُهُ: فَاِنْ قِيْلَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ...الخ ঃ এটিও ঈমান ও ইসলাম এক হওয়া এবং এতদুভয়ের মধ্যে বৈপরিত্ব না থাকার ব্যাপারে প্রশ্ন। যার সারকথা হল, হাদীসে জিবরাঈল নাতে খ্যাত প্রসিদ্ধ হাদীসটিতে রয়েছে, যখন জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ ﷺ কে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন নবী কারীম ﷺ দুটি কালেমায়ে শাহাদাত এবং আমল দ্বারা ইসলামের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এতে বুঝা যায়, ইসলাম দুটি কালেমায়ে শাহাদাত তথা তাওহীদও রিসালাতের স্বীকারোক্তি এবং আমলের সমষ্টির নাম। অথচ ঈমানের হাকীকত হল, আন্তরিক বিশ্বাস। সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিরোধ ও ভিন্নতা প্রমাণিত হল।

জবাবের সারকথা হল, ঈমান ও ইসলাম উভয়ের হাকীকত আন্তরিক বিশ্বাস। আর হাদীসে জিবরীলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উদ্দেশ্য হল, এগুলো ইসলামের ফল ও আলামত। সুতরাং তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকারোক্তি ইসলামের আলামত। আর আমল চারটি ইসলামের ফল। যেরূপভাবে আব্দুল কায়স সম্প্রদায়ের অগ্র প্রতিনিধিগণ যখন নবীজীর খেদমতে এসেছিল, তখন নবীজী তাদেরকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল– আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে আমাদের চেয়ে ভাল জানেন। তখন রাসূলে কারীম ﷺ ঈমানের ব্যাখ্যাও "তাওহীদ

ও রিসালাতের স্বীকারোক্তি এবং আমল" দ্বারা করেছেন। অথচ তাহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী কারও মতেই আমল ঈমানের হাকীকতভুক্ত নয়। অনুরূপভাবে প্রসিদ্ধ এক হাদীসে রয়েছে, নবীজী বলেন–

اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً اَعْلَاهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ

এ হাদীসেও নবী কারীম ﷺ ঈমানকে স্বীকারোক্তি ও আমল সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং এখানেও উদ্দেশ্য স্বীকারোক্তি অর্থাৎ তাওহীদ-রিসালাতের স্বীকারোক্তি ঈমানের আলামত আর আমল তার ফল।

وَاِذَا وُجِدَ مِنَ الْعَبْدِ التَّصْدِيْقُ وَالْاِقْرَارُ صَحَّ لَهٗ اَنْ يَّقُوْلَ اَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا لِتَحَقُّقِ الْاِيْمَانِ عَنْهُ وَلَا يَنْبَغِىْ اَنْ يَّقُوْلَ اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِاَنَّهٗ اِنْ كَانَ لِلشَّكِّ فَهُوَ كُفْرٌ لَامَحَالَةَ ـ وَاِنْ كَانَ لِلتَّادِيْبِ وَاِحَالَةِ الْاُمُوْرِ اِلٰى مَشِيَّةِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَوْلِلشَّكِّ فِى الْعَاقِبَةِ وَالْمَاٰلِ لَافِى الْاٰنِ وَالْحَالِ اَوْ لِلتَّبَرُّكِ بِذِكْرِ اللّٰهِ وَلِلتَّبَرُّءِ عَنْ تَزْكِيَةِ النَّفْسِ وَالْاِعْجَابِ بِحَالِهٖ فَالْاَوْلٰى تَرْكُهٗ لِمَا اَنَّهٗ يُوْهِمُ بِالشَّكِّ وَلِهٰذَا قَالَ لَا يَنْبَغِىْ دُوْنَ اَنْ يَّقُوْلَ لَا يَجُوْزُ ـ لِاَنَّهٗ اِذَا لَمْ يَكُنْ لِلشَّكِّ فَلَا مَعْنٰى لِنَفْىِ الْجَوَازِ ـ كَيْفَ وَقَدْ ذَهَبَ اِلَيْهِ كَثِيْرٌ مِنَ السَّلَفِ حَتّٰى الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ ـ

وَلَيْسَ هٰذَا مِثْلُ قَوْلِكَ اَنَا شَابٌّ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِاَنَّ الشَّبَابَ لَيْسَ مِنَ الْاَفْعَالِ الْمُكْتَسَبَةِ وَلَا مِمَّا يُتَصَوَّرُ الْبَقَاءُ عَلَيْهِ فِى الْعَاقِبَةِ وَالْمَاٰلِ وَلَا مِمَّا يَحْصُلُ بِهٖ تَزْكِيَةُ النَّفْسِ وَالْاِعْجَابِ ـ بَلْ مِثْلُ قَوْلِكَ اَنَا زَاهِدٌ مُتَّقٍ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِيْنَ اِلٰى اَنَّ الْحَاصِلَ لِلْعَبْدِ هُوَ حَقِيْقَةُ التَّصْدِيْقِ الَّذِىْ بِهٖ يَخْرُجُ عَنِ الْكُفْرِ لٰكِنَّ التَّصْدِيْقَ فِىْ نَفْسِهٖ قَابِلٌ لِلشِّدَّةِ وَالضَّعْفِ وَحُصُوْلُ التَّصْدِيْقِ الْكَامِلِ الْمُنْجِىْ الْمُشَارِ اِلَيْهِ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى اُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ اِنَّمَا هُوَفِىْ مَشِيَّةِ اللّٰهِ ـ

সহজ তরজমা

বান্দার পক্ষ থেকে আন্তরিক বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তি পাওয়া গেলে, তার জন্য একথা বলা বিশুদ্ধ হবে যে, আমি একজন প্রকৃত মুমিন। কারণ, তার ভিতর ঈমান সুপ্রতিষ্ঠিত। আর "ইনশাআল্লাহ আমি মুমিন" বলা ঠিক হবে না। কেননা ইতঃস্ততা বশতঃ ইনশাআল্লাহ বলা কুফরী। আর যদি আদব রক্ষার্থে ও সব বিষয় আল্লাহর ইচ্ছার উপর ন্যস্ত করার লক্ষ্যে কিংবা পরিণামে সন্দেহের কারণে বলে; বর্তমান অবস্থায় সন্দেহের কারণে নয়। অথবা আল্লাহ পাকের আলোচনা দ্বারা বরকত হাসিলের জন্য অথবা নিজের পবিত্রতা বর্ণনার জন্য এবং নিজের অবস্থার উপর আত্মপ্রসাদ লাভ থেকে পবিত্রতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে হয়, তবুও তা পরিহার করা উত্তম। কেননা তা সন্দেহের ধারণা জন্মায়। এ হিসেবে মুসান্নিফ রহ. لَايَنْبَغِىْ বলেছেন; لَايَجُوْزُ বলেন নি। কেননা এটা সন্দেহের বশে না হলে নাজায়েয হওয়ার কোন কারণ নেই। নাজায়েয হয় কিভাবে? অথচ বহু প্রবীন উলামায়ে কিরাম এমনকি সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈনের মাযহাবও তা-ই। এটি (ইনশাআল্লাহ আমি মুমিন বলা) তোমাদের উক্তি "ইনশাআল্লাহ আমি যুবক" এর মত নয়। কেননা যৌবন অর্জিত ও ঐচ্ছিক কর্মভুক্ত নয়; সেসব জিনিসের মধ্যেও গণ্য নয়, যেগুলোর ব্যাপারে ভবিষ্যতে অবশিষ্টতার কল্পনা করা যায় এবং এমন বিষয়ও নয় যদ্বারা আত্মপবিত্রতা ও আত্মপ্রসাদ লাভ হতে পারে। বরং তোমাদের উক্তি اَنَازَاهِدٌ مُتَّقٍ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ এর অনুরূপ।

আর কোন কোন আলিমের মতে বান্দার যা অর্জিত হয়, তা তাসদীক বা আন্তরিক বিশ্বাস। যার ফলে বান্দা কুফর থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু আন্তরিক বিশ্বাস স্বত্ত্বাগতভাবে শক্তি ও দুর্বলতা গ্রহণ করে। আর আযাব থেকে পরিত্রাণকারী পূর্ণাঙ্গ তাসদীক ও বিশ্বাস অর্জন, যার প্রতি আল্লাহ তা'আলার বাণী–

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

(তারাই সত্যিকার মুমিন। তাদের জন্যই তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে বহু উচ্চ মর্যাদা ও ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিযিক।)

এর মধ্যে ইংগিত করা হয়েছে, তা (এমন আন্তরিক বিশ্বাস) শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ঈমানের ব্যাপারে ইসতিছনা তথা ইনশাআল্লাহ আমি মুমিন বলার বৈধতা নিয়ে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতে ইসতিছনা মুসতাহাব; আমি খাটি মুমিন বলা মাকরূহ। ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে মুসান্নিফ রহ. এর বর্ণনা মাফিক বান্দার ভেতর আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তি পাওয়া গেলে তা বাস্তবায়িত হবে। তার জন্য আমি খাটি মুমিন বলা যথোপযুক্ত; ইনশাআল্লাহ আমি মুমিন বলা অনুচিৎ। কেননা সন্দেহের বশে ইনশাআল্লাহ বলা কুফরী। আর যদি আল্লাহ তা'আলার সাথে শিষ্টাচার বজায় রাখা ও সকল বিষয় আল্লাহ পাকের ইচ্ছার উপর ন্যস্ত করা অথবা বর্তমান ঈমানে সন্দেহ থাকার দরুন নয় বরং ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ার কারণে হয়; কেননা বান্দা অদৌ অশুভ পরিণতির আশঙ্কামুক্ত বা সন্দেহ থেকে নিরাপদ নয়। অথবা আল্লাহ পাকের আলোচনা দ্বারা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে এরূপ বলে। যেমন, কবর যিয়ারাতের দু'আ–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ

এ দু'আয় ইনশাআল্লাহ বলার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের আলোচনা দ্বারা বরকত হাসিল করা। কেননা একদিন না একদিন মৃত্যুবরণ করে মৃতদের সাথে মিলিত হওয়া নিশ্চিত। অথবা স্বয়ং নিজেকে পবিত্র মনে করা এবং নিজের অবস্থায় আত্মপ্রসাদ লাভ করা থেকে পবিত্রতা ও অসন্তোষ প্রকাশের জন্য ইনশাআল্লাহ বলে, তাহলে এ চারটি কারণ বৈধতার পক্ষে। তদুপরি ইসতিছনা বর্জন করাই উত্তম ও যথোপযুক্ত। কেননা তা ঈমানে সংশয় থাকার ধারণা জন্মায়। এজন্যই অর্থাৎ ইসতিছনা বর্জন করা উত্তম; আবশ্যক নয় বলে মুসান্নিফ রহ. لَايَنْبَغِي বলেছেন অর্থাৎ ইনশাআল্লাহ আমি মুমিন বলা অনুচিৎ, নাজায়েয নয়। কেননা সন্দেহের বশে নয় বরং উপরিউক্ত বৈধ কোনও কারণে যখন এরূপ বলবে, তখন নাজায়েয সাব্যস্ত করার কোনও কারণ নেই। আর নাজায়েয হয় কিভাবে? অথচ বহু প্রবীন উলামায়ে কিরাম এমনকি সাহাবা ও তাবেঈনে কিরাম এর বৈধতার প্রবক্তা।

কিফায়া গ্রন্থকারের প্রমাণের জবাব

قَوْلُهُ: وَلَيْسَ هٰذَا مِثْلَ قَوْلِكَ ...الخ ঃ ঈমানের ইসতিছনা অর্থাৎ اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ বলার অবৈধতা সম্পর্কে কিফায়া গ্রন্থকার প্রমাণ স্বরূপ বলেন– اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ বলা اَنَا شَابٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ বলার মত নয়। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, দ্বিতীয়টি অর্থহীন বাক্য। তাই প্রথম বাক্যটিও অর্থহীন হবে।

ব্যাখ্যাতা প্রত্যুত্তরে বলেন, বাক্য দুটি একরকম নয়। **প্রথমতঃ** যৌবন উপার্জিত ও ঐচ্ছিক নয় বিধায় নিরর্থক। অথচ ঈমান ও তাসদীক (বিশ্বাস) উপার্জিত ও ঐচ্ছিক বিষয়। **দ্বিতীয়তঃ** যৌবনের অবসান নিশ্চিত; এর স্থায়িত্বে কল্পনা করা যায় না। অথচ ঈমানের স্থায়িত্ব অনুমেয়। **তৃতীয়তঃ** যৌবন কোন নেক আমল নয়, যার উপর মানুষ গৌরব করতে পারে এবং আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারে। ঈমান এর বিপরীত। কেননা এটি সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। মানুষ এনিয়ে গর্ব ও আত্মপ্রশংসায় লিপ্ত হতে পারে বরং اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ বাক্যটি তোমাদের উক্তি اَنَا زَاهِدٌ مُتَّقٍ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ এর মত। কেননা ঈমান ও তাকওয়া পরহেযগারী সবই উপার্জিত এবং ঐচ্ছিক বিষয়। ভবিষ্যতেও এগুলোর স্থায়িত্ব অনুমেয়। একারণেই মানুষ আত্মপ্রশংসার শিকার হয়ে যায়। সুতরাং যেরূপভাবে তাকওয়া-পরহেযগারীর ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে ইসতিছনা জায়েয, তদ্রূপ ঈমানের ক্ষেত্রেও ইসতিছনা জায়েয হবে।

কোন কোন মুহাক্কিকের মাযহাব

قَوْلُهُ: وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِيْنَ ..لخ ঃ ঈমানে ইসতিছনাকে জায়েয সাব্যস্ত করার ব্যাপারে কোন কোন মুহাক্কির মাযহাব হল, মূল তাসদীক, যা বান্দাকে কুফর থেকে বের করে আনে, তা তো বান্দার অর্জিত আছে। কিন্তু তাসদীক স্বভাবগতভাবে শক্তি ও দুর্বলতাকে গ্রহণ করে। কেনা নবীগণের বিশ্বাস উম্মতের বিশ্বাস অপেক্ষা শক্তিশালী হওয়ার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। ইতোপূর্বে এ আলোচনা গত হয়ছে। আযাব থেকে নাজাত দাতা এ তাসদীকে কামেল বা পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিশ্চিত তা-ই হবে, যা মৃত্যু পর্যন্ত আক্ষুণ্ন থাকবে। যার প্রতি আল্লাহ তা'আলার বাণী- أُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ এর মধ্যে ইংগিত করা হয়েছে। তা আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন। সে সূত্রে ইসতিছনা তথা أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ বলা জায়েয হবে। এ সূরতে তার অর্থ হবে, أَنَا مُؤْمِنٌ كَامِلٌ نَاجٍ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ অর্থাৎ আমি পরিপূর্ণ ও মুক্তিপ্রাপ্ত মুমিন। এর বৈধতা নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই বরং এ অর্থে ইসতিছনা বর্জন করা জায়েয হবে না।

وَلَمَّا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْأَشَاعِرَةِ أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِنَاءً عَلٰى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْإِيْمَانِ وَالْكُفْرِ وَالسَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ بِالْخَاتِمَةِ حَتّٰى أَنَّ الْمُؤْمِنَ السَّعِيْدَ مَنْ مَاتَ عَلَى الْإِيْمَانِ وَإِنْ كَانَ طُوْلَ عُمْرِهِ عَلَى الْكُفْرِ وَالْعِصْيَانِ وَالْكَافِرُ الشَّقِيُّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَالِكَ وَإِنْ كَانَ طُوْلَ عُمْرِهِ عَلَى التَّصْدِيْقِ وَالطَّاعَةِ عَلٰى مَا أُشِيْرَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالٰى فِيْ حَقِّ إِبْلِيْسَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ وَبِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلسَّعِيْدُ مَنْ سَعِدَ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ أَشَارَ إِلٰى إِبْطَالِ ذَالِكَ بِقَوْلِهِ وَالسَّعِيْدُ قَدْ يَشْقٰى بِأَنْ يَرْتَدَّ بَعْدَ الْإِيْمَانِ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَالِكَ وَالشَّقِيُّ قَدْ يَسْعَدُ بِأَنْ يُؤْمِنَ بَعْدَ الْكُفْرِ ـ وَالتَّغَيُّرُ يَكُوْنُ عَلَى السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ دُوْنَ الْإِسْعَادِ وَالْإِشْقَاءِ وَهُمَا مِنْ صِفَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى لِمَا أَنَّ الْإِسْعَادَ تَكْوِيْنُ السَّعَادَةِ وَالْإِشْقَاءُ تَكْوِيْنُ الشَّقَاوَةِ ـ وَلَا تَغَيُّرَ عَلَى اللّٰهِ وَلَا عَلٰى صِفَاتِهِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْقَدِيْمَ لَا يَكُوْنُ مَحَلًّا لِلْحَوَادِثِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي الْمَعْنٰى لِأَنَّهُ إِنْ أُرِيْدَ بِالْإِيْمَانِ وَالسَّعَادَةِ مُجَرَّدُ حُصُوْلِ الْمَعْنٰى فَهُوَ حَاصِلٌ فِي الْحَالِ وَإِنْ أُرِيْدَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ النَّجَاةُ وَالثَّمَرَاتُ فَهُوَ فِيْ مَشِيَّةِ اللّٰهِ تَعَالٰى لَا قَطْعَ بِحُصُوْلِهِ فِي الْحَالِ فَمَنْ قَطَعَ بِالْحُصُوْلِ أَرَادَ الْأَوَّلَ وَمَنْ فَوَّضَ إِلَى الْمَشِيَّةِ أَرَادَ الثَّانِيَ ـ

সহজ তরজমা

আর যেহেতু কতিপয় আশ'আরী থেকে বর্ণিত আছে- أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ বলা যথোপযুক্ত। কেননা ঈমান ও কুফর এবং সৌভাগ্যও দুর্ভাগ্যের ক্ষেত্রে শেষাবস্থা ধর্তব্য। এমনকি ভাগ্যবান মুমিন সে ব্যক্তিই, যার মৃত্যু হয়েছে ঈমানের ওপর। যদিও সারা জীবন কুফর ও গুনাহে ডুবে থাকে। আর হতভাগা কাফির সে ব্যক্তিই, যার মৃত্যু হয় কুফর অবস্থায়। যদিও সারা জীবন বিশ্বাস ও আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকে। যেমন, সেদিকেই ইংগিত রয়েছে, ইবলীস সম্পর্কে অবতীর্ণ আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ এর মধ্যে এবং নবী কারীম ﷺ এর হাদীস- اَلسَّعِيْدُ مَنْ سَعِدَ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ (ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি, যে

মায়ের উদরে ভাগ্যবান; হতভাগা ঐ ব্যক্তি, যে মায়ের উদরে হতভাগা) এর মধ্যে। সুতরাং মূল গ্রন্থকার রহ. এর ভ্রান্তির প্রতি ইংগিত করে বলেন– ভাগ্যবান কখনও কখনও হতভাগা হয়ে যায়। যেমন, আল্লাহ না করুন কেউ ঈমান গ্রহণের পর মুরতাদ (নাস্তিক) হয়ে গেল। আবার হতভাগা অনেক সময় ভাগ্যবান হয়ে যায়। যেমন, কোন ব্যক্তি কুফরী করার পর ঈমান আনায়ন করে ফেলল। আর সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে; ভাগ্যবান করা ও হতভাগা করার ক্ষেত্রে নয়। অথচ اِسْعَاد ও اِشْقَاء আল্লাহ পাকের বৈশিষ্ট্য। কেননা اِسْعَاد অর্থ, সৌভাগ্য সৃষ্টি করা আর اِشْقَاء অর্থ, দুর্ভাগ্য সৃষ্টি করা। মূলতঃ আল্লাহর সত্তায় পরিবর্তন হয় না; পরিবর্তন হয় না তার গুণাবলীতেও। কেননা পূর্বে বলা হয়েছে, কাদীম বা অবিনশ্বর আদৌ নশ্বরের পাত্র হতে পারে না। তবে সঠিক কথা হল, অর্থগত দিকে থেকে কোন মতভেদ নেই। কেননা ঈমান ও সৌভাগ্য দ্বারা নিছক অর্থ তথা তাসদীক (বিশ্বাস) অর্জন উদ্দেশ্য হলে, তা এ মুহূর্তে অর্জিত আছে। আর যদি সে তাসদীক উদ্দেশ্য হয়, যার উপর নাজাত ও ফলাফল সংশ্লিষ্ট হবে, তাহলে তা আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন রয়েছে। এ মূহুর্তে তা হাসিল হওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং যিনি দৃঢ়তার সাথে ঈমান হাসিলের কথা বলেছেন, তিনি প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আর যিনি আল্লাহর ইচ্ছার উপর ন্যস্ত করেছেন, তিনি দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কতিপয় আশআরীর মতটি প্রত্যাখ্যাত

কতিপয় আশায়েরা বলেন– ঈমান ও কুফর তদ্রুপ সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের ক্ষেত্রে পরিসমাপ্তি ও শেষাবস্থা ধর্তব্য। এমনকি ভাগ্যবান মুমিন ঐ ব্যক্তি, যার মৃত্যু হয়েছে ঈমানের ওপর, যদিও সে জীবনবর কুফর ও পাপাচারে ডুবে ছিল। আর হতভাগা কাফির ঐ ব্যক্তি, যার মৃত্যু হয়েছে (নাউযুবিল্লাহ) কুফরের ওপর, যদিও সে জীবনভর ঈমান ও আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরিসমাপ্তি সম্পর্কে বান্দার কোন জ্ঞান নেই সে আদৌ জানে না, তার মৃত্যু ঈমানের উপর হবে কি না? বরং তা নির্ভর করে আল্লাহ পাকের ইচ্ছার ওপর। কাজেই اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ বলা দুরস্ত আছে।

মূল গ্রন্থকার এ উক্তি খণ্ডন করে বলেন– সৌভাগ্যবান অনেক সময় হতভাগা হয়ে যায়। যেমন, সে ঈমান আনয়নের পর ধর্মান্তরিত (মুরতাদ) হয়ে গেল। (নাউযুবিল্লাহ) অনুরূপভাবে অনেক সময় হতভাগাও সৌভাগ্যশীল হয়ে যায়। যেমন, সে কুফরী করার পর ঈমান গ্রহণ করে নিল এবং পাপাচারে ডুবে থাকার পর তাওবা করে ইবাদত-আনুগত্যে লেগে গেল।

ভাগ্যের পরিবর্তনে আল্লাহর গুণেও কি পরিবর্তন হয় ?

قَوْلُهُ: وَالتَّغَيُّر ..الخ ঃ এটি একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন হল, সৌভাগ্যশীল হতভাগা হওয়া এবং হতভাগা সৌভাগ্যশীল হওয়ার ফলে اِسْعَاد ও اِشْقَاء তথা ভাগ্যবান করা ও হতভাগা বানানোর মধ্যে পরিবর্তন আবশ্যক হয়। অথচ এটি আল্লাহর বৈশিষ্ট্য। আর তার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীতে পরিবর্তন আসা অসম্ভব।

জবাবের সারাংশ হল, সৌভাগ্যও দুর্ভাগ্য বান্দার বৈশিষ্ট্য ও গুণ। তাতে পরিবর্তন হতে পারে। আর আল্লাহর গুণ তো اِسْعَاد তথা সৌভাগ্যবান বানানো এবং اِشْقَاء তথা হতভাগা বানানো। এতে কোন প্রকার পরিবর্তন হয় না। এক ব্যক্তির সাথে কখনও সৌভাগ্যবান বানানো আবার কখনও হতভাগা বানানোর সম্পর্ক হয়। যেরূপভাবে একই ব্যক্তির সাথে কখনও জীবনদানের আবার কখনও মৃত্যুদানের সম্পর্ক হয়। তদুপরি আল্লাহ পাকের সৃষ্টিশীলতার গুণে কোন পরিবর্তন আসে না।

হানাফী ও শাফিঈদের মতবিরোধ মৌলিক নয় ?

قَوْلُهُ: وَالْحَقُّ اَنَّهُ لَاخِلَافَ ...الخ ঃ অর্থাৎ হানাফিয়াহ ও শাফিয়াদের মাঝে মতবিরোধ মৌলিক নয়। কেননা ঈমান দ্বারা তার হাকীকত (বাস্তবতা) তথা বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তি অর্জন উদ্দেশ্য হলে, তা এ মুহূর্তেই বিদ্যমান আছে। আর যদি তার দ্বারা সে ঈমান উদ্দেশ্য হয়, যার উপর পরকালীন মুক্তি নির্ভরশীল অর্থাৎ সর্বশেষ ঈমান, তাহলে সেটা আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন। বান্দার এ সংক্রান্ত কোনও জ্ঞান নেই। সুতরাং যিনি তা হাসিলের দৃঢ় বিশ্বাসে اَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا বলেছেন, তিনি প্রথমোক্ত অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আর যিনি আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করে اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ বলেছেন, তিনি দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

وَفِى اِرْسَالِ الرُّسُلِ جَمْعُ رَسُوْلٍ عَلٰى فَعُوْلٍ مِنَ الرِّسَالَةِ وَهِىَ سِفَارَةُ الْعَبْدِ بَيْنَ اللّٰهِ وَبَيْنَ ذَوِى الْاَلْبَابِ مِنْ خَلِيْقَتِهٖ لِيُزِيْحَ بِهَا عِلَّتَهُمْ فِيْمَا قَصُرَتْ عَنْهُ عُقُوْلُهُمْ مِنْ مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَقَدْ عَرَفْتَ مَعْنَى الرَّسُوْلِ وَالنَّبِىِّ فِى صَدْرِ الْكِتَابِ - حِكْمَةٌ اَىْ مَصْلَحَةٌ وَعَاقِبَةٌ حَمِيْدَةٌ - وَفِى هٰذَا اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّ الْاِرْسَالَ وَاجِبٌ لَا بِمَعْنَى الْوُجُوْبِ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى بَلْ بِمَعْنٰى اَنَّ قَضِيَّةَ الْحِكْمَةِ تَقْتَضِيْهِ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْحِكَمِ وَالْمَصَالِحِ وَلَيْسَ بِمُمْتَنِعٍ كَمَا زَعَمَتِ السُّمَنِيَّةُ وَالْبَرَاهِمَةُ - وَلَا بِمُمْكِنٍ يَسْتَوِىْ طَرْفَاهُ كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِيْنَ - ثُمَّ اَشَارَ اِلٰى وُقُوْعِ الْاِرْسَالِ وَ فَائِدَتِهٖ وَطَرِيْقِ ثُبُوْتِهٖ وَتَعْيِيْنِ بَعْضِ مَنْ ثَبَتَتْ رِسَالَتُهٗ فَقَالَ وَقَدْ اَرْسَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى رُسُلًا مِنَ الْبَشَرِ اِلَى الْبَشَرِ مُبَشِّرِيْنَ لِاَهْلِ الْاِيْمَانِ وَالطَّاعَةِ بِالْجَنَّةِ وَالثَّوَابِ وَمُنْذِرِيْنَ لِاَهْلِ الْكُفْرِ وَالْعِصْيَانِ بِالنَّارِ وَالْعِقَابِ فَاِنَّ ذٰلِكَ مِمَّا لَا طَرِيْقَ لِلْعَقْلِ اِلَيْهِ وَاِنْ كَانَ فَبِاَنْظَارٍ دَقِيْقَةٍ لَا يَتَيَسَّرُ اِلَّا لِوَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ وَمُبَيِّنِيْنَ لِلنَّاسِ مَا يَحْتَاجُوْنَ اِلَيْهِ مِنْ اُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ فَاِنَّهٗ تَعَالٰى خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَاَعَدَّ فِيْهِمَا الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ وَتَفَاصِيْلُ اَحْوَالِهِمَا وَطَرِيْقُ الْوُصُوْلِ اِلَى الْاَوَّلِ وَالْاِحْتِرَازِ عَنِ الثَّانِىْ مِمَّا لَا يَسْتَقِلُّ بِهِ الْعَقْلُ - وَكَذَا خَلَقَ الْاَجْسَامَ النَّافِعَةَ وَالضَّارَّةَ وَلَمْ يَجْعَلْ لِلْعُقُوْلِ وَالْحَوَاسِّ الْاِسْتِقْلَالَ بِمَعْرِفَتِهِمَا - وَكَذَا جَعَلَ الْقَضَايَا مِنْهَا مَا هِىَ وَاجِبَاتٌ اَوْ مُمْكِنَاتٌ لَا طَرِيْقَ اِلَى الْجَزْمِ بِاَحَدِ جَانِبَيْهَا - وَمِنْهَا مَا هِىَ وَاجِبَاتٌ اَوْ مُمْتَنِعَاتٌ لَا تَظْهَرُ لِلْعَقْلِ اِلَّا بَعْدَ نَظْرٍ دَائِمٍ وَبَحْثٍ كَامِلٍ بِحَيْثُ لَوِ اشْتَغَلَ الْاِنْسَانُ بِهٖ لَتَعَطَّلَ اَكْثَرُ مَصَالِحِهٖ فَكَانَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهٖ اِرْسَالُ الرُّسُلِ لِبَيَانِ ذٰلِكَ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

সহজ তরজমা

আর (হিকমত তথা কল্যাণ ও সুফল রয়েছে) নবী-রাসূল প্রেরণে। رُسُلٌ শব্দটি فَعُوْلٌ এর ওযনে رَسُوْلٌ শব্দের বহুবচন, رِسَالَت শব্দ থেকে নির্গত। رِسَالَت অর্থ, আল্লাহ ও তার বিবেকবান মাখলূকের মাঝে বান্দার দূত ও পথ প্রদর্শক হওয়া। যাতে তাঁর দ্বারা মানুষের রোগ-ব্যাধিও কলুষতা বিদূরীত হয়ে যায়, দুনিয়া আখিরাতের সেসব কল্যাণের ক্ষেত্রে, যেগুলো অনুধাবনে (মানবীয়) বিবেক অক্ষম। কিতাবের শুরুতে নবী-রাসূলের অর্থ তুমি জানতে পেরেছ। এতে বহু হিকমত তথা কল্যাণ ও প্রশংসনীয় পরিনাম রয়েছে। এতে এদিকে ইংগিত আছে যে, রাসূল প্রেরণ করা ওয়াজিব। তবে ইরসালে রসূল বা রাসূল প্রেরণ وُجُوْب عَلَى اللّٰهِ বা আল্লাহর উপর ওয়াজিব অর্থে নয় বরং হিকমত ও কল্যাণ তার (রাসূল প্রেরণের) দাবীদার হওয়ার অর্থে। কেননা এতে বহু হিকমত ও কল্যাণ রয়েছে; এটা অসম্ভব নয়। যেমনটি সুমানিয়াহ ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বলে থাকে। আবার তা রাসূল প্রেরণ এরূপ অসম্ভবও নয় যে, তার উভয় দিক সমান। যেমনটি কোন কোন মুতাকাল্লিমীনের অভিমত। অতঃপর মূল

গ্রন্থকার বাস্তবে রাসূল প্রেরণ, তার উপকারিতা, প্রমাণ পদ্ধতি এবং কতিপয় এমন রাসূল সুনির্দিষ্ট করণের প্রতি ইংগিত করেছেন, যাদের রেসালাত (দলীল দ্বারা) প্রমাণিত। সুতরাং তিনি বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির কাছে ঈমান্দার ও আনুতগ্যশীল বান্দাদেরকে জান্নাত ও প্রতিদানের সুসংবাদ শোনানোর জন্য এবং কাফির ও পাপিষ্ট বান্দাদেরকে জাহান্নাম ও আযাবের ভয় দেখানোর জন্য তাদের মধ্য থেকে রাসূল প্রেরণ করেছেন। কেননা, বিষয়গুলো এমন, যা জানার কোন উপায় বিবেকের নেই। আবার থাকলেও সূক্ষ্ম চিন্তায় সম্ভব, যা দু'একজনেরই আছে। তারা লোকদের কাছে দ্বীন-দুনিয়ার এমন সব বিষয় বর্ণনা করতেন, তারা যেগুলোর মুখাপেক্ষী ছিল। কেননা, আল্লাহ তা'আলা জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে প্রতিদান ও আযাব প্রস্তুত রেখেছেন। আর এদুটির বিশাদ বিবরণ এবং প্রথমটিতে (জান্নাতে) পৌছা আর দ্বিতীয়টি (জাহান্নাম) থেকে বাঁচার উপায় জানা এমন বিষয়, যাতে বিবেক যথেষ্ট নয়। (আকলের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়) অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা হিতকর ও অপকারী দেহ সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো জানার জন্য বিবেক ও ইন্দ্রিয়শক্তি যথেষ্ট বানান নি। অনুরূপভাবে এমন কিছু বাক্য রেখেছেন যা সম্ভাব্য সেগুলোর কোন একটি দিকের উপর একীন করার কোন উপায় নেই। আবার কিছু অনিবার্য অথবা অসম্ভব, যেগুলোর বিবেকের কাছে স্পষ্ট হয় না। তবে অব্যাহত চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা ও পরিপূর্ণ আলোচনার পর তা হতে পারে। এমনভাবে মানুষ যদি তাতে ডুবে যায়, তাহলে তার অধিকাংশ কাজ-কর্ম অচল হয়ে যাবে। কাজেই এসব বিষয় আলোচনার জন্য রাসূল প্রেরণ করা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ। যেমন, স্বয়ং তিনি ইরশাদ করেছেন– হে নবী! আমি আপনাকে সমস্ত জগতের জন্য একমাত্র রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। (জগতবাসীর উপর অনুগ্রহ করার জন্য আমি আপনাকে রাসূল বানিয়েছি।)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

নবুওয়াত ও রিসালাতের আলোচনা

এখান থেকে নবুওয়াত ও রেসালাতের আলোচনা শুরু হচ্ছে। রেসালাত অর্থ, দূত হওয়া এবং এক পক্ষ থেকে আরেক পক্ষে কল্যাণ পৌছানোর ক্ষেত্রে মাধ্যম হওয়া। অবশ্য এখানে রিসালাত অর্থ, মুতলাক দূতিয়ালী নয় বরং আল্লাহ ও তার বিবেকবান মাখলূকের মাঝে বান্দার দূতিয়ালী উদ্দেশ্য।

✪ ব্যাখ্যাতা রিসালাতের এ অর্থ বর্ণনায় সে সব লোকদের মত খণ্ডানোর প্রতি ইংগিত করেছেন, যারা বলে– প্রাণীজগতের প্রত্যেক জাতের জন্য সে বিবেকবান হোক বা না হোক, তাদের নিকট স্বজাতীয় রাসূল প্রেরণ করেছেন। তারা প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَاِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ উপস্থাপন করেন।

কাযী আয়ায রহ. স্বরচিত 'শিফা' গ্রন্থে তাদের এ উক্তি অত্যন্ত কঠোরভাবে খণ্ডন করেছেন। কেননা সে উক্তির সূত্রে কুকুর-শূকরেরও নবী-রাসূল হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ উল্লেখিত আয়াতে উম্মত বলে দল উদ্দেশ্য। আর দল দ্বারা মানব দল উদ্দেশ্য।

মোটকথা, রিসালাত দ্বারা আল্লাহ ও তার বিবেকবান সৃষ্টিকূলের মাঝে বান্দার দূত ও সেতু বন্ধন হওয়া উদ্দেশ্য। যাতে আল্লাহ এ বান্দার দুতিয়ালী ও মধ্যস্থতায় দুনিয়া-আখেরাতের সেসব অবস্থা ও মাসায়েল সম্পর্কে বান্দার সংশয়-সন্দেহ বিদূরীত করতে পারেন, যেগুলো অনুধাবনে তাদের বিবেক অক্ষম। একারণেই মুসান্নিফ রহ. বলেছেন, রাসূল প্রেরণের পেছনে বড় হিকমত এবং অনেক কল্যাণ ও উপকারিতা রয়েছে। যেমন, সেসব বিষয় অনুধাবনে মানবীয় বিবেক যথেষ্ট নয়, উতাহরণতঃ আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব, আল্লাহ পাকের ইল্‌ম ইত্যাদি, এসব বিষয়ে রাসূল ﷺ এর মাধ্যমে তাদের সাহায্য করা; সেসব ঔষধ-পথ্য ও খাদ্যদ্রব্যের উপকারীতা ও অপকারীতা রাসূল ﷺ এর মাধ্যমে বর্ণনা দেওয়া, যেগুলো গবেষণা করে উদঘাটন করতে হলে শতাব্দির অধিকাল সময় প্রয়োজন; তদ্রুপ বিষাক্ত খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধ-পথ্য নিয়ে গবেষণা করাও আশঙ্কামুক্ত নয়।

অনুরূপভাবে ইল্‌ম-আমলের ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষকে তার যোগ্যতা মাফিক কামেল বানানো বা পূর্ণাঙ্গতা দান; নেক আমলের প্রতি মানুষকে অনুপ্রাণিত করার জন্য নেককার বান্দাদের প্রতিদানের বিশাদ বিবরণ এবং বদ আমল থেকে লোকদেরকে দূরে রাখার লক্ষ্যে অবাধ্য-নাফরমান বান্দাদের শাস্তির বিশদ বিবরণ দেওয়া প্রভৃতি অসংখ্য কল্যাণ ও উপকারীতা রয়েছে। এজন্য মু'তাযিলা যারা اَصْلَحُ لِلْعَبْدِ তথা আল্লাহর উপর বান্দার জন্য কল্যাণকর জিনিস দেওয়া ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা, তারা রাসূল প্রেরণকে আল্লাহর উপর ওয়াজিব সাব্যস্ত করে। অর্থাৎ তা

বর্জন করা অসম্ভব। আর আল্লাহ তা'আলার উপর اَصْلَحُ لِلْعَبْدِ ওয়াজিব না হওয়া এবং এর প্রমাণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে পুনরায় দেখে নিন।

✪ মাতুরীদিয়ারাও রাসূল প্রেরণকে ওয়াজিব বলেন। অবশ্য মু'তাযিলার মতাদর্শ মাফিক "আল্লাহ তা'আলা তা বর্জন করতে সক্ষম নন" অর্থে নয় বরং রাসূল প্রেরণ সম্পর্কে আল্লাহ পাকের স্বভাবরীতি চালু থাকার অর্থে। এজন্য তিনি উপকারীতাকে প্রাধান্য দেন। যদিও তা পরিত্যাগ করা জায়েয এবং আল্লাহ তা'আলা রাসূল না পাঠানোর সামর্থক রাখেন। অধিকন্তু মাতুরীদিয়া বিনয় ও আদবের সাথে বলেন– রাসূল প্রেরণের এ আবশ্যকতা আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর উপর নয়।

রাসূল প্রেরণ কি অসম্ভব ?

সুমিনিয়া সম্প্রদায় রাসূল প্রেরণকে অসম্ভব সাব্যস্ত করে। প্রমাণস্বরূপ বলে, ইরসাল অর্থ রাসূল বানানো বা দূত নিযুক্ত করা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক "আমি তোমাকে রাসূল বানালাম" বলার উপর নির্ভরশীল। বস্তুতঃ একথা আল্লাহ তা'আলাই বলেছেন, এ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা তা কোনও জ্বিনের কথাও হতে পারে।

✪ এর জবাব হল, হতে পারে আল্লাহ তা'আলা এমন কোন প্রমাণ সৃষ্টি করে দিবেন, যা এটি আল্লাহর কালাম হওয়া বুঝাবে। অথবা তিনি সুস্পষ্ট জ্ঞান দান করবেন।

✪ দ্বিতীয় প্রমাণ হল, যদি অহী বাহক ফিরিশতা জিবরাঈল (আ.) কায়াবিশিষ্ট হয়ে থাকেন, তাহলে তো উপস্থিত সকলেই তাকে দেখার কথা। অথচ তেমন হয়নি। আর যদি দেহ বিহীন হয়ে থাকেন, তাহলে তো দেহ বিহীন বস্তু দেখা সকলের জন্যই অসম্ভব। আর দেখা ছাড়া রাসূল ﷺ কিভাবে নিশ্চিত হতে পারেন যে, তার শ্রুত আওয়াজ বিজরাঈল (আ.) এর আওয়াজ; ইবলীসের নয়।

✪ এর জবাব হল, দর্শনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা। তিনি এমনও করতে পারেন যে, অহীবাহক ফিরিশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) কে রাসূলের সামনে প্রতিভাত করে দিবেন এবং অন্যান্য লোকদের থেকে গোপন রাখবেন।

ব্রাহ্মণদের মতে রাসূল প্রেরণ

ব্রাহ্মণরা রাসূল প্রেরণকে অসম্ভব বলে না। কেননা কোন কোন ব্রাহ্মণ হযরত আদম (আ.) ও হযরত ইবরাহীম (আ.) এর নবুওয়াতের স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু তারা বলে– রাসূলের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, রাসূল যেসব বিধান নিয়ে আসবেন, সেগুলো দু'অবস্থার বাইরে নয়। হয়ত সেগুলো যৌক্তিক ও বিবেকগ্রাহ্য হবে। এমতাবস্থায় স্বয়ং মানুষ সেগুলোর উপর আমল করবে। রাসূল না আসলেও। নতুবা সেগুলো অযৌক্তিক ও বিবেক অগ্রাহ্য হবে। এমতাবস্থায় সেগুলো মানুষ স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করবে। যদিও সেগুলো কোন রাসূল নিয়ে আসেন। তাহলে রাসূলের প্রয়োজন কোথায় ? আদৌ কোন প্রয়োজন নেই।

জবাব ঃ কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যেগুলো ভালমন্দ অনুধাবনের জন্য মানবীয় জ্ঞান ও বিবেক যথেষ্ট নয়। বিধায় সেগুলোর ভালমন্দ বলে দেওয়ার জন্য রাসূল প্রয়োজন। জমহূর আশ'আরীর মতে রাসূল প্রেরণ সম্ভব।। অর্থাৎ বিবেক তার অস্তিত্বের দিককে প্রধান্য দেয় না বরং নিছক আল্লাহর ইচ্ছার দরুন তার অস্তিত্ব লাভের দিকটি অগ্রগণ্য। কেননা আল্লাহর কাজ স্বার্থনির্ভর নয়। তিনি স্বেচ্ছায় যে কাজ চান, স্বার্থহীনভাবে এবং হিকমতও কল্যাণ প্রভৃতি কোন প্রকার কারণ ছাড়াই করেন। শারেহ রহ. স্বয়ং আশ'আরী হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় উক্তি وَلَا يُمْكِنُ দ্বারা জমহূর আশআরীর মতাদর্শ প্রত্যাখ্যান করে এ ব্যাপারে মাতুয়ীদিয়ার মাযহাবের প্রতি আগ্রহ (নিজের ঝোঁক) প্রকাশ করেছেন।

রাসূল প্রেরণের উপকারীতা

قَوْلُهُ: ثُمَّ اَشَارَ..الخ ঃ অর্থাৎ মুসান্নিফ রহ. স্বীয় উক্তি وَقَدْ اَرْسَلَ اللّٰهُ الخ দ্বারা বাস্তবে রাসূল প্রেরণের প্রতি, مُبَشِّرِيْنَ مُنْذِرِيْنَ مُبَيِّنِيْنَ...الخ দ্বারা রাসূল প্রেরণের উপকারীতার প্রতি, وَاَيَّدَهُمْ بِالْمُعْجِزَاتِ الخ দ্বারা সুনির্দিষ্ট করে কতিপয় রাসূল ﷺ এর প্রতি ইংগিত করেছেন, যাদের রিসালাত প্রমাণিত।

তিনি জ্বিন-ইনসান সকলের রাসূল

قَوْلُهُ : اَرْسَلَهُمْ اِلَى الْبَشَرِ ... الخ ঃ এখানে اِلَى الْبَشَرِ বলা হয়েছে, অধিকাংশের প্রতি লক্ষ্য করে। নতুবা হক পন্থীদের মতে তিনি জ্বিন-ইনসান সকলেরই রাসূল ছিলেন। অধিকন্তু اَيِ الْبَشَرِ এর মধ্যে بَشَرِ দ্বারা সাধারণ

মানুষ উদ্দেশ্য। কাজেই আল্লাহর বাণী اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا (আল্লাহ ফিরিশতাদের মধ্য হতে মনোনীত করেন বার্তবাহক। সূরা হজ্ব - ৭৫) দ্বারা প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না যে, আল্লাহ তা'আলা যখন ফিরিশিতাদেরকেও রাসূল বানিয়েছে, তাহলে মুসান্নিফ রহ. رُسُلًا مِنَ الْبَشَرِ (মানুষ থেকে রাসূল) কেন বললেন ? কেননা ফিরিশতাগণ সাধারণ মানুষ হিসেবে রাসূল নন বরং মানষের নবীগণের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছানোর দিকে লক্ষ্য করে রাসূল। মোটকথা, তারা সাধারণ মানুষের প্রতি রাসূল নন বরং মানুষের নবীগণের প্রতি রাসূল।

জ্বিনও কি রাসূল হয়েছে

অবশ্য কোন জ্বিন রাসূল হয়েছে কিনা -এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ আল্লাহর বাণী, يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ ("হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায় ! তোমাদের মধ্য হতে কি রাসূলগণ তোমাদের নিকট আগমণ করেনি।" সূরা আনআম -১৩০) এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করে বলেন-, জ্বিনদের মধ্যেও রাসূল হয়েছে। কেননা مِنْكُمْ এর হাযিরের যমীর (মধ্যমপুরুষ সর্বনাম) জ্বিন ও মানুষ উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। আবার কেউ কেউ তা অস্বীকার করে আয়াতটির জবাবে বলেন- আয়াতে কারীমায় জ্বিন রাসূল দ্বারা সেসব জ্বিন উদ্দেশ্য, যারা রাসূলে কারীম ﷺ এর কাছে শরঈ আহকাম শুনে স্বজাতির নিকট গিয়ে পৌঁছাত। যেমন- সে সব জ্বিন, যারা বতনে নাখ্‌লায় নবীজীর কাছে কুরআনে কারীম শুনে স্বগোত্রের নিকট পৌঁছিয়েছিল। যাদের ঘটনা সূরায়ে জ্বিনে উল্লেখ রয়েছে।

قَوْلُهٗ : وَخَلَقَ الْاَجْسَامَ النَّافِعَةَ الخ ঃ ঔষধ-পথ্যের উপকারীতা ও অপকারীতা অহীর মাধ্যমে জানা গেছে। চিকিৎসকগণ সেগুলো নবী-রাসূলদের থেকে জেনেছেন।

قَوْلُهٗ : وَكَذَاجَعَلَ الْقَضَايَا .الخ ঃ এখানে উহ্য বাক্য جَعَلَ الْاَحْكَامَ الْوَاقِعَةَ فِى الْقَضَايَا হবে।

قَوْلُهٗ : مِنْهَا مَاهِىَ مُمْكِنَات الخ ঃ উদাহরণতঃ আকাশের উপর সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা এবং লাওহে মাহফূযের অস্তিত্ব -সবই সত্ত্বাগতভাবে সম্ভব। এগুলো অনুধাবনে বিবেক যথেষ্ট নয়। কাজেই এগুলো বর্ণনা করার জন্য রাসূল প্রেরণ করা জরুরী। আবার কিছু আহকাম যৌক্তিকভাবে ওয়াজিব ও জরুরী। উদাহরণতঃ পৃথিবীর নশ্বরতা। আবার কিছু অসম্ভব। যেমন, আল্লাহ পাকের অংশীদার হওয়া। এ ধরনের বিধি-বিধান দলীল-প্রমাণের আলোকে জানা যায়। এখন যদি সেগুলো দলীল-প্রমাণের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে মানুষ এসব অনুধাবনের চিন্তা-ফিকির ও গবেষণায় ডুবে থাকার কারণে অন্যান্য কাজকর্মের সুযোগ পাবে না। তাদের যাবতীয় কাজকর্ম অচল হয়ে যাবে। তাই হিকমত ও কল্যাণের দাবী হল, সেসব বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য রাসূল প্রেরণ করা। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ-অনুকম্পায় মানব জাতির কাছে তার রাসূল প্রেরণ করেছেন। যেমন, তিনি স্বীয় বাণী وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ এর মধ্যে রাসূল ﷺ এর প্রেরণকে দুনিয়াবাসীর জন্য স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহে আখ্যা দিয়েছেন।

وَاَيَّدَهُمْ اَىِ الْاَنْبِيَاءَ بِالْمُعْجِزَاتِ النَّاقِضَاتِ لِلْعَادَاتِ جَمْعُ مُعْجِزَةٍ وَهِىَ اَمْرٌ يَظْهَرُ بِخِلَافِ الْعَادَةِ عَلٰى يَدِ مُدَّعِى النُّبُوَّةِ عِنْدَ تَحَدِّى الْمُنْكِرِيْنَ عَلٰى وَجْهٍ يُعْجِزُ الْمُنْكِرِيْنَ عَنِ الْاِتْيَانِ بِمِثْلِهٖ وَذَالِكَ لِاَنَّهٗ لَوْلَا التَّائِيْدُ بِالْمُعْجِزَةِ لَمَا وَجَبَ قَبُوْلُ قَوْلِهٖ وَلَمَا بَانَ الصَّادِقُ فِىْ دَعْوَى الرِّسَالَةِ عَنِ الْكَاذِبِ وَعِنْدَ ظُهُوْرِ الْمُعْجِزَةِ يَحْصُلُ الْجَزْمُ بِصِدْقِهٖ بِطَرِيْقِ جَرْىِ الْعَادَةِ بِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَخْلُقُ الْعِلْمَ بِالصِّدْقِ عَقِيْبَ ظُهُوْرِ الْمُعْجِزَةِ وَاِنْ كَانَ عَدَمُ خَلْقِ الْعِلْمِ مُمْكِنًا فِىْ نَفْسِهٖ ـ وَذَالِكَ كَمَا ادَّعٰى اَحَدٌ بِمَحْضَرٍ مِنْ جَمَاعَةٍ اَنَّهٗ رَسُوْلُ هٰذَا الْمَلِكِ اِلَيْهِمْ ـ ثُمَّ قَالَ لِلْمَلِكِ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَخَالِفْ عَادَتَكَ وَقُمْ مِنْ مَكَانِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ فَفَعَلَ ـ يَحْصُلُ لِلْجَمَاعَةِ عِلْمٌ ضَرُوْرِىٌّ عَادِىٌّ

بِصِدْقِهٖ فِىْ مَقَالَتِهٖ وَاِنْ كَانَ الْكِذْبُ مُمْكِنًا فِىْ نَفْسِهٖ فَاِنَّ الْاِمْكَانَ الذَّاتِىَّ بِمَعْنَى التَّجْوِيْزِ الْعَقْلِىِّ لَايُنَافِىْ حُصُوْلَ الْعِلْمِ الْقَطْعِىِّ كَعِلْمِنَا بِاَنَّ جَبَلَ اُحُدٍ لَمْ يَنْقَلِبْ ذَهَبًا مَعَ اِمْكَانِهٖ فِىْ نَفْسِهٖ فَكَذَا هٰهُنَا يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِصِدْقِهٖ بِمُوْجَبِ الْعَادَةِ لِاَنَّهَا اَحَدُ طُرُقِ الْعِلْمِ كَالْحِسِّ ـ وَلَا يَقْدَحُ فِىْ ذَالِكَ اِمْكَانُ كَوْنِ الْمُعْجِزَةِ مِنْ غَيْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَكَوْنِهَا لَا لِغَرَضِ التَّصْدِيْقِ اَوْ كَوْنِهَا لِتَصْدِيْقِ الْكَاذِبِ اِلٰى غَيْرِ ذَالِكَ مِنَ الْاِحْتِمَالَاتِ كَمَا لَا يَقْدَحُ فِى الْعِلْمِ الضَّرُوْرِىِّ بِحَرَارَةِ النَّارِ اِمْكَانُ عَدَمِ الْحَرَارَةِ لِلنَّارِ بِمَعْنٰى اَنَّهٗ لَوْ قُدِّرَ عَدَمُهَا لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ مُحَالٌ ـ

সহজ তরজমা

এবং স্বভাববিরুদ্ধ অলৌকিক মু'জিযা দ্বারা আম্বিয়ায়ে কিরামকে শক্তিশালী করেছেন। مُعْجِزَات শব্দটি معجزت এর বহুবচন। মু'জিযা এমন বিষয়, যা নবুওয়াতের দাবীদারের হাতে অস্বীকারকারী প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করার সময় এমনভাবে প্রকাশ পায়, যা অস্বীকারকারীদেরকে (তদনুরূপ নযীর উপস্থাপনে) অক্ষম করে দেয়। কেননা মু'জিযার মাধ্যমে যদি শক্তি যোগানো না হত, তাহলে তাদের কথা গ্রহণ করা ওয়াজিব হত না এবং নবুওয়াতের দাবীতে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর পার্থক্য স্পষ্ট হত না। আর মুযিজা প্রকাশিত হওয়ার সময় যথারীতি তার দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত হয় অর্থাৎ মুজিযা প্রকাশের পর আল্লাহ্ তা'আলা নবীর সত্যতার ইল্ম সৃষ্টি করে দেন। যদিও সত্ত্বাগতভাবে ইল্ম (দৃঢ় বিশ্বাস) সৃষ্টি না করাও সম্ভব। উদাহরণঃ যেমন, কোন ব্যক্তি ভরা মজলিসে দাবী করল– তিনি অমুক সম্রাটের পক্ষ থেকে তাদের নিকট প্রেরিত (রাসূল)। অতঃপর তিনি সম্রাটকে বললেন– আমি যদি সত্যবাদী হই তাহলে আপনি স্বীয় অভ্যাসের বিপরীত তিনবার নিজ আসন থেকে উঠুন-বসুন। সুতরাং সম্রাট যদি তা-ই করেন, তাহলে উপস্থিত জনতার মনে সে ব্যক্তির কথার সত্যতার ব্যাপারে যথারীতি নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে যাবে। যদিও ব্যক্তিগতভাবে তার মিথ্যাবাদী হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। কেননা সত্ত্বাগত সম্ভাব্যতা মানে যৌক্তিক বৈধতা, নিশ্চিত জ্ঞান হাসিলের পরিপন্থী নয়। যেমন, আমাদের নিশ্চিত জানা আছে– উহুদ পাহাড় স্বর্ণে পরিণত হয়নি। অথচ সত্ত্বাগতভাবে তা সম্ভব। সুতরাং অনুরূপভাবে এখানেও স্বভাবতঃ তার সত্যবাদীতার ইল্ম (দৃঢ় জ্ঞান) হাসিল হয়ে যাবে। কেননা ইন্দ্রিয় শক্তির মত স্বভাবও জ্ঞানার্জনের মাধ্যম। এতে (জ্ঞানার্জনে) মু'জিযা গাইরুল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও) থেকে হওয়া অথবা তাসদীক (আন্তরিক বিশ্বাস) ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে হওয়া কিংবা মিথ্যাবাদীকে বিশ্বাস করার জন্য হওয়া প্রভৃতি সম্ভাবনা কোনরূপ ক্ষতিকর হবে না। যেরূপভাবে আগুনের উষ্ণতার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে আগুন গরম না হওয়ার সম্ভাবনা কোনরূপ ক্ষতিকর নয়। অর্থাৎ যদি আগুন গরম নয় বলে ধরেও নেওয়া হয়, তথাপি এতে কোন অসম্ভব বিষয় আবশ্যক হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

নবী-রাসূলের বিশেষ মর্যাদা

আল্লাহ তা'আলা কাউকে নবুওয়াতের সম্মানে ভূষিত করলে তাকে দুটি জিনিস দান করেন। একটি শিক্ষা, দ্বিতীয়টি শক্তি-সহযোগিতা। শিক্ষা তো নবুওয়াতের মূল আর শক্তি-সহযোগীতা নবুওয়াতের প্রমাণ। কেননা পূর্বে জানা গেছে যে, রিসালাত আল্লাহ ও তার বান্দাদের মাঝে এক প্রকার দূতিয়ালী। আর দূতের স্বতন্ত্র কোন বৈশিষ্ট্য থাকা জরুরী। যাতে তার দূত ও রাসূল হওয়ার কথা জানা যায়। কাজেই আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলদের হাতে স্বীয় কুদরতের এমন কিছু কারিশমা (অলৌকিক ঘটনা) ও নিদর্শন প্রকাশ করেন, যেগুলো মানুষ থেকে প্রকাশ পাওয়া স্বভাবতঃ অসম্ভব। ফলে প্রত্যক্ষদর্শীদের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান অর্জিত হয়ে যায় যে, যার হাতে এসব নির্দশন প্রকাশ পেয়েছে, নিশ্চিত তিনি আল্লাহর রাসূল এবং রিসালাতের দাবীতে সত্যবাদী। কেননা এসব নিদর্শন মানাবীয় শক্তি-সামর্থের বাইরে ও উর্ধ্বে। আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া কোন মানুষ থেকে এর বহিঃপ্রকাশ অসম্ভব। মুজিযা প্রকাশের সময় নবুওয়াতের দাবীদারের সত্যবাদীতা সম্পর্কে স্বাভাবতই বিশ্বাস হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা

নিজের স্বভাবরীতি অনুযায়ী মু'জিযা প্রকাশ পাওয়ার পর দর্শকদের অন্তরে নবুওয়াতের দাবীদার ব্যক্তির সত্যতার ইল্‌ম স্বতঃসিদ্ধভাবে সৃষ্টি করে দেন। যদিও ইলম সৃষ্টি না করাও সম্ভব। আর এ (মু'জিযা দ্বারা নবুওয়াতের দাবীদারের সত্যতার জ্ঞানার্জন না হওয়ার) সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তা স্বভাবজাত হওয়া এমনই বিষয় যেমন, কোন ব্যক্তি ভরা মজলিসে দাবী করল– আমি অমুক সম্রাটের পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত। উপস্থিত লোকজন তার কাছে প্রমাণ দাবী করলে তিনি সম্রাটকে বললেন– আমি যদি আপনার দূত হওয়ার দাবীতে সত্যবাদী হই, তাহলে আপনি আপনার স্বভাব বিরুদ্ধ তিনবার নিজ আসন থেকে উঠুন এবং বসুন! সম্রাট যদি তা-ই করেন তাহলে উপস্থিত জনতার মনে সে ব্যক্তির স্বভাবসুলভ স্বতঃসিদ্ধ ইলম অর্জিত হবে। যদিও স্বত্ত্বাগতভাবে তার মিথ্যাবাদী হওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা আছে। কেননা হতে পারে সম্রাটের উঠা-বসা দূতীয়ালীর দাবীদারকে সত্যায়ণের জন্য নয় বরং অন্য কোন উদ্দেশ্যে। যেমন ধরন, সম্রাট তার এক এক প্রজার ফরমায়েশ পূরণে এতই আন্তরিকতা রাখেন যে, ব্যক্তিগত স্বকীয়তা ও সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করার কথাও ভাবেন না। অথবা কোন মিথ্যাবাদীকে সত্যায়ণের উদ্দেশ্যেও (সম্রাটের উঠা-বসা) হতে পারে। এসব সম্ভাবনা সত্ত্বেও সে ব্যক্তির সত্যতার ইল্‌ম ও ইয়াকীন হাসিল হবে। কেননা স্বত্ত্বাগত সম্ভাবনা অর্থাৎ বিবেকের বৈধতা নিশ্চিত জ্ঞানার্জনের পরিপন্থী নয়। যেমন, উহুদ পাহাড় স্বর্ণে পরিণত হওয়া সত্ত্বাগতভাবে সম্ভব। যদিও এ সত্ত্বাগত সম্ভাবনা আমাদের এ বিশ্বাস বিরোধী নয় যে, বাস্তবে পাহাড়টি স্বর্ণে পরিণত হয়নি। ঠিক তদ্রুপভাবে মুজিযা প্রকাশ পাওয়ার সময় নবুওয়াতের দাবীদারের সত্যতা সম্পর্কে আল্লাহ পাকের স্বভাবরীতি মাফিক নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়ে যায়। কেননা ইন্দ্রীয়শক্তির মত স্বভাবরীতিও জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে। সুতরাং যেভাবে ইন্দ্রয়লব্ধ জ্ঞান নিশ্চিত জ্ঞান; তদ্রুপ স্বভাবসূলভ জ্ঞান বা স্বভাব রীতির মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানও নিশ্চিত জ্ঞান।

মুজিযা, কারামত, মাঊনাত ও হস্তিদরাজ অর্থ

قَوْلُهُ : وَهِيَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ .....الخ ঃ স্বভাববিরুদ্ধ অলৌকিক ঘটনাবলির বহিঃপ্রকাশ যদি নবুওয়াত অস্বীকার কারীদেরকে অভিযুক্ত ও অক্ষম বানানোর উদ্দেশ্যে হয়, তবে তা মুজিযা। আর যার হাতে আল্লাহ তা'আলা সেসব বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন, এসব যদি তার ইজ্জত ও সম্মানার্থে হয়, তবে তা হবে কারামত। চাই তিনি নবী হোন কিংবা অলী হোন। আর যদি সাধারণ মানুষ থেকে প্রকাশ পায়, যার আল্লাহওয়ালা হওয়া বা পাপাচারী হওয়া অজানা, তবে তা মাঊনাত বা সাহায্য। যদি কাফির কিংবা ফাসিক থেকে তার উদ্দেশ্য মাফিক প্রকাশ পায়, তবে তা ইস্তিদরাজ (যথার্থ)। আর যদি উদ্দেশ্যের পরিপন্থী প্রকাশ পায়, তবে তা লাঞ্ছনা। যেমন মিথ্যুক মুসাইলামা জনৈক কানা ব্যক্তির চোখে হাত বুলিয়েছিল, যেন তার নষ্ট চোখটি ভাল হয়ে যায়। তখন সে লোকের ভাল চোখটিও নষ্ট হয়ে গেল।

নবুওয়াত অস্বীকার কারীদের নানা সংশয়

قَوْلُهُ : وَلَا يَقْدَحُ ....الخ ঃ নবুওয়াত অস্বীকার কারীরা মুজিযা নবুওয়াতের প্রমাণ হওয়ার ব্যাপারে একাধিক সংশয় প্রকাশ করে থাকে। যেমন, নবুওয়াতের দাবীদারের হাতে আল্লাহ পাকের স্বভাববিরুদ্ধ অলৌকিক ঘটনার বহিঃপ্রকাশ তার সত্যায়ণের জন্য নাও হতে পারে অথবা তোমরা আশআরীদের মতে আল্লাহ পাকের কোন কাজ স্বার্থনির্ভর ও উদ্দেশ্যমূলক নয় বলে হয়ে থাকবে অথবা নবুওয়াতের দাবীদার ব্যক্তির দু'আ কবুলের সুফলেও মুজিযার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে কিংবা মাখ্‌লূকের (ঈমান) পরীক্ষার উদ্দেশ্যেও হতে পারে। যাতে ব্যক্তিগত ইজতিহাদ ও চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে তার রিসালাতের সত্যায়ণ থেকে বিরত থেকে প্রতিদানের যোগ্য হয়। অথবা মিথ্যাবাদীর সত্যায়ণের নিমত্ত হয়ে থাকবে। কেননা আশআরীদের মতে আল্লাহ পাকের কোন কাজ মন্দ নয়।

শারেহ রহ. এসব সম্ভাবনা ও আপত্তির একটিমাত্র জবাব দিয়েছেন। বলেছেন– যেভাবে আগুন গরম না হওয়া সত্ত্বাগতভাবে সম্ভব। তদুপরি এ সত্ত্বাগত সম্ভাবনা আগুন গরম হওয়ার নিশ্চিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না। অনুরূপভাবে উপরিউক্ত সমূহ সম্ভাবনা সত্ত্বাগতভাবে সম্ভাব্য হওয়া সত্ত্বেও মুজিযা প্রকাশের সময় নবুওয়াতের দাবীদারের সত্যতার সুদৃঢ় জ্ঞানার্জনে কোন ব্যাঘ্যাত সৃষ্টি করবে না।

وَاَوَّلُ الْاَنْبِيَاءِ اٰدَمُ وَاٰخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمَّا نُبُوَّةُ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبِالْكِتَابِ الدَّالِّ عَلٰى اَنَّهُ قَدْ اُمِرَ وَنُهِيَ مَعَ الْقَطْعِ بِاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيْ زَمَانِهِ نَبِيٌّ اٰخَرُ ـ فَهُوَ بِالْوَحْيِ لَاغَيْرُ ـ وَكَذَا السُّنَّةِ وَالْاِجْمَاعِ فَاِنْكَارُ نُبُوَّتِهِ عَلٰى مَا نُقِلَ عَنِ الْبَعْضِ يَكُوْنُ كُفْرًا ـ وَاَمَّا نُبُوَّةُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلِاَنَّهُ ادَّعَى النُّبُوَّةَ وَاَظْهَرَ الْمُعْجِزَةَ وَاَمَّا دَعْوَى النُّبُوَّةِ فَقَدْ عُلِمَ بِالتَّوَاتُرِ وَاَمَّا اِظْهَارُ الْمُعْجِزَةِ فَلِوَجْهَيْنِ اَحَدُهُمَا اَنَّهُ اَظْهَرَ كَلَامَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَتُحَدِّيَ بِهِ الْبُلَغَاءَ مَعَ كَمَالِ بَلَاغَتِهِمْ ـ فَعَجَزُوْا عَنْ مُعَارَضَتِهِ بِاَقْصَرِ سُوْرَةٍ مِنْهُ مَعَ تَهَالُكِهِمْ عَلٰى ذَالِكَ حَتّٰى خَاطَرُوْا بِمُهَجَتِهِمْ وَاَعْرَضُوْا عَنِ الْمُعَارَضَةِ بِالْحُرُوْفِ اِلَى الْمُقَارَعَةِ بِالسُّيُوْفِ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَعَ تَوَفُّرِ الدَّوَاعِي الْاِتْيَانُ بِشَيْءٍ مِمَّا يُدَانِيْهِ فَدَلَّ ذَالِكَ قَطْعًا عَلٰى اَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ وَعُلِمَ بِهِ صِدْقُ دَعْوَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِلْمًا عَادِيًّا لَايَقْدَحُ فِيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْاِحْتِمَالَاتِ الْعَقْلِيَّةِ عَلٰى مَاهُوَشَانُ سَائِرِ الْعُلُوْمِ الْعَادِيَّةِ وَثَانِيْهَا اَنَّهُ نُقِلَ عَنْهُ مِنَ الْاُمُوْرِ الْخَارِقَةِ لِلْعَادَةِ مَا بَلَغَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ مِنْهُ اَعْنِيْ ظُهُوْرَ الْمُعْجِزَةِ حَدَّ التَّوَاتُرِ ـ وَاِنْ كَانَتْ تَفَاصِيْلُهَا اٰحَادًا كَشَجَاعَةِ عَلِيٍّ رض وَ جُوْدِ حَاتِمٍ وَهِيَ مَذْكُوْرَةٌ فِيْ كُتُبِ السِّيَرِ ـ

সহজ তরজমা

প্রথম নবী হযরত আদম (আ.) আর সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ। যাহোক হযরত আদম (আ.) এর নবুওয়াত তো আল্লাহর কিতাব দ্বারা প্রমাণিত। যাতে বুঝা যায়, তাঁকে (হযরত আদম আ.) সৎকাজের আদেশ ও অস্যৎ কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছিল। অথচ নিশ্চিত তাঁর যুগে অন্য কোন নবী ছিলেন না। অতএব তা (আদেশ-নিষেধ) ছিল অহীর মাধ্যমে; অন্য কিছুর মাধ্যমে নয়। অনুরূপভাবে সুন্নাত ও ইজমা দ্বারাও (তাঁর নবুওয়াত) প্রমাণিত। সুতরাং তাঁর নবুওয়াত অস্বীকার করা কুফরী হবে। যেমন, কারও কারও থেকে তদনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। বাকী রইল মুহাম্মদ ﷺ এর নবুওয়াতীর কথা। সুতরাং তাঁর নবুওয়াতী প্রমাণিত হওয়ার কারণ হল, তিনি নবুওয়াতের দাবী করেছেন এবং মুজিযা প্রকাশ করেছেন। তবে তাঁর নবুওয়াতের দাবী মুতাওয়াতিররূপে জানা গেছে। অবশ্য মুজিযা প্রকাশ পেয়েছে দুটি কারণে। **এক.** তিনি আল্লাহর কালাম পেশ করেছেন, এর দ্বারা চ্যালেঞ্জ করেছেন আরবের ভাষা পণ্ডিতদেরকে। অথচ তারা ছিল শীর্ষ ভাষাবিদ। (অর্থাৎ তার নযীর পেশ করতে তাবৎ সাহিত্যিককে ভাষা অলংকারে বিজ্ঞ পণ্ডিৎ হওয়া সত্ত্বেও চ্যালেঞ্জ করেছেন।) অতঃপর তারা প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কুরআনের ছোট্ট একটি সূরা দ্বারাও (রচনা করেও) তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অক্ষম হয়েছে। এমনকি তারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে ফেলে (শাঙ্কিত করে তোলে) এবং ভাষা ও কথাশিল্পে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছেড়ে তরবারী দ্বারা লড়াইয়ের উদ্দ্যেগ নেয়। অথচ অসংখ্য আবেদন থাকা সত্ত্বেও তাদের কারও থেকে এমন কালাম রচনার কথা বর্ণিত নেই, যা কুরআনের সাদৃশ হয়। অতএব এটি এ ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণ যে, কুরআন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। ফলে নবী কারীম ﷺ এর সত্যতার স্বভাবজাত জ্ঞান অর্জিত হয়ে গেল। যাতে কোন প্রকার যৌক্তিক সম্ভাবনা ক্ষতিকর নয়। যেমন, যাবতীয় স্বভাবিক জ্ঞানের অবস্থাও তা-ই।

দ্বিতীয়তঃ রাসূলে কারীম ﷺ থেকে একাধিক অলৌকিক বিষয় বর্ণিত আছে, যেগুলোর যৌথ বিষয়টি অর্থাৎ মুজিযার বহিঃপ্রকাশ তাওয়াতুরের পর্যায়ে পৌঁছেছে। যদিও তার বিস্তারিত অংশগুলো অর্থাৎ পৃথক পৃথকভাবে সেগুলো খবরে ওয়াহিদ। যেমন, হযরত আলী রাযি. এর বীরত্ব এবং হাতেম তাঈর দানশীলতা। এসব বিষয় সীরাত গ্রন্থাবলিতে উল্লেখ আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সর্বপ্রথম নবী কে ? এর প্রমাণ কি ?

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ. কে সর্বপ্রথম নবী আর হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে সর্বশেষ নবী ও রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন। হযরত আদম (আ.) এর নবুওয়াতের উপর ব্যাখ্যাতা প্রমাণ স্বরূপ বলেন– তাঁর নবুওয়াত কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। কুরআনে কারীমে তাঁকে আদেশ-নিষেধের জন্য সম্বোধন করা হয়েছে। আদেশের উদাহরণ, আল্লাহ পাকের বাণী يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ আর নিষেধের উদাহরণ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ। আর এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, তাঁর যুগে অপর কোন নবী-রাসূল ছিলেন না। কাজেই কোন নবীর মাধ্যমে তাঁর কাছে এ আদেশ-নিষেধ পৌঁছার সম্ভাবনা ভ্রান্ত। এতে প্রমাণিত হল, এ আদেশ-নিষেধ তাঁকে সরাসরি অহীর মাধ্যমে করা হয়েছে। এবং অহী নবুওয়াতের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং তাঁর নবুওয়াতী প্রমাণিত হল।

অহী নবুওয়াতের বৈশিষ্ট্য হয় কিভাবে ?

এর উপর আপত্তি উঠে যে, হযরত মূসা (আ.) এর মাতার কাছেও আল্লাহ তা'আলা অহী প্রেরণ করেছেন। তাতে আদেশ-নিষেধও রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي

অনুরূপভাবে হযরত মারইয়াম (আ.) কে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ অথচ গবেষক ও বিজ্ঞজনেরা নারী জাতির নবুওয়াতীকে অস্বীকার করেছেন।

জবাব ঃ (ক) সাধারণ অহী নবুওয়াতের বৈশিষ্ট্য নয় বরং যে অহী প্রচারের জন্য, তা হবে নবুওয়াতর বৈশিষ্ট্য ও নবুওয়াতকে আবশ্যককারী। সুতরাং হযরত আদম (আ.) এর অহী ছিল হযরত হাওয়া (আ.) এর কাছে প্রচারের জন্য। বিধায় তিনি ছিলেন নবী। আর হযরত মূসা (আ.) এর মাতা এবং হযরত মারইয়াম (আ.) এর কাছে অবতীর্ন অহী প্রচারের জন্য ছিল না। বিধায় তাঁদের অহী তাঁদের নবুওয়াতকে আবশ্যক করে না। **(খ)** দ্বিতীয় প্রমাণ হাদীস শরীফ। সুতরাং মসনাদে আহমদে হযরত আবু যর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন– আমি রাসূলে কারীম ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম, সর্বপ্রথম নবী কে? তিনি বললেন– আদম (আ.)। পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করলাম– তিনি কি নবী ছিলেন ? তখন তিনি বললেন– نَعَمْ نَبِيٌّ مُكَلَّمٌ হাঁ, তিনি নবী ছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলা তার সাথে কথাবার্তা বলেছেন। অর্থাৎ তাঁর উপর সহীফা আকারে আল্লাহর কালাম অবতীর্ণ হয়েছে।(গ) তৃতীয়তঃ তাঁর নবুওয়াতের উপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইজমা রয়েছে।

মুহাম্মদ ﷺ এর নবুওয়াতীর প্রমাণ

মুহাম্মদ ﷺ এর নবুয়াতের প্রমাণ হল, তিনি নবী হওয়ার (নবুওয়াতীর) দাবী করেছেন। একথা মুতাওয়াতিররূপে জানা গেছে। তিনি নবুওয়তের প্রমাণস্বরূপ মুজিযা প্রকাশ করেছেন। আর যিনি নবুওয়াতের দাবী করেন এবং নবুয়তের প্রমাণ তথা মুযিজা প্রকাশ করেন, তিনি নবী। কাজেই মুহাম্মদ ﷺ নবী।

এ প্রমাণের দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ মুজিযা প্রকাশ করা দুটি দলীল দ্বারা প্রমাণিত।

(১) তিনি একটি কালাম (কুরআন) পেশ করেছেন এবং দাবী করেছেন– এটি আল্লাহর কাল্লাম; আমার উপর অবতীর্ণ হয়। এ কালাম আল্লাহর হওয়ার ব্যাপারে তোমাদের যদি সংশয়-সন্দেহ জাগে; আর তোমরা মনে কর, আমি উম্মী (নিরক্ষর) হওয়া সত্ত্বেও এ কালাম স্বয়ং বানিয়ে নিয়েছি, তাহলে তোমরা এ কুরআনের ছোট্ট একটি সূরার মত কালাম বানিয়ে দেখাতে পার। তোমরা ভাষা অলংকারে বিজ্ঞ পণ্ডিৎ হওয়া সত্ত্বেও যদি তদনুরূপ কিছু বানাতে না পার, তাহলে নিশ্চিত জেনে নিও– একালাম মানুষের হতে পরে না বরং আল্লাহর কালাম। সুতরাং তারা শত সহস্র চেষ্টা চালানোর পরও কুরআনের ছোট্ট একটি সূরার মত কিছু রচনা করতে অক্ষম হয়েছে। ফলে কুরআনে কারীম মুজিযা এবং নবীজীর সে মুজিযা প্রকাশ করা প্রমাণিত হয়ে গেল।

(২) তাছাড়া রাসূলে কারীম ﷺ থেকে প্রকাশিত অলৌকিক বিষয় অসংখ্য-অগণিত। সেগুলোর যৌথ বিষয় (মুজিযা প্রকাশ পাওয়া) মুতাওয়াতিরের সীমায় পৌঁছেছে। অবশ্য ঘটনাগুলো পৃথকভাবে খবরে ওয়াহিদের পর্যায়ভুক্ত। যেমন, গাছ-পাথর কর্তৃক রাসূলে কারীম ﷺ কে সালাম করা, তাঁর কাছে জীব-জন্তুর অভিযোগ, তাঁর বরকতে সামান্য খাবারও বিশাল এক দলের পরিতৃপ্তী সহকারে খাওয়া, আঙ্গুলি মোবারক থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া এবং শত-সহস্র লোকের পিপাসা নিবারণ হওয়া ইত্যাদি; যেমন, হযরত আলী রাযি. এর বীরত্ব এবং হাতেম তাঈর দানশীলতার ঘটনাগুলোর প্রতিটিই পৃথকভাবে খবরে ওয়াহিদ। কিন্তু তাদের ঘটনাবলির যৌথ বিষয় অর্থাৎ প্রতিটি ঘটনা বীরত্ব ও দানশীলতার প্রতীক বা প্রমাণ হওয়া মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌঁছে।

وَقَدْ يَسْتَدِلُّ اَرْبَابُ الْبَصَائِرِ عَلٰى نُبُوَّتِهٖ بِوَجْهَيْنِ ـ اَحَدُهُمَا مَا تَوَاتَرَ مِنْ اَحْوَالِهٖ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَحَالَ الدَّعْوَةِ وَبَعْدَ تَمَامِهَا وَاَخْلَاقِهِ الْعَظِيْمَةِ وَاَحْكَامِهِ الْحِكَمِيَّةِ وَاِقْدَامِهٖ حَيْثُ تُحْجِمُ الْاَبْطَالُ وَوُثُوْقِهٖ بِعِصْمَةِ اللّٰهِ فِىْ جَمِيْعِ الْاَحْوَالِ وَثَبَاتِهٖ عَلٰى حَالِهٖ لَدَى الْاَهْوَالِ بِحَيْثُ لَمْ تَجِدْ اَعْدَاءُهٗ مَعَ شِدَّةِ عَدَاوَتِهِمْ وَحِرْصِهِمْ عَلَى الطَّعْنِ فِيْهِ مَطْعَنًا وَلَا اِلَى الْقَدْحِ فِيْهِ سَبِيْلًا فَاِنَّ الْعَقْلَ يَجْزِمُ بِامْتِنَاعِ اجْتِمَاعِ هٰذِهِ الْاُمُوْرِ فِىْ غَيْرِ الْاَنْبِيَاءِ وَاَنْ يَّجْمَعَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَثَانِيْهِمَا اَنَّهٗ ادَّعٰى ذَالِكَ الْاَمْرَ الْعَظِيْمَ بَيْنَ اَظْهُرِ قَوْمٍ لَاكِتَابَ لَهُمْ وَلَا حِكْمَةً مَعَهُمْ ـ وَبَيَّنَ لَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُمُ الْاَحْكَامَ وَالشَّرَائِعَ ـ وَاَتَمَّ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ ـ وَاَكْمَلَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فِى الْفَضَائِلِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ ـ وَنَوَّرَ الْعَالَمَ بِالْاِيْمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ ـ وَاَظْهَرَ اللّٰهُ دِيْنَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ كَمَا وَعَدَهٗ وَلَا مَعْنٰى لِلنُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ سِوٰى ذَالِكَ ـ

সহজ তরজমা

অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন প্রবীন ব্যক্তিবর্গ তাঁর (হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর) নবুওয়াতের পক্ষে দুভাবে প্রমাণ পেশ করেন। এক. তাঁর সেসব অবস্থা, যেগুলো তাওয়াতুর (সর্বযুগে বহুসংখ্যক নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনা) দ্বারা প্রমাণিত। নবুওয়াতের পূর্বে এবং নবুওয়াতের পরে, দাওয়াত ও তাবলীগের সময় এবং তার পূর্ণতা লাভের পর, তাঁর উন্নত চরিত্র মাধুরী ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধি-বিধান। এমন স্থানে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা রাখা, যেখানে বড় বড় বীর-বিক্রম পিছপাও পর্যুদস্ত হয়ে যায়, সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের তত্ত্বাবধায়ন ও হেফাযতে আল্লাহর ভরসা রাখা, যাবতীয় সমস্যা-সংকটে নিজ অবস্থায় তার দৃঢ়তা, (সবই) এমনভাবে যে, তাঁর কট্টর শত্রুরা তাঁর সাথে চরম শত্রুতা এবং তাকে ভর্ৎসনা করার জন্য লালায়িত থাকা সত্ত্বেও তাকে তিরস্কারের কোনও সুযোগ পায়নি, না পেয়েছে তার কুৎসা রটনানোর কোন পথ। (এসবই তাঁর নবুওয়াতের নিদর্শন।) কেননা নবী ব্যতীত অপর কারও মধ্যে একত্রে এসবের সমাহার এবং আল্লাহ তা'আলা এসব বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা এমন ব্যক্তির মধ্যে জমা করবেন, যার সম্পকে, তিনি জানেন– সে (আল্লাহর রাসূল হওয়ার দাবী করে) তার (আল্লাহর) বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করছে। তারপরও তাঁকে তেইশ বছর অবকাশ দিবেন। আবার তাঁর ধর্মকে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করবেন, তাঁর শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করবেন এবং তাঁর সমূহ নিদর্শন ও বিধান তাঁর ইন্তিকালের পরও কিয়ামত অবধি সজীব (বলবৎ) রাখবেন– এসবের অসম্ভাব্যতায় বিবেক দৃঢ় বিশ্বাসী। আর দ্বিতীয় প্রমাণ হল, তিনি ঐ সুমহান মর্যাদা তথা নবুওয়াতের দাবী করেছেন এমন সম্প্রদায়ের মাঝে, যাদের কাছে আসমানী কোন কিতাব (ইতোপূর্বে) ছিল না; না ছিল তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি। তাদের কাছে তিনি কিতাব ও হিকমত (এর কথা) বর্ণনা করেছেন। তাদেরকে হুকুম-আহকাম ও শরী'আতের জ্ঞান শিখিয়েছেন। উন্নত চরিত্র-মাধুরীর পূর্ণতা দান করেছেন। অসংখ্য ব্যক্তিকে ইল্‌ম-আমলের গুণাবলিতে কামেল (পূর্ণাঙ্গ) বানিয়েছেন। পৃথিবীকে ঈমান ও নেক আমলের দ্বারা নূরান্বিত (আলোকাজ্জল) করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীনকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেছেন। যেরূপ তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আর নবুওয়াত ও রিসালাতের এছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মুহাম্মদ ﷺ এর নবুওয়াতী দুভাবে প্রমাণিত

প্রথম প্রমাণ রাসূলে কারীম ﷺ -এর কামিল (সুযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গ) হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে। দ্বিতীয় প্রমাণ মুকাম্মিল (ইসমে ফায়েলের সীগা) অর্থাৎ অন্যকে পরিপূর্ণতা দানকারী হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে। কেননা একই ব্যক্তির মাঝে এতগুলো গুণের সমাবেশ ঘটা এবং সেগুলোর বিপরীত ত্রুটিগুলো আকস্মিকভাবেও তাঁর ধারেরকাছে

না আসা রীতিমত অলৌকিক ব্যাপার। অনুরূপভাবে অল্প সময়ের ব্যবধানে একটি মুর্খ, বর্বর ও দুরাচারী জাতিকে ইল্ম-আমলে সুসজ্জিত করা এবং ইলম-আমলের গুণাবলিতে আদর্শবান বানিয়ে দেওয়াও অলৌকিক কাণ্ড। যার দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে গোটা দুনিয়া অক্ষম।

وَاِذَا ثَبَتَتْ نُبُوَّتُهٗ وَقَدْ دَلَّ كَلَامُهٗ وَكَلَامُ اللّٰهِ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ عَلٰى اَنَّهٗ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَاَنَّهٗ مَبْعُوْثٌ اِلٰى كَافَّةِ النَّاسِ بَلْ اِلَى الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ثَبَتَ اَنَّهٗ اٰخِرُ الْاَنْبِيَاءِ وَاَنَّ نُبُوَّتَهٗ لَا تَخْتَصُّ بِالْعَرَبِ كَمَا زَعَمَ بَعْضُ النَّصَارٰى ـ فَاِنْ قِيْلَ قَدْ وَرَدَ فِى الْحَدِيْثِ نُزُوْلُ عِيْسٰى بَعْدَهٗ قُلْنَا نَعَمْ لٰكِنَّهٗ يُتَابِعُ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ السَّلَامُ لِاَنَّ شَرِيْعَتَهٗ قَدْ نُسِخَتْ فَلَا يَكُوْنُ اِلَيْهِ وَحْىٌ وَنَصْبُ الْاَحْكَامِ بَلْ يَكُوْنُ خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلٰمُ ثُمَّ الْاَصَحُّ اَنَّهٗ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ وَيَؤُمُّهُمْ وَيَقْتَدِىْ بِهِ الْمَهْدِىُّ لِاَنَّهٗ اَفْضَلُ فَاِمَامَتُهٗ اَوْلٰى ـ

সহজ তরজমা

যখন তাঁর নবুওয়াতী প্রমাণিত হয়ে গেল এবং স্বয়ং তাঁর বাণী ও তাঁর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর কালাম নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, তিনি আখেরী নবী। তিনি গোটা মানব জাতি বরং জ্বিন-মানব উভয়ের প্রতি প্রেরিত। অতএব বুঝা গেল, তিনি সর্বশেষ নবী; তাঁর নবুওয়াত আরববাসীদের সাথে খাছ নয়। কোন কোন খ্রিস্টান যেমনটি মনে করেছে। সুতরাং যদি প্রশ্ন করা হয়, হাদীস শরীফে তো হযরত ঈসা (আ.) এর আকাশ থেকে পুনরায় অবতরণের কথা বর্ণিত হয়েছে। আমরা জবাব দেব– হ্যাঁ (তা তো বটেই।) তবে তিনি হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর অনুসরণ করবেন। কেননা তার শরী'আত রহিত হয়ে গেছে। বিধায় তার কাছে অহী অবতীর্ণ হবে না; তিনি আহকামও নির্ধারণ করবেন না বরং তিনি আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর খলীফা ও প্রতিনিধি হবেন। তারপর অধিকতর বিশুদ্ধ কথা হল, তিনি লোকদেরকে নামায পড়াবেন, তাদের ইমামত করবেন। ইমাম মাহ্দী (আ.) তাঁর অনুসরণ করবেন। কেননা তিনি শ্রেষ্ঠ বিধায় তার ইমামতিই হবে উত্তম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মুহাম্মদ ﷺ সর্বশেষ নবী

খতমে নবুওয়াতের মাসআলা অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর উপর নবুওয়াত ও অহী অবতরণের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়ে যাওয়া এবং তার আখেরী নবী হওয়া, কুরআন হাদীস ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত। তাঁর পরে আর কোনও নবী জন্ম নেবেন না। খতমে নবুওয়াত প্রসঙ্গে কুরআনে কারীমের প্রমাণ থেকে একটি হল, আল্লাহর বাণী–

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ ـ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

"মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের মধ্য হতে কোন পুরুষের পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।" সূরা আহযাব – ৪০

আর হাদীস শরীফের মধ্যে রাসূলে কারীম ﷺ এর সে বাণী, যা ইমাম আবু দাউদ রহ. ও ইমাম তিরমিযী রহ. হযরত সাওবান রাযি. থেকে রিওয়ায়েত করেছেন। হাদীসের ভাষ্য নিম্নরূপ।

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهٗ نَبِىٌّ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَانَبِىَّ بَعْدِىْ ـ

"ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না অনেক দাজ্জাল মিথ্যাবাদীর আগমন ঘটবে, যাদের প্রত্যেকেই দাবী করবে– সে নবী। অথচ আমিই সর্বশেষ নবী; আমার পরে আর কোন নবী আসবে না।"

তাহলে ঈসা আ. এর শুভাগমন হবে কিভাবে ?

বাকী রইল হযরত ঈসা (আ.) নিজ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় শেষযুগে আকাশ থেকে অবতরণ করার কথা। সুতরাং তা খতমে নবুওয়াতের পরিপন্থী নয়। কেননা নবী কারীম ﷺ সর্বশেষ নবী হওয়ার মর্ম হল,

তাঁর পরে কোন নবী-রাসূল জন্ম গ্রহণ করবেন না। তার পরে কাউকে নবুওয়াত বা রিসালত দেওয়া হবে না। আর হযরত ঈসা (আ.) আমাদের নবী ﷺ এর পূর্বেই জন্মগ্রহণ করেছেন এবং নবুওয়াতের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন। তিনি পূর্ব মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকাবস্থায়ই শেষযুগে পুনরায় আগমন করবেন। তবে নবী হিসেবে নয়, খলীফা হিসেবে। কাজেই তাঁর পুনঃআগমন মুহাম্মদ ﷺ শেষ নবী হওয়ার ক্ষেত্রে আদৌ প্রতিবন্ধক নয়।

মাহ্দী আ. ও ঈসা আ. এর ইমামতি

قَوْلُهُ : ثُمَّ الْاَصَحُّ اَنَّهُ يُصَلِّى بِالنَّاسِ الخ ঃ "নিবরাস" গ্রন্থকার উপরিউক্ত জবাব ও প্রমাণের উপর আপত্তি করেছেন। কেননা এ ধরনের বিষয়গুলোতে নকলী দলীল আবশ্যক। অথচ নকলী দলীল এর বিপরীত বুঝায়। যেমন, মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আ.) যখন অবতরণ করবেন, তখন উম্মতের আমীর তাঁকে বলবেন– আপনি আসুন! আমাদেরকে নামায পড়ান। তখন ঈসা (আ.) তা প্রত্যাখ্যান করে বলবেন– তোমরা একে অন্যের আমীর। আর তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এ উম্মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

অনুরূপভাবে ইমাম দারাকুতনী রহ. হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন– হে আব্বাস রাযি. ! আল্লাহ তা'আলা (দ্বীনের) এ কাজ আমার দ্বারা সূচনা করেছেন। আর সর্বশেষ এ কাজটি আপনার সন্তানদের মধ্য থেকে এমন এক সন্তান দ্বারা করাবেন, যিনি পৃথিবীকে ন্যায়-নিষ্ঠা ও ইনসাফ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন। তিনিই হবেন সে ব্যক্তি, যিনি হযরত ঈসা (আ.) কে নামায পড়াবেন।

وَقَدْ رُوِىَ بَيَانُ عَدَدِهِمْ فِىْ بَعْضِ الْاَحَادِيْثِ عَلٰى مَارُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ عَدَدِ الْاَنْبِيَاءِ فَقَالَ مِأَةُ اَلْفٍ وَاَرْبَعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ اَلْفًا وَ فِىْ رِوَايَةٍ مِأَتَا اَلْفٍ وَاَرْبَعٌ وَّعِشْرُوْنَ اَلْفًا وَالْاَوْلٰى اَنْ لَايُقْتَصَرَ عَلٰى عَدَدٍ فِى التَّسْمِيَةِ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَلَايُؤْمَنُ فِىْ ذِكْرِ الْعَدَدِ اَنْ يَدْخُلَ فِيْهِمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ اِنْ ذُكِرَ عَدَدٌ اَكْثَرُ مِنْ عَدَدِهِمْ اَوْ يَخْرُجَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِيْهِمْ اِنْ ذُكِرَ اَقَلُّ مِنْ عَدَدِهِمْ يَعْنِىْ اَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ عَلٰى تَقْدِيْرِ اِشْتِمَالِهِ عَلٰى جَمِيْعِ الشَّرَائِطِ الْمَذْكُوْرَةِ فِىْ اُصُوْلِ الْفِقْهِ لَا يُفِيْدُ اِلَّا الظَّنَّ ـ وَلَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ فِىْ بَابِ الْاِعْتِقَادِيَّاتِ خُصُوْصًا اِذَا اشْتَمَلَ عَلٰى اِخْتِلَافِ رِوَايَةٍ وَكَانَ الْقَوْلُ بِمُوْجِبِهِ مِمَّا يُفْضِىْ اِلٰى مُخَالَفَةِ ظَاهِرِ الْكِتَابِ وَهُوَ اَنَّ بَعْضَ الْاَنْبِيَاءِ لَمْ يُذْكَرْ لِلنَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَحْتَمِلُ مُخَالَفَةَ الْوَاقِعِ وَهُوَ عَدُّ النَّبِىِّ مِنْ غَيْرِ الْاَنْبِيَاءِ اَوْ غَيْرِ النَّبِىِّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ بِنَاءً عَلٰى اَنَّ اِسْمَ الْعَدَدِ اِسْمٌ خَاصٌّ فِىْ مَدْلُوْلِهِ لَايَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ ـ

সহজ তরজমা

কোন কোন হাদীসে নবীগণের সংখ্যার বিবরণ রয়েছে। যেমন, বর্ণিত আছেঃ নবী কারীম ﷺ এর নিকট নবীগণের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন– এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। আরেক বর্ণনায় আছে, দু' লক্ষ চব্বিশ হাজার। অবশ্য বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন সংখ্যার উপর নির্ভর না করাই শ্রেয়। কেননা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আমি আপনার কাছে কিছু সংখ্যক নবীর কথা বর্ণনা করেছি আর কিছু সংখ্যক নবীর কথা বর্ণনা করিনি। সংখ্যা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে যদি বাস্তাবিকই তাদের প্রকৃত সংখ্যা হতে অধিক উল্লেখ করা হয়, তবে তাদের মধ্যে এমন লোকও শামিল হয়ে যাবে। যিনি তাদের (নবীগণের) অন্তর্ভুক্ত নন অথবা আর যদি তাদের সংখ্যা বাস্তবিকই কমিয়ে বলা হয় তবে এমন লোকও তাদের থেকে বাদ পড়বেন, যিনি প্রকৃতপক্ষে তাদের (নবীদের) অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ খবরে ওয়াহিদ উসূলে ফিকহে বর্ণিত যাবতীয় শর্তাবলীর মোয়াফিক হওয়ার সূরতেও ধারণা

জ্ঞানের ফায়দা দেয়। আর আকীদা বা আন্তরিক বিশ্বাস সংক্রান্ত ব্যাপারে ধারণা জ্ঞানের ধর্তব্য নেই। বিষেশতঃ রিওয়ায়েত যখন বিভিন্ন রকম হয় এবং তার অনুগামী উক্তি প্রকাশ্য কিতাবুল্লাহর বিরোধিতার কারণ হয়। আর তা হল, কিছু সংখ্যাক নবীর কথা রাসূলে কারীম ﷺ এর নিকট বর্ণনা করা হয় নি। আবার বাস্তব বহির্ভূত হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে। তার মানে নবীকে নবী নয় কিংবা নবী নয় ব্যক্তিকে নবী গণ্য করা। কেননা সংখ্যাবাচক শব্দ (ইসমে আদদ) নিজ অর্থে সুনির্দিষ্ট; কমবেশীর সম্ভাবনা রাখে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

নবীগণের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা বর্ণনা করা অনুচিৎ

উপরিউক্ত আলোচনার সারকথা হল, নবীগণের সুনির্দিষ্ট কোন সংখ্যা উল্লেখ না করা উচিৎ। কেননা সংখ্যা প্রমাণিত হয়েছে খবরে ওয়াহিদ দ্বারা, যা ধারণা জ্ঞানের ফায়দা। অথচ আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ে ধারণা জ্ঞান যথেষ্ট নয় বরং নিশ্চিত জ্ঞান উদ্দেশ্য। অধিকন্তু নবীগণের সংখ্যা সংশ্লিষ্ট খবরে ওয়াহেদগুলো মতবিরোধ পূর্ণ। এক বর্ণনায় নবীগণের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার আরেক বর্ণনায় দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার উল্লেখ আছে। তাছাড়া নবীগণের প্রকৃত সংখ্যা হতে বাস্তবিকই কম উল্লেখ করা হলে বহু নবী (আ.) গাইরে নবী হওয়া বা নবীগণের সংখ্যা থেকে বাদ পড়া আবশ্যক হবে। আর বাস্তবিকই বেশী উল্লেখ করলে অনেক গাইরে নবী অর্থাৎ নবী নয় এমন ব্যক্তির নবী হিসেবে গণ্য হওয়া আবশ্যক হবে। তদ্রুপ কোন সুনির্দিষ্ট সংখ্যা বর্ণনা করা প্রকাশ্য কিতাবুল্লাহ বিরোধীও বটে। কেননা কিতাবুল্লাহে রয়েছে– مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ অর্থাৎ কিছু সংখ্যক নবীদের কথা আপনার কাছে বলিনি।

وَكُلُّهُمْ كَانُوا مُخْبِرِيْنَ مُبَلِّغِيْنَ عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰى . لِاَنَّ هٰذَا مَعْنَى النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ صَادِقِيْنَ نَاصِحِيْنَ لِلْخَلْقِ لِئَلَّا تَبْطُلَ فَائِدَةُ الْبِعْثَةِ وَالرِّسَالَةِ . وَفِىْ هٰذَا اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّ الْاَنْبِيَاءَ مَعْصُوْمُوْنَ عَنِ الْكَذِبِ خُصُوْصًا فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِاَمْرِ الشَّرَائِعِ وَتَبْلِيْغِ الْاَحْكَامِ وَاِرْشَادِ الْاُمَّةِ . اَمَّا عَمْدًا فَبِالْاِجْمَاعِ . وَاَمَّا سَهْوًا فَعِنْدَ الْاَكْثَرِيْنَ . وَفِىْ عِصْمَتِهِمْ عَنْ سَائِرِ الذُّنُوْبِ تَفْصِيْلٌ . وَهُوَ اَنَّهُمْ مَعْصُوْمُوْنَ عَنِ الْكُفْرِ قَبْلَ الْوَحْىِ وَبَعْدَهُ بِالْاِجْمَاعِ وَكَذَا عَنْ تَعَمُّدِ الْكَبَائِرِ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ خِلَافًا لِلْحَشْوِيَّةِ . وَاِنَّمَا الْخِلَافُ فِىْ اَنَّ اِمْتِنَاعَهُ بِدَلِيْلِ السَّمْعِ اَوِ الْعَقْلِ .

وَاَمَّا سَهْوًا فَجَوَّزَهُ الْاَكْثَرُوْنَ . اَمَّا الصَّغَائِرُ فَيَجُوْزُ عَمْدًا عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ خِلَافًا لِلْجُبَّائِىْ وَاَتْبَاعِهِ . وَيَجُوْزُ سَهْوًا بِالْاِتِّفَاقِ اِلَّا مَا يَدُلُّ عَلَى الْخِسَّةِ كَسَرِقَةِ لُقْمَةٍ وَالتَّطْفِيْفِ بِحَبَّةٍ لٰكِنَّ الْمُحَقِّقِيْنَ اشْتَرَطُوْا اَنْ يُّنَبَّهُوْا عَلَيْهِ فَيَنْتَهُوْا عَنْهُ هٰذَا كُلُّهُ بَعْدَ الْوَحْىِ .

وَاَمَّا قَبْلَهُ فَلَا دَلِيْلَ عَلٰى اِمْتِنَاعِ صُدُوْرِ الْكَبِيْرَةِ . وَذَهَبَتِ الْمُعْتَزِلَةُ اِلٰى اِمْتِنَاعِهَا لِاَنَّهَا تُوْجِبُ النَّفْرَةَ الْمَانِعَةَ عَنْ اِتِّبَاعِهِمْ فَتَفُوْتُ مَصْلَحَةُ الْبِعْثَةِ . وَالْحَقُّ مَنْعُ مَا يُوْجِبُ النَّفْرَةَ كَعُهْرِ الْاُمَّهَاتِ وَالْفُجُوْرِ وَالصَّغَائِرِ الدَّالَّةِ عَلَى الْخِسَّةِ . وَمَنَعَتِ الشِّيْعَةُ صُدُوْرَ الصَّغِيْرَةِ وَالْكَبِيْرَةِ قَبْلَ الْوَحْىِ وَبَعْدَهُ . لٰكِنَّهُمْ جَوَّزُوْا اِظْهَارَ الْكُفْرِ

تَقِيَّةً إِذَا تَقَرَّرَ هٰذَا فَمَا نُقِلَ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مِمَّا يُشْعِرُ بِكَذِبٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ فَمَا كَانَ مَنْقُوْلًا بِطَرِيْقِ الْآحَادِ فَمَرْدُوْدٌ ـ وَمَا كَانَ بِطَرِيْقِ التَّوَاتُرِ فَمَصْرُوْفٌ عَنْ ظَاهِرِهٖ إِنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَمَحْمُوْلٌ عَلٰى تَرْكِ الْأَوْلٰى أَوْ كَوْنِهٖ قَبْلَ الْبِعْثَةِ ـ وَتَفْصِيْلُ ذٰلِكَ فِى الْكُتُبِ الْمَبْسُوْطَةِ

সহজ তরজমা

সকল নবী (আলাই.) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বার্তাবাহক ও প্রচারক ছিলেন। কেননা নবুওয়াত ও রিসালাতের মর্ম তা-ই। তারা ছিলেন সত্যবাদী, সৃষ্টিজীবের কল্যাণকামী উপদেশ দাতা। যাতে রিসালাত ও নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যাহত না হয়। এতে ইংগিত করা হয়েছে যে, নবীগণ মিথ্যা থেকে পবিত্র, বিষেশতঃ সেসব বিষয়ে যেগুলো শরী'আত, হুকুম-আহকাম প্রচার ও উম্মতের পথপ্রদর্শনের সাথে সংশ্লিষ্ট। ইচ্ছাকৃত মিথ্যা থেকে সর্বসম্মতভাবে পবিত্র এবং ভুলবশতঃ মিথ্যা থেকে পবিত্র সংখ্যাগরিষ্টের মতে। আর অন্যান্য গুনাহ থেকে তাদের পবিত্র থাকার ব্যাপারে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। সে ব্যাখ্যা হল, তারা সর্বসম্মতভাবে কুফর থেকে পবিত্র। অহী প্রাপ্তির পূর্বেও এবং পরেও। অনুরূপভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে ইচ্ছাকৃতভাবে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকেও পবিত্র। হাশবিয়া গোষ্ঠির অভিমত এর বিপরীত। তবে মতভেদ শুধু ইচ্ছাকৃতভাবে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার অসম্ভাব্যতা (অর্থাৎ কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকা) নকলী প্রমাণ দ্বারা নাকি যৌক্তিক প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত –এ নিয়ে। রইল ভুলবশতঃ (কবীরা গুনাহ প্রকাশ পাওয়ার কথা)। সুতরাং অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এটিকে জায়েয ও সম্ভব বলেছেন। রইল সগীরা গুনাহ। তা ইচ্ছাকৃতভাবে (জমহূরের মতে) জায়েয। জুব্বাই ও তার অনুসারীরা এর পরিপন্থী। আর ভুলবশতঃ (সগীরা গুনাহ প্রকাশ পাওয়া) সর্বসম্মতভাবে জায়েয। অবশ্য এমন সগীরা ব্যতীত, যেগুলো নীচুতা ও হেয়তার পরিচায়ক। যেমন, এক লোকমা চুরি করা; এক শষ্য পরিমাণ ওজনে কম দেওয়া (প্রভৃতি)। কিন্তু অভিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম শর্তারোপ করে বলেন– এ ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করতে হবে। যাতে তাঁরা তা থেকে বিরত থাকে। এসব ব্যাখ্যা (মতভেদ) অহী অবতীর্ণ হওয়ার পর। কিন্তু অহী অবতরণের পূর্বে কবীরা প্রকাশ না পাওয়ার পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। আর মুতাযিলারা অহী অবতরণের পূর্বেও তাদের থেকে কবীরা প্রকাশ না পাওয়ার পক্ষাবলম্বন করেছেন। কেননা কবীরা গুনাহ ঘৃণা সৃষ্টি করবে। যা লোকজন তাদের অনুসরণ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে। ফলে নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। সঠিক কথা হল, এমন কবীরা গুনাহ অসম্ভব, যা ঘৃণার জন্ম দেয়। যেমন, মায়ের সাথে যিনা করা এবং অপকর্ম ও নীচুতার পরিচায়ক সগীরা গুনাহ।

শী'আরা অহী অবতরণের পূর্বে এবং পরেও (নবীদের থেকে) সগীরা ও কবীরা গুনাহ প্রকাশ পাওয়াকে অস্বীকার করেছে। অবশ্য তাকিয়্যার উদ্দেশ্য কুফরী প্রকাশ পাওয়াকেও জায়েয সাব্যস্ত করেছে।

যখন এ ব্যাখ্যা (মতভেদ) বিবৃত হয়ে গেল, তখন নবীদের থেকে বর্ণিত যেসব কথা মিথ্যা ও গুনাহ বুঝায়, তা যদি খবরে ওয়াহিদ দ্বারা বর্ণিত হয়ে থাকে, তাহলে প্রত্যাখ্যাত। আর যদি মুতাওয়াতিররূপে বর্ণিত হয়ে থাকে, তাহলে সম্ভব হলে এর প্রকাশ্য অর্থ বর্জন করে একে ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করতে হবে। নতুবা উত্তম বর্জনের উপর অথবা নবুওয়াত লাভের পূর্বের কাজ বলে ধরতে হবে। আর এর বিশদ বিবরণ বড় বড় কিতাবাদিতে রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

নবী-রাসূলগণ কি করতে?

নবী-রাসূলগণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সংবাদ দিতেন। বান্দার কাছে আহকাম পৌছাতেন। কেননা সংবাদ পৌছানো এবং প্রচার করাই নবুওয়াত ও রিসালাতের অর্থ। সুতরাং শাব্দিক অর্থে নবী ঐ ব্যক্তি, যিনি সংবাদ দাতা, বার্তাবাহক। আর রাসূল ঐ ব্যক্তি, যিনি একজনের কথা অন্যের কাছে পৌছান।

قَوْلُهٗ: وَفِىْ هٰذَا اِشَارَةٌ ..الخ ঃ অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরামকে সত্যবাদী বলার মধ্যে ইংগিত করা হয়েছে যে, নবীগণ মিথ্যার প্রচার বা দ্বীন প্রচারে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া থেকে পবিত্র। ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলা থেকে তো

সর্বসম্মতভাবে পবিত্র। আর ভুলবশতঃ মিথ্যা বলা থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুতাকাল্লিমীনের মতে পবিত্র। কাযী আয়ায মালেকী ব্যাপক আকারে নবীগণ মিথ্যা থেকে নিষ্পাপ হওয়ার মতকে প্রধান্য দিয়েছেন। চাই তাবলীগেই হোক কিংবা অন্যান্য দুনিয়াবী বিষয়েই হোক এবং ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলবশতঃ হোক। এ ব্যাপারে তিনি সালফে সালেহীনের ইজমা রয়েছে বলে দাবী করেছেন। কেননা যে মিথ্যুক সনাক্ত হবে বা যার মিথ্যাবদীতা পরিস্কার হয়ে যাবে, তার কথায় মানুষের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় মানুষ তার অনুসরণ করবে না। অথচ তা নবুওয়াত ও রিসালাতের হিকমত পরিপন্থী।

আর মিথ্যা ছাড়া অন্যান্য গুনাহ থেকে আম্বিয়ায়ে কিরাম নিষ্পাপ হওয়ার ব্যাপারে ব্যাখ্যা হচ্ছে, কুফর থেকে তো নবুওয়াত লাভের পূর্বে এবং পরে উভয় অবস্থায় সর্বসম্মতভাবে নিষ্পাপ। আর কুফর ছাড়া অন্যান্য গুনাহের ব্যাপারে কথা হল, নবুওয়াত লাভের পর ইচ্ছাকৃতভাবে কবীরা গুনাহ প্রকাশ পাওয়া থেকে হাশবিয়া ব্যতীত মুতাযিলাসহ সকল মুতাকাল্লিমীনের মতে নিষ্পাপ। তবে মতভেদ হল, ইচ্ছাকৃতভাবে কবীরা গুনাহ প্রকাশ না পাওয়ার কথা নকলী দলীল দ্বারা নাকি যৌক্তিক দলীল দ্বারা প্রমাণিত? অধিকাংশ আশ'আরীর মতে তাবলীগে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া থেকে পবিত্র ও নিষ্পাপ হওয়ার কথা তো যৌক্তিক দলীলের আলোকে জানা যায়। আর যৌক্তিক দলীল হল, মুজিযা। তবে মিথ্যা ছাড়া অন্যান্য গুনাহ থেকে নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি যৌক্তিক দলীল দ্বারা নয় বরং একাধিক নছ ও ইজমা দ্বারা পরিজ্ঞাত।

কোন কোন আশ'আরী এবং অধিকাংশ মুতাযিলীর মতে ইচ্ছাকৃতভাবে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে নবীগণ নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি যৌক্তিক দলীল দ্বারা জানা গেছে। সে যৌক্তিক দলীল হল, ইচ্ছাকৃতভাবে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া তাদের প্রতি জনমনে ঘৃণা সষ্টি করবে। ফলে লোকজন এ নবীর অনুসরণ থেকে বিরত থাকবে। অথচ তা রাসূল প্রেরণের হিকমত পরিপন্থী কথা।

রইল নবুওয়াত প্রাপ্তির পর ভুলবশতঃ কিংবা خطاء اجتهادى তথা ইজতেহাদী ভ্রান্তির ভিত্তিতে কবীরা গুনাহ প্রকাশ পাওয়ার কথা। সুতরাং অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে এটি জায়েয এবং সম্ভব। কিন্তু কাযী আয়ায রহ. "ইচ্ছাকৃতভাবে ও ভুলবশতঃ" এর শর্ত ব্যতীত কবীরা গুনাহ থেকে আম্বিয়ায়ে কিরামের পবিত্রতার ব্যাপারে ইজমা নকল করেছেন।

উপরিউক্ত ব্যাখ্যা ছিল, নবুওয়াত প্রাপ্তির পর ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা ভুলবশতঃ কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে নবীগণের পবিত্রতা ও নিষ্কলূষতা প্রসঙ্গে। নিম্নে নবুওয়াত প্রাপ্তির পর সগীরা গুনাহ থেকে তাদের পবিত্রতা ও নিষ্কলূষতা সংক্রান্ত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হল।

নবুওয়াতের পর সগীরা গুনাহের বহিঃপ্রকাশ

এখানে ব্যাখ্যাতা আল্লামা তাফতাযানী রহ. 'মাওয়াকিফ' গ্রন্থকারের অনুসরণ করে আম্বিয়ায়ে কিরাম থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে সগীরা গুনাহ প্রকাশ পাওয়াকে জায়েয সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তিনি স্বরচিত অপর কিতাব 'তাহযীব', 'শরহে মাকাসিদ' প্রভৃতিতে নাজায়েয হওয়াকে পছন্দনীয় ও উত্তম সাব্যস্ত করেছেন। "মাওয়াকিফ" গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারও এ মতকে মুতাযিলীর মাযহাব সনাক্ত করেছেন। মুতাযিলীর মধ্য হতে আবূ আলী জুব্বাই এবং তার ভক্তবৃন্দরাও একথাই বলেছেন অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরাম থেকে ভুলবশতঃ অথবা ইজতিহাদী ভুলে সগীরা গুনাহ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব; ইচ্ছাকৃতভাবে নয়। পক্ষান্তরে মুতাযিলীর মধ্য হতে জাহিয ও নিযাম বলেন– ইচ্ছাকৃতভাবেও আম্বিয়ায়ে কিরাম থেকে সগীরা গুনাহ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। তবে শর্ত হল, আল্লাহ তা'আলা যখন তাদেরকে সতর্ক করে বলবেন– এটি অনুচিৎ, তখন তারা সে কাজ থেকে ফিরে আসবেন; বিরত থাকবেন।

অবশ্য নবুওয়াত প্রাপ্তির পর ভুলবশতঃ সগীরা গুনাহ প্রকাশ পাওয়া সর্বসম্মতভাবে জায়েয। তবে এমন সগীরা গুনাহ ব্যতীত, যেগুলো নীচুতা ও হেয়তার পরিচায়ক। যেমন, এক লোকমা চুরি করা অথবা এক শষ্য পরিমাণ মাপে কম দেওয়া।

উপরিউক্ত আলোচনা ছিল নবুওয়াত প্রাপ্তির পর ইচ্ছাকৃতভাবে কবীরা ও সগীরা গুনাহ থেকে আম্বিয়ায়ে কিরামের নিষ্কলূষতা ও পবিত্র সম্পর্কে। আর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে বিভিন্ন গুনাহ থেকে তাদের পবিত্রতা ও নিষ্কলূষতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা (মতভেদ) নিম্নে প্রদত্ত হল।

নবুওয়াতপূর্ব সময়ে নবীদের নিষ্পাপতা

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অধিকাংশ এবং কিছু সংখ্যক মুতাযিলীর মতে নবুওয়াতের পূর্বে নবীদের থেকে কবীরা গুনাহ প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রমাণ নেই। অধিকাংশ মুতাযিলী এবং কোন কোন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে নবুওয়াতের পূর্বেও কবীরা গুনাহ প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব। কেননা কবীরা গুনাহ নবীর প্রতি জনমনে ঘৃণা উদ্রেগের কারণ হবে। নবীর অনুসরণেও বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। ব্যাখ্যাতা বলেন– নবুওয়াতের পূর্বে নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া ও নিষ্কলুষতার ব্যাপারে বিশুদ্ধ কথা হল, তখনও তাঁদের দ্বারা এমন কাজ অসম্ভব, যা নিশ্চিত ঘৃণার জন্ম দেয়। যেমন, তাদের মায়ের ব্যাভিরারিণী হওয়া কিংবা দুরাচারী হওয়া এবং যেসব সগীরা গুনাহ নীচুতা ও হেয়তার পরিচায়ক।

শী'আদের বাড়াবাড়ি

قَوْلُهُ : وَمَنَعَتِ الشِّيْعَةُ الخ ঃ এখানে ব্যাখ্যাতার উদ্দেশ্য শী'আদের নির্বুদ্ধিতা এবং ইফরাত-তাফরীত তথা বাড়াবাড়ি ও শিথিলতায় আক্রান্ত হওয়ার প্রতি ইংগিত করা। অর্থাৎ তারা একদিকে তো আম্বিয়ায়ে কিরামের নিষ্কলূষতার ব্যাপারে এতটাই বাড়াবাড়ি ও চরমপন্থা অবলম্বন করেছে যে, নবুওয়াত লাভের পূর্বেও ভুলবশতঃ সগীরা গুনাহ প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব সাব্যস্ত করেছে। অপরদিকে এতটাই শিথিলতা ও হেঁয়ালী করেছে যে, তাকিয়্যা তথা শত্রুদের ভয়ে কুফরী প্রকাশ করাকেও জায়েয সাব্যস্ত করেছে। যেমন, হযরত আলী রাযি. থেকে শাইয়খাইন তথা হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর রাযি. এর স্তুতি এবং তাদের খেলাফতের স্বীকৃতি সম্পর্কে বর্ণিত উক্তিগুলো, অনুরূপভাবে খেলাফতের ব্যাপারে হযরত আলী রাযি. এর নীরবতা অবলম্বন এবং শাইখাইনের সাথে বিবাদে লিপ্ত না হওয়াকে শী'আরা তাকিয়্যা (শত্রুর আশঙ্কা) হিসেবে ধরেছে। আল্লাহর বাণী اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ এর মধ্যে اَتْقٰى দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছে, তাকিয়্যাকারী। এমনকি জাফরে সাদিক রহ. এর প্রতি সম্বন্ধ করে তারা বলে– তিনি উক্তি করেছেন, তাকিয়্যা আমার এবং আমার পিতৃপুরুষের ধর্ম। অথচ বিজ্ঞজনের কাছে অস্পষ্ট নয় যে, তাকিয়্যা হিসেবে অর্থাৎ শত্রুদের ভয়ে সত্য বিরোধী কিছু প্রকাশ করা, তাদের কথা ও কাজের উপর আস্থা-বিশ্বাস নিঃশেষ করে দেবে। কিন্তু আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং তাঁর অনুসারীদের ব্যাপারে আমরা জানি, তারা নিজেদের সংখ্যালঘুতা এবং শত্রুর সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও জালিম বাদশার সামনে সত্য প্রকাশ করেছেন।

সুতরাং যখন প্রমাণিত হয়ে গেল, হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম নবুওয়াত প্রাপ্তীর পর গুনাহ থেকে মাসুম বা নিষ্পাপ, তখন তাদের সম্পর্কে বর্ণিত এমন সব বিষয়, যেগুলো মিথ্যা ও অবাধ্যতা বুঝায়, সেগুলো খবরে ওয়াহিদ পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়ে থাকলে সবই প্রত্যাখ্যাত। কেননা আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি পাপাচার ও অবাধ্যতা সম্পৃক্ত করা অপেক্ষা রাবীর (হাদীস বর্ণনাকারীর) প্রতি মিথ্যা ও ভুলের সম্বন্ধ করাই শ্রেয়। আর যদি সেগুলো মুতাওয়াতিররূপে প্রমাণিত হয়ে থাকে, তাহলে ব্যাখ্যাযোগ্য হলে ব্যাখ্যা করা হবে; নতুবা সেটিকে উত্তমের বিপরীত ধরা হবে। যেমন, তারাকারাজির প্রতি ইংগিত করে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর উক্তি هٰذَا رَبِّىْ কুরআনে কারীম বর্ণনা করেছে। বিধায় তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য নয় বরং এর ব্যাখ্যা করা হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা হবে, এখানে প্রশ্নসূচক অব্যয় 'হামযা' উহ্য রয়েছে। পরোক্ষ বাক্য হবে أَهٰذَا رَبِّىْ بِزَعْمِكُمْ (তোমাদের ধারণা মাফিক একি আমার প্রভু ?) তদ্রূপ عَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى এর মধ্যে অবাধ্যতাকে উত্তম পরিত্যাগের অর্থে প্রযোজ্য ধরা হবে।

وَاَفْضَلُ الْاَنْبِيَاءِ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اَلْاٰيَةَ وَلَاشَكَّ اَنَّ خَيْرِيَّةَ الْاُمَّةِ بِحَسْبِ كَمَالِهِمْ فِى الدِّيْنِ وَذَالِكَ تَابِعٌ لِكَمَالِ نَبِيِّهِمْ اَلَّذِىْ يَتَّبِعُوْنَهُ وَالْاِسْتِدْلَالُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ لِىْ ضَعِيْفٌ لِاَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلٰى كَوْنِهِ اَفْضَلَ مِنْ آدَمَ بَلْ مِنْ اَوْلَادِهِ -

সহজ তরজমা

আম্বিয়ায়ে কিরামের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ ﷺ সর্বশ্রেষ্ঠ। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– তোমরা সর্বোত্তম উম্মত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব দ্বীনের মধ্যে তাদের কামেল হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে

হয়ে থাকে। আর দ্বীনের মধ্যে কামেল হওয়া তাদের নবীর কামালত বা শ্রেষ্ঠত্বের উপর নির্ভরশীল, তারা যার অনুসরণ করে। আর নবীজীর বাণী- اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ...الخ (আমি বনী আদমের সর্দার। এটা আমি গর্ব করে বলছি না।) এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করা দুর্বল। কেননা হাদীসটি আদম (আ.) থেকে নবীজীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে না বরং আদমের সন্তানদের থেকে শ্রেষ্ঠত্ব বুঝায়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মুহাম্মদ ﷺ সর্বশ্রেষ্ঠ নবী

মুসলমানদের সর্বজন স্বীকৃত আকীদা হল, সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম থেকে উত্তম। কেননা আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীকে সকল উম্মত থেকে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করেছেন। আর উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় দ্বীনের ক্ষেত্রে তার কামিল হওয়ার দ্বারা। দ্বীনের ক্ষেত্রে কামিল হওয়া নির্ভরশীল তাদের নবী কামিল হওয়ার ওপর, তার যার অনুসরণ করে। অবশ্য নবী কারীম ﷺ এর বাণী اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ দ্বারা মুহাম্মদ ﷺ সকল নবীগণ থেকে শ্রেষ্ঠ বা উত্তম হওয়ার পক্ষে পমাণ পেশ করা দুর্বল। কেননা হাদীসটি দ্বারা আদম-সন্তানের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়; আদম (আ.) এর উপর নয়। কিন্তু ব্যাখ্যাতা কর্তৃক এ দুর্বল সাব্যস্থকরণ সঠিক মনে হচ্ছে না। কারণ, আরবী ভাষাবিদগণ وُلْدِ اٰدَمَ বা আদম সন্তান বলতে মানবজাতি বুঝেন (বা وُلْد اٰدَم শব্দকে মানবজাতি অর্থে ব্যবহার করেন। এমতাবস্থায় হাদীসের অর্থ হবে, আমি মানবজাতির সর্দার।

وَالْمَلَائِكَةُ عِبَادُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَامِلُوْنَ بِاَمْرِهٖ عَلٰى مَادَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهٗ تَعَالٰى لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ. وَقَوْلُهٗ تَعَالٰى لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ وَلَا يُوْصَفُوْنَ بِذُكُوْرَةٍ وَلَا اُنُوْثَةٍ اِذْ لَمْ يَرِدْ بِذَالِكَ نَقْلٌ وَلَادَلَّ عَلَيْهِ عَقْلٌ وَمَازَعَمَ عَبَدَةُ الْاَصْنَامِ اَنَّهُمْ بَنَاتُ اللّٰهِ مُحَالٌ بَاطِلٌ وَاِفْرَاطٌ فِىْ شَانِهِمْ كَمَا اَنَّ قَوْلَ الْيَهُوْدِ اِنَّ الْوَاحِدَ فَالْوَاحِدُ مِنْهُمْ قَدْ يَرْتَكِبُ الْكُفْرَ وَيُعَاقِبُهُ اللّٰهُ بِالْمَسْخِ تَفْرِيْطٌ وَتَقْصِيْرٌ فِىْ حَالِهِمْ. فَاِنْ قِيْلَ اَلَيْسَ قَدْ كَفَرَ اِبْلِيْسُ وَكَانَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ بِدَلِيْلِ صِحَّةِ اِسْتِثْنَائِهٖ مِنْهُمْ قُلْنَا لَابَلْ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ لٰكِنَّهٗ لَمَّا كَانَ فِىْ صِفَةِ الْمَلَائِكَةِ فِىْ بَابِ الْعِبَادَةِ وَرِفْعَةِ الدَّرَجَةِ وَكَانَ جِنِّيًّا وَاحِدًا مَغْمُوْرًا فِيْمَا بَيْنَهُمْ صَحَّ اِسْتِثْنَاؤُهٗ مِنْهُمْ تَغْلِيْبًا وَاَمَّا هَارُوْتُ وَمَارُوْتُ فَالْاَصَحُّ اَنَّهُمَا مَلَكَانِ لَمْ يَصْدُرْ عَنْهُمَا كُفْرٌ وَلَا كَبِيْرَةٌ. وَتَعْذِيْبُهُمَا اِنَّمَا هُوَ عَلٰى وَجْهِ الْمُعَاتَبَةِ كَمَا يُعَاتَبُ الْاَنْبِيَاءُ عَلَى الزَّلَّةِ وَالسَّهْوِ. وَكَانَ يَعِظَانِ النَّاسَ وَيَقُوْلَانِ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. وَلَا كُفْرَ فِىْ تَعْلِيْمِ السِّحْرِ بَلْ فِىْ اِعْتِقَادِهٖ وَالْعَمَلِ بِهٖ.

সহজ তরজমা

এবং ফিরিশতাগণ আল্লাহ তা'আলার বান্দা। তার (আল্লাহর) নির্দেশ মত কাজ করেন। যেমন, এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার বাণী لَا يَسْبِقُوْنَهٗ...الخ "ফিরিশতারা তার (আল্লাহর) কথার উপর কথা বলে না; তার নির্দেশ মত কাজ করে।" তদ্রুপ আল্লাহ তা'আলার বাণী- لَايَسْتَكْبِرُوْنَ...الخ "তারা তার (আল্লাহর) ইবাদত থেকে অহংকার করে না বরং ক্লান্তও হয় না।" তারা পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গের গুণে গুণান্বিত হয় না। কেননা এ ব্যাপারে কোন নকলী দলীল নেই এবং যৌক্তিক প্রমাণও নেই। আর মূর্তিপূজক, যারা বলে- ফিরিশতারা আল্লাহর কন্যা। সে কথা অসম্ভব ও ভ্রান্ত এবং তাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন। যেরূপভাবে ইয়াহুদীদের উক্তি- তাদের

মধ্য হতে দু একজন কখনও কখনও কুফরী করে বসে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আকৃতি ফলে বিকৃতির শাস্তি দেন। (সবই) তাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও ফাজলামো (খামখেয়ালী)।

সুতরাং যদি প্রশ্ন করা হয়– ইবলীস কি কাফির হয়ে যায় নি ? অথচ সে (ইবলীস) ফিরিশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফিরিশতাদের থেকে তাকে (ইবলীসের) পৃথকিকরণ বিশুদ্ধ হওয়ার প্রমাণের আলোকে। আমরা জবাব দেব– না, বরং সে ছিল জ্বিন জাতির মধ্য থেকে একজন। পরবর্তীতে সে তার প্রতিপালকের হুকুম থেকে বিদ্রোহ করেছে। অবশ্য ইবাদত ও উচ্চ মর্যাদায় সে ফিরিশতাদের আসনে পৌঁছে ছিল। একজন জ্বিনই ছিল, যে ফিরিশিতাদের মধ্যে লুকায়িত ছিল। বিধায় তাগ্‌লীবান অর্থাৎ প্রবলতার ভিত্তিতে তাকে ইসতিছনা বা পৃথকিকরণ বিশুদ্ধ হয়েছে।

রইল হারুত-মারুতের কথা। (এ ব্যাপারে) অধিকতর বিশুদ্ধ কথা হল, তাদের থেকে কোনও কুফরী প্রকাশ পায়নি এবং কবীরা গুণাহও প্রকাশ পায়নি। তাদেরকে নিছক ভর্ৎসনার নিমত্ত শাস্তি দেওয়া হয়েছে। যেরূপভাবে পদস্খল ও ভুলের কারণে আম্বিয়ায়ে কিরামকে ভর্ৎসনা করা হয়। আর তারা লোকজনকে উপদেশ দিতেন এবং বলে দিতেন– আমরা (তোমাদের জন্য) পরীক্ষা স্বরূপ। অতএব কুফরী করবে না। আর যাদু বিদ্যা শেখায় কুফরী নেই বরং তাতে বিশ্বাস করা এবং তদনুযায়ী আমল করা কুফরী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

জ্বিন-ফিরিশতার পরিচয়

مَلَائِكَة শব্দটি مَلَاكٌ (লাম সাকিন, হামযায় যবর) এর বহুবচন। এতে আক্ষরিক উলোট-পালট হয়েছে। "ফা" কালেমার হামযাকে আইন কালেমার এবং আইন কালেমার লামকে "ফা" কালেমায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মূলতঃ مَألَك (হামযা সাকিন, লামে যবর) ছিল। যা الوكة। অর্থাৎ রিসালাত থেকে গৃহীত। কেননা আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে স্বীয় দূত ও বার্তাবাহক বানিয়ে আম্বিয়ায়ে কিরামের নিকট প্রেরণ করেছেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে ফিরিশতাগণ সূক্ষ্ম ও নূরানী কায়ার অধিকারী। আর ফিরিশতা, জ্বিন ও শয়তান সব সূক্ষ্ম দেহী হওয়া সত্ত্বেও প্রাসঙ্গিক দিক থেকে পরস্পর স্বতন্ত্রতা ও ভিন্নতা রাখে। সুতরাং ফিরিশতার সৃষ্টি কল্যাণ ও আনুগত্যের ওপর। মন্দ কাজ ও পাপের যোগ্যতা তাদের মধ্যে একদম নেই। জ্বিনের মধ্যে মঙ্গল-অমঙ্গল দুটোরই যোগ্যতা আছে। তবে মন্দ ও অমঙ্গলের যোগ্যতা প্রবল। আর শয়তান বলে প্রত্যেক খবীস ও অবাধ্য জ্বিনকে। জ্বিনদের মধ্যে নারী-পুরুষও আছে। তাদের সন্তানাদি ও বংশ বিস্তার হয়। আদম সন্তান তথা মানবজাতির মত তারাও প্রতিশ্রুতি ও সতর্কবাণীর মুকাল্লাফ (আদিষ্ট)। পক্ষান্তরে ফিরিশতাদের মধ্যে এসব কিছুই নেই। আর সৃষ্টিগত পার্থক্য হল, ফিরিশ্‌তারা নূরের তৈরী . জ্বিন আগুনের তৈরী। যেমন, মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُوْرٍ وَخُلِقَ الْجَنُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ

"ফিরিশতাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে নূর দ্বারা, জ্বিন সৃষ্টি করা হয়েছে অগ্নিশিখা দ্বারা। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদের কাছে বর্ণিত জিনিস (মাটি) দ্বারা।

ফিরিশতাদের নিষ্পাপতা

মুসান্নিফ রহ. স্বীয় উক্তি اَلْعَامِلُوْنَ بِاَمْرِهٖ দ্বারা ফিরিশতাদের নিষ্পাপ হওয়ার প্রতি ইংগিত করেছেন। কিন্তু কেউ কেউ তা অস্বীকার করেছেন। তারা বলেছেন– ইবলীস ফিরিশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। **(প্রথমতঃ)** প্রমাণ হল, আল্লাহর বাণী– وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْس "যখন আমি ফিরিশতাদেরকে বললাম– তোমরা আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল।" সূরা বাকারা– ৩৪

উল্লেখিত আয়াতে ইবলীসকে ফিরিশতাদের থেকে ইসতিছনা বা ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে। আর ইসতিছনার ক্ষেত্রে আসল হল, مُتَّصِل তথা মুসতাছনাটি মুসতাছনা মিনহুর জাত থেকে হওয়া (উভয়টি এক ধরনের বস্তু হওয়া।) বুঝা গেল, ইবলীস ফিরিশতা জাতের অন্তর্ভুক্ত। তথাপি সে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে পাপে লিপ্ত

হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– اَبٰى وَ اسْتَكْبَرَ "সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল।" বুঝা গেল, ফিরিশতারা নিষ্পাপ নন।

ব্যাখ্যাতা এর জবাবে বলেন– ইবলীস ফিরিশতাদের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং সে জ্বিন ছিল। কিন্তু যে দলের উপর সিজদার হুকুম ছিল, তাদের মধ্যে জ্বিনদের থেকে কেবল ইবলীসই ছিল। বাকীরা সবাই ছিলেন ফিরিশতা। বিধায় তাগ্লীবান তথা প্রবলতার ভিত্তিতে গোটা দলকেই ফিরিশতা নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং ফিরিশতাদের থেকে তাকে ইসতিছনা বা ব্যতিক্রমভুক্ত করা বিশুদ্ধ হয়েছে।

(দ্বিতীয়তঃ) ফিরিশতাদের নিষ্পার হওয়াকে যারা অস্বীকার করেন, তারা হারূত-মারূত ফিরিশতাদ্বয়ের ঘটনা দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেন। প্রমাণ দেওয়ার কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা–

(১) হাদীস শরীফে আছে– ফিরিশতারা আল্লাহর সামনে আদম সন্তানের উপর স্বীয় ইবাদতের কারণে গর্ব প্রকাশ করেছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন– আমি আদম সন্তানের মধ্যে যৌন চাহিদা ও প্রবৃত্তি সৃষ্টি করেছি। অতঃপর ফিরিশতা বললেন– আমাদের ভিতরেও যদি যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করে দেন, তথাপি আমরা গুণাহ করব না। আল্লাহ তা'আলা বললেন– তাহলে তোমরা নিজেদের মধ্য হতে দুজনকে মনোনীত কর। আমি তাদের মধ্যে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করব। ফিরিশতারা হারূত-মারূত নামের ফিরিশতাদ্বয়কে মনোনীত করল। আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করে ইরাকের বাবেল শহরের শাসকরূপে পৃথিবীতে পাঠালেন। একসময় তারা দুজন যাহরা নামের এক রমনীর প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ল। সে তাদেরকে ব্যাভিচার ও মদ্যপানে লিপ্ত করে দিল। আল্লাহ তাদেরকে ইহকালীন শাস্তি এবং পরকালীন আযাবের যে কোন একটি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিলেন। তখন তারা ইহকালীন শাস্তি বেছে নিল। সুতরাং যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা চাইবেন ততদিন পর্যন্ত তারা শাস্তি ভোগ করবে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বাণী– وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ এর মধ্যে যাদুবিদ্যা শেখা থেকে হযরত সুলাইমান (আ.) এর পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। যাতে বুঝা যায়, যাদুবিদ্যা শেখা কুফরী। অথচ হারূত-মারূত মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত। সুতরাং ফিরিশতারা নিষ্পাপ নন প্রমাণিত হল।

হারূত-মারূতের নিষ্পাপতা

শারেহ রহ. জবাবে বলেন– হারূত-মারূত থেকে কোন কুফরী প্রকাশ পায়নি। তারা কোন কবীরা গুণাহও করেনি। কেননা যাহরা নামক রমনীর সাথে প্রেমপ্রীতির ঘটনা নিছক একটি প্রেমোপাখ্যান। এর কোন বাস্তবতা নেই। রইল যাদু শিখানোর কথা। বস্তুতঃ তা কুফরী নয় বরং যাদুর কুফরী কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তদনুযায়ী আমল করা কুফরী। বিশেষতঃ যখন তারা লোকদেরকে যাদু শিখানোর পূর্বে বলে দিতেন, আমরা তোমাদের পরীক্ষার জন্য এসেছি। কখনও আবার এসব শিখে কাফির হয়ে যেও না। এতে তাদের নিষ্পাপতাই প্রমাণিত হয়। রইল তাদের আযাব হওয়ার কথা। তা তো ভর্ৎসনামূলক আযাব। যেমন, হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের পদস্খলনের কারণে তাদেরকেও ভর্ৎসনা করা হত। কিন্তু শারেহ রহ.এর উপর বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। তিনি হারূত-মারূত থেকে কবীরা গুনাহ পাওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন। স্বীকৃতি দিয়েছেন তাদের আযাবকে। অথচ যে রিওয়ায়াতে যাহরার সাথে প্রেমপ্রীতি, ব্যভিচার এবং মদ্যপানের কথা বর্ণিত হয়েছে, তাতে আযাবেরও বিবরণ রয়েছে। সুতরাং রিওয়ায়াতটি ভ্রান্ত হলে দুটি বিষয়ই ভ্রান্ত ও অবান্তর হবে। আর সঠিক হলে দুটি বিষয়ই প্রমাণিত হয়ে গেল।

وَلِلّٰهِ تَعَالٰى كُتُبٌ اَنْزَلَهَا عَلٰى اَنْبِيَائِهٖ وَبَيَّنَ فِيْهَا اَمْرَهٗ وَنَهْيَهٗ وَ وَعْدَهٗ وَوَعِيْدَهٗ وَكُلُّهَا كَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَهُوَ وَاحِدٌ وَاِنَّمَا التَّعَدُّدُ وَالتَّفَاوُتُ فِى النَّظْمِ الْمَقْرُوِّ وَالْمَسْمُوْعِ ـ وَبِهٰذَا الْاِعْتِبَارِ كَانَ الْاَفْضَلُ هُوَ الْقُرْاٰنُ ثُمَّ التَّوْرَاةُ وَالْاِنْجِيْلُ وَالزَّبُوْرُ ـ كَمَا اَنَّ الْقُرْاٰنَ كَلَامٌ وَاحِدٌ لَا يُتَصَوَّرُ فِيْهِ تَفْضِيْلٌ ثُمَّ بِاعْتِبَارِ الْقِرَاءَةِ وَالْكِتَابَةِ يَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ بَعْضُ السُّوَرِ اَفْضَلَ كَمَا وَرَدَ فِى الْحَدِيْثِ ـ وَحَقِيْقَةُ التَّفْضِيْلِ اَنَّ قِرَاءَتَهٗ اَفْضَلُ لِمَا اَنَّهٗ اَنْفَعُ وَذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْهِ اَكْثَرُ ـ ثُمَّ الْكُتُبُ قَدْ نُسِخَتْ بِالْقُرْاٰنِ تِلَاوَتُهَا وَكِتَابَتُهَا وَبَعْضُ اَحْكَامِهَا ـ

সহজ তরজমা

এবং আল্লাহ তা'আলার কতগুলো কিতাব আছে। সেগুলো তিনি তার নবীগণের উপর অবতীর্ণ করেছেন। তাতে (সে সব কিতাবে) তাঁর আদেশ-নিষেধ এবং প্রতিশ্রুতি ও সতর্কবাণী বর্ণনা করেছেন। আর সবই আল্লাহর পাকের কালাম এবং তা (কালামুল্লাহ) এক। তবে পঠিত ও শ্রুত নযম বা শব্দে ভিন্ন ভিন্ন।এ দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআনে কারীম শ্রেষ্ঠগ্রন্থ। তারপর তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিল। যেরূপভাবে কুরআনে কারীম অভিন্ন একই কালাম, তাতে এক আয়াত থেকে অপর আয়াতকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের কল্পনা করা যায় না। অতঃপর কিরাত ও লিখনীর দিক থেকে কোন কোন সূরা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। যেমন, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর শ্রেষ্ঠত্ব দানের বিশুদ্ধ অর্থ হচ্ছে, তার (কুরআনের একটি সূরা হতে অপর সূরার) তিলাওয়াত উত্তম। কেননা সেটি অধিক উপকারী। তাতে আল্লাহ তা'আলার যিকির অপেক্ষাকৃত বেশী। অতঃপর কুরআনে কারীমের মাধ্যমে অন্যান্য কিতাবের তিলাওয়াত, লিখনী ও কতিপয় আহকাম রহিত হয়ে গেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আসমানী কিতাব

আল্লাহ তা'আলা তার নবীগণের উপর কিছু কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তন্মধ্যে তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কুরআন চারটি বড় কিতাব। বাকীগুলো ছোট এবং সহীফা নামে খ্যাত। মোটকথা, সবগুলো কিতাবই আল্লাহর সিফাত কালামে নফসী বুঝায়। যেমনটি ইতোপূর্বে সিফাতে কালামের আলোচনায় বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ সিফাতে কালাম একটি। আধিক্য ও পার্থক্য হয় তার উপর নির্দেশক পঠিত নযমে। আর নযম ও ইবারতের দিক থেকেই সেসব কিতাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুরআনে কারীম। তারপর অন্যান্য কিতাব। সিফাতে কালামে একটির উপর আরেকটির কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলত নেই। যেরূপভাবে কুরআনে কারীম অভিন্ন এক কালাম। কালামুল্লাহ হওয়ার ক্ষেত্রে তার কোন সূরা বা আয়াত অন্য সূরা ও আয়াত থেকে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী নয়। অবশ্য কিরাত (পঠন) ও লেখার দৃষ্টিকোণ থেকে (যার সম্পর্ক শব্দের সাথে) কোন কোন সূরা ও আয়াত অন্যান্য সূরা ও আয়াত থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারে। যেমন, হাদীস শরীফে এসেছে– اَفْضَلُ الْقُرْاٰنِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ (কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা হচ্ছে সূরায়ে বাকারা।) তদ্রূপ নবী কারীম ﷺ আরও ইরশাদ করেছেন– اَعْظَمُ اٰيَةٍ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ اٰيَةُ الْكُرْسِىِّ اَوْ كَمَا قَالَ ـ (আল্লাহর কিতাবের সবচেয়ে বড় আয়াত হচ্ছে, আয়াতুল কুরসী।) কোন সূরা অপর সূরা হতে শ্রেষ্ঠ হওয়ার মর্ম হল, তাতে উপকারীতা অধিক; তার তিলাওয়াত উত্তম। অনুরূপভাবে কোন কোন সূরা যেমন, সূরায়ে আল্-আস্‌র, যাতে ঈমান, নেক আমল এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রভৃতি বিষয়ে অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়েছে। যেমন– সূরায়ে ইখলাছ, তাতে আল্লাহর কথা দুবার স্পষ্ট নামে এবং চারবার যমীর বা সর্বনাম আকারে উল্লেখ রয়েছে।

وَالْمِعْرَاجُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْيَقْظَةِ بِشَخْصِهٖ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ اِلٰى مَاشَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنَ الْعُلٰى حَقٌّ اَىْ ثَابِتٌ بِالْخَبَرِ الْمَشْهُوْرِ حَتّٰى اِنَّ مُنْكِرَهٗ يَكُوْنُ مُبْتَدِعًا ـ وَاِنْكَارُهٗ وَادِّعَاءُ اِسْتِحَالَتِهٖ اِنَّمَا يَبْتَنِىْ عَلٰى اُصُوْلِ الْفَلَاسِفَةِ وَاِلَّا فَالْخَرْقُ وَالْاِلْتِيَامُ عَلَى السَّمٰوَاتِ جَائِزٌ ـ وَالْاَجْسَامُ مُتَمَاثِلَةٌ يَصِحُّ عَلٰى كُلِّ مَايَصِحُّ عَلَى الْاٰخَرِ ـ وَاللّٰهُ تَعَالٰى قَادِرٌ عَلَى الْمُمْكِنَاتِ كُلِّهَا ـ فَقَوْلُهٗ فِى الْيَقْظَةِ اِشَارَةٌ اِلَى الرَّدِّ عَلٰى مَنْ زَعَمَ اَنَّ الْمِعْرَاجَ كَانَ فِى الْمَنَامِ عَلٰى مَارُوِىَ عَنْ مُعَاوِيَةَ اَنَّهٗ سُئِلَ عَنِ الْمِعْرَاجِ فَقَالَ كَانَتْ رُؤْيَا صَالِحَةً وَرُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ مَا فُقِدَجَسَدُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ ـ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ـ وَأُجِيْبَ بِاَنَّ الْمُرَادَ الرُّؤْيَا بِالْعَيْنِ ـ وَالْمَعْنٰى مَا فُقِدَجَسَدُهٗ عَنِ الرُّوْحِ بَلْ كَانَ مَعَ رُوْحِهٖ ـ وَكَانَ الْمِعْرَاجُ لِلرُّوْحِ وَالْجَسَدِ جَمِيْعًا ، وَقَوْلُهٗ بِشَخْصِهٖ اِشَارَةٌ اِلَى الرَّدِّ عَلٰى مَنْ زَعَمَ اَنَّهٗ كَانَ لِلرُّوْحِ فَقَطْ ـ وَلَايَخْفٰى اَنَّ الْمِعْرَاجَ فِى الْمَنَامِ اَوْ بِالرُّوْحِ لَيْسَ مِمَّا يُنْكَرُ كُلَّ الْاِنْكَارِ وَالْكَفَرَةُ اَنْكَرُوْا اَمْرَ الْمِعْرَاجِ غَايَةَ الْاِنْكَارِ ـ بَلْ كَثِيْرٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَدْ اِرْتَدُّوْا بِسَبَبِ ذَالِكَ ـ وَقَوْلُهٗ اِلَى السَّمَاءِ اِشَارَةٌ اِلَى الرَّدِّ عَلٰى مَنْ زَعَمَ اَنَّ الْمِعْرَاجَ فِى الْيَقْظَةِ لَمْ يَكُنْ اِلَّا اِلٰى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ عَلٰى مَانَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ وَقَوْلُهٗ ثُمَّ اِلٰى مَاشَاءَ اللّٰهُ اِشَارَةٌ اِلٰى اِخْتِلَافِ اَقْوَالِ السَّلَفِ ـ فَقِيْلَ اِلَى الْجَنَّةِ وَقِيْلَ اِلَى الْعَرْشِ وَقِيْلَ اِلٰى فَوْقِ الْعَرْشِ وَقِيْلَ اِلٰى طَرَفِ الْعَالَمِ ـ فَالْاِسْرَاءُ وَهُوَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلٰى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَطْعِىٌّ ـ ثَبَتَ بِالْكِتَابِ ـ وَالْمِعْرَاجُ مِنَ الْاَرْضِ اِلَى السَّمَاءِ مَشْهُوْرٌ وَمِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْجَنَّةِ اَوْ اِلَى الْعَرْشِ اَوْ غَيْرِ ذَالِكَ اٰحَادٌ ـ ثُمَّ الصَّحِيْحُ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّمَا رَأٰى رَبَّهٗ بِفُؤَادِهٖ لَابِعَيْنِهٖ

সহজ তরজমা

রাসূলে কারীম ﷺ এর জাগ্রত অবস্থায় স্ব-শরীরে আসমান পর্যন্ত তারপর যেখানে আল্লাহ পাকের ইচ্ছে হয়েছে সে উর্ধ্বজগত পর্যন্ত গমণ সত্য। আর তার উর্ধ্বগমণ (মিরাজ হওয়া) খবরে মাশহূর দ্বারা প্রমাণিত। এমনকি তার অস্বীকারকারী বিদ'আতী। তার অস্বীকৃতি এবং এর সম্ভাব্যতার দাবী নিছক দার্শনিকদের কয়েকটি মূলনীতির উপর নির্ভরশীল। নতুবা আসমান বিদীর্ণ হওয়া ও জোড়া লাগা সম্ভব। প্রতিটি দেহ সাদৃশ্যপূর্ণ (একই ধরনের)। একটির উপর যা প্রযোজ্য হয়, অপরটির উপর তা পযোজ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা সকল সম্ভাব্য বস্তুর উপর সক্ষম। কাজেই গ্রন্থকারের উক্তি فِى الْيَقْظَةِ (জাগ্রত অবস্থায়) এর মধ্যে সেসব লোকের অভিমত প্রত্যাখ্যানের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, যারা বলে– মি'রাজ হয়েছিল স্বপ্নযোগে। যেমন, হযরত মুআবিয়া রাযি. থেকে বর্ণিত। তাঁকে মি'রাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তা ছিল ভাল একটি স্বপ্ন। আর হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন– মি'রাজ রজনীতে মুহাম্মদ ﷺ এর শরীর মোবারক নিখোঁজ হয় নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন– যে স্বপ্ন আপনাকে দেখিয়েছি, তা নিছক মানুষের পরীক্ষার নিমিত্ত দেখিয়েছি। আর

জবাব দেওয়া হয়েছে, (হাদীসে মু'আবিয়া রাযি. এর মধ্যে رُؤْيَه দ্বারা স্বপ্ন নয়) চোখে দেখা উদ্দেশ্য। আর (হযরত আয়েশা রাযি. এর হাদীসের) অর্থ হল, রাসূলে কারীম ﷺ এর দেহ মুবারক রূহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় নি বরং রূহের সাথেই ছিল। মি'রাজ রূহ ও শরীর উভয়েরই হয়েছে। গ্রন্থকারের উক্তি بِشَخْصِه দ্বারা সেসব লোকের মত খণ্ডন করার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, যারা বলে মি'রাজ শুধু রূহের হয়েছে। আর এ কথা অস্পষ্ট থাকার কথা নয় যে, স্বপ্নযোগে বা আত্মিক (রূহানী) মি'রাজ এমন বিষয় নয়, যাকে চরমভাবে অস্বীকার করা যায়। অথচ কাফির্রা চরমভাবে মি'রাজকে অস্বীকার করেছে বরং অনেক মুসলমানও একারণে মুরতাদ হয়ে গেছে। মুসান্নিফ রহ. এর উক্তি إِلَى السَّمَاءِ দ্বারা সেসব লোকের মত খণ্ডানোর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, যারা বলে– জাগ্রত অবস্থায় মি'রাজ হয়েছে শুধু বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত। কিতাবুল্লাহ (কুরআনে কারীম) তেমনই বর্ণনা করেছে। গ্রন্থকারের উক্তি ثُمَّ إِلَى مَا شَاءَ اللّٰهُ দ্বারা সালফে সালেহীনের মতানৈক্যের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। সুতরাং তাদের কেউ বলেছেন– জান্নাত পর্যন্ত। আবার কেউ বলেছেন, আরশ পর্যন্ত। কেউ বলেছেন, আরশের উপর পর্যন্ত। আর কেউ বলেছেন, জগতের প্রান্তসীমা পর্যন্ত (মি'রাজ হয়েছে।) তবে ইসরা তথা মসজিদে হারাম থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত নৈশ ভ্রমণ সুনিশ্চিত। কুরআনে কারীমের আলোকে প্রমানিত। আর মি'রাজ তথা জমীন থেকে আসমান পর্যন্ত ভ্রমণ হাদীসে মশহূর দ্বারা প্রমাণিত। সেখানে থেকে আরশ জান্নাত অথবা আরশ প্রভৃতি স্থান পর্যন্ত ভ্রমণ খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রমাণিত। অতঃপর বিশুদ্ধ কথা হল, স্বীয় প্রতিপালককে তিনি অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেছেন, চর্মচোখে নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মি'রাজ ছিল স্বশরীরে

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের স্বতঃসিদ্ধ আকীদা হল, রাসূলে কারীম ﷺ কে জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে মসজিদে হারাম থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত অতঃপর সেখান থেকে আকাশের উপরে বিভিন্ন উঁচুস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুতরাং মসজিদে হারাম থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ইসরা নামে খ্যাত জমিনের সফর অকাট্য। কুরআনের আয়াত سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى (পবিত্র ও মহীমাময় তিনি, যিনি রজনীর একাংশে তার বান্দাকে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আক্সা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন। সূরা বনী ইসরাইল–১) এর দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই এর অস্বীকারকারী কাফির হবে। অতঃপর মসজিদে আক্সা থেকে উর্ধ্বাকাশের দিকে গমণ তথা মি'রাজ খ্যাত এ ভ্রমণ হাদীসে মাশহূর দ্বারা প্রমাণিত। এর অস্বীকারকারী হবে বিদ'আতী। আর আকশের উপরে আরশ বা জান্নাত পর্যন্ত কিংবা অন্যান্য যেসব জায়গায় আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা মাফিক নিয়ে গেছেন, তা খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রমাণিত। এর অস্বীকারকারী গুনাহগার।

দার্শনিকরা মি'রাজকে অস্বীকার করল কেন ?

দার্শনিকরা শুধুমাত্র একটি কারণে মি'রাজ অস্বীকার করেছে অর্থাৎ কেউ আকাশে যেতে হলে, আকাশ বিদীর্ণ হওয়া আবশ্যক। তাছাড়া আসমানের আগে অগ্নিমণ্ডল। যা তাতে প্রবেশকারী সবকিছু জালিয়ে ভস্ম করে দেয়। কাজেই কারও তা পেরিয়ে আসমান পর্যন্ত পৌছা সম্ভব নয়। তাছাড়া এত অল্প সময়ে এত দূরে ঘুরে আসা বা এত দীর্ঘপথ অতিক্রম করা কল্পনাতীত ব্যাপার।

জাবাবঃ সকল দেহ চাই উর্ধ্বজগতের হোক যেমন, আকাশ অথবা অধ্বজগতের হোক যেমন, জমিন সবই সাদৃশ্যপূর্ণ ও এক প্রকৃতির। কেননা সবগুলোই পরমাণূ দ্বারা গঠিত। কাজেই একটিতে যা সম্ভব অপরটিতেও তা সম্ভব। যেহেতু জমিনে ভাঙা-গড়া সম্ভব, আকাশেও সম্ভব। অনুরূপভাবে অগ্নিমণ্ডল ভস্মকারী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে রাসূলে কারীম ﷺ এর ক্ষেত্রে ভস্মকারী না হওয়াও সম্ভব। যেমন, আল্লাহর নির্দেশে ইবরাহীম (আ.) এর ক্ষেত্রে আগুন ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক হয়ে গিয়েছিল। অনুরূপভাবে অতিঅল্প সময়ে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করাও অসম্ভব নয় বরং নিতান্তই সম্ভব। তবে স্বাভাববিরুদ্ধ। আর তাই এ ঘটনা মুযিজা।

মি'রাজ কি স্বপ্নযোগে হয়েছিল ?

কেউ কেউ বলেন– মি'রাজ স্বপ্নযোগে হয়েছে। ব্যাখ্যাতা এর তিনটি প্রমাণ জবাবসহ পেশ করেছেন। যথা–

(১) হযরত মুআবিয়া রাযি. বলেছেন, মি'রাজ একটি ভাল স্বপ্ন ছিল। এর জবাব হল, رُؤْيَه দ্বারা স্বপ্ন উদ্দেশ্য

নয় বরং স্বচক্ষে দেখা উদ্দেশ্য। যা জাগ্রত অবস্থায় হয়ে থাকে। فِى الْيَقْظَةِ বলে সেদিকেই ইংগিত করেছেন। অতএব হযরত মুআবিয়া রাযি. এর উক্তির মর্ম হবে, মি'রাজ একটি ভাল বা মনোরম দৃশ্যপট ছিল।

(২) হযরত আয়েশা রাযি. এর উক্তি "মি'রাজ রজনীতে মুহাম্মদ ﷺ এর শরীর মুবারক নিখোঁজ হয়নি বরং তিনি বিছানায়ই ছিলেন। এর মর্ম হল, মি'রাজ স্বপ্নযোগে হয়েছিল। এর জবাব হবে, **প্রথমতঃ** হযরত আয়েশা রাযি. নিজের প্রত্যক্ষ ঘটনা বর্ণনা করনেনি। কেননা ইসরা এর ঘটনা পর্যন্ত তিনি রাসূলে কারীম ﷺ এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধই হননি। তাছাড়া সে সময় তিনি এতটুকু বয়সের মেয়ে ছিলেন না যে, কোন ঘটনা স্মরণ রাখতে পারেন। কারণ, হিজরতের সময় তার বয়স ছিল আট বছর। অথচ প্রধান্যপ্রাপ্ত মতানুসারে রাসূলে কারীম ﷺ এর মি'রাজ হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে হয়েছে। এ হিসেবে মি'রাজের সময় তার বয়স ছিল তিন বছর। সুতরাং সুস্পষ্টতই তিন বছরের বাচ্চা কোন কথা আয়ত্ব করতে পারে না। **দ্বিতীয়তঃ** হযরত আয়েশা রাযি. এর উক্তির মর্ম হল, মে'রাজের বজনীতে রাসূলে কারীম ﷺ এর দেহ মোবারক রূহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়নি বরং রূহ এর সাথে শরীরও সফর করেছে। রূহ ও দেহ উভয়েরই মি'রাজ হয়েছে। আর সুস্পষ্ট যে, শরীরের কোথাও যাওয়া জাগ্রত অবস্থাই সম্ভব। বুঝা গেল, মি'রাজ স্বপ্নযোগে ছিল না।

(৩) আল্লাহর বাণী– وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ এর মধ্যে মি'রাজকে رُؤْيَا নামে অভিহিত করা হয়েছে, যার অর্থ স্বপ্ন। এর জবাব হল,

প্রথমত ঃ এ আয়াতে কারীমায় رُؤْيَا بِالْعَيْنِ অর্থাৎ চাক্ষুস দেখা উদ্দেশ্য। যেমন, বুখারী শরীফে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এর ভাষ্য উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেন–

هِىَ رُؤْيَا عَيْنٍ اُرِيَهَا النَّبِىُّ ﷺ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِهٖ بَيْتَ الْمَقْدِسِ

অর্থাৎ এটি ছিল চাক্ষুস দর্শন, যা রাসূলে কারীম ﷺ কে ইসারার রজনীতে দেখানো হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ যদি মি'রাজ স্বপ্নযোগে হত তাহলে এতে লোকদের জন্য পরীক্ষার কিছু ছিল না। কেননা কারও স্বপ্নে আকাশে যেতে দেখা বিস্ময়ের কিছু নয়। অথচ আয়াতে কারীমায় رُؤْيَا কে মানুষের জন্য পরীক্ষা বলা হয়েছে। বিধায় কাফির্রা এ ঘটনাকে কঠোরভাবে অস্বীকার করেছে। এতে বুঝা গেল, রাসূলে কারীম ﷺ জাগ্রত অবস্থায় মি'রাজ হওয়ার বিবরণ দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ হযরত মুআবিয়া রাযি. সম্পর্কে বলেন– মি'রাজের সময় তিনি ইসলামে দিক্ষতই হননি। কেননা তিনি হুদাইবিয়ার সন্ধি বা মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অথচ মি'রাজের ঘটনা তার অনেক বছর পূর্বে অর্থাৎ প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতানুসারে হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে হয়েছে। কাজেই সে সময় যত মুসলমান ছিলেন যেমন, হযরত উমর রাযি., হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. প্রমুখ; তারা বলেন– মিরাজ জাগ্রত অবস্থায় হয়েছে। হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর উক্তি অপেক্ষা তাদের কথাই অগ্রগণ্য।

রইল মিরাজের সফরে রাসূলে কারীম ﷺ আল্লাহ পাকের দর্শন লাভ করেছেন কি না এবং করে থাকলে অন্তর্দৃষ্টিতে নাকি চর্মচোখে– এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। ব্যাখ্যাতা অন্তর্দৃষ্টিতে দর্শন লাভ করাকে প্রধান্য দিয়েছেন। কেননা চর্ম চোখে বা স্বচক্ষে দেখার ব্যাপারে কোন নছ (আয়াত-হাদীস কিছুই) নেই।

وَكَرَامَاتُ الْاَوْلِيَاءِ حَقٌّ ـ وَالْوَلِىُّ هُوَ الْعَارِفُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى وَصِفَاتِهٖ حَسَبَ مَا يُمْكِنُ الْمُوَاظِبُ عَلَى الطَّاعَاتِ الْمُجْتَنِبُ عَنِ الْمَعَاصِىْ الْمُعْرِضُ عَنِ الْاِنْهِمَاكِ فِى اللَّذَّاتِ وَالشَّهَوَاتِ ـ وَكَرَامَتُهٗ ظُهُوْرُ اَمْرٍ خَارِقٍ لِلْعَادَةِ مِنْ قِبَلِهٖ غَيْرِ مُقَارِنٍ لِدَعْوَى النُّبُوَّةِ ـ فَمَا لَا يَكُوْنُ مَقْرُوْنًا بِالْاِيْمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ يَكُوْنُ اِسْتِدْرَاجًا ـ وَمَا يَكُوْنُ مَقْرُوْنًا بِدَعْوَى النُّبُوَّةِ يَكُوْنُ مُعْجِزَةً ـ وَالدَّلِيْلُ عَلٰى حَقِّيَّةِ الْكَرَامَةِ مَا تَوَاتَرَ مِنْ كَثِيْرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ اِنْكَارُهٗ خُصُوْصًا الْاَمْرُ الْمُشْتَرَكُ وَاِنْ كَانَتِ

التَّفَاصِيلُ اٰحَادًا - وَاَيْضًا اَلْكِتَابُ نَاطِقٌ بِظُهُوْرِهَا مِنْ مَرْيَمَ وَمِنْ صَاحِبِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَبَعْدَ ثُبُوْتِ الْوُقُوْعِ لَاحَاجَةَ إِلَى إِثْبَاتِ الْجَوَازِ

সহজ তরজমা

আউলিয়ায়ে কিরামের কারামাত সত্য। আলী ঐ ব্যক্তি, যার আল্লাহ ও তার গুণাবলি সম্পর্কে যথাসম্ভব মা'রিফত লাভ হয়েছে। যিনি ইবাদতে পাবন্ধ; গুনাহ থেকে বেঁচে থাকেন। ভোগ-বিলাস এবং প্রবৃত্তির তাড়না থেকে দূরে থাকেন। আর তার কারামাত হল, তার পক্ষ থেকে অলৌকিক বিষয় প্রকাশ পাওয়া। তবে তিনি নবুওতের দাবীর ধারে কাছেও যাবেন না। সুতরাং ঈমান ও নেকআমলের সাথে যে অলৌকিক বিষয় প্রকাশ হবে না, তা ইসতিদরাজ তথা ঢিল মারা। আর নবুওয়াতের দাবীর সাথে যা প্রকাশ পায়, তা মুজিযা। কারামতের সত্যতার দলীল হল, সেসব অলৌকিক বিষয়, যেগুলো বহু সাহাবায়ে কিরাম এবং তাদের পরবর্তী লোকদের থেকে এতটাই মুতাওয়াতিররূপে বর্ণিত যে, সেসব বিশেষভাবে যৌথ বিষয়টি অস্বীকার করা অসম্ভব। যদিও পৃথক পৃথক অংশগুলো খবরে ওয়াহিদ। তাছাড়া মারিয়ম (আ.) ও হযরত সুলাইমান (আ.) এর উজির থেকে কারামত প্রকাশ পাওয়ার ব্যাপারে কিতাবুল্লাহ সাক্ষ্য দেয়। আর বাস্তবতা প্রমাণিত হওয়ার পর সম্ভাবনা প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

অলৌকিক বিষয়ের শ্রেণীভাগ

অলৌকিক বিষয় চার প্রকার। কারণ, (১) অলৌকিক বিষয় যদি নবুওতের দাবীদারের হাতে তার ইচ্ছা অনুযায়ী প্রকাশ পায়, তাহলে মুজেযা। (২) যদি সাধারণ নেককার বুযুর্গ মানুষ থেকে প্রকাশ পায় তা হবে কারামত। (৩) যদি ফাসিক-ফুজ্জার অথবা কোন কাফির থেকে প্রকাশ পায়, তা হবে ধোঁকা ও ইসতিদরাজ। (৪) কেউ কেউ আরও এক প্রকার বর্ণনা করেন অর্থাৎ অলৌকিক বিষয় যদি তার ইচ্ছা-বিরুদ্ধ প্রকাশ পায়, তা হবে এহানত বা লাঞ্ছনা। যেমন, মিথ্যুক মুসাইলামা জনৈক কানা ব্যক্তির জন্য দু'আ করল, যেন তার চোখ ভাল হয়ে যায়। তখন লোকটির যে চোখ ভাল ছিল, তাও নষ্ট হয়ে গেল। বস্তুতঃ এমন অলৌকিক বিষয় প্রকাশ পায় নবুওতের দাবীদারকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য। পক্ষান্তরে সকল হকপন্থীদের মতে আউলিয়াদের কারামতকে সম্ভব ও প্রমাণিত। মুতাযিলারা একে অস্বীকার করে। তাদের অস্বীকৃতির কারণ ও তার জবাব সামনে আসছে।

আউলিয়ায়ে কিরামের কারামত সত্য

হকপন্থীরা আউলিয়াদের কারামতের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ সেসব অলৌকিক বিষয় উপস্থাপন করেন, যেগুলো সাহাবায়ে কিরাম ও তৎপরবর্তী নেককার ব্যক্তিবর্গ থেকে প্রকাশিত হওয়া তাওয়াতুরের পর্যায়ে পৌছেছে। যদিও পৃথক পৃথক ঘটনাগুলো খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু সেগুলোর যৌথ বিষয় তথা "অলৌকিক ঘটনাবলির বহিঃপ্রকাশ" তাওয়াতুর পর্যায়ে পৌছেছে। তাছাড়া কোন কোন অলিআল্লাহ থেকে অলৌকিক ঘটনা বহিঃপ্রকাশের কথা কুরআনে কারীমেও বিবৃত হয়েছে। যেমন, হযরত মরিয়ম (আ.) এর ঘটনা। যিনি আপন খালু হযরত যাকারিয়া (আ.) এর তত্ত্বাবধায়নে ছিলেন। তিনি মরিয়মকে কামরায় আবদ্ধ রেখে নিজ কাজে বেরিয়ে যেতেন। ফিরে এসে দেখতে পেতেন মরিয়ম (আ.) এর সামনে বে-মৌসমী খাদ্যপানীয় ভরপুর। হযরত যাকারিয়া (আ.) বিস্ময়ভরে জিজ্ঞাসা করতেন– তোমার সামনে এসব এল কোথেকে! মারিয়াম (আ.) বলতেন– আল্লাহ পাকের তরফ থেকে। অনুরূপভাবে কুরআনে কারীমে বিবৃত হয়েছে– বিলকিসের সিংহাসন শতশত মাইল দূরে থাকা সত্ত্বেও আসিফ ইবনে বারখিয়া চোখের পলকে হযরত সুলাইমান (আ.) এর সামনে উপস্থিত করেছেন। সুতরাং অলিআল্লাহ থেকে কারামত প্রকাশিত হওয়ার বাস্তবতা প্রমাণিত হয়ে গেল। এখন সম্ভাব্যতা প্রমাণের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, সম্ভাব্য বস্তুই বাস্তব হয়ে থাকে।

ثُمَّ اَوْرَدَ كَلَامًا يُشِيْرُ اِلٰى تَفْسِيْرِ الْكَرَامَةِ وَاِلٰى تَفْصِيْلِ بَعْضِ جُزْئِيَّاتِهِ الْمُسْتَبْعَدَةِ جِدًّا فَقَالَ فَتَظْهَرُ الْكَرَامَةُ عَلٰى طَرِيْقِ نَقْضِ الْعَادَةِ لِلْوَلِيِّ مِنْ قَطْعِ الْمَسَافَةِ الْبَعِيْدَةِ فِى الْمُدَّةِ الْقَلِيْلَةِ كَاتْيَانِ صَاحِبِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ اٰصِفُ بْنُ بَرْخِيَا عَلَى الْاَشْهَرِ لِعَرْشِ بِلْقِيْسَ قَبْلَ ارْتِدَادِ الطَّرْفِ مَعَ بُعْدِ الْمَسَافَةِ. وَظُهُوْرِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَاللِّبَاسِ عِنْدَ الْحَاجَةِ كَمَا فِى حَقِّ مَرْيَمَ فَاِنَّهُ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَامَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَالْمَشْيِ عَلَى الْمَاءِ كَمَا نُقِلَ عَنْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَوْلِيَاءِ. وَالطَّيَرَانِ فِى الْهَوَاءِ كَمَا نُقِلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ وَلُقْمَانَ السَّرْخَسِيِّ وَغَيْرِهِمَا. وَكَلَامُ الْجَمَادِ وَالْعَجْمَاءِ اَمَّا كَلَامُ الْجَمَادِ فَكَمَا رُوِىَ اَنَّهُ كَانَ بَيْنَ يَدَىْ سَلْمَانَ وَاَبِى الدَّرْدَاءِ قَصْعَةٌ. فَسَبَّحَتْ وَسَمِعَا تَسْبِيْحَهَا. وَاَمَّا كَلَامُ الْعَجْمَاءِ فَتَكَلَّمَ الْكَلْبُ لِاَصْحَابِ الْكَهْفِ. وَكَمَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوْقُ بَقَرَةً قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا. اِذَا الْتَفَتَتِ الْبَقَرَةُ اِلَيْهِ وَقَالَتْ اِنِّىْ لَمْ اُخْلَقْ لِهٰذَا. وَاِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَتَكَلَّمُ الْبَقَرَةُ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اٰمَنْتُ بِهٰذَا. وَانْدِفَاعِ الْمُتَوَجِّهِ مِنَ الْبَلَاءِ وَكِفَايَةِ الْمُهِمِّ عَنِ الْاَعْدَاءِ وَغَيْرِ ذَالِكَ مِنَ الْاَشْيَاءِ مِثْلِ رُؤْيَةِ عُمَرَ رض وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِى الْمَدِيْنَةِ جَيْشَهُ بِنَهَاوَنْدَ حَتّٰى قَالَ لِاَمِيْرِ جَيْشِهِ يَاسَارِيَةُ الْجَبَلَ اَلْجَبَلَ. تَحْذِيْرًا لَهُ مِنْ وَرَاءِ الْجَبَلِ لِمَكْرِ الْعَدُوِّ هُنَاكَ، وَسَمَاعِ سَارِيَةَ. كَلَامَهُ مَعَ بُعْدِ الْمَسَافَةِ. وَكَشُرْبِ خَالِدٍ السَّمَّ مِنْ غَيْرِ تَضَرُّرٍ بِهِ وَكَجَرَيَانِ النِّيْلِ بِكِتَابِ عُمَرَ رض وَاَمْثَالُ ذَالِكَ مِنْ اَنْ يُحْصٰى.

সহজ তরজমা

এরপর গ্রন্থকার এমন কথা বর্ণনা করেছেন, যা কারামতের ব্যাখ্যা এবং নিতান্তই দুরূহ, দুর্বোধ্য কল্পনাতীত কতিপয় ঘটনার ব্যাখ্যার প্রতি ইংগিত করে। সুতরাং তিনি বলেন– অলিআল্লাহর জন্য অলৌকিকভাবে কারামত প্রকাশ পায়। যেমন, অতিঅল্প সময়ে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করা। যেমন, সুলাইমান (আ.) এর উযীর প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী আসিফ বিন বারখিয়া কর্তৃক বিলকিসের সিংহাসনকে দীর্ঘ দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও চোখের পলকে নিয়ে আসা। তদ্রুপ প্রয়োজনের সময় খাদ্য-পানি ও পোশাক-পরিচ্ছদ উপস্থিত হওয়া। যেমন, হযরত মরিয়ম (আ.) এর বেলায় হয়েছে। যখনই তার খালু হযরত যাকারিয়া (আ.) আবদ্ধ (ফেলে যাওয়া) কামরায় আসতেন তখন দেখতেন, তার সামনে অমৌসমী খাদ্য-পানীয় বিদ্যমান। জিজ্ঞাসা করতেন, হে মরিয়ম! এসব পেলে কোথায়? এসব জিনিস তোমার কাছে এলো কোত্থেকে? মরিয়ম জবাবে বলতেন– আল্লাহ পাকের তরফ থেকে। তদ্রুপ বহু অলিআল্লাহর পানির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার কথা বর্ণিত আছে। যেমন, মহাশূন্যে উড়ার কথা হযরত জাফর ইবনে আবী তালিব এবং হযরত লোকমান সারাখসী রহ. এর সম্পর্কে বর্ণিত আছে। তদ্রুপ জড়পদার্থ ও জীবজন্তুর কথা বলা। জড়পদার্থের কথোপকথন সম্পর্কে বর্ণিত আছে, হযরত সালমান রাযি. ও হযরত আবূ দারদা রাযি. এর সামনে (একদা) একটি পেয়ালা ছিল। সেটি সুবহানাল্লাহ বলল। উভয় বুযুর্গ এ তাসবীহ শুনেছেন। জীবজন্তুর কথা প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, আসহাফে কাহফের কুকুর কথা বলেছে। তদ্রুপ বর্ণিত আছে; জনৈক ব্যক্তি ষাড় নিয়ে যাচ্ছিল। তার

পিঠে ছিল বোঝা। সহসা ষাড়টি তার উদ্দেশ্যে বলল– আমাকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয় নি। আমাকে শুধু হালচাষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। লোকজন বিস্ময়ে বলে উঠে– সুবহানাল্লাহ ষাড়ও কথা বলে! একথা শুনে নবীজী বললেন, আমি এর সত্যায়ণ করি! (আল্লাহর কুদরতে এ অসম্ভব কিছু নয়) অদ্রুপ অত্যাসন্ন বিপদাপদ বিদূরীত হয়ে যাওয়া, শত্রুদের অনিষ্ট থেকে বেঁচে যাওয়া ইত্যাদি। যেমন, হযরত উমর রাযি. মদীনার মসজিদের মিম্বরে বসে নেহাওন্দ নামক স্থানে যুদ্ধরত তার (মুসলিম) সেনা বাহিনীকে দেখে ফেলা, এমনকি সেখানে শত্রুদের ষড়যন্ত্রের কারণে সেনাবাহিনীকে পাহাড়ের পেছন থেকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে ডেকে বলছিলেন– হে সারিয়াহ! পাহাড়ের ব্যাপারে সতর্ক হও! সারিয়া বহু দূরে থাকা সত্ত্বেও তার কথা শুনে ফেলে। অদ্রুপ প্রতিক্রিয়াহীনভাবে হযরত খালিদ রাযি. এর বিষপান করা এবং হযরত উমর রাযি. এর চিঠির কারণে নীল দরিয়া প্রবাহিত হওয়া। এছাড়াও এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কুরআনের ভাষায় বিলকিসের সিংহাসন স্থানান্তরের ঘটনা

قَوْلُهُ: كَاتْيَانِ صَاحِبِ سُلَيْمَانَ ..الخ ঃ বিলকিসের সিংহাসনকে হযরত সুলাইমান (আ.) এর কাছে নিয়ে আসার ঘটনা কুরআনে কারীমে নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছে।

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ

"সুলাইমান (আ.) আরও বলেন– হে আমার সভাসদবর্গ! তারা আমার কিনট আত্মসমর্পণ করে আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে আছে, তার সিংহাসন আমার কাছে নিয়ে আসবে? এক শক্তিশালী জ্বিন বলল– আপনি নিজ আসন থেকে উঠার পূর্বে আমি তা নিয়ে আসব এবং এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই সক্ষম বিশ্বস্ত। কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, আপনি চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি সেটা আপনাকে এনে দিব।" (সূরা নামল ঃ ৩৮- ৪০) কোন কোন মুফাস্‌সির বলেন– উক্ত আয়াতে الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ দ্বারা স্বয়ং সুলাইমান (আ.) উদ্দেশ্য। তবে প্রসিদ্ধ উক্তি হল, এর দ্বারা হযরত সুলাইমান (আ.) এর উযীর আসিফ ইবনে বারখিয়া উদ্দেশ্য।

জাফর তাইয়ারের ঘটনা

قَوْلُهُ: كَمَا نُقِلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ঃ তিনি হযরত আলী রাযি. এর ভাই। তিনি এক সময় মক্কা থেকে হিজরত করে হাবশায় চলে গিয়েছিলেন। মদীনায় এসেছেন খায়বার বিজয়ের দিন। তখন রাসূলে কারীম ﷺ বললেন– আমি জানি না, আমার আজকের আনন্দ খায়বার বিজয়ের কারণে নাকি জাফরের আগমনে! নবীজী তাকে এক সেনাবাহিনীর সাথে সিরিয়া অভিমূখে পাঠিয়ে দেন। সেখানেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তার দুটি হাতই কেটে ফেলা হয়েছিল।

তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– رَأَيْتُ جَعْفَرَ يَطِيْرُ فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ অর্থাৎ আমি জাফরকে জান্নাতে ফিরিশতাদের সঙ্গে উড়তে দেখেছি। এ কারণেই তিনি জাফরে তাইয়ার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এ ব্যাখ্যার আলোকে জাফর ইবনে আবূ তালিব রাযি. কে উপমাস্বরূপ পেশ করা ব্যাখ্যাতার জন্য যথোচিত হয় নি। কেননা মৃত্যুর পর উড়া আমাদের আলোচনার বাইরে।

কুকুরের কথোপকথন

قَوْلُهُ: فَتَكَلَّمَ الْكَلْبُ ...الخ ঃ আসহাবে কাহ্‌ফ ছিলেন সাতজন মুমিন পুরুষ। তারা শিরকের প্রতি আহবানকারী বাদশার রাজ্য থেকে পালিয়ে গিরিগুহায় আশ্রয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের পেছনে পেছনে একটি কুকুরও চলছিল। তারা কুকুরটিকে দূর দূর করে তাড়াতে চাইলে কুকুরটি বলল– لَا تَطْرُدُوْنِي فَإِنِّي أُحِبُّ أَوْلِيَاءَ اللهِ অর্থাৎ আমাকে দূর দূর কর না। কারণ, আমি অলিআল্লাহদের ভালবাসি।

যুদ্ধরত এক সারিয়াকে উমর রাযি. এর সতর্কীকরণ

قَوْلُهُ: مِثْلُ رُؤْيَةِ عُمَرَ رض ..الخ ঃ ব্যাখ্যাতার বিবরণে বুঝা যায়, হযরত উমর রাযি.এর উক্তি اَلْجَبَلَ যবর বিশিষ্ট। কেননা এটি اِتَّقِ উহ্য ফে'লের মাফউল অর্থাৎ হে সারিয়া! পাহাড়ের দিক থেকে সাবধান! সহসা যেন পাহাড়ের পেছনে থেকে শত্রুপক্ষ আক্রমণ করে না বসে। অথচ ইমাম বাইহাকী, আবূল নু'আইম এবং ইবনে মারদুওয়াই প্রমুখ মুহাদ্দিসগণের বর্ণিত হাদীসের সারাংশ হচ্ছে, হযরত উমর রাযি. হযরত সারিয়া ইবনে যানীম রাযি. কে সেনাপতি করে একটি সৈন্যদল পাঠালেন। পরবর্তী এক সময় মদীনার মিম্বরে বসে জুম'আর খুৎবার মাঝখানে খুৎবা বন্ধ করে পর পর তিনবার বললেন-.يَاسَارِيَةُ اَلْجَبَلَ اَلْجَبَلَ اَلْجَبَلَ তখন উপস্থিত সকলেই একে অপরের দিকে থাকতে লাগলেন। এমনকি কেউ কেউ বলেই ফেললেন, সম্ভবতঃ তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তখন হযরত আলী রাযি. বললেন, তিনি যা কিছু বলেছেন, তা বাস্তব হবে। অতঃপর আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. হযরত উমর রাযি. এর নিকট এ রহস্য জানতে চাইলে তিনি বললেন- আমি মুশরিকদেরকে দেখলাম, তারা সামনে পিছনে উভয় দিক থেকে একযোগে আক্রমণ করে মুসলমানদেরকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছে। এজন্য আমি তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি, তারা যেন তাদের পাহাড় পিছনে রাখে। যাতে পিছন দিক থেকে শত্রু আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে। শুধু একদিকে লড়াই হয়। সুতরাং একমাস পর বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে আগমনকারী বলেন- আমরা জুমার নামাযের সময় শত্রুদের সাথে লড়াই করেছি। তখন তারা প্রায় আমাদেরকে পর্যুদস্ত করে ফেলেছিল। হঠাৎ আমরা শুনতে পেলাম, কোন আহবানকারী বলছেন- হে সারিয়া! পাহাড়! পাহাড়! পাহাড়! অতঃপর আমার পাহাড়ের সন্নিকটে চলে গেলাম। সেদিকে পিঠ দিয়ে (পাহাড়টি পশ্চাতে রেখে) যুদ্ধ করতে থাকলাম। অবশেষে শত্রুদের পর্যুদস্ত করে দিলাম। এ ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায়, হযরত উমর রাযি. এর উক্তি اَلْجَبَلَ মানসূব (যবর বিশিষ্ট) হবে। কেননা এখানে اِلْتَزِمْ (আবশ্যক করে নাও) ক্রিয়াটি উহ্য রয়েছে। এর মর্ম হবে, পাহাড়ের আশ্রয় নাও! কিংবা পাহাড়ের সাথে লেগে যাও।

وَلَمَّا اِسْتَدَلَّتِ الْمُعْتَزِلَةُ الْمُنْكِرَةُ لِكَرَامَةِ الْاَوْلِيَاءِ بِاَنَّهُ لَوْجَازَ ظُهُوْرُ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ مِنَ الْاَوْلِيَاءِ لَاشْتَبَهَ بِالْمُعْجِزَةِ فَلَمْ يَتَمَيَّزُ النَّبِيُّ مِنْ غَيْرِ النَّبِيِّ اَشَارَ اِلَى الْجَوَابِ بِقَوْلِهِ وَيَكُوْنُ ذَالِكَ اَىْ ظُهُوْرُ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ مِنَ الْوَلِيِّ الَّذِىْ هُوَ مِنْ اُحَادِ الْاُمَّةِ مُعْجِزَةً لِلرَّسُوْلِ الَّذِىْ ظَهَرَتْ هٰذِهِ الْكَرَامَةُ لِوَاحِدٍ مِنْ اُمَّتِهِ لِاَنَّهُ يَظْهَرُ بِهَا اَىْ بِتِلْكَ الْكَرَامَةِ اَنَّهُ وَلِىٌّ وَلَنْ يَكُوْنَ وَلِيًّا اِلَّا وَاَنْ يَكُوْنَ مُحِقًّا فِى دِيَانَتِهِ ـ وَدِيَانَتُهُ الْاِقْرَارُ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ بِرِسَالَةِ رَسُوْلِهِ مَعَ الطَّاعَةِ لَهُ فِىْ اَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيْهِ حَتّٰى لَوِادَّعٰى هٰذَا الْوَلِىُّ الْاِسْتِقْلَالَ بِنَفْسِهِ وَعَدَمَ الْمُتَابَعَةِ لَمْ يَكُنْ وَلِيًّا وَلَمْ يَظْهَرْ ذَالِكَ عَلٰى يَدِهِ ـ وَالْحَاصِلُ اَنَّ الْاَمْرَ الْخَارِقَ لِلْعَادَةِ فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْوَلِىِّ كَرَامَةٌ لِخُلُوِّهِ عَنْ دَعْوَى نُبُوَّةِ مَنْ ظَهَرَ ذَالِكَ مِنْ قِبَلِهِ فَالنَّبِىُّ لَابُدَّ مِنْ عِلْمِهِ بِكَوْنِهِ نَبِيًّا وَمِنْ قَصْدِهِ اِظْهَارَ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ ـ وَمِنْ حُكْمِهِ قَطْعًا بِمُوْجَبِ الْمُعْجِزَاتِ بِخِلَافِ الْوَلِىِّ

সহজ তরজমা

আর যখন আউলিয়ায়ে কিরামের কারামাত অস্বীকার করে মুতাযিলীরা প্রমাণ পেশ করেছে- যদি অলীদের থেকে অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পাওয়া জায়েয বা সম্ভব হত, তাহলে তা মুজিযা হওয়ার সন্দেহ হত এবং নবীকে অনবী থেকে পার্থক্য করা যেত না। গ্রন্থকার স্বীয় উক্তি দ্বারা এর জবাবের প্রতি ইংগিত করে বলেন- তা হবে .... অর্থাৎ উম্মতের মধ্য হতে একজন অলী থেকে অলৌকিক ঘটনার বহিঃপ্রকাশ সে রাসূলেরই মুযিজা হবে, যার কোন

উম্মতের জন্য এ কারামত প্রকাশ পেয়েছে। কেননা ঐ কারামত দ্বারাই প্রকাশ পাবে তিনি অলিআল্লাহ। আর কোন ব্যক্তি তখনই অলী হতে পারে, যখন সে দ্বিয়ানতদারীতে (দ্বীনদারীতে) সততার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর দিয়ানতদারী হল আন্তরিকভাবে রাসূলে কারীম ﷺ এর রিসালাতের স্বীকৃতি দেওয়া। সাথে সাথে তার আদেশ-নিষেধে তাকে মেনে চলা। এমনকি সে যদি নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং রাসূলের অনুসরণ না করার দাবী করে, সে অলী হবে না; তার হাতে ঐ কারামত প্রকাশ পাবে না।

সারকথা, অস্বাভাবিক অলৌকিক ঘটনা নবী-রাসূল ﷺ এর দিক বিবেচনায় মুযিজা। চাই সেটি তার তরফ থেকে প্রকাশ পাক কিংবা তার কোন একজন উম্মত থেকে প্রকাশ পাক। আর অলির দিক বিচারে সেটি কারামত। কারণ, সে ব্যক্তি নবুওয়তের দাবী শূন্য, যার তরফ থেকে অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। অতএব নবীর জন্য তার নবুওতের একীন থাকা, অলৌকিক ঘটনা প্রকাশের ইচ্ছা করা এবং মুজিযার দাবী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেওয়া আবশ্যক। পক্ষান্তরে অলীর জন্য উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ের কোনটিই আবশ্যক নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কারামাত অস্বীকার কারীদের দলীল

অধিকাংশ মুতাযিলা যারা কারামত আস্বীকার করে, তারা স্বপক্ষে প্রমাণস্বরূপ বলে, নবীকে গাইরে নবী থেকে পার্থক্যকারী বস্তু হল মুজিযা অর্থাৎ তার থেকে অস্বভাবিক অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ হওয়া। সুতরাং যদি অলিদের থেকে অলৌকিক ঘটনার বহিঃপ্রকাশ সম্ভাব্য হয়, যাকে কারামত বলে, তাহলে কারামত মুযিজা হওয়ার সন্দেহ জাগবে। কারণ, দুটোই অলৌকিক ব্যাপার। আর যখন কারামত মুজিযা হওয়ার সন্দেহ হবে, তখন কারামতওয়ালা অর্থাৎ অলির মুযিজাওয়ালা হওয়া তথা নবী হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি হবে। এমতাবস্থায় নবী ও অনবীর মাঝে কোন প্রার্থক্য থাকবে না। লোকেরা অনবীকে নবী মনে করবে এবং পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। ফলে নবী প্রেরণের উদ্দেশ্যই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

✪ মূল গ্রন্থাকার মুতাযিলার এ দলীলের জবাব দিয়েছেন– যে অলৌকিক ঘটনা অলি থেকে প্রকাশ পাবে, তা হবে অলির কারামত। আর তিনি যে নবীর উম্মত সে নবীর মুজেযা। কারণ, তার হাতে অলৌকিক ঘটনার বহিঃপ্রকাশ ঐ নবীর অনুসরণেরই বরকত ও সুফল। এমনকি সে ব্যক্তি যদি অলৌকিক ঘটনা প্রকাশের ব্যাপারে স্বকীয়তার এবং নবীর অনুসরণ না করার দাবী করে, তাহলে সে ব্যক্তি অলী গণ্য হবে না। তার হাতে কারামত প্রকাশ পাবে না বরং অস্বাভাবিক যা কিছু প্রকাশ পাবে, সবই ধোঁকা ও ঢিল নিক্ষেপণ বলে গণ্য হবে। তাছাড়া যার হাতে কারামত প্রকাশ পায়, তিনি নবুওয়াতের দাবীদার হন না। পক্ষান্তরে মুযিজা যার হাতে প্রকাশ পায়, তিনি নবুওয়াতের দাবীদার হন অথবা বলা যায়, মুজিযা কেবল নবুওয়াতের দাবীদারের হাতে প্রকাশিত অস্বাভাবিক অলৌকিক ঘটনাবলির নাম । কাজেই উক্ত সংশয় অমূলক।

নবী ও অলীর পার্থক্য

قَوْلُهُ: فَالنَّبِيُّ لَابُدَّ مِنْ عِلْمِهِ ...الخ ঃ এখান থেকে ব্যাখ্যাতা মুজিযার অধিকারী আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং কারামতের অধিকারী আউলিয়ায়ে কিরামের মধ্যে তিনটি পার্থক্য বর্ণনা করছেন। যথা–

(১) নবীর জন্য তার নবুওয়াতীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক; কিন্তু অলীর জন্য তার বেলায়েত বা অলী হওয়ার জ্ঞান থাকা আবশ্যক নয়।

(২) নবীর জন্য অলৌকিক ঘটনা প্রকাশের ইচ্ছা থাকা আবশ্যক অর্থাৎ মুজিযার বহিঃপ্রকাশ নবীর ইচ্ছার পরে হয়। অলি এর বিপরীত। তার জন্য অলৌকিকক ঘটনা প্রকাশের ইচ্ছা থাকা জরুরী নয় বরং বিনা প্রয়োজনে গোপন করা জরুরী।

(৩) নবীর জন্য অকাট্যভাবে মুজিযার দাবী অর্থাৎ নিজের সত্যতার সিদ্ধান্ত দেওয়া জরুরী। অলি এর বিপরীত। তার জন্য স্বীয় কারামতের দাবী অর্থাৎ নিজের অলী হওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া আবশ্যক নয়।

وَاَفْضَلُ الْبَشَرِ بَعْدَ نَبِيِّنَا وَالْاَحْسَنُ اَنْ يُقَالَ بَعْدَ الْاَنْبِيَاءِ ـ لٰكِنَّهُ اَرَادَ الْبَعْدِيَّةَ الزَّمَانِيَّةَ وَلَيْسَ بَعْدَ نَبِيِّنَا نَبِيٌّ ـ مَعَ ذَالِكَ لَابُدَّ مِنْ تَخْصِيْصِ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ اِذْ لَوْ اُرِيْدَ كُلُّ بَشَرٍ يُوْجَدُ بَعْدَ نَبِيِّنَا اِنْتَقَضَ بِعِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَوْ اُرِيْدَ كُلُّ بَشَرٍ يُوْلَدُ بَعْدَهُ لَمْ يُفِدِ التَّفْضِيْلَ عَلَى الصَّحَابَةِ ـ وَلَوْ اُرِيْدَ كُلُّ بَشَرٍ هُوَ مَوْجُوْدٌ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ فِى الْجُمْلَةِ اِنْتَقَضَ بِعِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ اَلَّذِىْ صَدَّقَ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِى النُّبُوَّةِ مِنْ غَيْرِ تَلَعْثُمٍ وَفِى الْمِعْرَاجِ بِلَاتَرَدُّدٍ ـ ثُمَّ عُمَرُ الْفَارُوْقُ اَلَّذِىْ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فِى الْقَضَايَا وَالْخُصُوْمَاتِ ثُمَّ عُثْمَانُ ذُو النُّوْرَيْنِ لِاَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ زَوَّجَهُ رُقَيَّةَ وَلَمَّا مَاتَتْ رُقَيَّةُ زَوَّجَهُ اُمَّ كُلْثُوْمٍ ـ وَلَمَّا مَاتَتْ قَالَ لَوْكَانَتْ عِنْدِىْ ثَالِثَةٌ لَزَوَّجْتُكَهَا ثُمَّ عَلِىٌّ الْمُرْتَضٰى مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَخُلَّصِ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلٰى هٰذَا وَجَدْنَا السَّلَفَ ـ وَالظَّاهِرُ اَنَّهُ لَوْلَمْ يَكُنْ لَهُمْ دَلِيْلٌ عَلٰى ذَالِكَ لَمَا حَكَمُوْا بِذَالِكَ ـ وَاَمَّا نَحْنُ فَقَدْ وَجَدْنَا دَلَائِلَ الْجَانِبَيْنِ مُتَعَارِضَةً ـ وَلَمْ نَجِدْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهٖ شَيْئٌ مِنَ الْاَعْمَالِ اَوْ يَكُوْنُ التَّوَقُّفُ فِيْهِ مُخِلًّا بِشَيْئٍ مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَكَانَ السَّلَفُ كَانُوْا مُتَوَقِّفِيْنَ فِىْ تَفْضِيْلِ عُثْمَانَ حَيْثُ جَعَلُوْا مِنْ عَلَامَاتِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ تَفْضِيْلَ الشَّيْخَيْنِ وَمَحَبَّةَ الْخَتَنَيْنِ ـ وَالْاِنْصَافُ اَنَّهُ اِنْ اُرِيْدَ بِالْاَفْضَلِيَّةِ كَثْرَةُ الثَّوَابِ فَلِلتَّوَقُّفِ جِهَةٌ ـ وَاِنْ اُرِيْدَ كَثْرَةُ مَا يَعُدُّهُ ذَوُوالْعُقُوْلِ مِنَ الْفَضَائِلِ فَلَا ـ

সহজ তরজমা

আমাদের নবীর পর সকল মানুষ থেকে উত্তম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি.। এখানে নবীগণের পর বলাই অধিক শ্রেয়। কিন্তু মূলগ্রন্থকার সময়ের পর উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আর আমাদের নবীর পর আর কোন নবী নেই। তদুপরি হযরত ঈসা (আ.) কে ইসতিছনা (পৃথক) করা আবশ্যক। কেননা আমাদের নবীর পর যত মানুষ রয়েছে উদ্দেশ্য হলে হযরত ঈসা (আ.) নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। আর যদি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়– আমাদের নবীর পর যত মানুষ জন্ম নেবে, তাহলে সাহাবায়ে কিরাম থেকে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত হবে না। আর যদি পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল মানুষ উদ্দেশ্য নেওয়া হয় তাহলে হযরত ঈসা (আ.) কে নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। (মোটকথা, আমাদের নবীর পর সকল মানুষ অপেক্ষা) আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. যিনি রাসূলের নবুওয়াতের ব্যাপারে দ্বিধাহীনচিত্তে এবং মিরাজের ব্যাপারে কোন প্রকার ইতঃস্ততা ছাড়াই রাসূলে কারীম ﷺ এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। এরপর উমর ফারুক রাযি.। যিনি হক-বাতিলের মধ্যে প্রভেদ তৈরী করেছেন। এরপর উসমান যুন-নুরাইন রাযি.। কেননা নবীজী তার নিকট নিজ কন্যা রুকাইয়া রাযি. কে বিয়ে দিয়েছেন। যখন তাঁর ইন্তিকাল হয়ে যায়, তখন তাঁর নিকট বিয়ে দিয়েছেন উম্মে কুলসুম রাযি. কে। এরপর তাঁরও ইন্তেকাল হয়ে গেলে রাসূলে কারীম ﷺ বলেন– আমার যদি তৃতীয় আরেকটি মেয়ে থাকত, তবে তাঁকেও তোমার নিকট বিবাহ দিয়ে দিতাম। এরপর (সকল মানুষ অপেক্ষা উত্তম) হযরত আলী রাযি.। তিনি ছিলেন আল্লাহর বান্দা এবং রাসূলে কারীম ﷺ এর সঙ্গি-সাথীদের মধ্যে প্রিয়পাত্র ও বিশিষ্ট সাহাবী। এ বিন্যাসের উপরই আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি।

প্রকাশ থাকে যে, তাদের কাছে যদি এর কোন প্রমাণ না থাকত, তাহলে এ সিদ্ধান্ত দিতেন না। অবশ্য আমরা উভয়পক্ষের প্রমাণগুলো পরস্পর বিরোধী পেয়েছি। আমরা এ বিষয়টিকে কোন আমলের সাথে সংশ্লিষ্ট কিংবা এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন কোন ওয়াজিবের ক্ষেত্রে ত্রুটি সৃষ্টিকারী পাই নি। সালফে সালেহীন হযরত উসমান রাযি. কে শ্রেষ্ঠত্ব দানের ক্ষেত্রে নীরবতা অবলম্বন করতেন। সুতরাং তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিদর্শনাবলি থেকে শাইখাইন তথা হযরত আবূ বকর রাযি. ও হযরত উমর রাযি. কে শ্রেষ্ঠত্বদান এবং খাতানাইন তথা রাসূলে কারীম ﷺ এর দুই জামাতার প্রতি ভালবাসাকে একটি নিদর্শন সাব্যস্ত করেছেন। বস্তুতঃ ইনসাফের কথা হল, শ্রেষ্ঠত্বদানের দ্বারা প্রচুর সাওয়াব উদ্দেশ্য হলে নীরবতা অবলম্বনের কারণ আছে। আর যদি সেসব বিষয় উদ্দেশ্য হয়, যেগুলোকে বিজ্ঞজনেরা ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে গণ্য করেছেন, তাহলে নীরবতা অবলম্বনের কোন কারণ নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

নবীজীর পর শ্রেষ্ঠ মানুষের ক্রমধারা

এখান থেকে ইমামত বা নেতৃত্বের আলোচনা শুরু হচ্ছে। মুহাক্কিকগণ বলেন- ইলমে কালামে সেসব ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, যেগুলো দ্বারা নেককাজের উপর প্রতিদান ও পূণ্য বৃদ্ধি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অধিকন্তু এসব স্থানে بَعْد শব্দটিকে উলামায়ে কিরাম 'মর্যাদার দূরত্ব' অর্থে ব্যবহার করেন। সুতরাং তারা বলেন- اَفْضَلُ الْاَنْبِيَاء بَعْدَ نَبِيِّنَا اِبْرَاهِيْم اَفْضَلُ الْكُتُبْ بَعْدَ الْقُرْآن التَّوْرَات। এ হিসেবে মূল গ্রন্থকারের ইবারতে কিছুটা ত্রুটি রয়েছে। কেননা মর্যাদার দূরত্ব উদ্দেশ্য নিলে তাঁর ইবারতের অর্থ হবে, আমাদের নবীর মর্যাদার পর সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান হযরত আবু বকর রযি.। এতে সকল নবী অপেক্ষাও হযরত আবু বকর রাযি. শ্রেষ্ঠ হওয়া আবশ্যক হয়। এজন্য ব্যাখ্যাতা বলেছেন- بَعْدَ نَبِيِّنَا অপেক্ষা بَعْدَ الْاَنْبِيَاء বলাই শ্রেয়। যাতে খুলাফায়ে রাশেদীন নবীগণ থেকেও শ্রেষ্ঠ হওয়া আবশ্যক না হয়। অবশ্য ব্যাখ্যাতা بَعْدَ الْاَنْبِيَاء বলাকে নিছক অধিক উপযোগী ও উত্তম বলেছেন, ওয়াজিব বলেন নি। কেননা بَعْدِيَّتْ অর্থাৎ পরবর্তীতে হওয়াকে بَعْدِيَّتْ زَمَانِى তথা পরবর্তীকালে হওয়ার অর্থেও প্রয়োগ করা সম্ভব। যেমন, স্বয়ং তিনিই বলেছেন- গ্রন্থকার بَعْدِيَّتْ زَمَانِى উদ্দেশ্য নিয়েছেন। ইবারতের মর্ম হবে, আমাদের নবীজির পরবর্তী সময়ে সকল মানুষ অপেক্ষা হযরত আবু বকর রাযি. শ্রেষ্ঠ। এমতাবস্থায় নবীগণের চেয়ে খুলাফায়ে রাশেদীনের শ্রেষ্ঠত্ব আবশ্যক হয় না বটে। তবে ঈসা (আ.) কে ইসতিছনা (পৃথক) করা তখনও আবশ্যক। কেননা তিনি আমাদের নবী কারীম ﷺ এর যুগের পরও চতুর্থ আকশে জীবিত অবস্থায় বর্তমান আছেন। এজন্য গ্রন্থকার রহ.এর বলা উচিৎ ছিল, আমাদের নবীর পর হযরত ঈসা (আ.) ব্যতীত সকল মানুষ অপেক্ষা হযরত আবু বকর রাযি. শ্রেষ্ঠ।

উপরিউক্ত ক্রমধারা কি ধারনা প্রসূত না সুনিশ্চিত ?

قَوْلُهُ: وَاَمَّا نَحْنُ فَوَجَدْنَا ..الخ ঃ এখানে ব্যাখ্যাতা বলতে চান, শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি প্রবল ধারণাপ্রসূত। সালফে সালেহীনের প্রতি সুধারণাই এর দলীল। কেননা তাদের নিকট যদি এ সংক্রান্ত কোন প্রমাণ না থাকত, তবে তাঁরা শ্রেষ্ঠত্বের এ ধারাবাহিকতা বিন্যাস করতেন না। আমরা যদি সেসব সালফে সালেহীনের প্রতি সুধারণার ভিত্তিতে তাদের অনুসরণ না করতাম, তবে এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করাই উত্তম ছিল। কারণ, **প্রথমতঃ** এ ব্যাপারে শী'আ সম্প্রদায় এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দলীলগুলো পরস্পর বিরোধী। কাজেই তাদের কোন কথায় আস্থা রাখা বা নিশ্চিত হওয়া যায় না। **দ্বিতীয়তঃ** বিষয়টি আকীদা সংক্রান্ত; আমল সংক্রান্ত নয়। আমলের ব্যাপারে তো ধারণার উপরই নির্ভর করা যথেষ্ট। কিন্তু আকীদার ব্যাপারে ধারণার উপর নির্ভর করা চলে না বরং নিশ্চিত জ্ঞান উদ্দেশ্য। **তৃতীয়তঃ** এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন কোন শরঈ ওয়াজিবের ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক নয়। কিন্তু ব্যাখ্যাতা কর্তৃক বর্ণিত উপরিউক্ত ব্যাখ্যাগুলো দুর্বল। (এর পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। নিম্নে সেগুলো প্রদত্ত হল।)

(১) উপরিউক্ত বিন্যাসের উপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রমাণ একাধিক সহীহ হাদীস। অথচ শী'আরা দলীল দেয় জাল কিংবা এমন সব হাদীস দ্বারা যেগুলো হযরত আলী রাযি. এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে অস্পষ্ট।

(২) শর্তহীন ও সাধারণভাবে আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ে ধারণা জ্ঞান যথেষ্ট নয় বলা অশুদ্ধ। নতুবা সালফে সালেহীন আকীদা সংক্রান্ত বই-পুস্তকে ফিরিশতাগণ নবীদের থেকে অথবা নবীগণ ফিরিশতাদের থেকে শ্রেষ্ঠ

হওয়া, আশারায়ে মুবাশ্‌শারা অপর সাহাবায়ে কিরাম থেকে উত্তম হওয়া, ঈমানেহ্রাস বৃদ্ধি না হওয়া, মুজতাহিদকে ভুল-শুদ্ধ উভয় ইজতিহাদে প্রতিদান দেওয়া ইত্যাদি ধারণামূলক মাসআলা উল্লেখ করতেন না বরং যেসব আকীদা-বিশ্বাস ও ইয়াকীন উদ্দেশ্য, সেগুলোতে ধারণাজ্ঞান যথেষ্ট নয়। আর যেসব আকীদায় সাব্যস্থই হয় যন্নী (ধারণামূলক) দলীল দ্বারা সেগুলো যন্নি হিসেবেই মেনে নেওয়া ওয়াজিব। যেমন, কবর ও হাশরের বিস্তারিত বিবরণ সংক্রান্ত হাদীসগুলো খবরে ওয়াহিদ। কাজেই সেগুলো যন্নি হিসেবেই মেনে নেওয়া ওয়াজিব।

(৩) এ মাসআলার উপরে শী'আদের মাযহাব বাতিল করা নির্ভরশীল। আর তাদের মাযহার বাতিল করা শরী'আতের দৃষ্টিতে ওয়াজিব ও অত্যাবশ্যক। কেননা তারা আলী রাযি. কে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করে। তাকে খলীফা মনোনীত না করার কারণে সাহাবায়ে কিরামকে জালিম এবং আবু বকর রাযি. প্রমুখকে ক্ষমতা জবর দখলকারী সাব্যস্থ করে। এ জন্য শ্রেষ্ঠত্বের মাসআলাটিকে গুরুত্ব দেওয়া ওয়াজিব।

قَوْلُهُ: وَكَانَ السَّلَفُ كَانُوا مُتَوَقِّفِيْنَ ..الخ ঃ এখানে كان (তাশদীদযুক্ত নূনের সাথে) হরফে তাশবীহ। সালফে সালেহীন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলামত হিসাবে রাসূলে কারীম ﷺ এর দুই জামাতার প্রতি ভালবাসা রাখা আবশ্যক সাব্যস্থ করেছেন; দুজনের মধ্য থেকে একজনকে অপর থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা আবশ্যক সাব্যস্থ করেন নি। ব্যাখ্যাতা এর দ্বারা প্রমাণ দিয়ে বলেন, এ মাসআলায় সালফে সালেহীন নীরবতা অবলম্বন করাকে প্রধান্য দিতেন। কিন্তু ব্যাখ্যাতার এই প্রমাণ প্রদান করা সঠিক নয়। কেননা আহলে সুন্নত ও শী'আ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিতর্কিত মাসআলা হযরত উসমান রাযি. ও আলী রাযি. মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের মাসআলা নয় বরং আবু বকর রাযি. হযরত আলী রাযি. থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার মাসআলা। সুতরাং তারা এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেন নি বরং শাইখাইনদের শ্রেষ্ঠ মনে করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিদর্শন গণ্য করে শুধু আবু বকর রাযি. ই নয় বরং উমর রাযি. কেও আলী রাযি. থেকে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করেছেন।

ব্যাখ্যাতার উপর প্রশ্ন জাগে যে, তিনি উপরে বলেছেন, عَلٰى هٰذَا وَجَدْنَا السَّلَفَ। অর্থাৎ উপরিউক্ত বিন্যাসের উপর আমরা সালফে সালেহীনকে পেয়েছি। যাতে আবু বকর রাযি. সর্বশ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর এখানে তিনি বলছেন, শ্রেষ্ঠত্বের মাসআলায় সালফে সালেহীন নীরবতা অবলম্বন করতেন। এ তো সুস্পষ্ট বিরোধ। এর জবাব হল, উপরে সালফে সালেহীন দ্বারা সংখ্যগরিষ্ঠ আর এখানে সংখ্যলঘু উদ্দেশ্য।

এ নীরবতার কোন কারণ আছে কি ?

قَوْلُهُ: وَالْاِنْصَافُ...الخ ঃ অর্থাৎ যদি শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা প্রচুর সওয়াব উদ্দেশ্য হয়, তবে তো নীরবতা অবলম্বনের কারণ রয়েছে। কেননা বিবেক দ্বারা জানা যায় না যে, কে সওয়াব বেশী পাবে ? তাছাড়া কুরআন-হাদীসে এ সংক্রান্ত কিছু বর্ণিতও হয় নি। আর যদি সে সব জিনিসের আধিক্য উদ্দেশ্য হয়, যেগুলোকে মানুষ বৈশিষ্ট্য মনে করে, তাহলে নীরবতা অবলম্বনের কোন কারণ নেই। কেননা হযরত আলী রাযি. এর বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি ও কারামাত অধিক। এ বাক্যের কারণে কেউ কেউ বলেন– ব্যাখ্যাতার কথায় শী'আবাদের গন্ধ আসে। কোন কোন মাশায়েখ এর জবাব দিয়েছেন, হযরত আলী রাযি. ফযীলত ও মর্যাদা স্বীকৃতি আদৌ শী'আবাদ নয়।

وَخِلَافَتُهُمْ اَىْ نِيَابَتُهُمْ عَنِ الرَّسُوْلِ فِىْ اِقَامَةِ الدِّيْنِ بِحَيْثُ يَجِبُ عَلٰى كَافَّةِ الْاُمَمِ الْاِتِّبَاعُ عَلٰى هٰذَا التَّرْتِيْبِ اَيْضًا يَعْنِىْ اَنَّ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِاَبِىْ بَكْرٍ رض ثُمَّ لِعُمَرَ رض ثُمَّ لِعُثْمَانَ رض ثُمَّ لِعَلِىٍّ رض وَذٰلِكَ لِاَنَّ الصَّحَابَةَ قَدِ اجْتَمَعُوْا يَوْمَ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَقِيْفَةِ بَنِىْ سَاعِدَةَ وَاسْتَقَرَّ رَأْيُهُمْ بَعْدَ الْمُشَاوَرَةِ الْمُنَازَعَةِ عَلٰى خِلَافَةِ اَبِىْ بَكْرٍ رض فَاَجْمَعُوْا عَلٰى ذَالِكَ وَبَايَعَهُ عَلِىٌّ رض عَلٰى رُؤُوْسِ الْاَشْهَادِ بَعْدَ تَوَقُّفٍ كَانَ مِنْهُ ـ وَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْخِلَافَةُ حَقًّا لَهُ لَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ رض ـ وَلَنَازَعَهُ عَلِىٌّ رض كَمَا نَازَعَ مُعَاوِيَةَ رض وَلَاحْتَجَّ عَلَيْهِمْ لَوْكَانَ فِىْ حَقِّهِ نَصٌّ ـ كَمَا

زَعَمَتِ الشِّيْعَةُ . وَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ فِىْ حَقِّ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْاِتِّفَاقُ عَلَى الْبَاطِلِ وَتَرْكِ الْعَمَلِ بِالنَّصِّ الْوَارِدِ . ثُمَّ اِنَّ اَبَابَكْرٍ رض لَمَّا يَئِسَ مِنْ حَيٰوتِهٖ دَعَا عُثْمَانَ رض وَاَمْلٰى عَلَيْهِ كِتَابَ عَهْدِهٖ فَلَمَّا كَتَبَ خَتَمَ الصَّحِيْفَةَ . وَاَخْرَجَهَا اِلَى النَّاسِ، وَاَمَرَهُمْ أنْ يُّبَايِعُوْا لِمَنْ فِى الصَّحِيْفَةِ فَبَايَعُوْا حَتّٰى مَرَّتْ بِعَلِيٍّ رض فَقَالَ بَايَعْنَا لِمَنْ فِيْهَا . وَاِنْ كَانَ عُمَرُ رض . وَبِالْجُمْلَةِ وَقَعَ الْاِتِّفَاقُ عَلٰى خِلَافَتِهٖ . ثُمَّ اُسْتُشْهِدَ عُمَرُ رض وَتَرَكَ الْخِلَافَةَ شُوْرٰى بَيْنَ سِتَّةٍ عُثْمَانَ رض وَعَلِيٍّ رض وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رض . وَطَلْحَةَ رض وَزُبَيْرِ رض وَسَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رض ثُمَّ فَوَّضَ الْاَمْرَ خَمْسَتُهُمْ اِلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رض . وَرَضُوْا بِحُكْمِهٖ فَاخْتَارَ عُثْمَانَ رض . وَبَايَعَهٗ بِمَحْضَرٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ رض . فَبَايَعُوْهُ وَانْقَادُوْا لِاَوَامِرِهٖ وَصَلُّوْا مَعَهُ الْجُمَعَ وَالْاَعْيَادَ . فَكَانَ اِجْمَاعًا . ثُمَّ اُسْتُشْهِدَ وَتَرَكَ الْاَمْرَ مُهْمَلًا . فَاَجْمَعَ كِبَارُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ عَلٰى عَلِيٍّ رض وَالْتَمَسُوْا مِنْهُ قَبُوْلَ الْخِلَافَةِ . وَبَايَعُوْهُ لِمَا كَانَ اَفْضَلَ اَهْلِ عَصْرِهٖ . وَاَوْلَهُمْ بِالْخِلَافَةِ وَمَا وَقَعَ مِنَ الْمُخَالَفَاتِ وَالْمُحَارَبَاتِ لَمْ يَكُنْ مِنْ نِزَاعٍ فِى خِلَافَتِهٖ بَلْ عَنْ خَطَأٍ فِى الْاِجْتِهَادِ وَمَا وَقَعَ مِنَ الْاِخْتِلَافِ بَيْنَ الشِّيْعَةِ وَاَهْلِ السُّنَّةِ فِىْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ . وَادِّعَاءِ كُلٍّ مِنَ الْفَرِيْقَيْنِ النَّصَّ فِىْ بَابِ الْاِمَامَةِ وَاِيْرَادِ الْاَسْئِلَةِ وَالْاَجْوِبَةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَمَذْكُوْرٌ فِى الْمُطَوَّلَاتِ .

সহজ তরজমা

তাদের খেলাফত অর্থাৎ দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে এমনভাবে রাসূলে কারীম ﷺ এর প্রতিনিধি হওয়া যে, সকল উম্মতের উপর তাদের অনুসরণ আবশ্যক হয়, তা-ও উক্ত ক্রমানুসারে বিন্যস্ত। অর্থাৎ রাসূলে কারীম ﷺ এর পরে খেলাফত হযরত আবু বকর রাযি. এর, এরপর হযরত উমর রাযি. এর, এরপর হযরত উসমান রাযি. এর এরপর হযরত আলী রাযি. এর। তার কারণ, রাসূলে কারীম ﷺ এর তিরোধানের দিন সাহাবায়ে কিরাম সকীফায়ে বনী সাইদায় সমবেত হন। পারস্পরিক পরামর্শ ও বাদানুবাদের পর হযরত আবু বকর রাযি. এর খেলাফতের উপর তাদের মতামত চূড়ান্ত হয়ে যায়। এরপর সকলেই এর উপর ঐক্যমত হোন। হযরত আলী রাযি. ও কিছুদিন নীরবতা অবলম্বনের পর গণসমাবেশে তার হাতে বাই'আত গ্রহণ করে ফেলেন। খেলাফত যদি তার হক না হত, তাহলে সাহাবায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত হতেন না। হযরত আলী রাযি. তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হতেন। যেমন, তিনি হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিলেন। আর তাঁর স্বপক্ষে যদি কোন নছ বা প্রমাণ থাকত, তবে তিনি সে প্রমাণ সাহাবায়ে কিরামের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতেন। তাছাড়া সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে বাতিলের উপর একমত হওয়া এবং অবতীর্ণ নসের উপর আমল পরিত্যাগ করার কথা কিভাবে কল্পনা করা যায়? এরপর যখন হযরত আবু বকর রাযি. জীবনের আশা ছেড়ে দিলেন, তখন হযরত উসমান রাযি. ডেকে এনে নিজের অঙ্গিকারনামা লেখালেন। অঙ্গিকারনামা লেখা শেষ হলে তাতে সীল মোহর লাগালেন। পেশ করলেন গণমানুষের সম্মুখে। তাদেরকে নির্দেশ দিলেন– এ সীল মোহরযুক্ত পত্রে যার নাম রয়েছে, তোমরা তার হাতে বাই'আত গ্রহণ কর। সকল সাহাবায়ে কিরাম বাই'আত হলেন। এমনকি হযরত আলী রাযি. এর কাছে পত্রটি পৌঁছুলে তিনি বলেন– এতে যার নাম আছে, আমি তাঁর হাতে বাই'আত হলাম। যদিও সে নাম হয় উমর

রাযি. এর। মোটকথা হযরত উমর রাযি. এর খেলাফতের উপর ঐকমত্য হয়।

পরবর্তীতে তাকে শহীদ করে দেওয়া হয়। তিনি খেলাফতের বিষয়টি ছয় সদস্যের একটি পরামর্শ সভা তথা (১) হযরত উসমান রাযি. (২) হযরত আলী রাযি. (৩) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. (৪) তলহা রাযি. (৫) যুবাইর রাযি. এবং (৬) সা'আদ ইবনে আবী ওয়াককাস রাযি. এর উপর ন্যস্ত করে যান। এরপর তাঁদের পাঁচজনই এ বিষয়টির দায়িত্বভার হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. এর কাঁধে সমর্পণ করেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তের উপর সন্তোষ প্রকাশ করেন। তখন তিনি হযরত উসমান রাযি. কে মনোনীত করেন। সাহাবায়ে কিরামের এক বৈঠকে তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। এরপর অন্যান্য লোকজন তার হাতে বাই'আত হন। তাঁর আনুগত্য মেনে নেন। তার সাথে জুমা ও ঈদের নামায পড়েন। তখন ইজমা (ঐকমত্য) হয়ে গেল। পরবর্তীতে তাঁকে শহীদ করে দেওয়া হয়। তিনি (খলীফা নির্বাচনের) বিষয়টি অমীমাংসিত রেখে যান। তখন বড় বড় মুহাজির এবং আনসারগণ হযরত আলী রাযি. ব্যাপারে একমত হন। খেলাফতের আসন গ্রহণ করার জন্য তাঁর কাছে দরখাস্ত করেন এবং তার হাতে বাই'আত হন। কেননা তিনি ছিলেন সমকালের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং খেলাফতের অধিক হকদার। আর হযরত আলী রাযি. এবং হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর মাঝে যেসব মতবিরোধ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে, সেগুলো খিলাফত নিয়ে সৃষ্ট বিবাদের কারণে হয়নি বরং ভুল ইজতিহাদের দরুন হয়েছে। এ ব্যাপারে (খিলাফতের মাসআলায়) শী'আ ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মধ্যে সৃষ্ট মতবিরোধ, ইমামতের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষেরই স্বতন্ত্র নছ (কুরআন-হাদীসের প্রমাণ) থাকার দাবী করা এবং উভয় পক্ষ থেকে সুওয়াল-জওয়াব উপস্থাপন সবই বড় বড় কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ فِى سَقِيْفَةِ بَنِى سَاعِدَةَ الخ ঃ সকীফা অর্থ ছাদ বিশিষ্ট এমন স্থান, যার এক বা একাধিক দিকে খোলা থাকে, কোন দেয়াল থাকে না। একে করিডোরও বলে। আর বনূ সাইদা আনসারদের একটি বংশের নাম।

চার খলীফার খিলাফত অবিতর্কিত

قَوْلُهُ : بَعْدَ تَوَقُّفٍ كَانَ مِنْهُ ঃ কোন কোন ঐতিহাসিক রিওয়ায়েতে নীরবতার কারণ বলা হয়েছে, খলীফা নির্বাচনের পরামর্শে তাঁকে শরীক না করা। যেমন, তারিখে ইসলাম গ্রন্থে আল্লামা আকবর শাহ নাজীরাবাদী লিখেছেন– হযরত আলী রাযি. একদিন হযরত আবু বকর রাযি. এর কাছে এসে বললেন, আমি আপনার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করি। আপনাকে খেলাফতের যোগ্যও মনে করি। কিন্তু আপত্তি হল, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আত্মীয়। আপনি সাকীফায়ে বানী সাইদায় আমার সাথে পরামর্শ ব্যতিত কেন লোকদের বাই'আত নিলেন? আমাকে যদি সেখানে ডেকে পাঠাতেন, তাহলে আমিও সবার আগে আপনার হাতে বাই'আত হতাম। হযরত আবু বকর রাযি. বললেন– রাসূলে কারীম ﷺ এর আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা আমার কাছে আপন-আত্মীয় স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করার চেয়েও অধিক প্রিয়। আমি সকীফায়ে বনী সাইদায় বাই'আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে যাইনি বরং মুহাজির ও আনছারগণের বাক-বিতণ্ডা নিরসন করা অথিত জরুরী ছিল। আমি স্বয়ং নিজের জন্য বাই'আতের দরখাস্তও করিনি নাই বরং উপস্থিত লোকজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার হাতে বাই'আত হয়েছে। তখন যদি আমি বাই'আত গ্রহণ করাকে মূলতবী রাখতাম, তাহলে এ আশংকা পুনরায় আরও শক্তিশালী হয়ে দিকবিদিক ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। অথচ তোমরা দাফন-কাফনের কাজে ব্যস্ত ছিলে। এমন তাড়াহুড়ার সময় আমি তোমাদেরকে ডাকি কিভাবে? হযরত আলী রাযি. একথা শুনে তৎক্ষণাত আপত্তি প্রত্যাহার করে নিলেন। পরের দিন মসজিদে নববীতে সাধারণ বৈঠকে জনসম্মুখে হযরতে আবু বকর রাযি.এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন।

قَوْلُهُ : لَوْلَمْ تَكُنِ الْخِلَافَةُ حَقًّالَهُ ঃ অর্থাৎ যদি হযরত আবু বকর রাযি. খেলাফতের যোগ্য না হতেন, তাহলে সাহাবায়ে কিরাম তার ব্যাপারে একমত হতেন না। কেননা হাদীসের আলোকে বোধগম্য যে, এ উম্মত কখনো বাতিল ও ভ্রান্তির উপর একমত হবে না। বিশেষতঃ রাসূলে কারীম ﷺ এর সাহাবায়ে কিরাম, যারা নবীগণের পর শ্রেষ্ঠ মানুষ।

قَوْلُهُ : وَمَا وَقَعَ مِنَ الْاِخْتِلَافِ وَالْمُحَارَبَاتِ الخ ঃ এতে জংগে জামাল ও জংগে সিফফীনের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। খেলাফতের ব্যাপারে হযরত আলী রাযি. মতবিরোধের কারণে নয় বরং ভুল ইজতিহাদের কারণে এসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। হযরত আলী রাযি. এর জ্ঞানে হযরত উসমান রাযি. ঘাতকদের উপর তাৎক্ষণিক কিসাস

গ্রহণে বিদ্রোহের আশঙ্কা ছিল। এজন্য হযরত আলী রাযি. মনে করলেন, খেলাফতের বিষয়টি স্থিতিশীল হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। অপর দিকে হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর দল, যাতে হযরত আয়েশা রাযি. অগ্রণী ছিলেন। তাঁরা তৎক্ষণাত কিসাস গ্রহণ করাকে আবশ্যক মনে করতেন। যাতে জনসাধারণ শীর্ষস্থানীয়দের উপর জুলুম করার ধৃষ্ঠতা না দেখাতে পারে।

وَالْخِلَافَةُ ثَلٰثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ بَعْدَهَا مُلْكٌ وَإِمَارَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْخِلَافَةُ بَعْدِيْ ثَلٰثُوْنَ سَنَةً. ثُمَّ يَصِيْرُ بَعْدَهَا مُلْكًا عَضُوْضًا. وَقَدِ اسْتُشْهِدَ عَلِيٌّ رض عَلٰى رَأْسِ ثَلٰثِيْنَ سَنَةً مِنْ وَفَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمُعَاوِيَةُ رض بَعْدَهٗ لَا يَكُوْنُوْنَ خُلَفَاءَ بَلْ مُلُوْكًا وَأُمَرَاءَ. وَهٰذِهٖ مُشْكِلٌ. لِأَنَّ أَهْلَ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنَ الْأُمَّةِ قَدْ كَانُوْا مُتَّفِقِيْنَ عَلٰى خِلَافَةِ الْخُلَفَاءِ الْعَبَّاسِيَّةِ وَبَعْضِ الْمَرْوَانِيَّةِ. كَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ رح مَثَلًا وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْخِلَافَةَ الْكَامِلَةَ الَّتِيْ لَا يَشُوْبُهَا شَيْءٌ مِنَ الْمُخَالَفَةِ وَمَيْلٌ عَنِ الْمُتَابَعَةِ تَكُوْنُ ثَلٰثِيْنَ سَنَةً. وَبَعْدَهَا قَدْ تَكُوْنُ وَقَدْ لَا تَكُوْنُ. ثُمَّ الْإِجْمَاعُ عَلٰى أَنَّ نَصْبَ الْإِمَامِ وَاجِبٌ. وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيْ أَنَّهٗ يَجِبُ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى أَوْ عَلَى الْخَلْقِ. بِدَلِيْلٍ سَمْعِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ. وَالْمَذْهَبُ أَنَّهٗ يَجِبُ عَلَى الْخَلْقِ سَمْعًا لِقَوْلِهٖ ص مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهٖ فَقَدْ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً. وَلِأَنَّ الْأُمَّةَ قَدْ جَعَلُوْا أَهَمَّ الْمُهِمَّاتِ بَعْدَ وَفَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَصْبَ الْإِمَامِ. حَتّٰى قَدَّمُوْهُ عَلَى الدَّفْنِ. وَكَذَا بَعْدَ مَوْتِ كُلِّ إِمَامٍ وَلِأَنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ. كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهٖ.

সহজ তরজমা

খিলাফতের মেয়াদ ত্রিশ বছর। তারপর রাজত্ব ও শাসন (আমীরী)। কেননা রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– আমার পরে ত্রিশ বছর পর্যন্ত থাকবে খিলাফত। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে শোষণের রাজত্ব (জালিম রাজত্ব)। হযরত আলী রাযি. রাসূলে কারীম ﷺ এর তিরোধানের ত্রিশ বছর পূরণের পর শহীদ হয়েছেন। সুতরাং হযরত মু'আবিয়া রাযি. এবং তার পরবর্তীগণ খলীফা নন বরং রাজা-বাদশা ও আমীর। এ বিষয়টি আপত্তিকর। কেননা উম্মতের মুজতাহিদগণ আব্বাসীয় খলীফাগণ এবং কোন কোন মারওয়ানিয়া খলীফা যেমন, হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. এর খেলাফতের ব্যাপারে একমত। আর সম্ভাবনা আছে যে, হাদীসের মর্ম হবে– পরিপূর্ণ খেলাফত, যাতে ইসলামী নীতির বিরোধিতা এবং শরী'আতের অনুসরণ থেকে বিমূখতার কোন লেশমাত্র নেই, সে খেলাফত ত্রিশ বছর পর্যন্ত থাকবে। তারপর খেলাফত কখনও হবে আবার কখনও হবে না। এরপর ইমাম (ও খলীফা) নিযুক্ত করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মতানৈক্য শুধু, ওয়াজিব কি আল্লাহর ওপর নাকি মাখলূকের ওপর? শ্রুত প্রমাণের আলোকে নাকি যৌক্তিকভাবে –এ নিয়ে। হকপন্থীদের মতে মাখলূকের উপর শ্রুত প্রমাণাদির আলোকে ওয়াজিব। কেননা নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মারা গেল যে, তার সমকালের ইমাম ও খলীফার কোন খবরই নেই, তবে সে জাহেলিয়্যাতের মরা মরল। কেননা উম্মত নবীজীর তিরোধানের পর ইমাম ও খলীফা নিযুক্ত করাকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সাব্যস্ত করেছে। এমনকি (নবীজীর) কাফন-দাফনের উপরেও অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অনুরূপভাবে প্রত্যেক ইমামের ইন্তেকালের পর (তাকে সমাহীত করার পূর্বে পরবর্তী খলীফা নির্বাচন করেছেন।) কেননা বহু শরঈ ওয়াজিব কাজ ইমামের উপর নির্ভরশীল। (সেগুলো ইমাম ব্যতীত বাস্তবায়িত হতে পারে না।) যেমন, মূল গ্রন্থকার তাঁর পরবর্তী বাক্যে সেই দিকে ইংগিত করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

খিলাফতের মেয়াদ

খিলাফত তথা দ্বীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে রাসূলে কারীম ﷺ এর প্রতিনিধিত্ব তারই ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক একাধারে ত্রিশ বছর পর্যন্ত ছিল। হযরত আলী রাযি. এর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে সে মেয়াদ প্রায় পুরা হয়ে গেছে। বস্তুতঃ এ ত্রিশ বছর পূর্ণ হয়েছে হযরত হাসান ইবনে আলী রাযি. ছয় মাস পর্যন্ত খেলাফতের দায়িত্ব পালনের পর যখন হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর হাতে খেলাফতের দায়িত্ব চলে যায়। কেননা হযরত উমর রাযি. খেলাফতকাল দু বছর ছয় মাস। হযরত আবু বকর রাযি. এর খেলাফতকাল দশ বছর ছয় মাস। হযরত আলী রাযি. এর খেলাফতকাল চার বছর নয় মাস। সর্বমোট, ঊনত্রিশ বছর ছয় মাস হয়েছে। এজন্য হযরত আলী রাযি. এর শাহাদাতে মূলতঃ ত্রিশ বছর পরিপূর্ণ হয় না বরং প্রায় ত্রিশ বছর হয়।

পরিপূর্ণ খিলাফত হবে ত্রিশ বছর

قَوْلُهُ : وَهٰذَا مُشْكِلٌ..الخ ঃ অভিযোগ সুস্পষ্ট। ব্যাখ্যাতা لَعَلَّ الْمُرَادَ ..الخ বলে যে জবাব দিয়েছেন, তার সারকথা হল, اَلْخِلَافَةُ بَعْدِىْ ثَلَاثُوْنَ عَامًا হাদীসটির মধ্যে পরিপূর্ণ খেলাফত তথা খেলাফত আলা মিন্হাজিন নবুয়্যাহ উদ্দেশ্য। হাদীসটির মর্ম হল, একাধারে ধারাবাহিকভাবে খেলাফতে কামেলা বা পরিপূর্ণ খেলাফতের মেয়াদ ত্রিশ বছর থাকবে। অতঃপর সে ধারাবাহিকতা ভেঙে যাবে। কখনও তেমন খেলাফত হবে; আবার কখনও হবে না।

ইমাম নিযুক্ত করা ওয়াজিব

قَوْلُهُ : ثُمَّ الْاِجْمَاعُ عَلٰى اَنَّ نَصَبَ الْاِمَامِ وَاجِبٌ ঃ কেবল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতই নয় বরং তৎসঙ্গে মুতাযিলী এবং শী'আ তিনটি মাযহাবই ইমাম নিযুক্ত করার ব্যাপারে একমত। তবে শী'আ সম্প্রদায় মনে করে, ইমাম নিযুক্ত করা আল্লাহর তা'আলার উপর ওয়াজিব। আর আহলে সুন্নাত এবং মুতাযিলী উভয়ই ইমাম নিযুক্ত করা উম্মতের উপর ওয়াজিব মনে করে। অধিকন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে ইমাম নিযুক্ত করা শরী'আতের দৃষ্টিতে উম্মতের উপর ওয়াজিব। প্রমাণ নিম্নরূপ।

(১) রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, সে তার সমকালের ইমাম সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল, তাহলে সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করল।

(২) রাসূলে কারীম ﷺ এর তিরোধানের পর সাহাবায়ে কিরাম সর্বসম্মতভাবে খলীফা নিযুক্ত করা জরুরী মনে করেছেন। এমনকি এ কাজটি (খেলাফতের বিষয়টি মীমাংসা করা) এতোধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন যে, নবীজীর কাফন-দাফনের পূর্বে বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

(৩) বহুবিধ দ্বীনী বিষয় যেমন, শরঈ বিধি-বিধান কার্যকর করা ইত্যাদি ইমাম ছাড়া সমাধা হতে পারে না। আর এ কথা বিদিত যে, ওয়াজিব যে সব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল থাকে, তা-ও ওয়াজিব হয়।

পক্ষান্তরে মু'তাযিলীরা বলে– উম্মতের উপর ইমাম বা খলীফা নিযুক্ত করা যৌক্তিভাবে ওয়াজিব। কেননা প্রতিটি দলের এমন শক্তি থাকা প্রয়োজন, যা উম্মতের সদস্যদের বিবাদ মিটাবে এবং রাষ্ট্রে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় দায়িত্বশীল হবে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিবেক এবং শরী'আত উভয়ই খলীফা ও ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তায় একমত। বিবেক জাতির স্থিতিশীলতার দাবী করে। আর শরী'আত জাতির দিক নির্দেশনা ও পথপদর্শনের জন্য এমন একজন উন্নত আদর্শবান ব্যক্তির প্রত্যাশা করে, যার শক্তির উৎসমূল হবে জনগণের বা উম্মতের শক্তি, তার ব্যক্তিগত মান-মর্যাদা নয়।

وَالْمُسْلِمُوْنَ لَابُدَّلَهُمْ مِنْ اِمَامٍ يَقُوْمُ بِتَنْفِيْذِ اَحْكَامِهِمْ وَاِقَامَةِ حُدُوْدِهِمْ وَسَدِّ ثُغُوْرِهِمْ وَتَجْهِيْزِ جُيُوْشِهِمْ وَاَخْذِ صَدَقَاتِهِمْ وَقَهْرِ الْمُتَغَلِّبَةِ وَالْمُتَلَصِّصَةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيْقِ ـ وَاِقَامَةِ الْجُمَعِ وَالْاَعْيَادِ وَقَطْعِ الْمُنَازَعَاتِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَبُوْلِ الشَّهَادَاتِ الْقَائِمَةِ عَلَى الْحُقُوْقِ وَتَزْوِيْجِ الصِّغَارِ وَالصَّغَائِرِ الَّذِيْنَ لَا اَوْلِيَاءَ لَهُمْ وَقِسْمَةِ الْغَنَائِمِ وَنَحْوِ ذَالِكَ مِنَ الْاُمُوْرِ الَّتِىْ لَايَتَوَلَّاهَا اٰحَادُ الْاُمَّةِ ـ فَاِنْ قِيْلَ لِمَ لَايَجُوْزُ الْاِكْتِفَاءُ بِذِىْ شَوْكَةٍ فِىْ كُلِّ نَاحِيَةٍ ـ وَمِنْ اَيْنَ يَجِبُ نَصْبُ مَنْ لَهُ الرِّيَاسَةُ الْعَامَّةُ ـ قُلْنَا لِاَنَّهُ يُؤَدِّىْ اِلٰى مُنَازَعَاتٍ وَمُخَاصَمَاتٍ مُفْضِيَةٍ اِلٰى اِخْتِلَالِ اَمْرِ الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا ـ كَمَا نُشَاهِدُ فِىْ زَمَانِنَا هٰذَا ـ فَاِنْ قِيْلَ فَلْيَكْتَفِ بِذِىْ شَوْكَةٍ لَهُ الرِّيَاسَةُ الْعَامَّةُ اِمَامًا كَانَ اَوْ غَيْرَ اِمَامٍ ـ فَاِنَّ اِنْتِظَامَ الْاَمْرِ يَحْصُلُ بِذَالِكَ كَمَا فِىْ عَهْدِ الْاَتْرَاكِ قُلْنَا نَعَمْ يَحْصُلُ بَعْضُ النِّظَامِ فِىْ اَمْرِ الدُّنْيَا وَلٰكِنْ يَخْتَلُّ اَمْرُ الدِّيْنِ ـ وَهُوَ الْاَمْرُ الْمَقْصُوْدُ الْاَهَمُّ وَالْعُمْدَةُ الْعُظْمٰى ـ فَاِنْ قِيْلَ فَعَلٰى مَاذُكِرَ مِنْ اَنَّ مُدَّةَ الْخِلَافَةِ ثَلٰثُوْنَ سَنَةً يَكُوْنُ الزَّمَانُ بَعْدَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ خَالِيًا عَنِ الْاِمَامِ ـ فَيَعْصِى الْاُمَّةُ كُلُّهُمْ وَيَكُوْنُ مَيْتَتُهُمْ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً ـ قُلْنَا قَدْ سَبَقَ اَنَّ الْمُرَادَ اَلْخِلَافَةُ الْكَامِلَةُ ـ وَلَوْ سُلِّمَ فَلَعَلَّ دَوْرَ الْخِلَافَةِ تَنْقَضِىْ دُوْنَ دَوْرِ الْاِمَامَةِ بِنَاءً عَلٰى اَنَّ الْاِمَامَةَ اَعَمُّ ـ لٰكِنَّ هٰذَا الْاِصْطِلَاحَ مِمَّا لَمْ نَجِدْهُ مِنَ الْقَوْمِ بَلْ مِنَ الشِّيْعَةِ مَنْ يَّزْعَمُ اَنَّ الْخَلِيْفَةَ اَعَمُّ ـ وَلِهٰذَا يَقُوْلُوْنَ بِخِلَافَةِ الْاَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ دُوْنَ اِمَامَتِهِمْ ـ وَاَمَّا بَعْدَ الْخُلَفَاءِ الْعَبَّاسِيَّةِ فَالْاَمْرُ مُشْكِلٌ ـ

সহজ তরজমা

মুসলমানদের জন্য একজন ইমাম থাকা আবশ্যক। তিনি তাদের উপর শরঈ বিধান কার্যকর করবেন। দণ্ডবিধি প্রয়োগ করবেন। তাদের ভৌগলিক সীমা (রাষ্ট্রের সীমান্ত) রক্ষা করবেন। তাদের সৈন্য গঠন (তাদের সেনা অভিযান পরিচালনা) করবেন। তাদের থেকে সদকা উসূল করবেন। অত্যাচারী জালেম, ছিন্তাইকারী, সন্ত্রাস ও চোর-ডাকাত দমন করবেন। জুমা ও ঈদের নামাযের ব্যাবস্থা করবেন। মানুষের মাঝে সৃষ্ট বিবাদ মীমাংসা করবেন। বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে প্রদত্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন। অভিভাবক বিহীন না বালক ছেলেমেয়েদের বিয়ে-শাদী দিবেন। গনীমতের মাল বণ্টন করবেন। এছাড়া সে সব কাজ (সামাধা করবেন), যেগুলো সাধারণ উম্মত (জনসাধারণ) সমাধান করতে পারে না। সুতরাং যদি প্রশ্ন করা হয়, প্রত্যেক এলাকায় একজন ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী ব্যক্তিকে যথেষ্ট মনে করা কেন জায়েয নয়? গোটা ইসলামী রাজত্বের জন্য এমন কাউকে খলীফা নিযুক্ত করা, যার শাসন ক্ষমতা ব্যাপক বিস্তৃত হবে –একথা কোথায় আছে? আমরা জবাব দেব– তার (প্রত্যেক এলাকা ভিত্তিক খলীফা নিযুক্ত করা জায়েয না হওয়ার) কারণ হল, তা পারস্পরিক এমন কলহ-বিবাদ সৃষ্টির কারণ হবে, যা দ্বীন-দুনিয়ার কাজকর্ম বরবাদ হওয়ার (ধ্বংসের) কারণ হবে। যেমন, আমরা বর্তমানকালে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি (মুসলমান শাসকগণ পরস্পর মারমুখো হয়ে গেছে।)

এরপর যদি বলা হয়- এমন ব্যক্তিকে যথেষ্ট ধরে নেওয়া হোক, গোটা ইসলামী রাজত্বে যার ক্ষমতা ও প্রতাপ রয়েছে। চাই তিনি ইমাম হোন (অর্থাৎ ইমামতের গুণাবলি ও শর্তাবলি বিদ্যমান থাকা। যেমন, কুরাইশী হওয়া) অথবা তিনি ইমাম না হোন (অর্থাৎ ইমামতের গুণাবলি ও শর্তাবলি বিদ্যমান না থাকা। যেমন, তিনি কুরাইশী নন)। কেননা (দ্বীন-দুনিয়ার) কাজ-কারবার, শান্তি-শৃংখলা ও শাসনকার্য তার দ্বারাই হয়ে যাবে। যেমন, তুর্কী মুসলমান বাদশাদের যুগে হয়েছে। আমরা জবাব দেব- দুনিয়াবী কাজের কিছু শৃঙ্খলা (যেমন, ইসলামী সীমান্ত) রক্ষা পাবে বটে, কিন্তু দ্বীনী কাজে (যেমন, জুমা ও ঈদের নামায ইত্যাদি পালনে) ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। (কেননা এসব কাজের জন্য ইমাম থাকা আবশ্যক।) অথচ এটাই (দ্বীনী কাজকর্ম আঞ্জাম দেওয়াই ইমাম নিযুক্ত করার) মূখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। এরপর যদি উপরিউক্ত আলোচনা তথা "খেলাফতের মেয়াদ ত্রিশ বছর" এর উপর ভিত্তি করে প্রশ্ন করা হয় যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের পরবর্তী যুগ ইমাম শূন্য থাকবে। এতে গোটা উম্মত গোনাহগার হবে এবং উক্ত হাদীসের দৃষ্টিতে তাদের সকলের মৃত্যুই জাহেলিয়্যাতের মৃত্যু হবে।

আমরা জবাব দেব- পূর্বেই বলা হয়েছে, (খেলাফত বলতে) পরিপূর্ণ খেলাফত উদ্দেশ্য। আর যদি ধরেও নেওয়া হয়, মুতলাক বা সাধারণ খেলাফত উদ্দেশ্য, তাহলে দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে, সম্ভবতঃ খেলাফতের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে; ইমামতের মেয়াদ শেষ হবে না। কেননা খেলাফত অপেক্ষা ইমামত (নেতৃত্ব) ব্যাপক। কিন্তু এ পরিভাষা আমরা কারও কাছে পাইনি বরং কোন কোন শী'আর মতে (এর বিপরীত) খেলাফত আম। বিধায় তারা তিন ইমামের খেলাফত তো স্বীকার করে; তাদের ইমামত স্বীকার করে না। রইল আব্বাসীয় খলীফাদের পরবর্তীকালের কথা। সুতরাং এ ব্যাপারটি জটিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব

গ্রন্থকার উপরিউক্ত মূলপাঠে মুসলমানদের খলীফাও ইমামের পদীয় দায়িত্বের বিবরণ দিয়েছেন। যার সারকথা হল, ইসলামী বিধি-বিধান চালু করা, শরঈ দণ্ডবিধি কার্যকর করা, ধর্মীয় নীতিমালা বা উসূলে দ্বীনের তাবলীগ ও প্রচার, শরঈ ইলমের প্রসার, মামলা-মোকাদ্দমার মীমাংসা, জনগণ ও রাষ্ট্রীয় শান্তি-নিরাপত্তা বিধান, ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষা ইত্যাদি ইসলামী খলীফার পদীয় দায়িত্ব। মোটকথা, মুসলমানদের খলীফা ধর্ম ও রাজনীতির সমস্ত জ্ঞানগত ও কার্যগত গুণাবলিতে রাসূল কারীম ﷺ এর সত্যিকার প্রতিনীধি হতে হবে। যখন মুসলমানদের খলীফা এসব গুণের আধার হবেন, তখন তার খেলাফতকে খেলাফতে রাশেদাহ ও নববী আদর্শের খেলাফত বলা হবে। পূর্বে বলা হয়েছে, অধিকাংশ মুসলমান ইমাম বা খলীফা নির্ধারণ করাকে জরুরী মনে করেন। তবে আল্লামা ইবনে খালদূন রহ. তার "মুকাদ্দমায়" এমন একটি সম্প্রদায়ের কথাও উল্লেখ করেছেন, যারা খলীফা নির্ধারণ করাকে জরুরী মনে করে না। মুতাযিলার মধ্যে আসমা এবং খারেজী সম্প্রদায় এ দলভুক্ত। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, উম্মতের মধ্যে খোদায়ী বিধান বা আল্লাহর আইন চালু হওয়া। কিন্তু যখন সে আইন-কানুন সাংবিধানিক মর্যাদা লাভ করে এবং রাষ্ট্রে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন কোন ইমাম ও খলীফার প্রয়োজন নেই বরং প্রত্যেক এলাকায় যে ব্যক্তি প্রভাবশালী কিংবা গোটা ইসলামী রাষ্ট্রে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা যার আছে, সেই যথেষ্ট। তার মধ্যে ইমামতের শর্তাবলি থাকুক চাই না থাকুক।

বস্তুতঃ খোলফায়ে রাশেদীনের পরবর্তী খলীফাদের মধ্যে রাজত্বের প্রভাবে যে চারিত্রিক অবনতি ঘটেছে, তাতে প্রভাবিত ও কুধারণা নিয়ে সেসব লোক এ মত পোষণ করেছে। এ দিকটি ভ্রান্ত হওয়ার কারণ হল, এমন ব্যক্তি দ্বারা শান্তি-নিরাপত্তা ইত্যাদি দুনিয়াবী কিছু সমস্যা সমাধান হবে ঠিক, কিন্তু দ্বীনের বহুবিধ কাজ যেমন, দণ্ডবিধি প্রয়োগ ইত্যাদি যেগুলো কেবল ইমাম ও খলীফা দ্বারাই সম্পাদিত হতে পারে, সেগুলো সম্পূর্ণ বেকার-অচলাবস্থায় পড়ে থাকবে। অথচ দ্বীনী বিধি-বিধান চালু করাই ইমাম ও খলীফা নির্দিষ্ট করার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্যে।

قَوْلُهُ: فَعَلَى مَاذُكِرَ مِنَ اَنَّ مُدَّةَ الْخِلَافَةِ ..الخ ঃ অর্থাৎ খেলাফতের মেয়াদ কাল যখন রাসূলে কারীম ﷺ এর ওফাতের পর মাত্র ত্রিশ বছর ছিল, তখন তার পরবর্তী যুগ ইমাম ও খলীফা শূন্য হবে এবং গোটা উম্মত ওয়াজিব বর্জনের কারণে গুনাহগার হবে। রাসূলে কারীম ﷺ এর হাদীস مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ

الخلافة بعدي فقد مات ميتة جاهلية এর আলোকে তার মৃত্যু জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু হবে। অথচ পূর্বোক্ত ثلثون عاما হাদীসে রাসূলের মধ্যে খেলাফতে কামেলা বা পূর্ণাঙ্গ খেলাফত এবং খেলাফতে রাশেদা উদ্দেশ্য। হাদীসটির মর্মার্থ হবে, একাধারে ধারাবাহিকভাবে খেলাফতে রাশেদার যুগ থাকবে ত্রিশ বছর। তারপর হুকুমত ও রাজত্বের প্রাচীর তৈরী হওয়ায় সে ধারাবাহিকতা ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু তারপরও কখনও কখনও খলীফায়ে রাশেদ হতে থাকবেন। কাজেই উক্ত প্রশ্ন উঠবে না। তবে ব্যাখ্যাতা কর্তৃক সামনে প্রশ্নটি উত্থাপন করার উদ্দেশ্য হল, উপরিউক্ত জবাবের পুনরাবৃত্তি এবং তার উপর আরেকটি জবাব সংযুক্ত করা। দ্বিতীয় জবাবটি ইমাম ও খলীফার পার্থক্যের উপর নির্ভরশীল। আর তা হল, খলীফা ঐ ব্যক্তি, যার রাজত্ব রাসূলে কারীম ﷺ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ অনুযায়ী হবে। কিন্তু ইমাম আম। কেননা ইমাম ঐ ব্যক্তি, সাধারণ মুসলমানের উপর যার কর্তৃত্ব রয়েছে বা যিনি ক্ষমতাসীন। তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ ও সুন্নাতের উপর থাকুন চাই না থাকুন। সুতরাং হাদীস মোতাবেক ত্রিশ বছরের মাথায় খেলাফতের যুগ শেষ হয়ে গেছে। তবে ইমামতের যুগ শেষ হয়নি। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মুতাকাল্লিমীন থেকে এ পার্থক্য বর্ণিত নেই। বরং কিছু সংখ্যা শী'আ উল্টো খলীফাকে আম মনে করে। তারা বলে, খলীফা দ্বারা সুলতান বা শাসক উদ্দেশ্য। চাই তিনি ন্যায়পরায়ণ হোন বা জালিম হোন। পক্ষান্তরে ইমাম নিশ্চয় তাদের কথিত বার ইমামের একজন হবে। যাদের সবাই নিষ্পাপ। একারণে তারা তিন ইমাম তথা হযরত আবু বকর রাযি., হযরত উমর রাযি. এবং হযরত উসমান রাযি. এর খেলাফত তো স্বীকার করে। সেমতে তাঁদেরকে প্রথম খলীফা, দ্বিতীয় খলীফা, তৃতীয় খলীফা অভিহিত করে। কিন্তু তাদের ইমামতের কথা স্বীকার করে না। এজন্য দ্বিতীয় জবাবটি আপত্তিজনক। প্রথম জবাবটিই যথার্থ ও বিশুদ্ধ। তদুপরি আব্বাসীয় খলীফাদের পরবর্তী যুগের দিক থেকে প্রশ্ন থেকে যায়। কেননা তাদের পরে পূর্ণাঙ্গ খেলাফত বা অপূর্ণাঙ্গ, ক্রুটিপূর্ণ খেলাফত কোনটিই অবশিষ্ট নেই। কারণ, হাদীসের আলোকে পূর্ণাঙ্গ খেলাফত তো হযরত আলী রাযি. কিংবা হযরত হাসান ইবনে আলী রাযি. এর মাধ্যমেই শেষ হয়ে গেছে। আর অপূর্ণাঙ্গ ক্রুটিপূর্ণ খেলাফত অবশিষ্ট না থাকার কারণ হল, আব্বাসীয় খলীফাদের পরবর্তী যুগে গোটা ইসলামী রাষ্ট্রে কোন কুরাইশী বংশোদ্ভূত ব্যক্তির একক সার্বজনীন নেতৃত্ব ছিল না। আর কুরাইশী লোক ছাড়া অন্য কাউকে খলীফা নিযুক্ত করা الائمة من قريش হাদীসের আলোকে জায়েয নয়। কাজেই উম্মত ওয়াজিব বর্জনের কারণে গুনাহগার হবে।

এ প্রশ্নের একটি জবাব হচ্ছে, সতর্কবাণী এসেছে, ইচ্ছা-কৃতভাবে বর্জন করার ব্যাপারে। উম্মত ইচ্ছাকৃতভাবে ইমাম নির্ধারণ বা ইমাম নির্বাচন বর্জনের গুনাহে লিপ্ত নয় বরং অনৈচ্ছিক ও অপারগতার বশে এমনটি হয়েছে। দ্বিতীয় জবাব হল, من مات ولم يعرف امام زمانه এর মধ্যে স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ এর সত্ত্বা উদ্দেশ্য।

ثم ينبغي ان يكون الامام ظاهرا ليرجع اليه . فيقوم بالمصالح . ليحصل ما هو الغرض من نصب الامام لا مختفيا من اعين الناس خوفا من الاعداء وما للظلمة من الاستيلاء ولا منتظرا خروجه عند صلاح الزمان وانقطاع مواد الشر والفساد واختلال نظام اهل الظلم والفساد . كما زعمت الشيعة خصوصا الامامية منهم ان الامام الحق بعد رسول الله ﷺ علي رض . ثم ابنه الحسن رض . ثم الحسين . ثم ابنه علي زين العابدين . ثم ابنه محمد الباقر . ثم ابنه جعفر الصادق . ثم ابنه موسى الكاظم . ثم ابنه علي الرضا . ثم ابنه محمد تقي . ثم ابنه علي النقي . ثم ابنه الحسن العسكري . ثم ابنه محمد القاسم المنتظر المهدي . وقد اختفى خوفا من اعدائه وسيظهر فيملأ الدنيا قسطا وعدلا . كما ملئت جورا وظلما . ولا امتناع في طول عمره . وامتداد ايام حيوته كعيسى والخضر وغيرهما . وانت خبير بان اختفاء الامام وعدمه سواء في عدم حصول الاغراض المطلوبة من وجود الامام . وان خوفه من

اَلْاَعْدَاءِ لَا يُوْجِبُ الْاِخْتِفَاءَ بِحَيْثُ لَا يُوْجَدُ مِنْهُ اِلَّا اِسْمٌ بَلْ غَايَةُ الْاَمْرِ اَنْ يُّوْجِبَ اِخْتِفَاءَ دَعْوَى الْاِمَامَةِ كَمَا فِىْ حَقِّ اٰبَائِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا ظَاهِرِيْنَ عَلَى النَّاسِ - وَلَا يَدَّعُوْنَ الْاِمَامَةَ وَاَيْضًا فَعِنْدَ فَسَادِ الزَّمَانِ وَاخْتِلَافِ الْاٰرَاءِ وَاسْتِيْلَاءِ الظَّلَمَةِ اِحْتِيَاجُ النَّاسِ اِلَى الْاِمَامِ اَشَدُّ وَانْقِيَادُهُمْ لَهُ اَسْهَلُ -

সহজ তরজমা

অতঃপর ইমাম প্রকাশ্যে থাকা চাই। যেন তার শরণাপন্ন হওয়া যায়। তিনি মানুষের কল্যাণে কাজ করবেন। যাতে ইমাম নির্বাচনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। শত্রু ও জালিমদের আধিক্যতার ভয়ে তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে গা-ডাকা দেবেন না। যুগের অবস্থা পরিস্থিতি ভাল হয়ে যাওয়া, ফেৎনা ফাসাদ-সন্ত্রাসের উৎসমূল খতম হওয়া এবং জালিম-অত্যাচারির দৌরাত্ম বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময় পর্যন্ত তার আত্মপ্রকাশের অপেক্ষাও করা হবে না। এমন নয়, যেমনটি শী'আ সম্প্রদায় বিশেষতঃ ইমামিয়াহ সম্প্রদায় বলে অর্থাৎ রাসূলে কারীম ﷺ এর পরে সত্যিকার ইমাম হযরত আলী রাযি.। অতঃপর তার পুত্র হযরত হাসান রাযি.। অতঃপর হাসানের ভাই হযরত হুসাইন রাযি.। অতঃপর যথাক্রমে আলী যাইনুল আবেদীন ইবনে হুসাইন রাযি., মুহাম্মদ বাকের ইবনে যাইনুল আবেদীন রাযি., জাফরে সাদেক ইবনে মুহাম্মদ বাকের, মূসা কাযিম ইবনে জাফরে সাদিক এবং আলী রেযা ইবনে মূসা কাযিম, মুহাম্মদ তাকী ইবনে মূসা কাযিম, আলী নকী ইবনে মুহাম্মদ তাকী, হাসান আসকারী ইবনে আলী নকী ও মুহাম্মদ কাসিম ইবনে হাসান আসকারী, তাঁরা প্রতীক্ষিত মাহ্দী। তাঁরা শত্রুদের আতংকে লোকচক্ষুর আড়াল হয়ে গেছেন। শীঘ্রই তাঁদের আত্মপ্রকাশ (আবির্ভাব) ঘটবে। তারা ন্যায়-নিষ্ঠায় পৃথিবীকে আলোকিত করবেন। যেরূপ বর্তমানে অন্যায়-জুলুমে পৃথিবী ঘেরা। তাদের দীর্ঘায়ূ ও দীর্ঘ জীবন লাভের পথে কোন অন্তরায় নেই। যেমন হযরত ঈসা (আ.) ও খিযির (আ.) প্রমুখ। অথচ আপনারা ভাল করেই জানেন, ইমামের আত্মগোপন এবং অস্তিত্বহীনতা উভয়ই ইমাম দ্বারা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন না হওয়ার ক্ষেত্রে সমান ও অভিন্ন। আপনারা আরও জানেন, শত্রুদের কারণে শঙ্কিত হওয়া এভাবে ইমামের আত্মগোপন দাবী করে না যে, কেবল তার নাম থাকবে (বা নাম স্বর্বস্ব ইমাম হওয়ার দাবী করে না) বরং বড়জোর ইমামতের দাবী গোপন রাখা কামনা করে। যেমন, তাদের পিতৃপুরুষ সম্পর্কে আমরা জানি, তারা জনসমক্ষে ছিলেন এবং ইমামতের দাবী করতেন না। তাছাড়া যুগের বিপর্যয় (ফেৎনা-ফাসাদের যুগে) পরামর্শদাতাদের বিভেদ এবং জালিমদের দৌরাত্মের সময় মানুষের জন্য ইমামের প্রয়োজন অত্যাধিক। জনগণের পক্ষে তার অনুসরণ করাও সহজতর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ইমাম আত্মগোপন করতে পারবেন না

শী'আদের মধ্যে ইমমিয়াদের আকীদা হল, রাসূলেল কারীম ﷺ এর পর ইমামের ক্রমধারা হযরত আলী রাযি. থেকে শুরু হয়ে বারতম ইমাম হযরত ইমাম মাহদী পর্যন্ত এসে সমাপ্ত হয়েছে। তিনি (ইমাম মাহদী) শত্রুদের ভয়ে দুইশত পাঁচ বা ছয় হিজরীতে এক গিরিগুহায় আত্মগোপন করেছেন। গুহাটির নাম "সুর্‌রা মান্‌রাআ।" এসব লোক প্রতি বছর নির্দিষ্ট একটি তারিখে ঐ গুহার সম্মুখে জড়ো হয়ে তার বের হওয়ার অপেক্ষা করে। অধিকন্তু তারা বলে– যখন পৃথিবী থেকে ফিৎনা-ফাসাদ শেষ হয়ে যাবে এবং বাতেলপন্থীদের দৌরাত্ম অবদমিত হয়ে যাবে, তখন হযরত মাহদী আত্মপ্রকাশ করবেন এবং পৃথিবীকে ন্যায়-নিষ্ঠায় আলোকিত করবেন, ন্যায়-নীতিতে পরিপূর্ণ করে দেবেন। গ্রন্থকার তাদের মতবাদ খণ্ডন করে বলেন– ইমামকে জনসমক্ষে থাকতে হবে, লোকচক্ষুর আড়ালে গা-ডাকা দেওয়া যাবে না। যাতে করে প্রয়োজনের সময় মানুষ তার শরণাপন্ন হতে পারে। মানুষের মাঝে থেকে তিনি জনগণের প্রয়োজন মিটাতে পারেন। জনকল্যাণে নিন্তর কাজ করে চলেন। ইমাম নির্বাচনের মূল উদ্দেশ্য এটিই। শারেহা রহ. অদৃশ্য ইমাম (ইমামের আত্মগোপন) এর আকীদা ভ্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে স্বীয় উক্তি وَاَنْتَ خَبِيْرٌ .الخ দ্বারা তিনটি প্রমাণ পেশ করেছেন।

(১) ইমাম নির্ধারণের পেছনে যেসব উদ্দেশ্য রয়েছে, যেমন দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা প্রভৃতি, সেগুলো অর্জিত না হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম অদৃশ্য হওয়া বা আত্মগোপন করা এবং একেবারেই ইমাম না থাকা উভয়ই সমান।

(২) শত্রুর ভয় এমনভাবে আত্মগোপন বা অদৃশ্য হতে বাধ্য করে না যে, তার নাম ছাড়া কিছুই থাকবে না। বড়জোর জনসাধারণ থেকে নিজের ইমামতের দাবী গোপন রাখার প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং তাদের পূর্বপুরুষের কেউ কেউ যেমন হাসান আসকারী জনসমক্ষে থাকতেন কিন্তু ইমামতের দাবী করতেন না।

(৩) সমসাময়িক লোকদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, কলহ-বিবাদ এবং জালিমদের দৌরাত্মের সময় জনগণের জন্য ইমামের প্রয়োজনীয়তা অত্যাধিক। এ সময়ে তাদের পক্ষে ইমামের অনুসরণ ও আনুগত্য করা অপেক্ষাকৃত সে সময় থেকে অধিকতর সহজ, যখন পৃথিবী থেকে ফেৎনা-ফাসাদ ও অকল্যাণের মূলোৎপাটন হয়ে যাবে এবং বাতিলপন্থীদের লম্ফ-ঝম্ফ ও মতবাদ বিলীন হয়ে যাবে।

وَيَكُوْنُ مِنْ قُرَيْشٍ وَلَا يَجُوْزُ مِنْ غَيْرِهِمْ ـ وَلَا يَخْتَصُّ بِبَنِىْ هَاشِمٍ وَاَوْلَادِ عَلِىٍّ رض ـ يَعْنِىْ يُشْتَرَطُ اَنْ يَكُوْنَ الْاِمَامُ قُرَيْشِيًّا لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْاَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ـ وَهٰذَا وَاِنْ كَانَ خَبَرًا وَاحِدًا ـ لٰكِنْ لَمَّا رَوَاهُ اَبُوْ بَكْرٍ رض مُحْتَجًّا بِهٖ عَلَى الْاَنْصَارِ ـ وَلَمْ يُنْكِرْهُ وَاحِدٌ فَصَارَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ ـ وَلَمْ يُخَالِفْ فِيْهِ اِلَّا الْخَوَارِجُ وَبَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ ـ وَلَا يُشْتَرَطُ اَنْ يَكُوْنَ هَاشِمِيًّا اَوْ عَلَوِيًّا لِمَا ثَبَتَ بِالدَّلَائِلِ مِنْ خِلَافَةِ اَبِىْ بَكْرٍ رض ـ وَعُمَرَ رض وَعُثْمَانَ رض مَعَ اَنَّهُمْ لَمْ يَكُوْنُوْا مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قُرَيْشٍ فَاِنَّ قُرَيْشًا اِسْمٌ لِاَوْلَادِ نَضْرِ بْنِ كِنَانَةَ وَهَاشِمٌ هُوَ اَبُوْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ جَدِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاِنَّهٗ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَىِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوَىِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَعْدِ بْنِ عَدْنَانَ ـ فَالْعَلَوِيَّةُ وَالْعَبَّاسِيَّةُ مِنْ هَاشِمٍ لِاَنَّ الْعَبَّاسَ وَاَبَا طَالِبٍ اِبْنَا عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ـ وَاَبُوْ بَكْرٍ رض قُرَيْشِىٌّ لِاَنَّهٗ اِبْنُ اَبِىْ قُحَافَةَ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوَىٍّ ـ وَكَذَا عُمَرُ رض لِاَنَّهٗ اِبْنُ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّٰى بْنِ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُرْطِ بْنِ عَدِىِّ بْنِ كَعْبٍ ـ وَكَذَا عُثْمَانُ رض ـ لِاَنَّهٗ بْنُ عَفَّانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ بْنِ اُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ـ

সহজ তরজমা

ইমাম কুরাইশ বংশোদ্ভুত হতে হবে। অন্য বংশের হওয়া জায়েয নয়। তদ্রুপ বনী হাশেম ও হযরত আলী রাযি. এর বংশধরদের সাথে সুনির্দিষ্ট নয়। অর্থাৎ ইমাম কুরাইশী হওয়া শর্ত। কেননা রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– ইমাম হবে কুরাইশী। হাদীসটি যদিও খবরে ওয়াহিদ, কিন্তু হযরত আবু বকর রাযি. যেহেতু এটি আনসারদের বিপরীত প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছেন এবং কেউ তা অস্বীকার করেনি তা-ই এটি সর্বসম্মত হাদীস হয়ে গেছে। এ শর্তের ব্যাপারে খারেজী সম্প্রদায় এবং কতিপয় মুতাযিলী ছাড়া আর কেউ মতবিরোধ করেনি। অবশ্য হাশেম কিংবা আলী রাযি. এর বংশোদ্ভুত হওয়া শর্ত নয়! কেননা বহু প্রমাণাদি দ্বারা হযরত আবু বকর রাযি., হযরত উমর রাযি. এবং হযরত উসমান রাযি. এর খেলাফত সাব্যস্ত হয়ে গেছে। অথচ তারা হাশিম বংশের ছিলেন না। অবশ্য কুরাইশী ছিলেন। কেননা কুরাইশ নযর ইবনে কেনানার বংশধরদের নাম। আর হাশিম নবী কারীম

ﷺ এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের পিতার নাম। বিধায় রাসূলে কারীম ﷺ এর বংশধারা নিম্নরূপ ঃ

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুরবাই ইবনে কা'বা ইবনে লুওয়াই ইবনে গালিব ইবনে ফাহ্‌র ইবনে মালিক ইবনে নযর ইবনে কিনানাহ ইবনে খুযাইমাহ ইবনে মুদ্‌রিকাহ ইবনে ইলইয়াছ ইবনে মুযর ইবনে নাযার ইবনে মা'আদ ইবনে আদনান। অতএব আলী রাযি. এবং আব্বাসের বংশধর হলেন বনু হাশেম। কেননা আব্বাস এবং হযরত আলী রাযি. এর পিতা আবু তালেব দুজনই আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান। (আর আব্দুল মুত্তালিব হাশিমের পুত্র।) আর হযরত আবু বকর রাযি. কুরাইশী। কেননা তার বংশধারা এরূপঃ আব্দুল্লাহ আবু বকর সিদ্দীক ইবনে আবী কুহাফা উসমান ইবনে আমের ইবনে উমর উবনে তাইম ইবনে মুর্‌রা ইবনে কা'ব ইবনে লুওয়াই। তদ্রূপ উমর রাযি.-ও কুরাইশী। কেননা তাঁর বংশধারা এরূপঃ উমর ইবনে খাত্তাব ইবনে নুফাইল ইবনে আব্দুল উবাবা ইবনে আদী ইবনে কা'ব। অনুরূপভাবে হযরত উসমান রাযি.-ও কুরাইশী। কেননা তার বংশধারা হল, উসমান ইবনে আফ্‌ফান ইবনে আবীল আস ইবনে উমাইয়াহ ইবনে আব্‌দে শাম্‌স ইবনে আবদে মানাফ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মুসলমানদের ইমাম ও রাষ্ট্রপ্রধান কে হবেন ?

পৃথিবীর সকল জ্ঞানী-গুণিজন স্বীকার করেন যে, জাতির নেতা এমন ব্যক্তি হওয়া উচিৎ, যিনি বুদ্ধিমান, সাবালক, স্বাধীন, পুরুষ, বীর ও বিবেকবান হবেন। কিন্তু ইসলাম এসব যৌক্তিকভাবে প্রয়োজনীয় শর্তাবলির সাথে আরও কিছু শত সংযোজন করেছে। তন্মধ্যে একটি শর্ত হল, মুসলমানদের খলীফা বা ইমাম কুরাইশ বংশের হওয়া উচিৎ। খারেজী সম্প্রদায়, কোন কোন মু'তাযিলী এবং কাযী আবু বকর বাকিল্লানী ইবনে খালদূন এ শর্তটি অস্বীকার করেছেন। অথচ اَلْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ হাদীসটি বাদী-বিবাদী উভয়ের মতেই বিশুদ্ধ প্রমাণিত।

অস্বীকারকারী প্রতিপক্ষের প্রমাণ

(১) রাসূলে কারীম ﷺ ছিলেন মানবতার সাম্যের ঝাণ্ডাবাহক। তিনি মানুষের তৈরী বংশীয় প্রাচীর ও বৈষম্য মিটিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং কি করে সম্ভব ছিল যে, খেলাফতকে কুরাইশের সাথে বিশেষিত করে স্বয়ং তিনিই সে অনৈসালামী বংশ-বৈষম্যকে জিইয়ে রাখবেন?

(২) রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاِنْ وُلِّيَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ ذُوْزَبِيْبَةٍ অর্থাৎ এক তুচ্ছকায় কদাকার কুৎসিত হাবশী গোলামকেও যদি তোমাদের শাসক বানিয়ে দেওয়া হয়, তথাপি তোমরা তার কথা শোন এবং তার আনুগত্য কর।

(৩) হযরত উমর ফারুক রাযি. বলেছেন– لَوْكَانَ سَالِمٌ مَوْلٰى حُذَيْفَةَ حَيًّا لَوَلَّيْتُهٗ অর্থাৎ যদি (হযরত) হুযাইফা রাযি. এর গোলাম সালেম জীবীত থাকত, তবে আমি তাকে রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত করতাম। উপরিউক্ত হাদীসের আলোকে বুঝা যায়, রাসূলে কারীম ﷺ কুরাইশী হওয়ার শর্ত মানাকে প্রয়োজনীয় মনে করেন নি এবং হযরত উমর রাযি. ও প্রয়োজনীয় মনে করেননি।

(৪) اَلْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ হাদীসটি কোন হুকুম নয় বরং ভবিষ্যদ্বাণী। নবীজী খেলাফত সম্পর্কে একথা বলেছেন। এ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তব হয়েছে। সুদীর্ঘ যগ পর্যন্ত কুরাইশ থেকেই খলীফা নিযুক্ত হয়েছেন।

কুরাইশী হওয়ার শর্তারোপকারীদের প্রমাণাদিঃ

(১) সাকীফায়ে বনী সাইদায় যখন খেলাফতের ব্যাপারে মতবিরোধ চরমে পৌঁছাল। আনসারগণ নিজেদেরকে খেলাফতের হকদার দাবী করলেন, তখন হযরত আবু বকর রাযি. আনসারদের প্রতিবাদে প্রমাণস্বরূপ اَلْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ হাদীসটি পড়ে শোনালেন। হাদীসটি যদিও খবরে ওয়াহিদ, কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কেউ এটিকে অস্বীকার করেননি। কাজেই তা সর্বসম্মত হয়ে গেল। এতে বুঝা গেল, সাহাবায়ে কেরাম হাদীসটিকে ভবিষ্যদ্বাণী সনাক্ত করেন নি বরং হুকুম হিসেবে মেনে নিয়েছেন। রাসূলের এক নির্দেশের সামনে তাদের মস্তক অবনমিত হয়ে যায়। তারা আত্মসমর্পণ করেন।

(২) নিঃসন্দেহে ইসলাম মানবিক সাম্যের ঝাণ্ডাবাহী। কিন্তু ইসলাম গুণাবলির বৈচিত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখে মর্যাদাগত পার্থক্যও স্বীকার করে। যেমন, আলিমদের মর্যাদা গাইরে আলিমের উপর এবং মহিলার উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব নছ তথা কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

(৩) হাবশী গোলামের আনুগত্যের ব্যাপারে যে হাদীস এসেছে, তা খলীফা নির্বাচন সম্পর্কে নয় বরং হাদীসের ভাষ্য হল, যদি অযোগ্য ব্যক্তি খলীফা হয়ে যায় তখন মুসলমানদের কর্ম পদ্ধতি বা করণীয় কি হওয়া উচিৎ? রইল হুযাইফা রাযি. এর গোলাম সালিম সম্পর্কে হযরত উমর রাযি. এর উক্তির তাৎপর্য। এটি যেহেতু নিছক এক সাহাবীর উক্তির মর্যাদা রাখে, বিধায় তা প্রমাণযোগ্য হতে পারে না। বস্তুতঃ কুরাইশী হওয়া যোগ্যতার শর্ত নয় বরং অধিক হকদার হওয়ার শর্ত। অর্থাৎ মুসলমান যদি পরামর্শের ভিত্তিতে তাদের খলীফা ও ইমাম নির্বাচন করে, তাহলে কুরাইশী লোককে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যেমন নামাযের ইমামতির জন্য দুজন প্রার্থী আছেন। গুণাবলিতে দুজনেই সমান। কিন্তু একজন বংশের দিক থেকে সম্ভ্রান্ত। তাহলে তাকেই ইমাম নির্বাচিত করা হবে। সুতরাং যখন ছোট ইমামতিতে বংশীয় আভিজাত্য ধর্তব্য, তখন বড় ইমামতিতেও তা লক্ষ্য রাখতে দোষ কি? কিন্তু এটি যেহেতু অগ্রাধিকার প্রদানের কারণ; যোগ্যতার কারণ নয়, এজন্য সেদিকে লক্ষ্য না রাখলেও খিলাফত প্রতিষ্ঠায় কোন ত্রুটি সৃষ্টি হবে না। যেভাবে নামাযের ইমামতিতে বংশে অভিজাত ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য না রাখলে নামাযের বিশুদ্ধতায় কোন সমস্যা বা ত্রুটি সৃষ্টি হয় না।

وَلَا يُشْتَرَطُ فِى الْإِمَامِ اَنْ يَكُوْنَ مَعْصُوْمًا لِمَا مَرَّ مِنَ الدَّلِيْلِ عَلٰى اِمَامَةِ اَبِىْ بَكْرٍ رض مَعَ عَدَمِ الْقَطْعِ بِعِصْمَتِهٖ . وَاَيْضًا اَلْاِشْتِرَاطُ هُوَ الْمُحْتَاجُ اِلَى الدَّلِيْلِ . وَاَمَّا فِىْ عَدَمِ الْاِشْتِرَاطِ فَيَكْفِىْ فِيْهِ عَدَمُ دَلِيْلِ الْاِشْتِرَاطِ . وَاحْتَجَّ الْمُخَالِفُ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى لَايَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِيْنَ . وَغَيْرُ الْمَعْصُوْمِ ظَالِمٌ فَلَايَنَالُهٗ عَهْدُ الْاِمَامَةِ . وَالْجَوَابُ اَلْمَنْعُ . فَاِنَّ الظَّالِمَ مَنِ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً مُسْقِطَةً لِلْعَدَالَةِ مَعَ عَدَمِ التَّوْبَةِ وَالْاِصْلَاحِ . فَغَيْرُ الْمَعْصُوْمِ لَايَلْزَمُ اَنْ يَكُوْنَ ظَالِمًا . وَحَقِيْقَةُ الْعِصْمَةِ اَنْ لَا يَخْلُقَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِى الْعَبْدِ الذَّنْبَ مَعَ بَقَاءِ قُدْرَتِهٖ وَاخْتِيَارِهٖ وَهٰذَا مَعْنٰى قَوْلِهِمْ هِىَ لُطْفٌ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى يَحْمِلُهٗ عَلٰى فِعْلِ الْخَيْرِ وَيَزْجُرُهٗ عَنِ الشَّرِّ مَعَ بَقَاءِ الْاِخْتِيَارِ تَحْقِيْقًا لِلْاِبْتِلَاءِ وَلِهٰذَا يَظْهَرُ فَسَادُ قَوْلِ مَنْ قَالَ اِنَّهَا خَاصِيَّةٌ فِىْ نَفْسِ الشَّخْصِ اَوْ فِىْ بَدَنِهٖ يَمْتَنِعُ بِسَبَبِهَا صُدُوْرُ الذَّنْبِ . كَيْفَ ، وَلَوْ كَانَ الذَّنْبُ مُمْتَنِعًا لَمَا صَحَّ تَكْلِيْفُهٗ بِتَرْكِ الذَّنْبِ . وَلَمَا كَانَ مُثَابًا عَلَيْهِ

সহজ তরজমা

ইমামের ক্ষেত্রে নিষ্পাপ হওয়া শর্ত নয়। হযরত আবু বকর রাযি. এর খেলাফত সম্পর্কে পূর্বোক্ত দলীলের কারণে। অথচ তাঁর নিষ্পাপ হওয়ার কথা নিশ্চিত বলা যায় না। তাছাড়া এ শর্তারোপের জন্য দলীলের প্রয়োজন রয়েছে। তবে শর্তারোপ না করার ক্ষেত্রে শর্তারোপের দলীল না থাকাই যথেষ্ট। প্রতিপক্ষরা আল্লাহর বাণী– لاينال عهد الظالمين (আমার প্রতিশ্রুতি জালিমরা লাভ করতে পারবে না।) এর দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। আর যে ব্যক্তি নিষ্পাপ নয়, সে জালিম। সুতরাং সে ইমামতের মসনদ (আসন) পাবে না।

জবাব হল, (ইমাম নিষ্পাপ না হলে জালিম হবে) স্বীকার করি না। কেননা জালিম ঐ ব্যক্তি, যে এমন গুনাহে লিপ্ত হয়, যা তার দ্বীনদারী বিনষ্ট (খতম) করে দেয়। (এমন গুনাহ হতে) তাওবা ও সংশোধন না করলে জালিম হওয়া আবশ্যক নয়। আর নিষ্পাপ হওয়ার বাস্তবতা হল, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দার মধ্যে গুনাহ সৃষ্টি না করা, তার গুনাহের শক্তি-সামর্থ থাকা সত্ত্বেও। মাশায়েকগণের উক্তি "নিষ্পাপ হওয়া আল্লাহ পাকের একটি অনুগ্রহ, যা

বান্দাকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করে এবং অসৎ কাজ হতে বিরত রাখে, ইচ্ছা-স্বাধীনতা বহাল থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষা বাকী রাখার জন্য" এর উদ্দেশ্যও তা-ই। এজন্য শাইখ আবু মানসূর মাতুরিদী বলেন– নিষ্পাপতা পরীক্ষা বাতিল করে না। আর এতে ঐ সব লোকের কথার ভ্রান্তি সুস্পষ্ট হয়ে যায়, যারা বলে, নিষ্পাপতা যে কোন ব্যক্তির স্বত্ত্বায় অথবা তার দেহে এমন বৈশিষ্ট্য, যদ্দরুন (তার থেকে) গুনাহ পাওয়া অসম্ভব হয়ে যায়। তা কি করে অসম্ভব হতে পারে ? যদি অসম্ভব হত তাহলে তাকে গুনাহ বর্জনের নিমত্ত সাওয়াব দেওয়া হত না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ইমামের নিষ্পাপ হওয়া শর্ত কিনা ?

শী'আ ইমামিয়া ও ইসমাঈলিয়্যাহ এর মতে ইমামের জন্য নিষ্পাপ হওয়া শর্ত। প্রমাণ হল, অনিষ্পাপ ব্যক্তি জালিম। জালিম ইমামতের পদের যোগ্য নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– আমার প্রতিশ্রুত ইমামতের পদ জালিমরা পাবে না। বুঝা গেল, অনিষ্পাপ ব্যক্তি ইমাম হতে পারে না বরং ইমামতের নিষ্পাপ হওয়া শর্ত। বস্তুতঃ এ শর্তরোপের পেছনে তাদের মূখ্য উদ্দেশ্যে হল, হযরত আবু বকর রাযি. কে জালিম সনাক্ত করে তাকে ইমামতের অযোগ্য প্রমাণ করা।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে ইমামের নিষ্পাপ হওয়া শর্ত নয়। প্রমাণ হল, যদি ইমামের নিষ্পাপ হওয়া শর্ত হত, তবে হযরত আবু বকর রাযি. এর ইমামতের উপর সাহাবায়ে কিরাম একমত হতেন না। কেননা তার নিষ্পাপতা প্রমাণিত নয়। অথচ আবু বকর রাযি. এর ইমামতের উপর সাহাবায়ে কিরামের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বুঝা গেল, ইমাম নিষ্পাপ হওয়া শর্ত নয়। তাছাড়া এ শর্তারোপের পেছনে বিশুদ্ধ কোন প্রমাণও নেই।

থাকে শী'আদের প্রদত্ত প্রমাণের কথা। সুতরাং সে দলীলের প্রথম ভূমিকা অর্থাৎ অনিষ্পাপ ব্যক্তি, যে এমন কোন গুনাহে লিপ্ত হয়, যার ফলে তার আদালত ও দ্বীনদারী বরবাদ হয়ে যায়। আর না সে তাওবা করে, না নিজের অবস্থা সংশোধন করে। এমতাবস্থায় অনিষ্পাপ ব্যক্তি কোন গুনাহে লিপ্ত হলে সে আর নিষ্পাপই রইল না। কিন্তু সে যখন তাওবা করে নিল। ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে শুধরে নিল। ফলে সে জালিমও রইল না। অনুরূপভাবে আল্লাহর বাণী– لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيْنَ মধ্যে عَهْد দ্বারা বস্তুতঃ ইমামতের পদমর্যাদা নয় বরং নবুওয়াতের পদমর্যাদা উদ্দেশ্য।

নিষ্পাপতার বাস্তবতা

قَوْلُهُ : وَحَقِيْقَةُ الْعِصْمَةِ ঃ ব্যাখ্যাতার এ উক্তি عِصْمَت বা নিষ্পাপতার সংজ্ঞা নয় বরং তার ভবিষ্যৎ পরিণতি। নতুবা عِصْمَت দ্বারা উদ্দেশ্য, গুনাহের উপর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা থেকে আত্মরক্ষার (বেঁচে থাকার) যোগ্যতা লাভ করা। সে যোগ্যতা যেহেতু নিছক আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ও করুনার মাধ্যমে হাসিল হয়, এজন্য কেউ কেউ তার (সে অনুগ্রহের) পরিচয় لُطْفٌ مِنَ اللّٰهِ يَحْمِلُهُ عَلَى الطَّاعَةِ الخ দ্বারাও দিয়েছেন। যার মর্ম হল, عِصْمَت আল্লাহর অনুগ্রহে প্রাপ্ত এমন শক্তি, যা বান্দাকে সৎকাজে অনুপ্রাণিত করে এবং গুনাহ থেকে বিরত রাখে। তদুপরি তার ইচ্ছা-স্বাধীনতা ও শক্তি-ক্ষমতা অক্ষুণ্ন থাকে। যাতে বান্দার পরীক্ষা হতে পারে।

আর নিষ্পাপতার অর্থে ক্ষমতা ও ইচ্ছা বাকী থাকা শর্ত হওয়ার কারণেই শাইখ আবু মান্‌সূর মাতুরিদী বলেছেন– নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও সে ব্যক্তি আহকাম পালনে আদিষ্ট থাকে। আর যখন নিষ্পাপতার অর্থে ক্ষমতা ও ইচ্ছা বাকী থাকা শর্ত, তখন এতে কতিপয় শী'আদের নিম্নোক্ত বক্তব্যের ভ্রান্তি সুস্পষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ তারা বলেছে– নিষ্পাপতা মানুষের সত্ত্বায় অথবা তার দেহে এমন বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যার ফলে তার থেকে গুনাহ প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব হয়ে যায় এবং তার মধ্যে গুনাহের ক্ষমতা থাকে না। এ উক্তি ভ্রান্ত হওয়ার কারণ দুটি। যথা–

এক. যদি তার থেকে গুনাহ প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব হত, তাহলে সে গুনাহ বর্জনে আদিষ্ট হত না। অথচ নিষ্পাপ ব্যক্তিও গুনাহ বর্জনে আদিষ্ট। বুঝা গেল, নিষ্পাপ ব্যক্তি থেকে গুনাহ প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব নয়।

দুই. নিষ্পাপ ব্যক্তি থেকে যদি গুনাহ প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব হত, তবে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ফলে সে প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য হত না। অথচ সে প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য। বুঝা গেল, নিষ্পাপ ব্যক্তি থেকে গুনাহ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়।

وَلَا أَنْ يَكُوْنَ أَفْضَلَ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِ لِأَنَّ الْمُسَاوِىَ فِى الْفَضِيْلَةِ بَلِ الْمَفْضُوْلُ الْأَقَلُّ عِلْمًا وَعَمَلًا رُبَّمَا كَانَ أَعْرَفَ بِمَصَالِحِ الْإِمَامَةِ وَمَفَاسِدِهَا وَأَقْدَرَ عَلَى الْقِيَامِ بِمَوَاجِبِهَا . خُصُوْصًا إِذَا كَانَ نَصْبُ الْمَفْضُوْلِ أَدْفَعَ لِلشَّرِّ وَأَبْعَدَ عَنْ إِثَارَةِ الْفِتْنَةِ وَلِهٰذَا جَعَلَ عُمَرُ رض الْإِمَامَةَ شُوْرٰى بَيْنَ السِّتَّةِ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّ بَعْضَهُمْ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ . فَإِنْ قِيْلَ كَيْفَ يَصِحُّ جَعْلُ الْإِمَامَةِ شُوْرٰى بَيْنَ السِّتَّةِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ نَصْبُ إِمَامَيْنِ فِىْ زَمَانٍ وَاحِدٍ قُلْنَا غَيْرُ الْجَائِزِ هُوَ نَصْبُ إِمَامَيْنِ مُسْتَقِلَّيْنِ تَجِبُ طَاعَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْإِنْفِرَادِ . لِمَا يَلْزَمُ فِىْ ذٰلِكَ مِنْ إِمْتِثَالِ أَحْكَامٍ مُتَضَادَّةٍ وَأَمَّا فِى الشُّوْرٰى فَالْكُلُّ بِمَنْزِلَةِ إِمَامٍ وَاحِدٍ

সহজ তরজমা

এবং ইমাম সমসাময়িক সকল মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়াও শর্ত নয়। কেননা সমপর্যায়ের মর্যাদাবান ব্যক্তি বরং কিছুটা নিচু পর্যায়ের লোক, যার ইল্‌ম-আমল কম– তিনিও অনেক সময় ইমামতের কল্যাণ ও ক্ষতি সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত হয়ে থাকেন এবং তার পদীয় দায়িত্ব পালনে সুযোগ্য হয়ে থাকেন, বিশেষতঃ যখন কম মর্যাদার লোক নিযুক্ত করলে অপকর্ম অধিক অবদমিত হয় এবং ফিৎনা মাথা ছাড়া দিয়ে না উঠে। এজন্য হযরত উমর রাযি. ছয় সদস্যের পরামর্শ সভার উপর ইমাম নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পন করেছেন। অথচ তিনি নিশ্চিত জানতেন, তাদের কেউ কেউ অপর থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং যদি প্রশ্ন করা হয়, ছয় সদস্যের পরামর্শ সভার উপর ইমাম নির্বাচনের দায়িত্বভার ন্যাস্ত করা কিভাবে বিশুদ্ধ হতে পারে ? অথচ একই সময়ে স্বতন্ত্র দুজনকে পৃথকভাবে ইমাম নিযুক্ত করা নাজায়েয। আমরা জবাব দেব, এমন দুজনকে স্বতন্ত্রভাবে নিযুক্ত করা নাজায়েয, যাদের প্রত্যেকের আনুগত্য করা পৃথকভাবে আবশ্যক হবে। কেননা এমতাবস্থায় পরস্পর বিরোধী নির্দেশ পালন করা আবশ্যম্ভাবী হবে। রইল পরামর্শ সভার কথা। সুতরাং সকল সভাসদই প্রকারান্তরে এক ইমাম (এর হুকুমে)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ইমামের জন্য কি যুগশ্রেষ্ঠ হওয়া শর্ত ?

শী'আ সম্প্রদায় ইমামের জন্য সমসাময়িক সমস্ত মানুষের চেয়ে উত্তম হওয়াকে শর্ত সাব্যস্ত করে। বস্তুতঃ তাদের মতলব হচ্ছে, কথিত বার ইমাম ব্যতীত হযরত আবু বকর রাযি., হযরত উমর রাযি. এবং হযরত উসমান রাযি. এর ইমামতকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করা। কেননা শ্রেষ্ঠত্ব কেবল নছ দ্বারাই জানা যেতে পারে। তাদের কথামতে বার ইমাম ছাড়া কারও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে কোন নছ নেই। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে ইমামের জন্য সমকালের সমস্ত মানুষ অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ হওয়া আবশ্যক নয়। কেননা অনেক সময় সমমর্যাদার বরং নিম্ন মর্যাদার লোকও তার চেয়ে উঁচু মর্যাদার লোকের তুলনায় ইমামতের ভাল-মন্দ ও লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে অধিক ওয়াকিফহাল এবং নিজের শক্তি-সামর্থের কারণে ইমামতের দায়িত্ব খুবই সুচারুরূপে আঞ্জাম দিতে সক্ষম হন। আর ইমাম নির্বাচনের উদ্দেশ্যে এটিই। বিশেষতঃ যখন ইমাম নির্বাচিত করার মধ্যে ফেৎতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠার আশঙ্কা থাকে প্রবল। আর নিম্ন মর্যাদার লোক নির্বাচিত করার মধ্যে ফেৎনা-ফাসাদ দমিত হয়। তখন নিচু মর্যাদার লোককেই ইমাম নিযুক্ত করা উত্তম। এজন্যই ইমামের জন্য যুগশ্রেষ্ঠ হওয়া শর্ত নয়। তাছাড়া হযরত উমর রাযি. ছয় সদস্যের এক পরামর্শ সভাকে ইমামত সাব্যস্ত করেছেন। অথচ ঐ ছয় জনের কারও কারও শ্রেষ্ঠত্বের কথা হযরত উমর রাযি. জানতেন না। বুঝা গেল, ইমামের জন্য (সমকালীন সকল লোকদের থেকে) উত্তম হওয়া শর্ত নয়।

কিভাবে পরামর্শ সভাকে রাষ্ট্রনির্বাহী করা হল ?

قَوْلُهُ: فَإِنْ قِيْلَ كَيْفَ يَصِحُّ ...الخ ঃ অর্থাৎ একই সময়ে দুজন ইমাম নিয়োগ করা যখন নাজায়েয, তখন ছয় সদস্যের এক পরামর্শ সভার উপর ইমামতের দায়িত্ব অর্পণ করা কিভাবে বিশুদ্ধ হতে পারে?

জবাবঃ নাজায়েয হল, একত্রে এমন দু'জনকে ইমাম নিযুক্ত করা, যাদের প্রত্যেকের আনুগত্য করা স্বতন্ত্রভাবে

ওয়াজিব। কেননা এমতাবস্থায় পরস্পর বিরোধী বিধানাবলি কার্যকর করা আবশ্যক হবে। আর পরামর্শ সভার অবস্থায় প্রত্যেক সভাসদ স্বতন্ত্র ইমাম হোন না অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকের আনুগত্য করা আবশ্যক হয় না বরং পূর্ণ পরামর্শ সভা মিলে একটি সরকার বা ইমামের হুকুমে হয়। যেমন, পরামর্শ সভা একজন আইনগত ব্যক্তি এবং সিদ্ধান্ত দাতা বোর্ড ও সরকার।

আল্লামা তাফতাযানী রহ. এর এ প্রশ্নোত্তরকে কোন কোন ব্যাখ্যাতা অনর্থক আখ্যা দিয়ে বলেন- হযরত উমর রাযি. এই ছয় সদস্যকে ইমামতের কার্যনিবাহী পর্ষদের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করেন নি বরং এর উদ্দেশ্য ছিল, ছয় সদস্যের মধ্য হতে একজনকে শাসক বা ইমামতের জন্য নির্বাচন করা। কাজেই এ প্রশ্নই প্রয়োজন অতিরিক্ত যে, ছয় সদস্যের পরামর্শ সভাকে ইমামতের দায়িত্ব দেওয়া কিভাবে বিশুদ্ধ হতে পারে? কিন্তু আমরা মনে করি, আল্লামা তাফতাযানী রহ. অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। কেননা যে সংসদ ও পরামর্শ সভা ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) নিয়োগ করতে পারে, সে কেন তদপেক্ষা নিম্নমানের কাজ কর্ম সম্পাদন করতে পারবে না? বরং বলা উচিৎ, বর্তমান যুগে পরামর্শ সভাকে (সংসদকে) সিদ্ধান্ত প্রদানকারী (নীতি নির্ধারক) বোর্ড সাব্যস্ত করার যে রীতি বহুল আলোচিত, আল্লামা তাফতাযানী রহ. সেটিকে খেলাফতে রাশেদা থেকে সাব্যস্ত করেছেন। যদিও উক্ত ছয় সদস্যের পরামর্শ সভা মাত্র তিন দিন সরকারে থেকে রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ আঞ্জাম দিয়েছে। তদুপরি প্রমাণ হয়ে গেল যে, খিলাফতে রাশেদার যুগে পরামর্শ সভা নীতি নির্ধারক বা সিদ্ধান্ত প্রদানকারী বোর্ড হিসেবে কাজ করেছে।

وَيُشْتَرَطُ اَنْ يَّكُوْنَ مِنْ اَهْلِ الْوِلَايَةِ الْمُطْلَقَةِ الْكَامِلَةِ اَىْ مُسْلِمًا حُرًّا ذَكَرًا عَاقِلًا بَالِغًا ـ اِذْمَا جَعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ـ وَالْعَبْدُ مَشْغُوْلٌ بِخِدْمَةِ الْمَوْلٰى مُسْتَحْقَرٌ فِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ ـ وَالنِّسَاءُ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَ دِيْنٍ ـ وَالصَّبِىُّ وَالْمَجْنُوْنُ قَاصِرَانِ عَنْ تَدْبِيْرِ الْاُمُوْرِ وَالتَّصَرُّفِ فِىْ مَصَالِحِ الْجُمْهُوْرِ سَائِسًا اَىْ مَالِكًا لِلتَّصَرُّفِ فِىْ اُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ بِقُوَّةِ رَاْيِهٖ وَرَوِيَّتِهٖ وَمَعُوْنَةِ بَاْسِهٖ وَشَوْكَتِهٖ قَادِرًا بِعِلْمِهٖ وَعَدْلِهٖ وَكِفَايَتِهٖ وَشَجَاعَتِهٖ عَلٰى تَنْفِيْذِ الْاَحْكَامِ وَحِفْظِ حُدُوْدِ دَارِ الْاِسْلَامِ وَاِنْصَافِ الْمَظْلُوْمِ مِنَ الظَّالِمِ اِذَا الْاِخْلَالُ بِهٰذِهِ الْاُمُوْرِ مُخِلٌّ بِالْغَرَضِ مِنْ نَصْبِ الْاِمَامِ ـ

সহজ তরজমা

(ইমামের জন্য) আরও শর্ত হল, সাধারণ অভিভাবকত্বের পূর্ণ যোগ্য হওয়া। অর্থাৎ মুসলমান, স্বাধীন, পুরুষ, জ্ঞানী-বিবেকবান, বালেগ হওয়া। কেননা আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে মুসলমানদের উপর (কর্তৃত্ব করার) কোন অধিকার দেন নি। আর গোলাম তার মনিবের সেবায় ব্যস্ত। মানুষের দৃষ্টিতে হীন। নারী জাতির আকল-জ্ঞান কম ও দ্বীন অসম্পূর্ণ। বালক ও পাগল ব্যক্তি ব্যবস্থাপনা, কার্যনির্বাহ এবং জনকল্যাণে কাজ করতে অক্ষম। তিনি (ইমাম) হবেন ব্যবস্থাপক অর্থাৎ তাকে নিজের মত ও চিন্তাধারার দৃঢ়তা এবং নিজের শক্তি-সামর্থের সাহায্যে মুসলমানদের কাজকর্ম আঞ্জাম দিতে সক্ষম হতে হবে। নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি; ইনসাফ, স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও বীরত্বের মাধ্যমে শরঈ বিধি-বিধান কার্যকর করা, ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষা করা এবং অত্যাচারী থেকে অত্যাচারীতের ন্যায্য অধিকার আদায়ে তাঁকে হতে হবে ক্ষমতাবান। কেননা এসব ব্যাপারে ত্রুটি ও উদাসীনতা ইমাম নিয়োগের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

নেতৃত্বের জন্য সর্বসম্মত শর্তাবলি

ব্যাখ্যাতা ইমামের বিতর্কিত শর্তগুলো আলোচনার পর এখানে সর্বসম্মত শর্তগুলো আলোচনা করছেন।

প্রথম শর্তঃ ইমাম পূর্ণাঙ্গ অভিভাবকত্ব ও কর্তৃত্বের যোগ্যতা রাখতে হবে। এর জন্য পাঁচটি জিনিস আবশ্যক।

(১) মুসলমান হওয়া। কেননা আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে মুসলমানের উপর কর্তৃত্ব দেন নি।

(২) স্বাধীন হওয়া। কেননা গোলাম তার মনিবের কাজকর্ম ও সেবা শশ্রুষায় ব্যতিব্যস্ত থাকে। অথচ ইমামকে মুসলমানের কাজের জন্য অবকাশ পেতে হবে। তাঁকে হতে হবে পূর্ণ অবসর।

(৩) পুরুষ হওয়া। কেননা হাদীসের আলোকে নারী জাতির আকল-জ্ঞান কম এবং দ্বীন অসম্পূর্ণ।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলে কারীম ﷺ যখন জানতে পারলেন, পারস্যবাসী প্রয়াত সম্রাট কিসরার মেয়েকে তাদের শাসক মনোনীত করেছে, তখন তিনি ইরশাদ করেন– সে জাতি কখনও সফলকাম হতে পারে না, যারা তাদের শাসক মনোনীত করেছে কোন মহিলাকে। অধিকন্তু মহিলাদেরকে পর্দায় থাকা এবং গণসমাবেশ ও বৈঠকে না আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(৪) বিবেকবান-জ্ঞানী হওয়া। কেননা পাগলের পক্ষে রাষ্ট্র পরিচালনা করা অসম্ভব।

(৫) সাবালক হওয়া। কেননা কোন শিশু রাষ্ট্র পরিচালনা এবং জনকল্যাণে কাজ করতে অক্ষম।

দ্বিতীয় শর্তঃ সদৃঢ়মতামত ও চিন্তা-চেতনার অধিকারী, মানুষের অন্তরে তার সম্মান এবং বাহ্যিক শক্তি-সামর্থ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির সাহায্যে মুসলমানদের কাজ করতে সক্ষম হওয়া।

তৃতীয় শর্তঃ শরী'আতের বিধি-বিধান সম্পর্কে ওয়াফিকহাল এবং নেক আমল, ইনসাফ-সততা, সঠিক সিদ্ধান্ত ও নিজের শৌর্য বীর্য-বীরত্বের মাধ্যমে শরঈ বিধি-বিধান যেমন, দণ্ড-বিধি, কিসাস ইত্যাতি কার্যকর করা, ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত করা এবং জালিমের উপর মজলুমের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে ক্ষমতাবান হতে হবে। কেননা এটিই ইমাম নিয়োগের আসল উদ্দেশ্য।

وَلَا يَنْعَزِلُ الْاِمَامُ بِالْفِسْقِ اَيِ الْخُرُوْجُ عَنْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَالْجَوْرِ اَيِ الظُّلْمِ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ تَعَالٰى لِاَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ الْفِسْقُ وَانْتَشَرَ الْجَوْرُ مِنَ الْاَئِمَّةِ وَالْاُمَرَاءِ بَعْدَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَالسَّلَفُ كَانُوْا يَنْقَادُوْنَ لَهُمْ ـ وَيُقِيْمُوْنَ الْجُمَعَ وَالْاَعْيَادَ بِاِذْنِهِمْ ـ وَلَا يَرَوْنَ الْخُرُوْجَ عَلَيْهِمْ ـ وَلِاَنَّ الْعِصْمَةَ لَيْسَتْ بِشَرْطِ الْاِمَامَةِ اِبْتِدَاءً ـ فَبَقَاءً اَوْلٰى ـ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ اَنَّ الْاِمَامَ يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ وَالْجَوْرِ ـ وَكَذَا كُلُّ قَاضٍ وَاَمِيْرٍ ـ وَاَصْلُ الْمَسْأَلَةِ اَنَّ الْفَاسِقَ لَيْسَ مِنْ اَهْلِ الْوِلَايَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لِاَنَّهُ لَا يَنْظُرُ لِنَفْسِهٖ ـ فَكَيْفَ يَنْظُرُ لِغَيْرِهٖ ـ وَعِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ هُوَ مِنْ اَهْلِ الْوِلَايَةِ حَتّٰى يَصِحَّ لِلْاَبِ الْفَاسِقِ تَزْوِيْجُ اِبْنَتِهِ الصَّغِيْرَةِ وَالْمَسْطُوْرُ فِيْ كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ اَنَّ الْقَاضِيَ يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ بِخِلَافِ الْاِمَامِ ـ وَالْفَرْقُ اَنَّ فِيْ اِنْعِزَالِهٖ وَوُجُوْبِ نَصْبِ غَيْرِهٖ اِثَارَةَ الْفِتْنَةِ لِمَا لَهُ مِنَ الشَّوْكَةِ ـ بِخِلَافِ الْقَاضِيْ ـ وَفِيْ رِوَايَةِ النَّوَادِرِ عَنِ الْعُلَمَاءِ الثَّلَاثَةِ اَنَّهُ لَا يَجُوْزُ قَضَاءُ الْفَاسِقِ ـ وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَائِخِ اِذَا قُلِّدَ الْفَاسِقُ اِبْتِدَاءً يَصِحُّ ـ وَلَوْ قُلِّدَ وَهُوَ عَدْلٌ يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ ـ لِاَنَّ الْمُقَلِّدَ اِعْتَمَدَ عَلٰى عَدَالَتِهٖ فَلَمْ يَرْضَ بِقَضَائِهٖ بِدُوْنِهَا ـ وَفِيْ فَتَاوٰى قَاضِيْخَانْ اَجْمَعُوْا عَلٰى اَنَّهُ اِذَا ارْتَشٰى لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ فِيْمَا ارْتَشٰى ـ وَاَنَّهُ اِذَا اَخَذَ الْقَضَاءَ بِالرِّشْوَةِ لَا يَصِيْرُ قَاضِيًا وَلَوْ قَضٰى لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ ـ

সহজ তরজমা

ফিস্‌ক অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের উপর জুলুম করার করণে ইমাম অপসারিত হবেন না। কেননা খোলাফায়ে রাশেদীনের পরে ইমাম ও আমীরদের থেকে ফিস্‌ক প্রকাশ পেয়েছে এবং জুলুম ব্যাপকভাবে হয়েছে। অথচ সালফে সালেহীন তাদের আনুগত্য করতেন।

তাদের অনুমতি নিয়ে জুমা ও ঈদের নামায কায়েম করতেন। তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রহ করা জায়েয মনে করতেন না। কারণ, ইমামতের ক্ষেত্রে নিষ্পাপতা শুরুতেই শর্ত ছিল না। সুতরাং স্থায়িত্বের জন্য আরও উত্তম রূপে শর্ত হবে না। ইমাম শাফিঈ রহ. এর থেকে বর্ণিত আছে, ইমাম ফিসকের কারণে অপসারিত হয়ে যাবেন। অনুরূপভাবে প্রত্যেক কাযী এবং আমীরও (অপ্রসারিত হয়ে যাবেন।) বস্তুতঃ মাসআলাটির ভিত্তি হল, ইমাম শাফিঈ রহ. এর মতে ফাসিক নেতৃত্ব বা অভিভাবকত্বের যোগ্য নয়। কারণ, সে নিজের ব্যক্তি সত্ত্বার উপর দয়া করে না। অন্যের উপর কি দয়া করবে? আর শাফিঈ মাযহাবের কিতাবাদিতে বর্ণিত আছে, কাযী ফিস্‌কের কারণে অপসারিত হয়ে যাবেন। পক্ষান্তরে ইমাম অপসারিত হবে না। এ প্রার্থক্যের কারণ হল, ইমামের অর্জিত জনশক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে তার অপসারণ এবং তার পদে অন্যেকে নিয়োগ দানে ফিৎনা-ফাসাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। কাযী এর বিপরীত। আর উলামায়ে ছালাছ তথা ইমাম আবু হানীফা রহ., ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. থেকে নাওয়াদিরের রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, ফাসিকের কাযী হওয়া জায়েয নয়। কোন কোন মুশায়িখ বলেন, শুরু থেকেই ফাসিককে কাযী নিযুক্ত করলে জায়েয হবে। আর যদি আদেল বা দীনদার লোক থাকা অবস্থায় কাযী নিয়োগ করা হয়, তাহলে ফিসকের কারণে সে অপসারিত হয়ে যাবে। কেননা কাযী নিয়োগদাতা তার দ্বীনদারীর উপর বিশ্বাস করেছিল। সুতরাং দ্বীনদারী না থাকা অবস্থায় তার কাযী হওয়ার উপর সন্তুষ্ট হবে না। 'ফাত্‌ওয়ায়ে কাযীখান' গ্রন্থে রয়েছে, ফুকাহায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, কাযী যখন ঘুষ নিবে তখন ঘুষ খাওয়া মামলায় তার রায় কার্যকর হবে না। আর এ ব্যাপারেও ইজমা হয়েছে যে, কাযী যখন বিচারকের পদই ঘুষের মাধ্যমে দখল করবে, তখন সে কাযী বলে গণ্য হবে না। (কোন) রায় দিলে তার সে রায় কার্যকর হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ হল, ফিসক্ যেমন, যিনা-ব্যভিচার, মদ্যপান, বান্দার উপর জলুম-নির্যাতন প্রভৃতি কারণে ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) অপসারিত হবে কি না?

হানাফীদের যাহিরী মাযহাব হল, ফিস্‌কের অপরাধ্যে ইমাম একাধিক কারণে অপসারিত বরখাস্ত হবেন না। যথা–

(১) কেননা খোলাফায়ে রাশেদীনের পর যেসব খলীফা এবং তাদের অধিনস্ত আমীর-উমারা ছিলেন, তাদের অনেকেই বিভিন্ন ফিসক ও পাপাচারে লিপ্ত হয়েছেন। তারা মানুষের উপর অন্যায়-অবিচার, জুলুম-নির্যাতন করেছেন। তদুপরি সালফে সালেহীন তাদের আনুগত্য করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েয এবং যথোচিত মনে করেন নি। এতে বুঝা গেল, ইমাম ফিস্‌ক ও পাপাচারের কারণে তার পদ থকে বরখাস্ত হন না। নতুবা সালফে সালেহীনের মতে তার আনুগত্য করা আবশ্যক হত না।

(২) দ্বিতীয়তঃ কাউকে ইমাম নিযুক্ত করার সময় সে নিষ্পাপ থাকা শর্ত নয়। কাজেই ইমাম নিযুক্ত হওয়ার পর স্থায়িত্বের জন্য গুনাহ থেকে নিষ্পাপ হওয়া আরও উত্তমরূপে শর্ত হবে না।

ফাসিক কি কাযী বা বিচারপতি হতে পারেন ?

আর নাওয়াদিরে তিন ইমাম তথা ইমাম আবূ হানীফা রহ., ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. থেকে বর্ণিত আছে, ফাসিকের কাযী হওয়া জায়েয নয়। হেদায়া গ্রন্থ আছে, ফাসিক কাযী হতে পারে। অবশ্য তাকে কাযী বানানো উচিৎ নয়। আর ইমাম শাফেঈ রহ. থেকে বর্ণিত আছে, ফিস্‌ক ও জুলুমের কারণে ইমাম, কাযী, আমীর তদ্রুপ এমন এবং বরখাস্তে হয়ে যাবে, যাকে মুসলমানদের নেতা ও অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়েছে।

এ মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও ইমাম শাফেঈ রহ. এর মধ্যে মতানৈক্যের কারণ হল, ইমাম শাফিঈ রহ. এর মতে বিচারকার্য ولايت, বা অভিভাবকত্বের অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ, নিজের কথা অন্যের উপর কার্যকর করা। সে সন্তুষ্ট থাকুক চাই না থকুক। আর ফাসিক অভিভাবকত্বের যোগ্য নয়। সুতরাং সে বিচার কার্যেরও যোগ্য হবে না। আর যখন সে বিচারকার্যের যোগ্য নয়, তখন আরও উত্তমরূপে ইমামতরে যোগ্য হবে না।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে ফাসিক অভিভাবকত্বের যোগ্যতা রাখে। এমনকি ফাসিক পিতা তার নাবালিকা মেয়ের অভিভাবক। সুতরাং মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে যদি তার বিয়ে দিয়ে দেয়, তবে তা শুদ্ধ

হবে। আর শাফিঈ মাযহাবের বিভিন্ন কিতাবাদিতে শাফিঈ আলিমদের উক্তি হিসেবে লিখিত আছে, কাযী ফিসকের কারণে বরখাস্ত হয়ে যাবে। অবশ্য ইমাম ফিসকের কারণে বরখাস্ত হবেন না।

এ প্রার্থক্যের কারণ হল, কাযী বরখাস্ত হওয়া এবং তদস্থলে অন্য কাযী নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে কোন ফিৎনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠার আশঙ্কা নেই। কেননা কাযীর বিপরীতে ইমাম বা শাসকের ক্ষমতার জোর বেশী। কাযী যদি তদস্থলে অন্যকে কাযী নিযুক্ত করার কারণে কোন ফিৎনা সৃষ্টি করেন, তবে ইমাম তার ক্ষমতা বলে সে ফিৎনা দমন করতে পারবেন। পক্ষান্তরে ইমাম বরখাস্ত হলে এবং তার পদে অন্য ইমাম নিয়োগ হলে (বড় রকমের) ফিৎনার আশঙ্কা রয়েছে। যা সহজে দমন করা যাবে না।

কোন কোন মাশাইখ বলেন, কাউকে আদেল ও দ্বীনদার অবস্থায় কাযী নিয়োগ করা হল। পরবর্তীতে সে ফাসিক-পাপাচারী হয়ে গেল। তাহলে সে বরখাস্ত হয়ে যাবে। কেননা ইমাম তাকে আদেল ও দীনদার ভেবে কাযী নিয়োগ করেছিলেন। সুতরাং ফিসকের দরুন সে আর আদেল বা ন্যায়পরায়ণ রইল না। এমতাবস্থায় তার কাযী পদে বহাল থাকার ব্যাপারে তিনি (ইমাম) সম্মত হবেন না। যেন তিনি তার কাযী পদে বহাল থাকাকে তার ন্যায়পরায়ণতার সাথে ঝুলিয়ে রেখে ছিলেন। অর্থাৎ আপনি এখন যেমন ন্যায়পরায়ণ, তদ্রূপ ভবিষ্যতেও এ ন্যায় পরায়ণতায় অটল থাকবেন। তাহলে আপনি কাযী বা বিচারক পদে বহাল থাকবেন। নতুবা থাকবেন না। আর বিচারকার্য ও শাসন বা নেতৃত্বকে শর্তের সাথে ঝুলন্ত রাখাও জায়েয। কেননা রাসূলে কারীম ﷺ যায়েদ ইবনে হারেসাহ রাযি. এর নেতৃত্বে এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণের সময় বলেছিলেন– যায়েদ ইবনে হারেসাহ রাযি. শহীদ হয়ে গেলে, তোমাদের আমীর হবে জাফর রাযি.। তিনিও শহীদ হয়ে গেলে তোমাদের আমীর হবে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি.। অতএব লক্ষ্য করুন, রাসূলে কারীম ﷺ হযরত যাফর রাযি. এর নেতৃত্বকে যায়েদ ইবনে হারিসাহ রাযি. এর শাহাদাতের উপর ঝুলন্ত রেখেছেন। অনুরূপভাবে বিচারকার্যকেও শর্তের সাথে ঝুলন্ত রাখা জায়েয।

وَتَجُوْزُ الصَّلٰوةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلُّوْا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ . وَلِاَنَّ عُلَمَاءَ الْاُمَّةِ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ خَلْفَ الْفَسَقَةِ وَاَهْلِ الْاَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ . وَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ مِنَ الْمَنْعِ عَنِ الصَّلٰوةِ خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ . فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ اِذْ لَاكَلَامَ فِىْ كَرَاهَةِ الصَّلٰوةِ خَلْفَ الْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ . وَهٰذَا اِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْفِسْقُ اَوِ الْبِدْعَةُ اِلٰى حَدِّ الْكُفْرِ . اَمَّا اِذَا اَدّٰى اِلَيْهِ . فَلَا كَلَامَ فِىْ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلٰوةِ خَلْفَهُ . ثُمَّ الْمُعْتَزِلَةُ وَاِنْ جَعَلُوا الْفَاسِقَ غَيْرَ مُؤْمِنٍ . لٰكِنَّهُمْ يُجَوِّزُوْنَ الصَّلٰوةَ خَلْفَهُ . لِمَا اَنَّ شَرْطَ الْاِمَامَةِ عِنْدَهُمْ عَدَمُ الْكُفْرِ لَاوُجُوْدُ الْاِيْمَانِ بِمَعْنَى التَّصْدِيْقِ وَالْاِقْرَارِ وَالْاَعْمَالِ جَمِيْعًا . وَيُصَلّٰى عَلٰى كُلِّ بَرٍّوَفَاجِرٍ اِذَا مَاتَ عَلَى الْاِيْمَانِ لِلْاِجْمَاعِ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَدَعُوا الصَّلٰوةَ عَلٰى مَنْ مَاتَ مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ .

সহজ তরজমা

প্রত্যেক নেককার ও বদকারের পিছনে নামায পড়া জায়েয। কেননা রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– তোমরা প্রত্যেক নেককার ও বদকারের পিছনে নামায পড়ে নিও! এবং এজন্য যে, উম্মতের আলিমগণ ফাসিক, প্রবৃত্তি পুজারী এবং বিদ'আতীদের পিছনে অকুণ্ঠচিত্তে নামায পড়ে নিতেন। আর কোন কোন প্রবীন আলিম হতে বিদ'আতীর পিছনে নামায পড়ার যে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে, তা অপছন্দতা বা মাকরূহ হিসেবে প্রযোজ্য। কেননা ফাসিক ও বিদ'আতীর পেছনে নামায মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারে কোন কথা (মতভেদ) নেই। এ মতভেদ তখনই হবে, যখন তার ফিস্‌ক ও বিদ'আত কুফরের পর্যায়ে না পৌঁছাবে। মোটকথা, যখন কুফরের পর্যায়ে

পৌছবে তখন তার পেছনে নামায পড়া নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নেই। অতঃপর মুতাযিলারা ফাসিককে যদিও মুমিন গণ্য করে না, কিন্তু তারাও তার পেছনে নামায পড়া জায়েয সাব্যস্থ করে। কেননা তাদের মতে ইমামতির জন্য কাফির না হওয়া শর্ত; ঈমান অর্থাৎ আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং আমল তিনটিই পাওয়া যাওয়া শর্ত নয়। প্রত্যেক নেককার ও বদকারের জানাযার নামায পড়া হবে। এর এক কারণ ইজমা। আরেক কারণ, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– আহলে কিব্লার যে লোক মারা গেল, তোমরা তার জানাযার নামায পড়া বন্ধ করো না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ইমামের জন্য কি নিষ্পাপতা শর্ত ?

শী'আরা যেভাবে ইমামতে কুবরা তথা খেলাফতের মধ্যে ইমাম ও খলীফার জন্য নিষ্পাপ হওয়ার শর্তারোপ করে, তদ্রুপ ইমামতে ছুগরা তথা নামাযের ইমামতিতেও ইমামের নিষ্পাপতার শর্তারোপ করে। বিধায় তারা নামাযকে তার শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত ইমাম মাহদীর অপেক্ষায় পিছিয়ে রাখে। এমনকি যখন শেষ ওয়াক্ত এসে যায় তখন একাকী পড়ে নেয়। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হল, প্রত্যেক নেককার ও বদকার লোকের পেছনে নামায আদায় হয়ে যায়। (এর একাধিক প্রমাণ রয়েছে।)

(১) প্রথমতঃ রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– তোমরা প্রত্যেক নেককার ও বদকারের পেছনে নামায পড়ে নাও! অবশ্য হাদীসটি দুর্বল।

(২) দ্বিতীয় প্রমাণ ইজমা। কেননা উম্মতের আলিমগণ ফাসিক ও বিদ'আতীর পেছনে নামায পড়ে নিতেন এবং পড়ে আসছেন। কেউ তা অস্বীকার করেন নি, নাজায়েযও বলেন নি। কাজেই এর বৈধতার উপর ঐকমত্য হয়ে গেল।

প্রশ্ন ঃ তদুপরি প্রশ্ন থেকে যায় যে, কোন কোন আলিম তো ফাসিক ও বিদ'আতীর পেছনে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। তাহলে আপনারা কিভাবে বলেন, প্রত্যেক নেককার ও নেককারের পেছনে নামায পড়া জায়েয?

✪ এর জবাব হল, এ নিষেধাজ্ঞা অবৈধতার উপর প্রজোয্য নয় যে, উল্লেখিত বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হবে বরং তা মাকরূহ হিসেবে প্রজোয্য। অধিকন্তু ফাসিক ও বিদ'আতীর পেছনে ততক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়া জায়েয, যাবৎ না তার ফাসেকী ও বিদ'আত কুফরীর পর্যায়ে পৌছাবে। কুফরের পর্যায়ে পৌছালে তার পেছনে নামায পড়া জায়েয হবে না। যেমন, যেসব শী'আ হযরত আলী রাযি. কে প্রভু মনে করে, তার পেছনে নামায পড়া জায়েয নয়।

ম'তাযিলীরা যদিও ফাসিক এবং কবীরা গুনাহগারকে ঈমান থেকে খারেজ (বহিস্কৃত) মনে করে –যার দাবী হল, তার পেছনে নামায পড়া জায়েয না হওয়া। কিন্তু তারাও আমাদের মত ফাসিকের পেছনে নামায পড়া জায়েয সাব্যস্ত করে। কেননা তাদের মতে ইমাম মুমিন হওয়া শর্ত নয় বরং কাফির না হওয়া শর্ত। আর ফাসিক তাদের মতে যেভাবে মুমিন নয়; তদ্রুপ কাফিরও নয়। কাজেই ইমামতির শর্ত পাওয়া গেল।

প্রত্যেক নেককার ও বদকারের জানাযার নামায পড়া হবে

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আরেকটি আকীদা হল, প্রত্যেক নেককার ও বদকারের জানাযার নামায পড়া হবে। তবে শর্ত হল, বাহ্যতঃ তার মৃত্যু ঈমানের হালতে হতে হবে। এর প্রমাণ নিম্নরূপ।

এক. প্রথম প্রমাণ ইজমা। কেননা উম্মতের আলিমগণ ফাসিকের জানাযার নামায যথারীতি পড়ে আসছেন।

দুই. দ্বিতীয় প্রমাণ রাসূলে কারীম ﷺ এর হাদীস। তিনি ইরশাদ করেন– তোমরা আহলে কিবলার প্রত্যেক মাইয়্যেতের জানাযার নামায পড়!

তিন. ইমাম তাবারানী রহ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– صَلُّوْا عَلٰى مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অর্থাৎ তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠকারীর জানাযার নামায পড়!

চার. তদ্রুপ ইবনে মাজাহ-নাসাঈ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে صَلُّوْا عَلٰى كُلِّ مَيِّتٍ (তোমরা প্রত্যেক মৃতের উপর নামায পড়!) বাক্য বর্ণিত হয়েছে।

فَإِنْ قِيلَ أَمْثَالُ هٰذِهِ الْمَسَائِلِ إِنَّمَا هِيَ مِنْ فُرُوعِ الْفِقْهِ . فَلَا وَجْهَ لِإِيرَادِهَا فِي أُصُولِ الْكَلَامِ . وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ إِعْتِقَادَ حَقِّيَّةِ ذَالِكَ وَاجِبٌ . وَهٰذَا مِنَ الْأُصُولِ . فَجَمِيعُ مَسَائِلِ الْفِقْهِ كَذَالِكَ . قُلْنَا إِنَّهُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ مَقَاصِدِ عِلْمِ الْكَلَامِ مِنْ مَبَاحِثِ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ وَالْمَعَادِ وَالنُّبُوَّةِ وَالْإِمَامَةِ عَلٰى قَانُونِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَطَرِيقِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ حَاوَلَ التَّنْبِيهَ عَلٰى نُبَذٍ مِّنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي يَتَمَيَّزُ بِهَا أَهْلُ السُّنَّةِ وَعَنْ غَيْرِهِمْ مِمَّا خَالَفَتْ فِيهِ الْمُعْتَزِلَةُ أَوِ الشِّيعَةُ أَوِ الْفَلَاسِفَةُ أَوِ الْمَلَاحِدَةُ أَوْ غَيْرُهَا مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ سَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الْمَسَائِلُ مِنْ فُرُوعِ الْفِقْهِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْجُزْئِيَّاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعَقَائِدِ.

সহজ তরজমা

সুতরাং যদি প্রশ্ন করা হয়– এ ধরনের মাসআলাগুলো ফিকহ্ শাস্ত্রের শাখাগত মাসআলার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই কালাম শাস্ত্রের মূলনীতিতে এসব উল্লেখ করার অদৌ কোন যৌক্তিকতা নেই। আর যদি মূলগ্রন্থকারের মূর্খ্য উদ্দেশ্য হয়, এসবের যথার্থতার উপর বিশ্বাস করা ওয়াজিব। এ হিসেবে এগুলো উসূলের অন্তুর্ভুক্ত। তাহলে ফিকহের যাবতীয় মাসায়েল এরকমই। (এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। সেগুলোও উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল।)

আমরা জবাব দেব, মূলগ্রন্থকার যখন কালামশাস্ত্রের মূখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ অনিবার্য সত্ত্বা, তার গুণাবলি, কাজকর্ম, পরকাল নবুওয়াত এবং ইমামদের নেতৃত্বের (শাসনতন্ত্রের) আলোচনা ইসলামের বিধানুসারে এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নীতি অনুযায়ী বর্ণনা করে অবসর হলেন, তখন এমন কিছু মাসআলা মাসায়েল সম্পর্কে অবহিত করার ইচ্ছা করেছেন, যেগুলোর দ্বারা বিভিন্ন মতাবলম্বীদের থেকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পার্থক্য নির্ণয় হয়। অর্থাৎ সে সব মাসায়েল যাতে মুতাযিলী, শী'আ, দার্শনিক, নাস্তিক-মুরতাদ কিংবা অন্যান্য বিদ'আতী, প্রবৃত্তি পুজারী দলগুলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরোধীতা করেছে। চাই সেগুলো ফিকাহ শাস্ত্রের শাখাগত মাসায়েল হোক কিংবা অন্যান্য শাখাগত মাসায়েলই হোক, যেগুলো আকাইদের সাথে সংশ্লিষ্ট।

আমলের সাথে সংশ্লিষ্ট মাসায়েল বর্ণনার কারণ?

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ: فَإِنْ قِيلَ ...الخ ঃ যেহেতু কালাম শাস্ত্রে শরী'আতের সেসব বিধি-বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়, যেগুলোর সম্পর্ক আকীদার সাথে। যাকে উসূলে কালাম বা কালাম শাস্ত্রের মূলনীতি বলে। এজন্য প্রশ্ন উঠে যে, ফাসিকের পেছনে নামায পড়া সংক্রান্ত মাসআলাটি মোজার উপর মাসাহ করা ও নাবীযে তামার দ্বারা অযু করা জাতীয় মাসআলার অন্তর্ভুক্ত। যেগুলো আমলের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার দরুন ফিকাহ শাস্ত্রের শাখাগত মাসআলার পর্যায়ভুক্ত। তাহলে মূলগ্রন্থকার এসব মাসায়েল (কালাম শাস্ত্রের) এ কিতাবে আনলেন কেন? অধিকন্তু যদি বলা হয়, এসব মাসায়েলের যথার্থতার উপর বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব। সে মতে এগুলো ইল্‌মে কালামের মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত। তাহলে এ প্রমাণ এজন্য বিশুদ্ধ নয় যে, ফিকহের যাবতীয় মাসায়েলই এমন, যার যথার্থতার উপর বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব। কাজেই সবগুলোই উসূলে কালাম মেনে নিয়ে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ব্যাখ্যাতার প্রদত্ত জবাবের সারকথা হল, এসব মাসায়েল ফিকাহ শাস্ত্রের শাখাগত মাসআলা তো বটেই। কিন্তু যেহেতু এসব মাসায়েলে কোন কোন ভ্রান্ত সম্প্রদায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরোধীতা করেছে, এজন্য এগুলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের জন্য مَابِهِ الْإِمْتِيَازُ বা প্রার্থক্যকারী বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে। কাজেই মূলগ্রন্থকার এসব মাসায়েলের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অভিমত প্রকাশের ইচ্ছা পোষণ করেছেন।

وَيُكَفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ اِلَّا بِخَيْرٍ لِمَا وَرَدَ مِنَ الْاَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ فِىْ مَنَاقِبِهِمْ وَوُجُوْبِ الْكَفِّ عَنِ الطَّعْنِ فِيْهِمْ . كَقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَاتَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ . فَلَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِنْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نِصْفَهُمْ . وَكَقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَكْرِمُوْا اَصْحَابِىْ . فَاِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ . اَلْحَدِيْثُ . وَكَقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِىْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ . وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ . وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ . وَمَنْ اٰذَى اللّٰهَ تَعَالٰى فَيُوْشِكُ اَنْ يَّاْخُذَهٗ . ثُمَّ فِىْ مَنَاقِبِ كُلٍّ مِنْ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِىٍّ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ اَكَابِرِ الصَّحَابَةِ اَحَادِيْثُ صَحِيْحَةٌ . وَمَا وَقَعَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْمُنَازَعَاتِ وَالْمُحَارَبَاتِ . فَلَهٗ مَحَامِلُ . وَتَاوِيْلَاتٌ . فَسَبُّهُمْ وَالطَّعْنُ فِيْهِمْ اِنْ كَانَ مِمَّا يُخَالِفُ الْاَدِلَّةَ الْقَطْعِيَّةَ فَكُفْرٌ كَقَذْفِ عَائِشَةَ وَاِلَّا فَبِدْعَةٌ وَفِسْقٌ

সহজ তরজমা

আর মঙ্গল বা প্রসংশা ব্যতীত সাহাবায়ে কিরামের আলোচনা থেকে মুখ বন্ধ রাখা (বিরত রাখা) হবে। সেসব বিশুদ্ধ হাদীসের কারণে, যেগুলো তাদের ফযীলত এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা করা থেকে মুখ বন্ধ রাখার (বিরত থাকার) ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– আমার সাহাবীদেরকে মন্দ বলো না! কেননা তোমাদের মধ্যে কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর পথে সদকা করে, তবু সে তাদের (সাহাবাগণের) কারও সদকাকৃত এক মুদ বা অর্ধ মুদ পর্যায়েও পৌছতে পারবে না। তিনি আরও ইরশাদ করেছেন– আমার সাহাবীদেরকে সম্মান কর! কেননা তারা তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম। তিনি আরও বলেছেন– আমার সাহাবীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর! আমার (ইন্তকালের) পরে তোমরা তাদেরকে টার্গেট (লক্ষ্যবস্তু) বানিও না! সুতরাং যারা তাদেরকে ভালবাসবে, তারা আমাকে ভালবাসে বলেই তাদেরকে ভালবাসবে। আর যারা তাদের সাথে বিদ্বেষ রাখবে, তারা আমার সাথে বিদ্বেষ রাখে বলেই তাদের সাথে বিদ্বেষ রাখবে। যারা তাদেরকে কষ্ট দেবে, তারা আমাকে কষ্ট দিল। আর যারা আমাকে কষ্ট দিল, তারা আল্লাহ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করল। আর যারা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করল, শীঘ্রই আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করবেন। অতঃপর হযরত আবু বকর রাযি., হযরত উসমান রাযি., হযরত আলী রাযি., হযরত হাসান, হুসাইন রাযি. এর প্রত্যেকের এবং অন্যান্য বড় বড় সাহাবায়ে কিরামের ফযীলত সম্পর্কে বহু সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে যেসব মতপার্থক্য ও যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে, সেগুলোর পটভূমি ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে। সুতরাং যদি এরূপ কোন কারণে তাদেরকে গালি দেওয়া হয় এবং ভর্ৎসনা করা হয়, যা অকাট্য প্রমাণ বিরোধী, তা হবে কুফরী। যেমন, হযরত আয়েশা রাযি. কে অপবাদ দেওয়া। নতুবা তা হবে বিদ'আত ও ফিস্‌ক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সাহাবীর পরিচয় ও মর্যাদা

ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় সাহাবা দ্বারা সেসব পুতঃপবিত্র সত্ত্বা উদ্দেশ্য, যারা ঈমান অবস্থায় রাসূলে কারীম ﷺ এর সাহচর্য পেয়েছেন এবং আমরণ ঈমানের উপর অটল ছিলেন। তাঁরা এমন বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব যে, নবীগণের পর কোন ব্যক্তি চাই যতই ইবাদত-বন্দেগী, রিয়াযত করে ফেলুক না কেন, তাঁদের স্তরে ও মর্যাদায় কখনও পৌছতে পারবে না। তাদের মাহাত্ম ও পবিত্রতা আমাদের দ্বীন ও ঈমান। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাদের স্তুতি গেয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন–

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ـ (سورة الفتح : ٢٩)

"মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল; আর তার সহচরগণ কাফিরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু-সিজদায় অবনত দেখতে পাবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন। তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই রয়েছে। আর ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারাগাছ, যা হতে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে– চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে। এভাবে আল্লাহ মুমিনের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।

তাদের ন্যায়পরায়ণতা বর্ণনা করেছেন স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ সেসব সাহাবায়ে কিরামের ন্যায়পরায়ণতা ও পুতঃপবিত্রতার উপর আমাদের কুরআন-সুন্নাহ এবং তাবৎ ইসলামী নেযাম ও ব্যবস্থা নির্ভরশীল। তাঁরা আমাদের দ্বীন ও শরী'আতের রাজসাক্ষী। কুরআন-সুন্নাহ ও দ্বীনের নামে যা কিছু আমাদের কাছে পৌছেছে, যা কিছু আমরা পেয়েছি, তার সবই সেই মহান পুণ্যাত্মা ও পবিত্র সত্ত্বাগুলোর মাধ্যমে পৌছেছে। আমাদের পূর্বেকার মনীষীগণ তাদের বদৌলতেই কুফর-শিরকের স্থানে ঈমান-ইয়াকীনের আলোকরশ্মি পেয়েছেন। হযরত সাহাবায়ে কিরামের পবিত্রতার বিষয়টি কেবলই আকীদা সংক্রন্ত বিষয়ই নয় বরং গোটা শরী'আত এবং রাসূলে কারীম ﷺ এর সত্যতা ও হককানিয়্যতের বিষয়। সহসা কেউ যদি এ স্তম্ভগুলো ভেঙ্গে গড়িয়ে দিতে চায় এবং তাদের দ্বীনদারী ও বিশ্বস্থতাকে যখম করার জন্য নগ্ন হামলা চালায়, তাদের মাহাত্ম ও পবিত্রতায় কালিমা লেপন করতে চায়, তবে আমরা তাকে ধর্মীয় আত্মহত্যা এবং নিজের দ্বীন ও শরী'আতের সাথে শত্রুতা ও ঘাতকতা মনে করব। পূর্ণ হিতাকাঙ্খার সাথে সে হাত, সে কলম, সে জবান স্তব্ধ করে দেওয়াকে নিজের প্রথম কর্তব্য মনে করব। রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَاتَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِىْ

"আমার সাহাবাগণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর! আমার পরে তোমরা তাদেরকে
সমালোচনার টার্গেট বানিও না।"

আরেকটি হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে– আমার সাহাবাগণকে গাল-মন্দ কর না! তোমাদের কেউ যদি আল্লাহর রাস্তায় উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও ব্যয় করে ফেলে, তবু সে আমার সাহাবীর ব্যয়কৃত এক মুদ বা অর্ধমুদ পরিমাণের সমান সাওয়াব লাভ করতে পারবে না।

রাসূলে কারীম ﷺ এর এ হাদীসে পাকে সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে যে, তাঁর সাহাবায়ে কিরামকে আমল ও কৃর্তির পাল্লায় নয় বরং সম্পর্ক সাহচর্যের পাল্লায় ওজন করা হবে। যে এ মূলনীতির তোয়াক্কা করে নি, সেই হোঁচট খেয়েছে; পদস্খলিত হয়েছে। আর কারা বলে "নবীগণ ছাড়া কেউ সমালোচনার উর্ধ্বে নয়"। তারা সাহাবায়ে কিরামের বিরুদ্ধে সমালোচনার পথ-পাথেয় খুঁজে বেড়ায়। চাই সে ইসলামের চদ্মাবরণে আসুক না কেন। তার ভেতর সাবাই ও ইয়াহুদীবাদের জীবাণু সক্রিয়। ইমাম শা'বী রহ. এর মতানুসারে সে ইয়াহুদী খ্রিস্টান থেকেও জঘন্য ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট। ইয়াহুদী-খ্রিস্টান তাদের তুলনায় স্বীয় রাসূলের সঙ্গী-সাথীদের সাথে অনেক বেশী সদ্ব্যবহার করে। তাদেরকে ইযযত-সম্মান করে। তাদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল– তোমাদের উম্মতের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট লোক কারা? তখন ইয়াহুদীরা বলেছে, মূসা (আ.) এর সাথীবর্গ। আর খ্রিস্টানরা বলেছে– হওয়ারিয়্যীন তথা ঈসা (আ.) এর সাথীবর্গ। অথচ কিছু লোক আছে, যে স্বীয় রাসূলের সাহাবীদেরকে নিকৃষ্টতর উম্মত সনাক্ত করার পিছনে লেগে আছে। সে ভাবে না যে, যদি দ্বীনের সেই প্রাথমিক নিবেদিতপ্রাণ রক্ষকরা স্বার্থপর, স্বজনপ্রিয় এবং

জালিম-অত্যাচারী হয়ে থাকেন, তাহলে যে কুরআন-সুন্নাহ তাদের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং যার উপর দ্বীনের প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে, সবই ধ্বসে যাবে।

قَوْلُهُ: مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ ...الخ ঃ مُدٌّ (শব্দের মীমে পেশ, দাল তাশদীদ যুক্ত) সর্বসম্মতভাবে সা'য়ের এক চতুর্থাংশকে বলে। কেউ কেউ বলেন, দুই হাতের বেষ্টনীতে পড়ে এ পরিমাণকে মুদ বলে।

وَقَوْلُهُ: اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ ঃ উহ্য ইবারত اِتَّقُوا اللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ হবে।

قَوْلُهُ: ثُمَّ فِىْ مَنَاقِبِ كُلٍّ ..الخ ঃ যেরূপভাবে সকল সাহাবায়ে কিরামের ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে ব্যাপক শব্দে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তদ্রুপ বিশেষ বিশেষ সাহাবাগণের সন্মান-মর্যাদা সম্পর্কেও বহু সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আমরা নিম্নে কতিপয় হাদীস নকল করছি।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا لِاَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ اِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلَا اَبَابَكْرٍ فَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللّٰهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا نَفَعَنِىْ مَالُ اَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِىْ مَالُ اَبِىْ بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَاتَّخَذْتُ اَبَابَكْرٍ خَلِيْلًا.

"রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- আমি আবু বকর রাযি. ব্যতীত সব মানুষের অনুগ্রহের প্রতিদান দিয়ে ফেলেছি। তাঁর অনুগ্রহের প্রতিদান আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামত দিবসে দিবেন। কারও সম্পদ দ্বারা আমার ততটুকু উপকার হয়নি, যতটুকু হয়েছে আবু বকর রাযি. এর সম্পদ দ্বারা। আর আমি কাউকে নিবিড় বন্ধু বানালে আবু বকর রাযি. কে বানাতাম।"

وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ اِمْرَاَةٌ فَكَلَّمَتْهُ فِىْ شَيْئٍ فَاَمَرَهَا اَنْ تَرْجِعَ اِلَيْهِ. قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ جِئْتُ وَلَمْ اَجِدْكَ كَاَنَّهَا تُرِيْدُ الْمَوْتَ قَالَ فَاِنْ لَمْ تَجِدِيْنِىْ فَأْتِىْ اَبَا بَكْرٍ متفق عليه

"একবার রাসূলে কারীম ﷺ এর খেদমতে জনৈক মহিলা এসে কোন এক ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বললেন। তখন নবীজী তাকে পুনরায় আসার জন্য বললেন। মহিলা বলল- আমি আপনার কাছে এসে যদি আপনাকে না পাই! (তাহলে কি করব?) রাবী বলেন- সম্ভবতঃ মহিলা মৃত্যুর কথা ভেবেছে। নবীজী বললেন- তুমি এসে যদি আমাকে না পাও, তবে আবু বকর রাযি. এর শরণাপন্ন হবে।" -বুখারী ও মুসলিম।

وَعَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ اَبَابَكْرٍ دَخَلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَنْتَ عَتِيْقُ اللّٰهِ مِنَ النَّارِ فَيَوْمَئِذٍ سُمِّىَ عَتِيْقًا.

"হযরত আয়েশা রাযি. বলেন- একবার হযরত আবু বকর রাযি. রাসূলে কারীম ﷺ এর খেদমতে হাজির হলে তিনি বললেন- তুমি জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত। কাজেই সেদিন থেকে তাঁর নাম রাখা হয় আতীক।" (যেরূপভা অকপটে মি'রাজের ঘটনাকে সত্য বলে মেনে নেওয়ার কারণে তাকে সিদ্দীক বলা হয়। কাজেই সিদ্দীক ও আতীক দুটোই তাঁর উপাধি।) -তিরমিযী শরীফ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ وَ قَلْبِهِ

"ইবনে উমর (রাযি,) বলেন- রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা সত্যকে হযরত উমর রাযি. এর মুখে ও অন্তরে রেখেছেন।" -তিরমিযী শরীফ

وَعَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْكَانَ بَعْدِىْ نَبِىٌّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

"রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- আমার পরে যদি কোন নবী হতেন তবে তিনি হতেন উমর।" -তিরমিযী

عَنْ طَلْحَةَ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِىٍّ رَفِيْقٌ وَرَفِيْقِىْ يَعْنِىْ فِى الْجَنَّةِ عُثْمَانُ.

"রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- প্রত্যেক নবীরই একজন নিবিড় বন্ধু থাকে। আর জান্নাতে আমার নিবিড় বন্ধু হল, উসমান।" -তিরমিযী

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِىٌّ مَوْلَاهُ

"নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- আমি যার বন্ধু, আলী রাযি.ও তার বন্ধু।"-তিরমিযী

عَنْ اَنَسٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَیُّ اَهْلِ بَيْتِكَ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ.

"রাসূলে কারীম ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার কাছে আপনার পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় কে? তখন তিনি বললেন– হাসান ও হুসাইন রাযি.।"

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ قَالَ حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَاٰسِيَةُ امْرَاَةُ فِرْعَوْنَ.

"রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন–তোমার জন্য গোটা পৃথিবীর মহিলাদের মধ্যে মারইয়াম বিনতে ইমরান, খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ ﷺ এবং ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়াই যথেষ্ট।"

তাছাড়া বহু সংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম যেমন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি., হযরত আবু যুবাইর, হযরত উবাইদাহ ইবনে জার্‌রাহ, হযরত উবাই ইবনে কা'ব এবং হযরত মা'আয ইবনে জাবাল রাযি. প্রমুখ সাহাবীর মর্যাদা ও ফযীলত সম্পর্কে প্রচুর সহীহ হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

সাহাবায়ে কিরামের মতবিরোধ ছিল ইজতিহাদী কারণে

قَوْلُهٗ: وَمَا وَقَعَ بَيْنَهُمْ ...الخ ঃ অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যেসব যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা মতপার্থক্য হয়েছে, সেগুলো সঠিক অর্থে প্রযোজ্য। (সেগুলো হয়েছিল কোন মহৎ উদ্দেশ্যে।) সেগুলোর ব্যাখ্যায় বলা হবে, তারা সকলেই ছিলেন সত্য সন্ধানী। এক্ষেত্রে প্রত্যেকেই ছিলেন মুজতাহিদ। কেউ সে ইজতিহাদে সঠিক পথ পেয়েছিলেন। আবার কেউ ভুল পথে এগিয়েছেন। আর হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে ইজতিহাদ ভুলকারী মাযূর; অভিযুক্ত নন বরং সাওয়াবের হকদার।

وَبِالْجُمْلَةِ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ السَّلَفِ الْمُجْتَهِدِيْنَ وَالْعُلَمَاءِ الصَّالِحِيْنَ جَوَازُ اللَّعْنِ عَلٰى مُعَاوِيَةَ وَاَحْزَابِهٖ لِاَنَّ غَايَةَ اَمْرِهِمُ الْبَغْیُ وَالْخُرُوْجُ عَلَى الْاِمَامِ. وَهُوَ لَا يُوْجِبُ اللَّعْنَ. وَاِنَّمَا اخْتَلَفُوْا فِیْ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ حَتّٰى ذُكِرَ فِی الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهَا اَنَّهٗ لَا يَنْبَغِی اللَّعْنُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْحَجَّاجِ. لِاَنَّ النَّبِیَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنْ لَعْنِ الْمُصَلِّيْنَ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ. وَمَا نُقِلَ مِنَ النَّبِیِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ اللَّعْنِ لِبَعْضٍ مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ فَلِمَا اَنَّهٗ يَعْلَمُ مِنْ اَحْوَالِ النَّاسِ مَالَا يَعْلَمُهٗ غَيْرُهٗ وَبَعْضُهُمْ اَطْلَقَ اللَّعْنَ عَلَيْهِ. لِمَا اَنَّهٗ كَفَرَ حِيْنَ اَمَرَ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ رض. وَاتَّفَقُوْا عَلٰى جَوَازِ اللَّعْنِ عَلٰى مَنْ قَتَلَهٗ اَوْ اَمَرَ بِهٖ اَوْ اَجَازَهٗ وَرَضِیَ بِهٖ. وَالْحَقُّ اَنَّ رِضَا يَزِيْدَ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ رض وَاسْتِبْشَارَهٗ بِذَالِكَ وَاِهَانَةَ اَهْلِ بَيْتِ النَّبِیِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِمَّا تَوَاتَرَ مَعْنَاهُ وَاِنْ كَانَتْ تَفَاصِيْلُهٗ اٰحَادًا فَنَحْنُ لَانَتَوَقَّفُ فِیْ شَانِهٖ بَلْ فِیْ اِيْمَانِهٖ. لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَعَلٰى اَنْصَارِهٖ وَاَعْوَانِهٖ.

সহজ তরজমা

মোটকথা, প্রবীণ মুজতাহিদগণ ও মহান বুযুর্গ উলামায়ে কিরাম থেকে হযরত মুয়াবিআ রাযি. এবং তাঁর দলকে (সমর্থকদেরকে) অভিসম্পাত ও ভর্ৎসনা করার বৈধতা বর্ণিত নেই। কেননা বড়জোর তার উপর রাষ্ট্রদ্রোহ ও ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অভিযোগ আনা যায়। আর তা অভিসম্পাতকে আবশ্যক করে না। তারা কেবল ইয়াযীদ ইবনে মু'আবিয়া রাযি. সম্পর্কে মতবিরোধ করেছেন। এমনকি 'খোলাসা' প্রভৃতি গ্রন্থে রয়েছে, তার উপর

অভিশাপ দেওয়া যথোচিত নয় এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফের উপরেও নয়। কেননা রাসূলে কারীম ﷺ নামাযী মুসল্লী এবং সেসব লোকদেরকে অভিশাপ দিতে নিষেধ করেছেন, যারা আহলে কিবলার অন্তর্ভুক্ত। আর রাসূলে কারীম ﷺ থেকে কোন কোন আহলে কিবলার উপর যে অভিসম্পাতের কথা বর্ণিত আছে, তার কারণ হল, রাসূলে কারীম ﷺ মানুষের এরূপ অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন, যা অন্য লোকেরা জানত না। আবার কেউ কেউ তার (ইয়াযীদের) উপর অভিশম্পাত বর্ষণকে জায়েয সাব্যস্ত করেছেন। কেননা সে যখন হুসাইন রাযি. কে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল, তখন সে কাফির হয়ে গিয়েছিল। উলামায়ে কিরাম তাকে লা'নত করার বৈধতার ব্যাপারে একমত হয়েছেন, সে হযরত হুসাইন রাযি. কে হত্যা করেছে কিংবা তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছে অথবা হত্যার অনুমতি দিয়েছে এবং এতে খুশী হয়েছে। সত্য কথা হল, হযরত হুসাইন রাযি. এর হত্যায় তার সম্মতি দেওয়া, এতে তার আনন্দিত হওয়া এবং নবী পরিবারকে অপমানিত করা (সবই) এমন বিষয়, যা অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির। যদিও এর বিশদ বিবরণ খবরে ওয়াহিদ। সুতরাং আমরা তার ব্যাপারে বরং তার ঈমানের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করব না। তার উপর এবং তার সহযোগী অনুচরদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর মর্যাদা

হযরত মু'আবিয়া রাযি. রাসূলে কারীম ﷺ এর সাহাবী। স্ত্রীয় সম্পর্কীয় ভাই। একজন অহী লেখক। তাঁর সম্পর্কে বিশেষভাবে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন, তিরমিযী শরীফে একটি হাদীস আছে, যাতে রাসূলে কারীম ﷺ তার উদ্দেশ্যে বলেন- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا وَاهْدِ بِهِ

"হে আল্লাহ! তাকে পথপ্রদর্শক ও সুপথপ্রাপ্ত বানাও এবং তার মাধ্যমে লোকদেরকে হেদায়েত দাও।"

* বুখারী শরীফে আছে, একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. কে বলা হল, মু'আবিয়া রাযি. মাত্র এক রাকআত বিতির পড়েছেন। তখন ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, তাঁকে ছেড়ে দাও, তিনি ফকীহ। তিনি রাসূলে কারীম ﷺ এর সাহচর্য পেয়েছেন।

* আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল- হযরত মু'আবিয়া রাযি. শ্রেষ্ঠ নাকি উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.? তখন তিনি বললেন- রাসূলে কারীম ﷺ এর সাথে জিহাদের সময় হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর ঘোড়ার খুরে যে ধূলোবালি উড়েছে, তাও হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. থেকে উৎকৃষ্ট।

* খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. এর সম্মুখে জনৈক ব্যক্তি হযরত মু'আবিয়া রাযি.কে গালমন্দ করলে তিনি তাকে বেত্রাঘাত করেন। এসব ফয়ায়েল থাকা সত্ত্বেও মু'আবিয়া রাযি. উপর লা'নত করা নাজায়েয বলে ব্যাখ্যাতার চুপ থাকা এবং তার ফায়ায়েল ও মান-মর্যাদা প্রসঙ্গে কিছুই না বলা তার শানে নিতান্তই উদাসীনতা বৈ কিছু নয়।

ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া

قَوْلُهُ: وَاِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِىْ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ رض ..الخ ঃ ইয়াযীদের জন্ম ২৫/২৬/২৭ হিজরীতে হয়েছে। মু'আবিয়া রাযি. এর পরে সেই খেলাফতের লাগাম টেনে ধরে। ইয়াযীদ সম্পর্কে যে কথিত আছে- রাসূলে কারীম ﷺ হযরত মু'আবিয়া রাযি.কে দেখলেন, তিনি ইয়াযীদকে কোলে নিয়ে আছেন। তখন নবীজী বলেন- এক জান্নাতী এক জাহান্নামীকে কোলে নিয়েছে, হাদীসটি সরাসরি জাল, বানোয়াট। যেমন, শী'আদের একটি বর্ণনা আছে, রাসূলে কারীম ﷺ হযরত মু'আবিয়া রাযি. এবং তার পুত্র ইয়াযীদ দু'জনকেই জাহান্নামী বলেছেন, বর্ণনাটি সরাসরি জাল, বানোয়াট। কেননা রাসূলে কারীম ﷺ এর যুগে ইয়াযীদের জন্মই হয় নি। তার জন্ম হয়েছে হযরত উসমান রাযি. এর খেলাফতের যুগে।

ইয়াযীদ সম্পর্কে অনেক খারাপ কথাও বর্ণিত আছে। যেমন, সে ফাসিক, ফাজির, পাপিষ্ঠ। তার সবচেয়ে জঘন্য ও ঘৃণিত কাজ রাসূলে কারীম ﷺ এর পরিবারের সাথে তার মর্মন্তুদ ও নাজায়েয ব্যবহার। এজন্যই উলামায়ে কিরামের মাঝে প্রশ্ন উঠে- ইয়াযীদকে লা'নত করা জায়েয কি না?

কেউ কেউ যেমন ইমাম গাযালী রহ. প্রমুখ মনীষী থেকে লা'নতের নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে। কেননা ইয়াযীদ

যত বড় গুনাহগারই হোক না কেন, তবু সে গুনাহের কারণে ঈমান থেকে বেরিয়ে যায় নি। আর না আহলে কিবলা থেকে খারেজ হয়েছে। অপরদিকে রাসূলে কারীম ﷺ আহলে কিবলার উপর লা'নত করতে নিষেধ করেছেন। এখানে আহলে কিবলা দ্বারা উদ্দেশ্য, যে নামাযে কা'বাকে সামনে রাখে। এ কাজ তার মুসলমান হওয়ার নিদর্শন। কারণ, ইসলাম ছাড়া অন্যান্য আসমানী ধর্মাবলম্বীরা কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ে না। হাদীস শরীফে আছে– যে ব্যক্তি আমাদের মত নামায পড়বে, আমাদের কিবলাকে সম্মুখে রাখবে এবং আমাদের যবাই করা পশু খাবে, সে-ই ঐ মুসলমান, যার জন্য আল্লাহ ও তার রাসূলের দায়িত্ব আছে। এ হাদীসটি ইমাম বুখারী রহ. উল্লেখ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে লা'নত করলেন ?

পক্ষান্তরে কোন কোন আহলে কিবলা সম্পর্কে রাসূলে কারীম ﷺ থেকে যে লা'নতের কথা বর্ণিত আছে, তা এ অর্থে প্রযোজ্য যে, তিনি লোকদের এমন এমন অবস্থা অহী মারফত জানতে পারতেন, যা অন্যরা জানত না। সুতরাং হতে পারে, অহী মারফত রাসূলে কারীম ﷺ জানতে পেরেছেন– তার মৃত্যু হবে কুফরের হালতে।

ইয়াযীদকে লা'নত করা যাবে কি না?

কেউ কেউ মনে করেন, ইয়াযীদের উপর লা'নত করা জায়েয। তাদের মতে ইয়াযীদ হযরত হুসাইন রাযি. কে শহীদ করার নির্দেশ দেওয়ার কারণে কাফির হয়ে গিয়েছিল। আর কাফিরের উপর লা'নত করা জায়েয।

ব্যাখ্যাতা বলেন– হযরত হুসাইন রাযি. এর হত্যায় ইয়াযীদের সম্মতি দান, আনন্দিত হওয়া এবং রাসূলে কারীম ﷺ এর পরিবারের লোকদেরকে অপদস্থ-অপমানিত করার ব্যাপারটি অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির। যদিও শব্দাবলি খবরে ওয়াহিদ পর্যায়ের। এজন্য আমরা তাঁকে লা'নত করার ব্যাপারে দ্বিধাবোধ করি না বরং তাঁর ঈমানের ব্যাপারে সংশয় করি। এরপর ব্যাখ্যাতা لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলে তার মনের চাপা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু গবেষক উলামায়ে কিরামের উক্তি মতে লা'নত করার তিনটি ধরণ রয়েছে।

লা'নত করার পদ্ধতি

(১) ব্যাপক গুণের সাথে লা'নত করা। যেমন– বলা হল, কাফির ও ইয়াহুদীদের উপর আল্লাহর লা'নত। এ সূরত জায়েয বরং কোন কোন সগীরা গুনাহের ব্যাপারেও রাসূলে কারীম ﷺ ব্যাপক গুণের সাথে লা'নত করেছেন বলে প্রমাণিত আছে। যেমন, তিনি বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ এবং পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিনী মহিলাদের উপর লা'নত বর্ষণ করুন।

(২) এমন কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপরে লা'নত করা, যার কুফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার কথা শরী'আত প্রণেতার পক্ষ থেকে জানানোর দ্বারা প্রমাণিত। যেমন, ফেরাউন, আবু জাহল, ইবলীস প্রমুখ। এ সূরতও জায়েয।

(৩) এমন কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর লা'নত করা, যার কুফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার কথা অজ্ঞাত। এ সূরত নাজায়েয।

বিজ্ঞ গবেষকগণ এ ব্যাখ্যা প্রদানের কারণ হল, শরী'আত প্রণেতা লা'নত করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। যেমন, তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে– রাসূলে কারীম কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– لا يكون مؤمن لعانا অর্থাৎ মুমিন বান্দা লা'নতকারী হতে পারে না। তিরমিযী শরীফেই আরও বর্ণিত আছে– যে ব্যক্তি কারও উপর লা'নত করল, অথচ সে ঐ লা'নত পাওয়ার যোগ্য নয়, তাহলে সে লা'নত (যে করেছে) তার উপরেই বর্তাবে। অপরদিকে আমরা দেখতে পাই স্বয়ং রাসূলে কারীম কারীম ﷺ ব্যাপক গুণের সাথে লা'নত করেছেন। তদ্রুপ এমন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপরও লা'নত করেছেন, যার মত্যু হয়েছে কুফর অবস্থায়। কাজেই এ দু সূরতেই বৈধতা প্রযোজ্য হবে। আর নিষিদ্ধতার হাদীসগুলো তৃতীয় সূরতে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ এমন কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে লা'নত করা জায়েয নয়, যার কুফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা অজ্ঞাত।

উল্লেখ্য যে, ইয়াযীদের মৃত্যু কুফর অবস্থায় হয়েছে বলে কেউ জানে না। কাজেই নির্দিষ্ট করে তার উপর লা'নত করা জায়েয হবে না। তবে ব্যাপক গুণের সাথে লা'নত করা জায়েয। যেমন বলা হল, হুসাইন রাযি. এর ঘাতকের উপর লা'নত বর্ষিত হোক।

রয়ে গেল এ উক্তি যে, ইয়াযীদ যখন হুসাইন রাযি. কে শহীদ করার নির্দেশ দিয়েছিল, তখন সে কাফির হয়ে গিয়েছিল। এ উক্তি একাধিক কারণে সঠিক নয়। প্রথমতঃ ইয়াযীদ হযরত হুসাইন রাযি.কে শহীদ করার নির্দেশ ইবনে যিয়াদকে দিয়েছিল কি-না এর প্রমাণ নেই।

দ্বিতীয়তঃ এর প্রমাণ থাকলেও ইয়াযীদের কাফির হয়ে যাওয়ার কথা প্রমাণিত নয়। কেননা তার পক্ষ থেকে হযরত হুসাইন রাযি.কে শহীদ করার নির্দেশ প্রদান না হযরত হুসাইন রাযি. মুমিন হওয়ার কারণে ছিল; না ছিল রাসূলে কারীম কারীম ﷺ এর আত্মীয়-স্বজন হওয়ার কারণে বরং সে নির্দেশ ছিল দুনিয়াবী শত্রুতার কারণে। অবশ্যই তা কবীরা গুনাহ; কিন্তু কুফরী নয়।

وَنَشْهَدُ بِالْجَنَّةِ لِلْعَشَرَةِ الَّذِيْنَ بَشَّرَهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَيْثُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَبُوْ بَكْرٍ فِى الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِى الْجَنَّةِ ـ وَعَلِى فِى الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِى الْجَنَّةِ وَزُبَيْرٌ فِى الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ اَبِى وَقَّاصٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فِى الْجَنَّةِ وَاَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِى الْجَنَّةِ ـ وَكَذَا نَشْهَدُ بِالْجَنَّةِ الْفَاطِمَةِ رضـ وَالْحَسَنُ رضـ وَالْحُسَيْنُ رضـ لِمَا وَرَدَ فِى الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ اَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ ـ وَسَائِرُ الصَّحَابَةِ لَايُذْكَرُوْنَ اِلَّا بِخَيْرٍ وَيُرْجٰى لَهُمْ اَكْثَرُ مِمَّا يُرْجٰى لِغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ وَلَا نَشْهَدُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ لِاَحَدٍ بِعَيْنِهِ بَلْ نَشْهَدُ بِاَنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ. وَالْكَافِرِيْنَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ ـ

সহজ তরজমা

আশারায়ে মুবাশ্‌শারা

আমরা সে দশজন সাহাবীর পক্ষে জান্নাতের সাক্ষ্য দেই, যাদেরকে রাসূলে কারীম কারীম ﷺ সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন, তিনি ইরশাদ করেছেন– আবু বকর রাযি. জান্নাতী, উমর রাযি. জান্নাতী, উসমান রাযি. জান্নাতী, আলী রাযি. জান্নাতী, তালহা রাযি. জান্নাতী, যুবাইর রাযি. জান্নাতী, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. জান্নাতী, সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্‌কাস রাযি. জান্নাতী, সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযি. জান্নাতী এবং আবূ উবাইদাহ ইবনে জার্‌রাহ রাযি. জান্নাতী। তদ্রুপ হযরত ফাতেমা রাযি. হাসান রাযি. এবং হুসাইন রাযি. এর পক্ষেও জান্নাতের সাক্ষ্য দেই। কেননা সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে– ফাতেমা রাযি. জান্নাতী মহিলাদের নেত্রী এবং হাসান-হুসাইন রাযি. জান্নাতী যুবকদের নেতা। আর অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের আলোচনা কেবল ভাল ও প্রশংসার সাথে করতে হবে। তাঁদের জন্য ততোধিক সাওয়াব ও প্রতিদানের আশা করতে হবে, যতটা করা হয় অন্যান্য মুসলমানদের জন্য। আমরা সুনির্দিষ্টভাবে অন্য কারও জন্য জান্নাত ও জাহান্নামের সাক্ষ্য দেই না বরং আমরা এ সাক্ষ্য দেই যে, মুমিনগণ জান্নাতী আর কাফির্‌রা জাহান্নামী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

যে দশজন সাহাবায়ে কিরাম রাযি. সম্পর্কে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ প্রসিদ্ধ রয়েছে, তাঁরা ব্যতীত সাহাবায়ে কিরামের অন্য কোন দল যেমন, আসহাবে বদর ও আসহাবে বাই'আতে রিযওয়ান এবং কোন কোন সাহাবী যেমন, হযরত ফাতেমা রাযি., হযরত সালমান ফারসী রাযি. প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে জান্নাতের সুসংবাদ একাধিক সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তবে যেহেতু উপরিউক্ত দশজন সাহাবীর জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ একই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এজন্য তাঁদের জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। তারা জগৎখ্যাত হয়েছেন আশারায়ে মুবাশ্‌শারা নামে। সুতরাং সাহাবায়ে কিরামের যে দল এবং যে যে সাহাবী সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে

জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ বর্ণিত হয়েছে, আমরা তাঁদের জান্নাতী বলে সাক্ষ্য দেই। তারা ভিন্ন অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের জন্য সাধারণ মুসলমানদের তুলনায় আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক সাওয়াব, প্রতিদান ও মাগফিরাতের আশা করি। আর সাধারণ মুসলমানদের মধ্য হতে কারও জন্য সুনির্দিষ্টভাবে জান্নাতী বা জাহান্নামী হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করি না বরং ব্যাপক শব্দে এ সাক্ষ্য প্রদান করি যে, ঈমানদার-মুমিন জান্নাতী আর বেঈমান-কাফির জাহান্নামী।

وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ لِاَنَّهُ وَاِنْ كَانَ زِيَادَةً عَلَى الْكِتَابِ لٰكِنَّهُ بِالْخَبَرِ الْمَشْهُوْرِ ـ سُئِلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رض عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ وَرَوٰى اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّهُ قَالَ رُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً اِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ اَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا ـ وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ اَدْرَكْتُ سَبْعِيْنَ نَفَرًا مِنَ الصَّحَابَةِ يَرَوْنَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَلِهٰذَا قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ مَا قُلْتُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ حَتّٰى جَاءَنِىْ فِيْهِ مِثْلُ ضَوْءِ النَّهَارِ ـ وَقَالَ الْكَرْخِيُّ اَخَافُ الْكُفْرَ عَلٰى مَنْ لَا يَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِاَنَّ الْاٰثَارَ الَّتِىْ جَاءَتْ فِيْهِ فِىْ حَيِّزِ التَّوَاتُرِ وَبِالْجُمْلَةِ مَنْ لَا يَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْبِدْعَةِ حَتّٰى سُئِلَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَقَالَ اَنْ تُحِبَّ الشَّيْخَيْنِ وَلَا تَطْعَنَ فِى الْخَتَنَيْنِ وَتَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ـ

সহজ তরজমা

আমরা সফরে ও নিজগৃহে অবস্থানের সময় (মুকীম ও মুসাফির অবস্থায়) মোজার উপর মাসাহ করা জায়েয মনে করি। কেননা যদিও তা কিতাবুল্লাহর উপর অতিরঞ্জন, কিন্তু এ অতিরঞ্জন খবরে মাশহূর দ্বারা প্রমাণিত। হযরত আলী ইবনে আবী তালীব রাযি. এর নিকট মোজার উপর মাসাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, রাসূলে কারীম ﷺ মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত আর মকীমের জন্য একদিন একরাত মাসাহের মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন। হযরত আবু বকর রাযি. রাসূলে কারীম কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (নবীজী) মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত আর মুকীমের জন্য একদিন একরাত মোজার উপর মাসাহ করার অনুমতি দিয়েছেন। যখন সে (মোজার উপর মাসেহকারী) পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করে থাকে। আর হাসান বসরী রহ. বলেন– আমি এমন সত্তরজন সাহাবীকে পেয়েছি, যারা মোজার উপর মাসাহ করা জায়েয মনে করতেন। কাজেই ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মোজার উপর মাসাহ করার পক্ষপাতি হইনি, যাবৎ না এ ব্যাপারে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আমার কাছে পৌঁছেছে। ইমাম কারখী রহ. বলেন, যে ব্যক্তি মোজার উপর মাসাহ করা জায়েয মনে করে না, আমি তার কুফরীর ব্যাপারে আশঙ্কা করি। কেননা এ সংক্রান্ত যাবতীয় হাদীস মুতাওয়াতির পর্যায়ের। মোটকথা, যে ব্যক্তি মোজার উপর মাসাহ করা জায়েয মনে করে না, সে একজন বিদ'আতী। এমনকি হযরত আনাস রাযি. এর কাছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর আলামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে। তিনি বললেন– (এর আলামত হল,) শাইখাইন তথা হযরত আবূ বকর ও উমর (রাযি,) কে ভালবাসা, রাসূলে কারীম ﷺ এর দুই জামাতাকে ভর্ৎসনা না করা এবং মোজার উপর মাসাহ করা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মোজার উপর মাসাহ করা

মোজার উপর মাসাহ করার মাসআলাটি যদিও ফিকাহ শাস্ত্রের শাখাগত মাসআলা, কিন্তু যেহেতু শী'আ শানী'আহ সম্প্রদায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিপরীত এর বৈধতাকে অস্বীকার করে, এজন্য মুসান্নিফ রহ. মোজার উপর মাসাহের বৈধতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। অবশ্য কুরআনে কারীমের আলোকে অযুতে পা ধৌত করার কথা প্রমাণিত। সে হিসেবে মোজার উপর মাসাহের বৈধতার উক্তি কিতাবুল্লাহর উপর অতিরঞ্জন। কিন্তু এ অতিরঞ্জন খবরে মশহূর দ্বারা হওয়ার কারণে জায়েয। কেউ কেউ মোজার উপর মাসাহের বৈধতা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো এবং সাহাবায়ে কিরামের উক্তিগুলো মুতাওয়াতির বলে দাবী করেছেন। আর বৈধতা বিরোধীদেরকে কাফির সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু সঠিক কথা হল, (মোজার উপর মাসাহের) বৈধতা সংক্রান্ত হাদীস এবং সাহাবায়ে কিরামের উক্তি মুতাওয়াতির পর্যায়ের। আর বৈধতা বিরোধীরা বিদ'আতী; কাফির নয়। মোজার উপর মাসাহ করার নিয়মনীতি ও সময়সীমা বিস্তারিতভাবে ফিক্‌হের কিতাবে বিদ্যমান। সেখানে দেখে নিন।

وَلَانُحَرِّمُ نَبِيْذَ التَّمْرِ وَهُوَ اَنْ يُّنْبَذَ تَمْرٌ اَوْزَبِيْبٌ فِى الْمَاءِ فَيُجْعَلَ فِىْ اِنَاءٍ مِنَ الْخَزَفِ فَيَحْدُثَ فِيْهِ لَذْعٌ كَمَا فِى الْفُقَّاعِ كَاَنَّهُ نُهِىَ عَنْ ذَالِكَ فِىْ بَدْءِ الْاِسْلَامِ لِمَا كَانَتِ الْجِرَارُ اَوَانِى الْخُمُوْرِ ثم نُسِخَ فَعَدَمُ تَحْرِيْمِهِ مِنْ قَوَاعِدِ اَهْلِ السُّنَّةِ خِلَافًا لِلرَّوَافِضِ وَهٰذَا بِخِلَافِ مَا اِذَاشْتَدَّ وَصَارَ مُسْكِرًا فَاِنَّ الْقَوْلَ بِحُرْمَةِ قَلِيْلِهٖ وَكَثِيْرِهٖ مِمَّا ذَهَبَ اِلَيْهِ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ السُّنَّةِ ـ

সহজ তরজমা

আমরা খেজুর ভিজানো পানি বা নবীযে তামারকে হারাম মনে করি না। আর তা হল, (নাবীয এমন পানীয়, যা প্রস্তুত করা হয়,) শুকনো খেজুর বা কিসমিস পানিতে ভিজিয়ে রাখা। এরপর সে পানি আগুনে পোড়ানো মাটির পাত্রে রেখে দেওয়া। ফলে তাতে একপ্রকার তেজাক্রিয়া (জোস) সৃষ্টি হয়। যেমন হয়ে থাকে জবের মদের মধ্যে। তা ইসলামের প্রথম যুগে নিষিদ্ধ ছিল। যখন (নাবীযের) মটকাগুলো (পাত্রগুলো) শরাবের পাত্র (হিসেবে ব্যবহার) হত। পরবর্তীতে এ নিষিদ্ধতা রহিত হয়ে যায়। কাজেই তা (নবীযে তামার) হারাম না হওয়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের একটি মৌলিক মাসআলা। এর বিরোধী রাফেযী সম্প্রদায়। আর এ সূরত ঐ সূরতের বিপরীত, যখন তা (নাবীয) গাঢ় ও নেশাযুক্ত হয়ে যাবে। কেননা এর কম-বেশি উভয়ই হারাম হওয়ার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অধিকাংশই একমত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

নাবীযে তামার হারাম নয়

নাবীযে তামার, যার অর্থ ব্যাখ্যাতা বর্ণনা করেছেন। (অর্থাৎ খেজুর ভিজানো পানি।) তা যখন গাঢ় ও নেশাযুক্ত হয়ে যাবে, তখন এর কম-বেশি উভয়ই হারাম। কিন্তু যদি গাঢ় ও নেশাযুক্ত না হয়। অবশ্য তাতে তেজক্রিয়া বা জোস সৃষ্টি হয়। যেমন তেজাক্রিয়া হয়ে থাকে গম, জব দ্বারা প্রস্তুতকৃত মদের মধ্যে। তখন রাফেযীরা এটিকেও হারাম বলে। তবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর হারাম হওয়ার প্রবক্তা নয়। (তারা একে হারাম বলেন না।) শারেহ রহ. বলেন– ইসলামের বিজয়ের প্রাথমিক যুগে শারাবের পাত্রগুলোতে নাবীয বানানো হত। সে সময় নাবীযের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এ নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে যায়।

اَلْفُقَّاعُ ... : قَوْلُهٗ ؛ اَلْفُقَّاعُ শব্দের 'ফা" বর্ণে পেশ, কাফে তাশদীদ দিয়ে পড়তে হবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য, জব-গম প্রভৃতি দ্রব্য দিয়ে প্রস্তুতকৃত শরাব।

وَلَا يَبْلُغُ وَلِيٌّ دَرَجَةَ الْأَنْبِيَاءِ لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصُومُونَ مَامُونُونَ مِنْ خَوْفِ الْخَاتِمَةِ مُكَرَّمُونَ بِالْوَحْيِ وَمُشَاهَدَةِ الْمَلَكِ مَامُورُونَ بِتَبْلِيغِ الْأَحْكَامِ وَإِرْشَادِ الْأَنَامِ بَعْدَ الْإِتِّصَافِ بِكَمَالَاتِ الْأَوْلِيَاءِ ـ فَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْكَرَّامِيَّةِ مِنْ جَوَازِ كَوْنِ الْوَلِيِّ أَفْضَلَ مِنَ النَّبِيِّ كُفْرٌ وَضَلَالٌ ـ نَعَمْ قَدْ يَقَعُ تَرَدُّدٌ فِي أَنَّ مَرْتَبَةَ النُّبُوَّةِ أَفْضَلُ أَمْ مَرْتَبَةَ الْوَلَايَةِ بَعْدَ الْقَطْعِ بِأَنَّ النَّبِيَّ مُتَّصِفٌ بِالْمَرْتَبَتَيْنِ وَأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنَ الْوَلِيِّ الَّذِي لَيْسَ بِنَبِيٍّ وَلَا يَصِلُ الْعَبْدُ مَادَامَ عَاقِلًا بَالِغًا إِلَى حَيْثُ يَسْقُطُ عَنْهُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ لِعُمُومِ الْخِطَابَاتِ الْوَارِدَةِ فِي التَّكَالِيفِ وَاجْمَاعِ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى ذَالِكَ وَذَهَبَ بَعْضُ الْإِبَاحِيِّينَ إِلَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا بَلَغَ غَايَةَ الْمَحَبَّةِ وَصَفَاءِ قَلْبِهِ وَاخْتَارَ الْإِيمَانَ عَلَى الْكُفْرِ مِنْ غَيْرِ نِفَاقٍ سَقَطَ عَنْهُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ ـ وَلَا يُدْخِلُهُ اللّٰهُ النَّارَ بِارْتِكَابِ الْكَبَائِرِ ـ وَبَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ تَسْقُطُ عَنْهُ الْعِبَادَاتُ الظَّاهِرَةُ وَتَكُونُ عِبَادَتُهُ التَّفَكُّرَ ـ وَهٰذَا كُفْرٌ وَضَلَالٌ فَإِنَّ أَكْمَلَ النَّاسِ فِي الْمَحَبَّةِ وَالْإِيمَانِ هُمُ الْأَنْبِيَاءُ خُصُوصًا حَبِيبُ اللّٰهِ تَعَالَى ﷺ مَعَ أَنَّ التَّكَالِيفَ فِي حَقِّهِمْ أَتَمُّ وَأَكْمَلُ ـ وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا أَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا لَمْ يَضُرَّهُ ذَنْبٌ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ عَصَمَهُ مِنَ الذُّنُوبِ فَلَمْ يَلْحَقْهُ ضَرَرُهَا ـ

সহজ তরজমা

কোন ওয়ালী নবীগণের স্তরে (মর্যাদায়) পৌঁছুতে পারেন না। কেননা নবীগণ নিষ্পাপ। পরিণতির আশঙ্কা থেকে নিরাপদ। অহী এবং ফিরিশতাদের দর্শনে তারা সম্মানিত। হুকুম-আহকাম প্রচার ও মানুষকে পথপ্রদর্শনের জন্য আদিষ্ট। তারা ওয়ালীদের গুণেও গুণান্বিত। সুতরাং কোন কোন কার্‌রামিয়্যাহ থেকে ওয়ালী নবী হতে শ্রেষ্ঠ হওয়ার যে কথা বর্ণিত আছে, তা কুফর ও পথভ্রষ্টতা। অবশ্য মাঝে মধ্যে সংশয় জাগে যে, (নবীর) নবুওয়াতের মর্যাদা উত্তম, না বেলায়েতের (অলীত্বের) মর্যাদা উত্তম ? অথচ নিশ্চিত নবী (আ.) দুটি মর্যাদার অধিকারী এবং তিনি ঐ ওয়ালী থেকে উত্তম, যিনি নবী নন। আর বান্দা বিবেকবান, সাবালক থাকা পর্যন্ত সে পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না যে, তার উপর থেকে আদেশ-নিষেধ রহিত হয়ে যাবে। কেননা এ সংক্রান্ত সম্বোধনগুলো উন্মুক্ত এবং এ ব্যাপারে মুজতাহিদগণ একমত। আর কোন কোন ইবাহী (অর্থাৎ নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়াকে বৈধজ্ঞানকারী) এ পক্ষাবলম্বন করেছে যে, বান্দা যখন ভালবাসা ও মনের পরিশুদ্ধতার উচ্চাসনে পৌঁছে যায় এবং নিফাকমুক্ত অকপট ঈমানকে কুফরের উপর প্রধান্য দেয়, তখন তার উপর থেকে আদেশ-নিষেধ রহিত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা তাকে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন না। আবার কেউ কেউ মনে করে, বাহ্যিক ইবাদত (করার নির্দেশ) রহিত হয়ে যায়। (এমনকি) তার ইবাদত করা কুফরী। বস্তুতঃ এসব উক্তি সুস্পষ্ট কুফরী ও পথভ্রষ্টতা। কেননা ভালবাসা ও ঈমানের ক্ষেত্রে সকল মানুষের চেয়ে নবীগণ অধিক কামেল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিশেষতঃ আল্লাহর প্রিয় বন্ধু হযরত মুহাম্মদﷺ। তদুপরি তাঁদের ক্ষেত্রে (ইবাদত-বন্দেগীর) দায়িত্বভার পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গতর। রয়ে গেল, রাসূলে কারীমﷺ এর হাদীস– "যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন কোন গুনাহ তার ক্ষতি সাধন করতে পারে না।" অতএব এর মর্ম হবে– আল্লাহ তাকে (প্রিয় বান্দাকে) গুনাহ থেকে হেফাযত করেন। যার ফলে গুনাহের ক্ষতি তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আদৌ কোন অলীর মর্যাদা নবীর সমান নয়ঃ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল, কোন ব্যক্তি যতই ইবাদত, যিয়ারত করে ফেলুক না কেন, সে নবীগণের মর্যাদা ও স্তরে অদৌ পৌছতে পারে না। কেননা আউলিয়ায়ে কিরাম যেসব গুণে গুণান্বিত, আম্বিয়ায়ে কিরাম সেসব গুণে অতি উত্তমরূপে গুণান্বিত। সাথে সাথে আরও অনেক এমন যোগ্যতা ও গুণাবলীর ধারক-বাহক, যেগুলো থেকে আউলিয়ায়ে কিরাম বঞ্চিত। যেমন,

(১) নবীগণ নিষ্পাপ; ওয়ালীগণ নিষ্পাপ নন।

(২) নবীগণের পরিণতি নিয়ে আশংঙ্কা নেই; ওয়ালীগণের বরাবরই সে আশঙ্কা রয়েছে।

(৩) নবীগণের কাছে অহী আসে, তারা ফিরিশতাদেরকে প্রত্যক্ষ করেন; ওয়ালীগণ এ সম্মান থেকে বঞ্চিত।

(৪) নবীগণ আল্লাহর আহকাম প্রচার এবং মানবজাতিকে পথপ্রদর্শন করার ব্যাপারে আদিষ্ট; ওয়ালীগণ সরাসরি আদিষ্ট নয়।

সুতরাং যখন প্রমাণিত হয়ে গেল, ওয়ালীরা নবীদের মর্যাদায় পৌছতে পারেন না, তখন কার্‌রামিয়াদের জন্য "ওয়ালীর নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা আছে" উক্তি করা কুফরী ও পথভ্রষ্টতা। অবশ্য মাঝে মধ্যে এ সংশয় জাগে যে, নবী তো বেলায়েত এবং নবুওয়াত উভয় মর্যাদার অধিকারী। তাহলে তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদা উত্তম না কি বেলায়েতের মর্যাদা উত্তম?

কোন কোন সুফী মাশাইখ বলেন- নবীর বেলায়েতের মর্যাদা তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদা অপেক্ষা উত্তম। কেননা বেলায়েত হল, সৃষ্টিজীব থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হওয়া। আর নবুওয়াত হল, স্রষ্টা ও সৃষ্টিজীবের মাঝে সেতুবন্ধনের নাম। তাছাড়া বেলায়েত বাতেনী বা অভ্যান্তরীন যোগ্যতা ও গুণের নাম। নবুওয়াত যাহেরী বা বাহ্যিক গুণের নাম। আর বাতেনী যোগ্যতা ও গুণ বাহ্যিক গুণ ও যোগ্যতা থেকে শ্রেষ্ঠ। আবার কোন কোন মাশাইখ বলেছেন, নবুওয়াতের মর্যাদা উত্তম। কেননা বেলায়েতের ক্ষেত্রে ওয়ালীর সঙ্গে নবী শরীক, কিন্তু নবুওয়াতের মর্যাদায় নবীর সাথে কেউ শরীক নেই।

বান্দার উপর থেকে আদেশ-নিষেধ উঠে যায় না

قَوْلُهُ: وَلَايَصِلُ الْعَبْدُ ..الخ ঃ কোন কোন ইবাহীর অভিমত হল, বান্দা যখন আল্লাহ তা'আলাকে প্রচণ্ডভাবে ভালবাসতে শুরু করে, তার অন্তর পরিশোধিত হয়ে যায় এবং অকপটে সে ঈমানকে কুফরের উপর প্রাধান্য দিতে থাকে, তখন তাঁর উপর থেকে আদেশ-নিষেধ রহিত হয়ে যায়। আল্লাহ তাকে কবীরা গুনাহের কারণে শাস্তি দিবেন না। আবার কোন কোন ইবাহী বলে- বাহ্যিক ইবাদত, নামায, রোযা ইত্যাদি তার থেকে মাফ হয়ে যায়। তার ইবাদত করা কুফরী। তার কর্তব্য আল্লাহ পাকের সত্ত্বা ও গুণাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় তন্ময় থাকা।

মুসান্নিফ রহ. এ মত প্রত্যাখ্যান করে বলেন- বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত বিবেকবান সাবালক থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর বিধি-নিষেধের মুকাল্লাফি ও আদিষ্ট। কেননা শরী'আতের আহকাম ও বিধি-নিষেধ বিবেকবান সাবালকের ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় আম। তাছাড়া এ ব্যাপারে উম্মতের উজমা রয়েছে। কারণ, আল্লাহ তা'আলার প্রতি সবচেয়ে বেশী বিশ্বাসী এবং অগাধ মোহাব্বতকারী ছিলেন আম্বিয়ায়ে কিরাম, বিশেষতঃ সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ। তদুপরি তারা শরী'আতের আহকাম পালনে অধিক মুকাল্লাফ ও আদিষ্ট। বাকী থাকে রাসূলে কারীম ﷺ এর বাণী- "যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে প্রিয়পাত্র করে নেন, তখন কোন গুনাহ তার ক্ষতি সাধন করতে পারে না" -এর মর্মকথা। অতএব এর মর্ম হবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে গুনাহ থেকে হেফাযত করেন। তার থেকে গুনাহ হতে দেন না। গুনাহ হলে তো তার ক্ষতি সাধন হবে!

قوله: بعض الاباحيين ..الخ ঃ এসব লোক কোন কোন হারাম (কাজ বা বস্তুকে) মুবাহ বলে; হালাল মনে করে। এজন্য তাদেরকে اباحى নামে অভিহিত করা হয়েছে।

وَالنُّصُوصُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ تُحْمَلُ عَلٰى ظَوَاهِرِهَا مَالَمْ يَصْرِفْ عَنْهَا دَلِيْلٌ قَطْعِيٌّ ـ كَمَا فِي الآيَاتِ الَّتِيْ تُشْعِرُ بِظَوَاهِرِهَا بِالْجِهَةِ وَالْجِسْمِيَّةِ وَنَحْوِ ذَالِكَ ـ لاَيُقَالُ هٰذَا لَيْسَتْ مِنَ النُّصُوصِ بَلْ مِنَ الْمُتَشَابِهِ لاَنَّا نَقُوْلُ الْمُرَادُ بِالنُّصُوصِ هٰهُنَا لَيْسَ مَا يُقَابِلُ الظَّاهِرَ وَالْمُفَسَّرُ وَالْمُحْكَمُ بَلْ مَا يَعُمُّ اَقْسَامَ النَّظْمِ عَلٰى مَاهُوَ الْمُتَعَارِفُ ـ وَالْعُدُوْلُ عَنْهَا اَيْ عَنِ الظَّوَاهِرِ اِلٰى مَعَانٍ يَدَّعِيْهَا اَهْلُ الْبَاطِنِ وَهُمُ الْمَلاَحِدَةُ وَسُمُّوْا الْبَاطِنِيَّةَ لِادِّعَائِهِمْ اَنَّ النُّصُوصَ لَيْسَتْ عَلٰى ظَوَاهِرِهَا ـ بَلْ لَهَا مَعَانٍ بَاطِنِيَّةٌ لاَيَعْلَمُهَا اِلاَّ الْمُعَلِّمُ ـ وَقَصْدُهُمْ بِذَالِكَ نَفْيُ الشَّرِيْعَةِ بِالْكُلِّيَّةِ اِلْحَادٌ اَيْ مَيْلٌ وَعُدُوْلٌ عَنِ الاِسْلاَمِ وَاتِّصَالٌ وَالْتِصَاقٌ بِالْكُفْرِ لِكَوْنِهِ تَكْذِيْبًا لِلنَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا عُلِمَ مَجِيْئُهُ بِهِ بِالضَّرُوْرَةِ وَاَمَّا مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ بَعْضُ الْمُحَقِّقِيْنَ مِنْ اَنَّ النُّصُوصَ مَصْرُوْفَةٌ عَلٰى ظَوَاهِرِهَا ـ وَمَعَ ذَالِكَ فِيْهَا اِشَارَاتٌ خَفِيَّةٌ اِلٰى دَقَائِقَ تَنْكَشِفُ عَلٰى اَرْبَابِ السُّلُوْكِ يُمْكِنُ التَّطْبِيْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الظَّوَاهِرِ الْمُرَادَةِ فَهُوَمِنْ كَمَالِ الاِيْمَانِ وَمَحْضِ الْعِرْفَانِ

সহজ তরজমা

কিতাব ও সুন্নাহর (কুরআন-হাদীসের) নসগুলোকে তার প্রকাশ্য অর্থে প্রয়োগ করা হবে। যে পর্যন্ত প্রকাশ্য অর্থ বর্জনের ব্যাপারে কোন অকাট্য প্রমাণ না পাওয়া যায়। যেমন, যেসব আয়াত। বাহ্যতঃ (আল্লাহ পাকের জন্য) দিক ও দেহ ইত্যাদি বুঝায়, সেগুলো সম্পর্কে বলা যাবে না– এসব আয়াত নছগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয় বরং মুতাশাবিহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আমরা বলব– এখানে নছ বলতে সে অর্থ উদ্দেশ্য নয়, যা যাহির, মুফাস্সার ও মুহকামের বিপরীত বরং এমন অর্থ উদ্দেশ্য, যা নযমে কুরআনের সকল প্রকারকেই অন্তর্ভুক্ত করে। যেমনটি প্রসিদ্ধ। আর নছগুলোর বাহ্যিক অর্থ রেখে এমন অর্থের দিকে সরে যাওয়া, যা আহলে বাতেন তথা মুলহিদ দাবী করে। তাদেরকে বাতেনিয়্যাহ বলা হয়। কেননা তারা দাবী করে, নছগুলো তার প্রকাশ্য অর্থে প্রজোয্য নয় বরং সেগুলোর কিছু বাতেনী অর্থ আছে। যা কেবল নির্দিষ্ট শিক্ষকই জানেন। এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য, সম্পূর্ণরূপে শরী'আতকে অস্বীকার করা। ইলহাদ অর্থ, ইসলাম থেকে বিমুখ হওয়া এবং কুফরের সাথে জড়িয়ে পড়া। কেননা তা (ইলহাদ) হল, রাসূলে কারীম ﷺ কে সেসব বিষয়ে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, যেগুলো তিনি আল্লাহর কাছ থেকে এনেছেন বলে নিশ্চিতরূপে জানা গেছে। তবে কোন কোন মুহাক্কিক যে বলেছেন, নছগুলো তার প্রকাশ্য অর্থে প্রযোজ্য, তদুপরি তাতে এমন সব সূক্ষ্ম রহস্যের প্রতি গোপন ইংগিত রয়েছে, যেগুলো কেবল তাসাওউফপন্থীদের (অধ্যাত্মিকতার পথিক) কাছে বিকশিত হয়ে থাকে। সে সব সূক্ষ্ম ও প্রকাশ্য অর্থের মাঝে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব। অতএব সেটি কামেল ঈমান ও নিছক মা'আরিফতের কথা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কুরআন-সুন্নাহর নছগুলো শাব্দিক অর্থে না শরঈ অর্থে প্রযোজ্য ?

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে কুরআন-সুন্নাহর নছগুলোকে তার অভিধান ও শরী'আতের মাধ্যমে লব্ধ অর্থে প্রয়োগ করা হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এর বিপরীত কোনও দলীল না পাওয়া যাবে। যেমন, যেসব আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাকের জন্য দেহ-দিক ইত্যাদি প্রমাণিত হয়েছে, সেসব আয়াতের প্রকাশ্য ও আভিধানিক অর্থের বিপরীত অকাট্য দলীল সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। কাজেই এগুলোর প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য হবে না। কিন্তু যেসব নছের প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত অকাট্য দলীল সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, সেগুলোর প্রকাশ্য অর্থ বর্জন করে, বাতেনিয়াদের দাবী মাফিক উদ্দিষ্ট অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া কুফরী ও ইলহাদ। কেননা এতে রাসূলে কারীম ﷺ কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়।

নছ বলতে কি উদ্দেশ্য

قَوْلُهُ: لَايُقَالُ ..الخ ঃ প্রশ্নকারীর প্রশ্নের লক্ষ্য হচ্ছে, নছের পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া। ফিকাহ শাস্ত্রের উসূলবীদগণ যা উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন। কেননা তারা (ফিকহের উসূলবিদগণ) অর্থের স্পষ্টতার প্রতি লক্ষ্য করে শরী'আত প্রণেতার কথা ও বাণীকে চারভাবে বিভক্ত করেন। যথা- (১) নছ (২) যাহির (৩) মুফাস্সার (৪) মুহকাম। তদ্রুপ অর্থের অস্পষ্টতার দিক বিবেচনায়ও চার প্রকারে বিভক্ত করেন। যথা- (১) খফী (২) মুশকিল (৩) মুজমাল (৪) মুতাশাবিহ।

ব্যাখ্যাতার জবাবের সারকথা হল, এখানে নছ দ্বারা তার পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য নয় বরং শরী'আত প্রণেতার মুতলাক বা ব্যাপক কালাম (বাণী) উদ্দেশ্য। শরী'আত প্রণেতার কালামকে নছ বলার কারণ হল, এর অর্থের বিশুদ্ধতা অকাট্য ও নিশ্চিত। আর অভিধানে নছ অর্থ সুনিশ্চিত হওয়া, অকাট্য হওয়া।

সূফীদের নছ সমূহ

قَوْلُهُ: وَامَّا ذَهَبَ اِلَيْهِ ..الخ ঃ অভিজ্ঞ সুফীগণের মাযহাব মতে কুরআন-হাদীসের নছগুলো প্রকাশ্য অর্থে ব্যবহৃত। কিন্তু সাথে সাথে তাতে (নছগুলোতে) এমন সূক্ষ্মতার প্রতিও ইংগিত থাকে, যা তাসাওউফপন্থীদের সামনেই বিকশিত হয়ে থাকে। এসব সূক্ষ্মতা নছগুলোর প্রকাশ্য অর্থ বিরোধী হয় না বরং সেসব সূক্ষ্মতা ও প্রকাশ অর্থের মাঝে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ এর প্রকাশ্য অর্থ, কল্যাণের পথে সম্পদ ব্যয় করা। কিন্তু সূফীগণ এর দ্বারা অধ্যাত্মিক নিয়ামতরাজিও উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আয়াতের অর্থ করেছেন- আমি তাদেরকে মা'রিফাতের যে আলোকরশ্মি দিয়েছি, তারা সেগুলো অন্যদের সামনে পেশ করেন। এ ধরনের সূক্ষ্ম বিষয়াবলি হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. তাফসীরে বয়ানুল কুরআনের টীকায় لَطَائِفُ السُّلُوْك (আধ্যাত্মিকতার রহস্য) শিরোনামে লিপিবদ্ধ করেছেন।

وَرَدُّ النُّصُوْصِ بِاَنْ يُّنْكِرَ الْاَحْكَامَ الَّتِىْ دَلَّتْ عَلَيْهَا النُّصُوْصُ الْقَطْعِيَّةُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَحَشْرِ الْاَجْسَادِ مَثَلًا كُفْرٌ لِكَوْنِهٖ تَكْذِيْبًا صَرِيْحًا لِلّٰهِ تَعَالٰى وَرَسُوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَنْ قَذَفَ عَائِشَةَ بِالزِّنَا كُفْرٌ ـ وَاسْتِحْلَالُ الْمَعْصِيَةِ صَغِيْرَةً كَانَتْ اَوْ كَبِيْرَةً كُفْرٌ اِذَا اُثْبِتَ كَوْنُهَا مَعْصِيَةً بِدَلِيْلٍ قَطْعِيٍّ وَقَدْ عُلِمَ ذَالِكَ مِمَّا سَبَقَ ـ وَالْاِسْتِهَانَةُ بِهَا كُفْرٌ وَالْاِسْتِهْزَاءُ عَلَى الشَّرِيْعَةِ كُفْرٌ ـ لِاَنَّ ذَالِكَ مِنْ اَمَارَاتِ التَّكْذِيْبِ ـ وَعَلٰى هٰذِهِ الْاُصُوْلِ يَتَفَرَّعُ مَاذُكِرَ فِى الْفَتَاوٰى مِنْ اَنَّهٗ اِعْتَقَدَ الْحَرَامَ حَلَالًا فَاِنْ كَانَتْ حُرْمَتُهٗ لِعَيْنِهٖ وَقَدْ ثَبَتَ بِدَلِيْلٍ قَطْعِيٍّ يُكَفَّرُ ـ وَاِلَّا فَلَا ـ بِاَنْ يَّكُوْنَ حُرْمَتُهٗ لِغَيْرِهٖ اَوْ ثَبَتَ بِدَلِيْلٍ ظَنِّيٍّ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْحَرَامِ لِعَيْنِهٖ وَلِغَيْرِهٖ ـ فَقَالَ مَنِ اسْتَحَلَّ حَرَامًا وَقَدْ عُلِمَ فِىْ دِيْنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَحْرِيْمُهٗ كَنِكَاحِ ذَوِى الْمَحَارِمِ اَوْشُرْبِ الْخَمْرِ اَوْاَكْلِ الْمَيْتَةِ اَوِالدَّمِ اَوِ الْخِنْزِيْرِ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ فَكَافِرٌ ـ وَفِعْلُ هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ بِدُوْنِ الْاِسْتِحْلَالِ فِسْقٌ ـ وَمَنِ اسْتَحَلَّ شُرْبَ النَّبِيْذِ اِلٰى اَنْ يَّسْكَرَ كُفْرٌ ـ وَاَمَّا لَوْ قَالَ لِحَرَامٍ هٰذَا حَلَالٌ لِتَرْوِيْجِ السِّلْعَةِ اَوْ بِحُكْمِ الْجَهْلِ لَا يُكَفَّرُ ـ وَلَوْ تَمَنّٰى اَنْ لَا يَكُوْنَ الْخَمْرُ حَرَامًا اَوْ لَا يَكُوْنَ صَوْمُ رَمَضَانَ فَرْضًا لِمَا يُشَقُّ عَلَيْهِ لَا يُكَفَّرُ ـ بِخِلَافِ مَا اِذَا تَمَنّٰى اَنْ لَا يُحَرِّمَ الزِّنَا وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَاِنَّهٗ يُكَفَّرُ ـ لِاَنَّ حُرْمَةَ هٰذَا ثَابِتَةٌ فِىْ

جَمِيْعِ الْاَدْيَانِ مُوَافَقَةٌ لِلْحِكْمَةِ وَهٰذَا جَهْلٌ مِنْهُ بِرَبِّهٖ تَعَالٰى ـ وَذَكَرَ الْاِمَامُ السَّرَخْسِيُّ فِىْ كِتَابِ الْحَيْضِ اَنَّهٗ لَوِاسْتَحَلَّ وَطْئَ اِمْرَأَتِهِ الْحَائِضِ يُكَفَّرُ ـ وَفِى النَّوَادِرِ عَنْ مُحَمَّدٍ اَنَّهٗ لَا يُكَفَّرُ هُوَ الصَّحِيْحُ ـ وَفِىْ اِسْتِحْلَالِ اللِّوَاطَةِ بِامْرَأَتِهٖ لَا يُكَفَّرُ عَلَى الْاَصَحِّ ـ وَمَنْ وَصَفَ اللّٰهَ تَعَالٰى بِمَا لَا يَلِيْقُ بِهٖ اَوْ سَخِرَ بِاسْمٍ مِنْ اَسْمَاءِهٖ أو بِاَمْرٍ مِنْ وَصْفِ اللّٰهِ تَعَالٰى بِمَا لَا يَلِيْقُ بِهٖ اَوْ سَخِرَ بِاسْمٍ مِنْ اَسْمَآءِهٖ اَوْ بِاَمْرٍ مِنْ اَوَامِرِهٖ اَوْ اَنْكَرَ وَعْدَهٗ اَوْ وَعِيْدَهٗ يُكَفَّرُ ـ وَكَذَا لَوْ تَمَنّٰى اَنْ لَا يَكُوْنَ نَبِيٌّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ عَلٰى قَصْدِ اِسْتِخْفَافٍ اَوْ عَدَاوَةٍ ـ وَكَذَا لَوْ ضَحِكَ عَلٰى وَجْهِ الرِّضَاءِ فِيْمَنْ تَكَلَّمَ بِالْكُفْرِ ـ وَكَذَا لَوْ جَلَسَ عَلٰى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ وَحَوْلَهٗ جَمَاعَةٌ يَسْئَلُوْنَهٗ مَسَائِلَ وَيَضْحَكُوْنَهٗ وَيَضْرِبُوْنَهٗ بِالْوَسَائِدِ يُكَفَّرُوْنَ جَمِيْعًا ـ وَكَذَا لَوْ اَمَرَ رَجُلًا اَنْ يَّكْفُرَ بِاللّٰهِ أَوْ عَزَمَ عَلٰى اَنْ يَّاْمُرَ بِكُفْرِهٖ ـ وَكَذَا لَوْاَفْتٰى لِاِمْرَءَةٍ بِالْكُفْرِ لَتَبِيْنُ مِنْ زَوْجِهَا ـ وَكَذَا لَوْ قَالَ عِنْدَ شُرْبِ الْخَمْرِ اَوِالزِّنَا بِسْمِ اللّٰهِ وَكَذَا لَوْصَلّٰى بِغَيْرِ قِبْلَةٍ اَوْ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ مُتَعَمِّدًا يُكَفَّرُ وَاِنْ وَافَقَ ذَالِكَ الْقِبْلَةَ ، كَذَا لَوْاَطْلَقَ كَلِمَةَ الْكُفْرِاِسْتِخْفَافًالَا اِعْتِقَادًا اِلٰى غَيْرِ ذَالِكَ مِنَ الْفُرُوْعِ ـ

সহজ তরজমা

নছগুলো প্রত্যাখ্যান করা..... অর্থাৎ সেসব বিধি-বিধান অস্বীকার করা, যেগুলোর ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের অকাট্য নছগুলো সাক্ষ্য দেয়। যেমন, দৈহিক হাশরকে অস্বীকার করা কুফরী। কেননা তা সরাসরি আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ কে মিথ্যা প্রতিপণ্নতা। সুতরাং যে ব্যক্তি হযরত আয়েশা রাযি. উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, সে কাফির। আর কোন গুনাহ সগীরা হোক চাই কবীরা, হালাল মনে করা কুফরী। কেননা সেটি গুনাহ বলে অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হবে। ইতোপূর্বে সে কথা জানা হয়েছে। গুনাহকে মামুলী ও তুচ্ছ মনে করা কুফরী। শরী'আতের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা কুফরী। কেননা তা মিথ্যা প্রতিপণ্নতার লক্ষণ। এ মূলনীতির ভিত্তিতেই বহু মাসআলা বের হয়। সেগুলো ফাত্ওয়ার কিতাবে উল্লেখ আছে। যেমন, কোন ব্যক্তি হারামকে হালাল বলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখল। সুতরাং এর নিষিদ্ধতা যদি স্বত্ত্বাগত কারণে এবং অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাহলে সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে; নতুবা কাফির হবে না। অর্থাৎ এর নিষিদ্ধতা অন্য কারণে অথবা সেটি ধারণানির্ভর দলীল দ্বারা প্রমাণিত। আবার কেউ কেউ হারাম লি-আইনিহী এবং হারাম লি-গাইরিহীর মধ্যে পার্থক্য না করে বলেন, যে ব্যক্তি কোন হারামকে হালাল মনে করে; অথচ রাসূলে কারীম ﷺ এর দ্বীনে এর নিষিদ্ধতা নিশ্চিত পরিজ্ঞাত। যেমন, মাহরাম আত্মীয়কে বিয়ে করা, মদ্যপান করা অথবা মরা জন্তু, রক্ত বা বিনা প্রয়োজনে শূকর খাওয়া। তবে সে কাফির। আর হালাল মনে না করে এসব কাজে লিপ্ত হওয়া ফাসেকী। যে ব্যক্তি নাবীয নেশার পর্যায়ে পৌছাকে হালাল মনে করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। অবশ্য কেউ যদি পণ্য সামগ্রি প্রসার করার জন্য কিংবা অজ্ঞতার কারণে কোন হারাম দ্রব্য সম্পর্কে বলে– এটি হালাল, তবে সে কাফির হবে না। কেউ যদি আকাঙ্খা করে, মদ যদি হারাম না হত অথবা রমাযানের রোযা ফরয না হত; কেননা এতে কষ্ট হয়। তাহলে সে কাফির হবে না। পক্ষান্তরে যখন ব্যভিচার এবং অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা হারাম না হওয়ার আকাঙ্খা করবে, তবে সে কাফির হয়ে যাবে। কেননা সকল ধর্মে এর নিষিদ্ধতা প্রমাণিত ও হিকমতপূর্ণ। আর যে ব্যক্তি হিকমতের বাইরে

থাকার ইচ্ছা পোষণ করল, সে চায় আল্লাহ তা'আলা এমন হুকুম করুক, যা হিকমতশূন্য হবে। আর তা স্বীয় প্রতিপালকের ব্যাপারে তার অজ্ঞতা।

ইমাম সারাখসী কিতাবুল হায়েযে উল্লেখ করেছেন– যদি কেউ তার ঋতুস্রাবী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা হালাল মনে করে, তবে সে কাফির হয়ে যাবে। নাওয়াদিরে ইমাম মুহাম্মদ রহ. থেকে বর্ণিত আছে, সে কাফির হবে না। এটিই সঠিক। আর স্বীয় স্ত্রীর সাথে লাওয়াতাতকে (বায়ূপথে যৌন ক্রিয়া) হালাল মনে করার সূরতে (আক্রান্ত ব্যক্তি) অধিকতর বিশুদ্ধ মতে কাফির হবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে এমন এমন কথা বলে, যা তার মর্যাদা বিরুদ্ধ অথবা আল্লাহর কোন নাম বা কাজের উপর সে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে অথবা তার প্রতিশ্রুতি বা সতর্কবাণী অস্বীকার করে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

অনুরূপভাবে যদি কেউ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সাথে বা শত্রুতা বশতঃ আকাঙ্খা করে, যদি কোন নবী আসতেন! (তাহলেও কাফির হয়ে যাবে)। অনুরূপভাবে সম্মতি প্রকাশার্থে যদি এমন ব্যক্তির উপর হাসে, যে কুফরী কালাম উচ্চারণ করল। তদ্রুপ কেউ কোন উচ্চাসনে উঠে বসল। তার আশপাশে রয়েছে বহু লোক। তারা তার থেকে বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞাসা করছে, আর হাসি-ঠাট্টা করছে। ছুড়ে মারছে তাকিয়া বা বালিশ। তাহলে সকলকেই কাফির সনাক্ত করা হবে।

অনুরূপভাবে যদি কেউ মদ্যপানের সময় কিংবা যিনা ব্যভিচারের সময় বিসমিল্লাহ পড়ে, তদ্রুপ জেনে বুঝে যদি কিবলা ব্যতিত অন্য দিকে অথবা অযু ছাড়া নামায পড়ে (সেও কাফির হয়ে যাবে), ঘটনাক্রমে যদিও কিবলা দিকেই হয়ে থাকে না কেন। অনুরূপভাবে যদি তুচ্ছজ্ঞান করে কুফরী কালিমা উচ্চারণ করে, তার প্রতি বিশ্বাস করে নয় (তবে কাফির হয়ে যাবে)। এছাড়াও বহু খুঁটিনাটি ব্যাপার আছে (যাতে লিপ্ত ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়।)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মুসান্নিফ রহ. বলেন, কুরআন-সুন্নাহর নছগুলো প্রত্যাখ্যান করা কুফরী অর্থাৎ সেসব আহকামকে অস্বীকার করা, যেগুলোর উপর কুরআন এবং মুতাওয়াতির হাদীসের এমন এমন নছ সাক্ষ্য দেয়, যাতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবাকশ নেই। কেননা তা সরাসরি আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়। কাজেই যদি কেউ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. এর উপর যেনার অপবাদ দেয়, তবে সে কাফির হবে। কেননা তার পবিত্রা ও নিষ্কলুষতার ব্যাপারে সূরায়ে নূরে একাধিক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। أُولَـٰئِكَ مُبَرَّؤُونَ জাতীয় স্পষ্ট শব্দে তার পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে যে কাজ গুনাহ বলে অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত, সেটি সগীরা হোক চাই কবীরা, তা হালাল বলে আকীদা রাখাও কুফরী। কেননা তার মানে হবে– সে একে হারাম বলার ক্ষেত্রে (মা'আযাল্লাহ) শরী'আত প্রণেতাকে মিথ্যুক মনে করে। আর শরী'আত প্রণেতাকে মিথ্যা প্রতিপণ্ন করা কুফরী।

قَوْلُـهُ: وَعَلٰى هٰذِهِ الْأُصُوْل ঃ অর্থাৎ মা-ওয়ারাআন্ নাহরের উলামায়ে কিরামের ফাত্ওয়ায় আলোচিত বিষয়গুলো উপরিউক্ত মূলনীতির ভিত্তিতেই উৎসারিত শাখা-প্রশাখা। উক্ত মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ।

(ক) কোন গুনাহকে হালাল মনে করা কুফরী।

(খ) গুনাহকে তুচ্ছ-মামুলী মনে করা কুফরী।

(গ) শরী'আতের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা কুফরী।

قَوْلُـهُ: وَكَذَا لَوْجَلَسَ ..الخ ঃ ফাত্ওয়ায় এভাবে উল্লেখ হওয়ার কারণ, হয়ত এমন ঘটনা বাস্তবে ঘটেছিল। এরপর সে সম্পর্কে কেউ মুফতী সাহেবের শরণাপন্ন হয়েছেন।

وَالْيَاسُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى كُفْرٌ لِاَنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ . وَالْاَمْنُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى كُفْرٌ لِاَنَّهُ لَا يَاْمَنُ مِنْ مَكْرِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُوْنَ . فَاِنْ قِيْلَ الْجَزْمُ بِاَنَّ الْعَاصِىَ يَكُوْنُ فِى النَّارِ يَأْسٌ مِنَ اللّٰهِ وَبِاَنَّ الْمُطِيْعَ يَكُوْنُ فِى الْجَنَّةِ اَمْنٌ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى . فَيَلْزَمُ اَنْ يَكُوْنَ الْمُعْتَزِلِىُّ كَافِرًا مُطِيْعًا كَانَ اَوْعَاصِيًا . لِاَنَّهُ اِمَّا اٰمِنٌ اَوْ اٰئِسٌ وَمِنْ قَوَاعِدِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اَنْ لَا يُكَفَّرَ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ قُلْنَا هٰذَا لَيْسَ بِيَأْسٍ وَلَا اَمْنٍ . لِاَنَّهُ عَلٰى تَقْدِيْرِ الْعِصْيَانِ لَايَيْأَسُ اَنْ يُوَفِّقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِلتَّوْبَةِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَعَلٰى تَقْدِيْرِ الطَّاعَةِ لَايَاْمَنُ مِنْ اَنْ يَخْذُلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَيَكْتَسِبَ الْمَعَاصِىَ، وَبِهٰذَا يَظْهَرُ الْجَوَابُ لِمَا قِيْلَ اَنَّ الْمُعْتَزِلِىَّ اِذَا ارْتَكَبَ كَبِيْرَةً لَزِمَ اَنْ يَصِيْرَ كَافِرًا لِيَأْسِهٖ مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ وَلِاِعْتِقَادِهٖ اَنَّهُ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَذَالِكَ لِاَنَّا لَا نُسَلِّمُ اَنَّ اِعْتِقَادَ اِسْتِحْقَاقِهِ النَّارَ يَسْتَلْزِمُ الْيَأْسَ وَاَنَّ اِعْتِقَادَ عَدَمِ اِيْمَانِهِ الْمُفَسَّرِ بِمَجْمُوْعِ التَّصْدِيْقِ وَالْاِقْرَارِ وَالْاَعْمَالِ بِنَاءً عَلٰى اِنْتِفَاءِ الْاَعْمَالِ يُوْجِبُ الْكُفْرَ . وَالْجَمْعُ بَيْنَ قَوْلِهِمْ لَايُكَفَّرُ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ . وَقَوْلِهِمْ يُكَفَّرُ مَنْ قَالَ بِخَلْقِ الْقُرْاٰنِ اَوْ اِسْتِحَالَةِ الرُّؤْيَةِ اَوْ سَبِّ الشَّيْخَيْنِ اَوْ لَعْنِهِمَا وَاَمْثَالِ ذَالِكَ مُشْكِلٌ.

সহজ তরজমা

আল্লাহ তা'আলা হতে হতাশা বা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া কুফরী। কেননা তার রহমত হতে কেবল বাফিররাই নিরাশ হয়। আল্লাহর শাস্তি থেকে অভয় (নিশ্চিত) হওয়াও কুফরী। কেননা ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায় ব্যতীত অপর কেউ আল্লাহর আযাব থেকে নিশ্চিন্ত হয় না। সুতরাং যদি প্রশ্ন করা হয়– নিশ্চিত গুনাহগার জাহান্নামী হবে বিশ্বাস রাখাও তো আল্লাহর রহমত থেকে হতাশা। আবার অনুগত বান্দা নিশ্চিত জান্নাতী হবে বিশ্বাস রাখাও তো আল্লাহর আযাব থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া। সুতরাং মুতাযিলী আল্লাহর অনুগত হোক চাই অবাধ্য হোক, তার কাফির হওয়া অনিবার্য হয়ে যায়। কেননা সে হয়ত নিশ্চিন্ত হবে (অনুগত হওয়ার সূরতে) নতুবা (গুনাহগার হওয়ার সূরতে) নিরাশ হবে। অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নীতিমালায় রয়েছে, আহলে কিবলার কাউকে কাফির সাব্যস্ত করা যাবে না।

আমরা জবাব দেব– এটি নিরাশাও নয়, নিশ্চিন্তাও নয়। কেননা গুনাহগার হওয়ার সূরতেও সে নিরাশ হয় না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাকে তাওবা ও নেককাজের তাওফীক দিতে পারেন। আর অনুগত হওয়ার সূরতেও সে নিশ্চিন্ত হয় না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাকে লজ্জিত করতে পারেন, তাকে সাহায্যকারী বন্ধুবিহীন ছেড়ে দিতে পারেন। যদ্দরুন সে গুনাহে লিপ্ত হবে! এতে সে প্রশ্নের জবাবও পরিস্কার হয়ে যায়, যাতে বলা হয়– মুতাযিলী যখন কোন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হবে, তখন তার কাফির হয়ে যাওয়া আবশ্যক। কেননা সে আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ে যায়। স্বয়ং তার বিশ্বাস জন্মে– সে মুমিন নয়।

তার (জবাবটি পরিস্ফুট হওয়ার) কারণ, আমরা স্বীকার করি না যে, নিজেকে জাহান্নামের উপযুক্ত বলে বিশ্বাস রাখা (আল্লাহর রহমত থেকে) নৈরাশ্যতা আবশ্যক করে। আমরা এ-ও মানি না যে, ঈমান অর্থাৎ আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং আমলের সমষ্টি না হওয়ার বিশ্বাস আমল না থাকার দরুন কুফরীকে আবশ্যক করে। আর মাশাইখদের উক্তি "আহলে কিবলার কাউকে কাফির সাব্যস্ত করা যাবে না" এবং তাদের আরেকটি উক্তি "কুরআন সৃষ্ট, আল্লাহ তা'আলার দীদার অসম্ভব কিংবা শাইখাইনকে গালমন্দ বা অভিসম্পাত করা ইত্যাদির প্রবক্তাকে কাফির সনাক্ত করা হবে" –এ জাতীয় দুটি বিপরীতমুখী উক্তির মাঝে সমন্বয় সাধন করা জটিল।,

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মু'তাযেলীরা আল্লাহ থেকে হতাশ নাকি নিশ্চিন্ত ?

قَوْلُهُ: فَإِنْ قِيْلَ ..الخ ঃ মুতাযিলীদের মাযহাব হল, অনুগত বান্দাকে জান্নাতে আর অবাধ্য পাপিষ্ঠকে জাহান্নামে দাখিল করা আল্লাহ তা'আলার উপর ওয়াজিব। কাজেই প্রশ্ন উঠে, মুতাযিলী অনুগত হলে তার মনে তাকে জান্নাতে দাখিল করানোর বিশ্বাস জন্মিবে। সে আল্লাহ তা'আলার আযাব থেকে নিশ্চিন্ত থাকবে। আর গুনাহগার হলে সে নিজেকে জাহান্নামী বলে বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাবে। গ্রন্থকারের উক্তি মতে আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ্য এবং তার আযাব থেকে নিশ্চিন্ত থাকা উভয়ই কুফরী। অতএব উভয় অবস্থায় মুতাযিলীর কাফির হওয়া বাঞ্ছনীয়। অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিধান মতে আহলে কিবলার কাউকে কাফির বলা যথোচিৎ নয়।

ব্যাখ্যাতা প্রশ্নটির জবাবে বলেন– মুতাযিলী গুনাহগার হলেও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ নয় এবং অনুগত হলেও সে আল্লাহর আযাব থেকে নিশ্চিন্ত নয়। কেননা গুনাহ করলেও সে আশাহত হয় না। ভাবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তাওবা করার এবং নেককাজের তাওফীক দিতে পারেন। আর অনুগত হলেও সে ভীতশ্রদ্ধ যে, আল্লাহ তা'আলা তার থেকে নেক আমলের তাওফীক ছিনিয়ে নিবেন। ফলে সে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাবে।

আহলে কিবলাকে কাফির বলা যাবে কিনা ?

قَوْلُهُ: وَالْجَمْعُ بَيْنَ قَوْلِهِمْ ...الخ ঃ এক দিকে বলা হচ্ছে, আহলে কিবলাকে কাফির বলবে না। অপর দিকে বলা হচ্ছে, যারা বলে– কুরআন সৃষ্ট, জান্নাতে আল্লাহর দীদার অসম্ভব, যারা শাইখাইন তথা হযরত আবূ বকর রাযি. ও হযরত উমর রাযি. গালাগালি করে, তারা কাফির। এদুটি উক্তি পরস্পর বিরোধী। এতদুভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা জটিল ব্যাপার।

কিন্তু একাধিক পদ্ধতিতে এ প্রশ্ন নিরসন করা হয়েছে। **এক.** আহলে কিবলা হতে কাউকে কাফির না বলার উক্তি শাইখ আশ'আরী এবং তার ভক্ত-অনুরক্তদের। মুলতাকায় ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে তা-ই বর্ণিত আছে। আর উপরিউক্ত লোকদেরকে কাফির বলা ফুকাহায়ে কিরামের মাযহাব। সুতরাং প্রতিটি উক্তির প্রবক্তা যখন ভিন্ন ভিন্ন, তখন কোন বৈপরিত্ব রইল না। **দুই.** উপরিউক্ত লোকদেরকে কাফির বলা প্রকৃত অর্থে প্রজোয্য নয় বরং শাসন-ধমক ও কঠোরতার উপর প্রজোয্য। অর্থাৎ তাদেরকে প্রকৃত অর্থে কাফির বলা হয়নি বরং সতর্ক করা ও কঠোরতা আরোপের নিমিত্তে বলা হয়েছে।

وَتَصْدِيْقُ الْكَاهِنِ بِمَا يُخْبِرُهُ عَنِ الْغَيْبِ كُفْرٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ اَتٰى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَالْكَاهِنُ هُوَ الَّذِىْ يُخْبِرُ عَنِ الْكَوَائِنِ فِىْ مُسْتَقْبَلِ الزَّمَانِ وَيَدَّعِىْ مَعْرِفَةَ الْاَسْرَارِ وَمُطَالَعَةَ عِلْمِ الْغَيْبِ ـ وَكَانَ فِى الْعَرَبِ كَهَنَةٌ يَدَّعُوْنَ مَعْرِفَةَ الْاُمُوْرِ ـ فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَزْعَمُ اَنَّ لَهُ رَئِيًّا مِنَ الْجِنِّ وَتَابِعَةً يُلْقِىْ اِلَيْهِ الْاَخْبَارَ ـ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَزْعَمُ اَنَّهُ يَسْتَدْرِكُ الْاُمُوْرَ بِفَهْمٍ اُعْطِيَهُ وَالْمُنَجِّمُ اِذَا ادَّعٰى الْعِلْمَ بِالْحَوَادِثِ الْاٰتِيَةِ فَهُوَ مِثْلُ الْكَاهِنِ ـ وَبِالْجُمْلَةِ اَلْعِلْمُ بِالْغَيْبِ اَمْرٌ تَفَرَّدَ بِهِ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ لَا سَبِيْلَ اِلَيْهِ لِلْعِبَادِ اِلَّا بِاِعْلَامٍ مِنْهُ اَوْ اِلْهَامٍ بِطَرِيْقِ الْمُعْجِزَةِ اَوِ الْكَرَامَةِ وَاِرْشَادٍ اِلَى الْاِسْتِدْلَالِ بِالْاَمَارَاتِ فِيْمَا يُمْكِنُ فِيْهِ ذٰلِكَ ـ وَلِهٰذَا ذُكِرَ فِى الْفَتَاوٰى اَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ عِنْدَ رُؤْيَةِ هَالَةِ الْقَمَرِ يَكُوْنُ مَطَرٌ مُدَّعِيًا عِلْمَ الْغَيْبِ لَا بِعَلَامَتِهِ كُفْرٌ ـ

সহজ তরজমা

গনকের কথায় বিশ্বাস করা কুফরী

আর গণক অদৃশ্যের যে সংবাদ দেয়, সে ব্যাপারে তাকে সত্যায়ণ করা (বিশ্বাস করা) কুফরী। কেননা রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আসবে এবং তার ব্যক্ত কথায় বিশ্বাস করবে (তার কথাকে সত্য মনে করবে) সে এ কুরআনকে অস্বীকার করল, যা আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ এর উপর অবতীর্ণ করেছেন। আর গণক ঐ ব্যক্তি, যে ভবিষ্যতে আসন্ন ও সংঘটিতব্য ঘটনা সম্পর্কে সংবাদ দেয়। গোপন কথা জানা এবং অদৃশ্য সম্পর্কে অবহিত বলে দাবী করে। আরবে কিছু গণক ছিল। তারা অদৃশ্য জ্ঞানের দাবীদার। তন্মধ্যে কেউ কেউ দাবী করত– তাদের কিছু দৃশ্যমান ও সহযোগী জ্বিন আছে। যারা তাদের কাছে বিভিন্ন সংবাদ পৌঁছে দেয়। আবার কেউ কেউ দাবী করত– তারা তাদের আল্লাহ প্রদত্ত মেধা খাটিয়ে বহু অদৃশ্য বিষয় অনুধাবন করতে পারে। আর যতিষী যখন সংগঠিতব্য ঘটনাবলি জানার দাবী করবে, সে হবে জটিল গণক।

মোটকথা, অদৃশ্য জ্ঞান এমন বিষয়, যাতে আল্লাহ তা'আলাই সর্বেসর্বা (একচ্ছত্র অধিকারী) তাতে বান্দার কোন হাত (দখল) নেই। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা জানালে কিংবা মুজিযা বা কারামত স্বরূপ ইলহাম করলে অথবা সম্ভাব্য যত বিষয়ে আলামত দ্বারা প্রমাণ পেশ করার প্রতি দিকনির্দেশনা দিলে (বান্দা জানতে পারে।) কাজেই ফাতওয়ার কিতাবে উল্লেখ আছে, চন্দ্রের বৃত্ত দেখার সময় বৃষ্টির লক্ষণ দেখে নয়; অদৃশ্য জ্ঞানের দাবীদার হয়ে সংবাদ দাতার (উক্তিকারীর) উক্তি "বৃষ্টি হবে" কুফরী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এখানে গায়েব দ্বারা উদ্দেশ্য ?

গায়েব দ্বারা এমন বিষয় উদ্দেশ্য, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় বা ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা যা অনুভূত হতে পারে না। এর জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধও নয়, না এর উপর কোন দলীল-প্রমাণ আছে, যার মাধ্যমে এ জ্ঞান অর্জিত হতে পারে। কুরআন গাইরুল্লাহ থেকে এ অদৃশ্য জ্ঞানই অস্বীকার করেছে। বলেছে, আল্লাহ ছাড়া কারও এ অদৃশ্য জ্ঞান নেই। আর যে বিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে বিষয়ের জ্ঞান হাসিল করা যায় অথবা কোন দলীল দ্বারা অনুধাবন করা যায় কিংবা তার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, সেটি গায়েব তথা অদৃশ্যভুক্ত নয়। না তার জ্ঞানের দাবী করা কুফরী; না এর দাবীদারকে সত্যায়ণ করা বা বিশ্বাস করা কুফরী।

قَوْلُه: رَئِيًّا ঃ এ শব্দটি فَعِيل ওযনে ইসমে মাফউল; مَرْئِيّ এর অর্থে ব্যবহৃত। উদ্দেশ্য, দৃশমান সঙ্গী।

وَالْمَعْدُوْمُ لَيْسَ بِشَيْئٍ اِنْ اُرِيْدَ بِالشَّيْئِ اَلثَّابِتُ الْمُتَحَقِّقُ عَلٰى مَاذَهَبَ اِلَيْهِ الْمُحَقِّقُوْنَ مِنْ اَنَّ الشَّيْئِيَّةَ تُسَاوِقُ الْوُجُوْدَ وَالثُّبُوْتَ وَالْعَدَمَ يُرَادِفُ النَّفْىَ ـ فَهٰذَا حُكْمٌ ضَرُوْرِىٌّ ـ لَمْ يُنَازِعْ فِيْهِ اِلَّا الْمُعْتَزِلَةُ الْقَائِلُوْنَ بِاَنَّ الْمَعْدُوْمَ الْمُمْكِنَ ثَابِتٌ فِى الْخَارِجِ ـ وَاِنْ اُرِيْدَ اَنَّ الْمَعْدُوْمَ لَايُسَمّٰى شَيْئًا ـ فَهُوَ بَحْثٌ لُغَوِىٌّ مَبْنِىٌّ عَلٰى تَفْسِيْرِ الشَّيْئِ بِاَنَّهُ الْمَوْجُوْدُ اَوِ الْمَعْدُوْمُ اَوْ مَا يَصِحُّ اَن يُعْلَمَ وَيُخْبَرَ عَنْهُ فَالْمَرْجِعُ اِلَى النَّقْلِ وَتَتَبُّعِ مَوَارِدِ الْاِسْتِعْمَالِ

সহজ তরজমা

অস্তিত্বহীন জিনিস কোন বস্তু নয়। যদি شيئ দ্বারা বাস্তবে বিদ্যমান বস্তু উদ্দেশ্য হয় যেমনটি মুহাক্কিকগণের মাযহাব অর্থাৎ বস্তু হওয়া, বিদ্যমান থাকা ও অস্তিত্বের সামর্থক আর নাস্তিক না হওয়া বা অস্তিত্বহীনতার সমার্থক। সুতরাং এ হুকুমটি স্বতঃসিদ্ধ। এতে মুতাযিলীরা ব্যতীত কেউ দ্বিমত পোষণ করেন নি। তারা বলে– অস্তিত্বহীন সম্ভাব্য বস্তু বাস্তবে বিদ্যমান। আর যদি উদ্দেশ্য হয়, অস্তিত্বহীন বস্তুকে شيئ বলা হয় না, তাহলে এটি আভিধানিক আলোচনা। যা شيئ এর নিম্নোক্ত ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ شيئ বা বস্তু বাস্তবে বিদ্যমান কি বিদ্যমান নয় কিংবা شيئ এমন বস্তুর নাম, যার সম্পর্কে জানা বা সংবাদ দেওয়া বিশুদ্ধ। সুতরাং প্রমাণের গোড়া ও প্রয়োগক্ষেত্রের অনুসন্ধান করতে হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

অস্তিত্বহীন বস্তু সম্পর্কে দুটি মাসয়ালা

আশ'আরী ও মুতাযিলীদের মধ্যে বিতর্কিত মাসআলা-মাসায়েলের মধ্যে معدوم (অস্তিত্বহীন) সম্পর্কে দুটি মাসআলা আছে।

(১) আশ'আরীরা বলে- অস্তিত্বহীন বস্তু বাস্তবে উপস্থিত নেই। মুতাযিলারা বলে- সম্ভাব্য অস্তিত্বহীন বস্তু বাস্তবে বিদ্যমান, অনুপস্থিত নয়।

(২) আশ'আরীদের দাবী- সমাজ এবং অভিধানে অস্তিত্বহীন বস্তুকে شيئ বলা হয় না। অস্তিত্বহীন বস্তুর উপর شيئ শব্দ প্রয়োগ হয়ে থাকলেও তা রূপকার্থে প্রযোজ্য। আর মুতাযিলীরা বলে- অস্তিত্বহীন বস্তুকে شيئ বলা যেতে পারে। মুসান্নিফ রহ.এর ভাষ্যে উভয় মাসআলা বর্ণনার অবকাশ রয়েছে। এজন্য ব্যাখ্যাতা বলেছেন- মুসান্নিফ রহ. এর প্রথম মাসআলার বিবরণ দেওয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকলে তো এটি স্বতঃসিদ্ধ হুকুম। এর উপর প্রমাণ পেশ করা অদৌ প্রয়োজন নেই।

আর দ্বিতীয় মাসআলার বিবরণ দেওয়ার উদ্দেশ্য হয়ে থাকলে তো সেটি আভিধানিক বিতর্ক। এজন্য নকল ঐতিহাসিক প্রমাণ ও প্রয়োগক্ষেত্র দেখা প্রয়োজন।

وَفِى دُعَاءِ الْاَحْيَاءِ لِلْاَمْوَاتِ وَصَدَقَتِهِمْ اَىْ صَدَقَةِ الْاَحْيَاءِ عَنْهُمْ اَىْ عَنِ الْاَمْوَاتِ نَفْعٌ لَهُمْ اَىْ لِلْاَمْوَاتِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ ـ تَمَسُّكًا بِاَنَّ الْقَضَاءَ لَا يَتَبَدَّلُ ـ وَكُلُّ نَفْسٍ مَرْهُوْنَةٌ بِمَا كَسَبَتْ وَالْمَرْءُ مُجْزٰى بِعَمَلِهٖ لَا بِعَمَلِ غَيْرِهٖ ـ وَلَنَا مَاوَرَدَ فِى الْاَحَادِيْثِ الصِّحَاحِ مِنَ الدُّعَاءِ لِلْاَمْوَاتِ خُصُوْصًا فِى صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ ـ وَقَدْ تَوَارَثَهُ السَّلَفُ ـ فَلَوْلَمْ يَكُنْ لِلْاَمْوَاتِ نَفْعٌ فِيْهِ لَمَا كَانَ لَهُ مَعْنًى ـ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّىْ عَلَيْهِ اُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِاَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ اِلَّا شُفِّعُوْا فِيْهِ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ اَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمَّ سَعْدٍ رض قَدْ مَاتَتْ فَاَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ ـ قَالَ اَلْمَاءُ ـ فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ هٰذَا لِاُمِّ سَعْدٍ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلدُّعَاءُ يَرُدُّ الْبَلَاءَ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ ـ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ الْعَالِمَ وَالْمُتَعَلِّمَ اِذَا مَرَّا عَلٰى قَرْيَةٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ الْعَذَابَ عَنْ مَقْبَرَةِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ـ وَالْاَحَادِيْثُ وَالْاٰثَارُ فِىْ هٰذَا الْبَابِ اَكْثَرُ مِنْ اَنْ تُحْصٰى ـ

সহজ তরজমা

ইসালে সওয়াব

মৃতদের জন্য জীবিতদের দু'আয় এবং তাদের পক্ষ থেকে জীবীতদের দান সদকায় মৃতদের উপকার হয়। মুতাযিলীরা এর বিরোধী। (তাদের মতে কারও পক্ষে অন্যের আমল উপকারে আসবে না।) তাদের প্রমাণ হল, আল্লাহর ফায়সালা পরিবর্তন হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার আমলের ব্যাপারে দায়বদ্ধ-পাকড়াও হবে। মানুষ তার নিজ আমলেরই প্রতিদান পাবে। আর আমাদের দলীল, সহীহ হাদীসগুলোতে মৃতদের জন্য বিশেষতঃ জানাযার নামাযে দু'আর বর্ণনা আছে। সালফে সালেহীনও বিষয়টি একে অপর থেকে পেয়েছেন। সুতরাং এতে যদি মৃতদের কোন উপকার না হত, তবে এর কোন অর্থ থাকত না। রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- যে মাইয়েতের উপরেই শত মুসলমানের এক জামাত জানাযার নামায পড়ে; তারা সকলেই তার জন্য সুপারিশ করে, তাদের সুপারিশ তার জন্য অবশ্যই কবুল হয়। সা'দ ইবনে উবাদাহ রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বললেন- হে

আল্লাহর রাসূল! সা'দের মাতা ইন্তেকাল করেছেন। এখন তার জন্য কিরূপ সদকা অধিক উত্তম হবে? রাসূলে কারীম ﷺ বললেন- পানি। তখন সা'দ ইবনে উবাদা রাযি. একটি কূপ খনন করিয়ে দিলেন। বললেন- এটি উম্মে সা'দের নামে ওয়াক্‌ফকৃত। রাসূলে কারীম ﷺ আরও বলেন- দু'আ বিপদাপদ দূরীভূত করে। সদকা আল্লাহ পাকের ক্রোধানল নির্বাপিত করে। তিনি আরও বলেন- আলিম এবং তালিবে ইলম যখন কোন জনপদ অতিক্রম করে, তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ জনপদের কবরস্থান থেকে চল্লিশ দিনের জন্য আযাব উঠিয়ে নেন। এ সংক্রান্ত হাদীস এবং সাহাবায়ে কিরামের উক্তি প্রচুর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

বহু হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের উক্তি দ্বারা ইসালে সাওয়াব প্রমাণিত। যেমন, মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে মারফূ'রূপে বর্ণিত আছে-

إِذَا مَاتَ ابْنُ اٰدَمَ إِنْقَطَعَ عَمَلُهٗ إِلَّامِنْ ثَلٰثٍ، صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهٖ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْلَـهٗ.

"বনী আদম ইন্তিকাল করলে তার সমস্ত আমলই বন্ধ হয় যায়, তবে তিনটি আমল বন্ধ হয় না। (১) সদকায়ে জারিয়াহ। (২) উপকারী ইলম। (৩) নেককার সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করে।"

অনুরূপভাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে-

ما الميت فى قبرة الا شبيد الغريق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب أو ام أو ولد اوصدقه ثقة، فاذا الحقته كان احب الله من الدنيا

বাকী রইল মুতাযিলার প্রদত্ত প্রমাণ অর্থাৎ আল্লাহর ফায়সালা চাই কারও পুরস্কার প্রদানের জন্য হোক কিংবা কাউকে আযাব দেওয়ার নিমিত্তে হোক, তাতে পরিবর্তন হবে না।

এর জবাব হল, শরী'আত প্রণেতা যখন মৃতদের জন্য জীবিতদের দু'আ এবং তাদের পক্ষ থেকে দান-সদকা করা উপকারী বলে সংবাদ দিয়েছেন, তখন এর উপর ঈমান আনা ও বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে তাদের প্রদত্ত প্রমাণ- لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّامَاسَعٰى এর মধ্যে ইনসান (মানুষ) দ্বারা কাফির ইনসান উদ্দেশ্য।

وَاللّٰهُ تَعَالٰى يُجِيْبُ الدَّعْوَاتِ وَيَقْضِى الْحَاجَاتِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ لِلْعَبْدِ مَالَمْ يَدْعُ بِاِثْمٍ وَقَطِيْعَةِ رَحِمٍ مَالَمْ يَسْتَعْجِلْ وَلِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ رَبَّكُمْ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِىْ مِنْ عَبْدِهٖ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ اِلَيْهِ اَنْ يَّرُدَّهُمَا صِفْرًا، وَاعْلَمْ اَنَّ الْعُمْدَةَ فِىْ ذَالِكَ صِدْقُ النِّيَّةِ وَخُلُوْصُ الطَّوِيَّةِ وَحُضُوْرُ الْقَلْبِ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اُدْعُوا اللّٰهَ وَاَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالْاِجَابَةِ، وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ لَايَسْتَجِيْبُ الدُّعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ ، وَاخْتَلَفَ الْمَشَائِخُ فِىْ اَنَّهٗ هَلْ يَجُوْزُ اَنْ يُّقَالَ يُسْتَجَابُ دُعَاءُ الْكَافِرِ، فَمَنَعَهُ الْجُمْهُوْرُ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَمَادُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلَالٍ ، وَلِاَنَّهٗ لَايَدْعُوْ اللّٰهَ تَعَالٰى لِاَنَّهٗ لَايَعْرِفُهٗ وَاِنْ اَقَرَّبِهٖ فَلَمَّا وَصَفَهٗ بِمَا لَايَلِيْقُ بِهٖ فَقَدْ نَقَضَ اِقْرَارَهٗ ، وَمَا رُوِىَ فِى الْحَدِيْثِ اَنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ وَاِنْ كَانَ كَافِرًا يُسْتَجَابُ مَحْمُوْلٌ عَلٰى كُفْرَانِ النِّعْمَةِ ، وَجَوَّزَهٗ بَعْضُهُمْ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى حِكَايَةً عَنْ اِبْلِيْسَ رَبِّ اَنْظِرْنِىْ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ، هٰذِهٖ اِجَابَةٌ ، اِلَيْهِ ذَهَبَ اَبُوا الْقَاسِمِ الْحَكِيْمُ وَاَبُوْ نَصْرٍ الدَّبُوْسِىُّ ، قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيْدُ وَبِهٖ يُفْتٰى .

সহজ তরজমা

বান্দার দু'আ কবূল করা হয়

আল্লাহ তা'আলা দু'আ কবুল করেন। প্রয়োজন পূরণ করেন। কেননা তিনি ইরশাদ করেছেন– তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা কর! আমি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করব। রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– বান্দার দু'আ কবুল করা হয়। তবে শর্ত হল, সে যদি গুনাহ সম্পর্কে কিংবা আত্মীয়তা ছিন্ন করা সম্পর্কে দু'আ না করে এবং তাড়াহুড়ো না করে। রাসূলে কারীম ﷺ আরও ইরশাদ করেছেন– তোমাদের প্রতিপালক বড় লজ্জাশীল ও করুণাময়। বান্দা যখন তার দরবারে হাত তোলে, তখন তাকে শূন্য হাতে ফিরাতে তার লজ্জাবোধ হয়।

উল্লেখ যে, (দু'আ কবুলের জন্য) নির্ভরযোগ্য (আবশ্যকীয়) বিষয় হল, সঠিক নিয়্যত, একাগ্রচিত্ততা এবং (আল্লাহ পাকের সাথে) ধ্যান-তন্ময়তা। (বিনয় নম্রতা।) কেননা রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– তোমরা কবুল হওয়ার বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করা। জেনে রেখ, আল্লাহ তা'আলা উদাসীন তামাশাকারীর দু'আ কবুল করেন না। এ ব্যাপারে মাশাইখগণের মতানৈক্য রয়েছে যে, কাফিরের দু'আ কবুল হয়– বলা যায় কি না? অধিকাংশ মাশাইখ তা অস্বীকার করেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– কাফিরের দু'আ কেবলই বৃথা যায়। বস্তুতঃ সে আল্লাহর দরবারে দু'আই করে না। কারণ, সে আল্লাহকে চিনে না। আর যদিও সে মুখে স্বীকার করে, তদুপরি সে যখন আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি বর্ণনা করে– যা তার মান-মর্যাদা বিরোধী– তখন তার মৌখিক স্বীকৃতি নষ্ট হয়ে গেল। আর হাদীসে যে বর্ণিত হয়েছে, মজলূম নিপেড়িত ব্যক্তি কাফির হলেও তার দু'আ কবুল হয়, তা নেয়ামতের অকৃতজ্ঞ হওয়ার উপর প্রযোজ্য। কেউ কেউ একে জায়েয সাব্যস্ত করেছেন। তাছাড়া ইবলিস সম্পর্কে বিবরণমূলক আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ইবলীস বলল, হে আল্লাহ! আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন– তোমাকে অবকাশ দেওয়া হল। এ তো দু'আ কবুল হওয়া বুঝায়। আবুল কাসিম হাকীম ও আবূ নসর দাবূসীর মাযহাবও তা-ই। সদরে শহীদ বলেছেন– এর উপরই ফাত্ওয়া।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ: وَاخْتَلَفَ الْمَشَائِخُ..الخ ঃ দুটি উক্তির মাঝে সমন্বয় সাধনের পদ্ধতি হল, কাফিরের দু'আ যদি দুনিয়া সম্পর্কে হয়, তবে কবুল হতে পারে। আর যদি পরকাল সম্পর্কে হয় তবে কবুল হবে না।

وَمَا اَخْبَرَبِهِ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَىْ مِنْ عَلَامَاتِهَا مِنْ خُرُوْجِ الدَّجَّالِ وَدَابَّةِ الْاَرْضِ وَيَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ وَنُزُوْلِ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ السَّمَآءِ وَطُلُوْعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا فَهُوَ حَقٌّ لِاَنَّهَا اُمُوْرٌ مُمْكِنَةٌ اَخْبَرَبِهَا الصَّادِقُ قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ اسَيْدا نعفارى طَلَعَ النَّبِىُّ اكر فَقَالَ مَاتَذْكُرُوْنَ قُلْنَا نَذْكُرُ السَّاعَةَ قَالَ اِنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نتذ حَتّٰى تَرَوْاقَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُوْلَ عِيْسٰى بْنِ مَرْيَمَ وَيَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ وَثَلٰثَةَ خُسُوْفٍ خَسْفٍ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٍ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٍ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ ، وَاٰخِرُ ذَالِكَ نَارٌتَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ اِلٰى مَحْشَرِهِمْ، وَالْاَحَادِيْثُ الصِّحَاحُ فِىْ هٰذِهِ الْاَشْرَاطِ كَثِيْرَةٌ جِدًّا، وَقَدْ رُوِىَ اَحَادِيْثُ الصِّحَاحِ فِىْ هٰذِهِ الْاَشْرَاطِ كَثِيْرَةٌ جِدًّا، وَقَدْ رُوِىَ اَحَادِيْثُ وَاٰثَارٌ فِىْ تَفَاصِيْلِهَا وَكَيْفِيَّاتِهَا فَلْتَطْلُبْ مِنْ كُتُبِ التَّفْسِيْرِ وَالسِّيَرِ وَالتَّوَارِيْخ.

সহজ তরজমা

নবীজীর বর্ণিত আলামতে কিয়ামত সত্য

রাসূলে কারীম ﷺ কিয়ামতের যেসব আলামত সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যেমন, দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরয ও ইয়াজুজ-মাজূজের আবির্ভাব, আসমান হতে হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ এবং পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয় হওয়া -এসব সত্য। কেননা এগুলো এমন সম্ভাব্য ব্যাপার, যার সম্পর্কে সত্যবাদী সংবাদদাতা সংবাদ দিয়েছেন। হযরত হুযাইফা ইবনে উসাঈদ গাফফারী রাযি. বলেন– রাসূলে কারীম ﷺ সহসা আমাদের নিকট এসে পৌঁছেন। তখন আমরা সকলেই আপোষে কথা-বার্তা বলছিলাম। তিনি জজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি কথা বলছ? আমরা বললাম, কিয়ামতের আলোচনা করছি। তখন তিনি বললেন, কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত আসবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তার (কিয়ামতের) পূর্বে দশটি আলামত প্রত্যক্ষ্য করবে। অতঃপর তিনি ধোঁয়া, দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরয, পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয়, ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) এর অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজূজ এবং তিনটি খসুফ বা ভূমিধ্বস উদয়াচলে একটি আস্তাচলে একটি এবং আবর উপদ্বীপে একটি ভুমিধ্বসের কথা আলোচনা করলেন। অবশেষে ইয়ামান থেকে এক অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হবে। যা তাদেরকে হাশরের মাঠে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। এসব আলামত সম্পর্কে প্রচুর বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে। এসবের বিস্তারিত বিবরণ ও অবস্থা-প্রকৃতি সম্পর্কেও বহু হাদীস এবং সাহাবায়ে কিরামের উক্তি বর্ণিত আছে। কাজেই তাফসীর, সিরাত ও ইতিহাস গ্রন্থাবলি থেকে সেসব খুঁজে নেওয়া চাই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হল, নবী কারীম ﷺ কিয়ামতের যেসব আলামত সম্পর্কে অবহিত করেছেন, সেসব সত্য। কেননা সেগুলো এমন সম্ভাব্য ব্যাপার, যে সম্পর্কে সত্যবাদী সংবাদদাতা অবহিত করেছেন। আর সত্যবাদী সংবাদদাতা সেসব সম্ভাব্য বিষয়ের সংবাদ দেন, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং মেনে নেওয়া ওয়াজিব। কাজেই কিয়ামতের সেসব আলামতের উপর ঈমান আনা ওয়াজিব। এসব আলামতে কিয়ামতের বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যা সীরাত, ইতিহাস ও তাফসীর গ্রন্থাবলীতে বিদ্যমান। বক্ষমান গ্রন্থটি কলবরে দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আমরা সেগুলো পরিহার করেছি।

وَالْمُجْتَهِدُ فِى الْعَقْلِيَّاتِ وَالشَّرْعِيَّاتِ الْاَصْلِيَّةِ وَالْفَرْعِيَّةِ قَدْ يُخْطِى وَقَدْ يُصِيْبُ وَذَهَبَ بَعْضُ الْاَشَاعِرَةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ اِلٰى اَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ فِى الْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الَّتِىْ لَاقَاطِعَ فِيْهَا مُصِيْبٌ ، وَهٰذَا الْاِخْتِلَافُ مَبْنِىٌّ عَلٰى اِخْتِلَافِهِمْ فِىْ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى أَفِى كُلِّ حَادِثَةٍ حُكْمًا مُعَيَّنًا اَمْ حُكْمُهٗ فِى الْمَسَائِلِ الْاِجْتِهَادِيَّةِ مَااَدّٰى اِلَيْهِ رَاىُ الْمُجْتَهِدِ ويحقيق هٰذَا الْمَقَامَان الْمألة الْاِجْتِهَادِيَّة مَااَدّٰى اِلَيْه رَاى الْمُجْتَهِد وَيحْقِيق هٰذَا الْمَقَامَان الْمألة الْاِجْتِهَادِيَّة إمَّا لَايَكُوْن مِنَ اللّٰه تَعَالٰى فِيْهَاحُكْمٌ مُعَيَّنٌ قَبْلَ اِجْتِهَادِ الْمُجْتَهِد اَوْ يَكُوْنُ، وَحِيْنَئِذٍ اِمَّا اَنْ لَايَكُوْنَ مِنَ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ دَلِيْل اَوْ يَكُوْن، وَذَالِكَ الدَّلِيْلُ اِمَّا قَطْعِىّ اَوْظَنِّىّ ، فَذَهَبَ اِلٰى كُلِّ اِحْتِمَالٍ جَمَاعَةٌ وَالْمُخْتَارُ اَنَّ الْحُكْمَ مُعَيَّنٌ وَعَلَيْهِ دَلِيْلٌ ظَنِّىٌّ إنْ وَجَدَهٗ الْمُجْتَهِدُ اَصَابَ، وَان ، فَقَدَهٗ اَخْطَأ ، وَالْمُجْتَهِدُ غَيْرُ مُكَافٍ بِاصَابَتِهٖ نُعْموصنه وَخَفَاءِه فَلِذَالِكَ كَان الْمُخْطِى مَعْذُوْرًا بَلْ مَاجُوْرًا فَلَاخِلَافَ عَلٰى هٰذَا الْمَذْهَبِ فِىْ اَنَّ الْخَطِى لَيْسَ بِاثِم ، وَاِنَّمَا الْخِلَافُ فِىْ

اَنَّهٗ مُخْطِ ٍابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً اَىْ بِالنَّظْرِ اِلَى الدَّلِيْلِ وَالْحُكْمِ جَمِيْعًا ، وَاِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ الْمَشَائِخِ وَهُوَ مُخْتَارًا الشَّيْخِ اَبِىْ مَنْصُوْر اَوِانْتِهَاءٍ فَقَطْ اَىْ بِانظر اِلَى الْحُكْمِ حَيْثُ اَخْطَأَفِيْهِ وَاِنْ اَصَابَ فِى الدَّلِيْلِ حَيْثُ اَقَامَهٗ عَلٰى وَجْهِهٖ مُسْجَمْعًا بِجَمِيْعِ شَرَائِطِهٖ وَاَرْكَانِهٖ وَاَتٰى بِمَا كُلِّفَ مِنَ الْاِعْتِبَارَاتِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِى الْاِجْتِهَادِيَّاتِ اِقَامَةُ الْحُجَّةِ الْقَطْعِيَّةِ الَّتِىْ مَدْلُوْلُهَا حَقٌّ اَلْبَتَّةَ.

সহজ তরজমা

মুজতাদি তার ইজতিহাদে সাওয়াব পান

যৌক্তিক এবং শরী'আতের আসল ও শাখা মাসআলায় মুজতাহিদ কখনও ভুল করেন আবার কখনও হকের উপর থাকেন। কোন কোন আশ'আরী ও মুতাযিলীর মাযহাব মতে শরী'আতের যেসব শাখা মাসআলায় কোন অকাট্য প্রমাণ নেই, তাতে প্রত্যেক মুজতাহিদ হকের উপর থাকেন। এ মতপার্থক্য তাদের আরেকটি মতানৈক্যের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ প্রতিটি মাসআলায় আল্লাহর একটি হুকুম সুনির্দিষ্ট আছে নাকি ইজতিহাদী মাসআলায় তার সে হুকুমই থাকে, মুজতাহিদের চিন্তা-ভাবনা যে পর্যন্ত পৌঁছে?

বিষয়টির বাস্তবতা হল, ইজতিহাদী মাসআলায় মুজতাহিদের ইজতিহাদের প্রাক্কালে হয়ত আল্লাহর হুকুম থেকে কোন সুনির্দিষ্ট হুকুম থাকবে অথবা থাকবে না। এমতাবস্থায় তার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ত কোন প্রমাণ থাকবে নতুবা থাকবে না। সে প্রমাণ হয়ত অকাট্য হবে নতুবা যন্নী হবে। অতএব প্রত্যেক সম্ভাবনার দিকে এক এক দল ধাবিত হয়েছেন। অবশ্য পছন্দনীয় মত হল, হুকুম সুনির্দিষ্ট থাকে। আর এর প্রমাণ থাকে যন্নি। মুজতাহিদ সে পর্যন্ত পৌঁছে গেলে তিনি হকের উপর রয়েছেন। আর না পৌঁছালে তিনি ভুল করেছেন। মুজতাহিদ সঠিক হুকুমে পৌঁছার জন্য আদিষ্ট নয়। কেননা তা সূক্ষ্ম ও জটিল হতে পারে। এজন্যই ইজতিহাদে ভুলকারী মা'যুর (নির্দোর্ষ) বরং মাযূর তথা সাওয়াব ও প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য। সুতরাং এ মাযহাবের বিরুদ্ধে তথা ইজতিহাদে ভুলকারী মুজতাহিদ গুনাহগার না হওয়ার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। মতানৈক্য শুধু এ ব্যাপারে যে, সে মুজতাহিদ সূচনা ও পরিসমাপ্তি অর্থাৎ দলীল ও হুকুম দুটিতেই ভুলকারী এটিই কোন কোন মাশাইখের মত এবং শাইখ আবূ মানসূর মাতরীদীর পছন্দনীয় মত। অথবা সে মুজতাহিদ কেবল পরিসমাপ্তি অর্থাৎ হুকুমের দিক বিচারে ভুলকারী। অর্থাৎ তিনি হুকুম অনুধাবনে ভুল করছেন। অবশ্য দলীলের ব্যাপারে হকের উপর রয়েছে। অর্থাৎ সঠিক প্রমাণ পেশ করেছেন (বা যথার্থ দলীল কায়েম করেছেন) প্রমাণগুলো যাবতীয় শর্তাবলী ও রুকন সম্বলিত। তিনি সেসব শর্তাবলির প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন, যেগুলোর ব্যাপারে তিনি আদিষ্ট। ইজতিহাদী মাসআলায় অকাট্য প্রমাণ পেশ করা তার উপর ওয়াজিব নয়। যার অর্থ নিশ্চিতরূপে সঠিক হয়ে থাকে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ: فِى الْعَقْلِيَّاتِ ঃ عَقْلِيَّات দ্বারা সেসব মাসায়েল উদ্দেশ্য, যেগুলো নিছক এমন যৌক্তিক দলীল দ্বারা প্রমাণিত, যে দলীল কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা থেকে উৎসারিত নয়। যেমন– আল্লাহর অস্তিত্ব।

قَوْلُهٗ: وَالشَّرْعِيَّاتِ ঃ شَرْعِيَّات দ্বারা সেসব আহকাম উদ্দেশ্য, যেগুলো প্রমাণে যুক্তি-বিবেক যথেষ্ট নয়।

ইজতিহাদী মাসয়ালায় বিভিন্ন সম্ভাবনা

قَوْلُهٗ: وَتَحْقِيْقُ هٰذَا الْمَقَامِ ..الخ ঃ ইজতিহাদী মাসআলাগুলোতে মোট চার ধরণের সম্ভাবনা আছে।

(১) মুজতাহিদ কর্তৃক ইজতিহাদের পূর্বে তাতে আল্লাহ তা'আলার কোন হুকুম নির্দিষ্ট নেই বরং মুজতাহিদ তার ইজতিহাদের মাধ্যমে যা বুঝেন, তা-ই আল্লাহর হুকুম। এটিই অধিকাংশ মুতাযিলীর মাযহাব। এ সূরতে সঠিক পথ একাধিক হতে পারে। যেমন, ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর জন্য বমিকে অযু ভঙ্গকারী মনে করাও সঠিক, আবার ইমাম শাফেঈ রহ. এর জন্য অযু ভঙ্গকারী নয় মনে করাও সঠিক হবে।

(২) পূর্ব হতেই (এ ব্যাপারে) আল্লাহ তা'আলার একটি নির্দিষ্ট হুকুম রয়েছে। কিন্তু এর পক্ষে কোন প্রমাণ

নেই বরং সে সম্পর্কে অবগতি লাভ করা একটি আকস্মিক ব্যাপার। আর ভুলকারী মুজতাহিদ তার ইজতিহাদের মেহনতের সাওয়াব পাবে। এটি কোন কোন ফকীহ এবং মুতাকাল্লিমীনের মাযহাব।

(৩) তাতে পূর্ব হতে আল্লাহর একটি হুকুম নির্দিষ্ট আছে। তার উপর অকাট্য প্রমাণও প্রতিষ্ঠিত। এটি কোন কোন মুতাকাল্লিমীনের মাযহাব।

(৪) এ মাসাআলায় পূর্ব হতে আল্লাহর একটি হুকুম নির্দিষ্ট রয়েছে এবং তার উপর যন্নি দলীল প্রতিষ্ঠি আছে। মুজতাহিদ যদি সে দলীল পেয়ে যান, তবে তিনি সঠিক হুকুম জানতে পারবেন। আর যদি না পান, তবে সঠিক জানতে পারবেন না, ভুল করে বসবেন। আর মুজতাহিদ সঠিক হুকুম অনুধাবনের জন্য আদিষ্ট নন। কেননা হুকুম গোপন ও অস্পষ্ট থাকে। এজন্য ইজতিহাদে ভুলকারী মাযূরই নন বরং আল্লাহর কাছে সাওয়াব ও প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য। এটিই মুহাক্কিক্ উলামায়ে কিরামের মাযহাব এবং ব্যাখ্যতার নিকটেও পছন্দনীয়।

وَالدَّلِيْلُ عَلٰى اَنَّ الْمُجْتَهِدَ قَدْ يُخْطِئُ بِوُجُوْهٍ ، اَلْاَوَّلُ قَوْلُهٗ تَعَالٰى فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَالضَّمِيْرُ لِلْحُكُوْمَةِ وَالْفُتْيَا وَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنَ الْاِجْتِهَادَيْنِ صَوَابًا لِمَا كَانَ لِتَخْصِيْصِ سُلَيْمَانَ بِالذِّكْرِ جِهَةٌ لِاَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قد اصا الْحُكْم حِيْنَئِذٍ، وَفَهِمَه، اَلثَّانِى الْاَحَادِيْثُ وَالْاٰثَارُ الدَّالَّةُ عَلٰى تَرْدِيْدِ الْاِجْتِهَادِ بَيْنَ الصَّوَابِ وَالْخَطَاءِ بِحَيْثُ صَارَتْ مُتَوَاتِرَةَ الْمَعْنٰى ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِن اَصَبْتَ فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَاِنْ اَخْطَاْتَ فَلَكَ حَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَفِىْ حَدِيْثٍ اٰخَرَ جَعَلَ لِلْمُصِيْبِ اَجْرَيْنِ وَلِلْمُخْطِئِ اَجْرًا وَاحِدًا وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ اِنْ اَصَبْتُ فَمِنَ اللّٰهِ وَاِلَّا فَمِنِّىْ وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَقَدْ اشْتَهَرَت تَخْطِيَةُ الصَّحَابَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا فِى الْاِجْتِهَادِيَّاتِ، اَلثَّالِثُ اَنَّ الْقِيَاسَ مُظْهِرٌ لَا مُثْبِتٌ فَاِنَّ الثَّابِتَ بِالْقِيَاسِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ اَيْضًا معنى وَقَدْ اَجْمَعُوْا عَلٰى اَنَّ الْحَقَّ فِيْمَا ثَبَتَ بِالنَّصِّ وَاحِدٌ لَاغَيْرُ اَلرَّابِعُ اَنَّهٗ لَاتفرق فِى الْعُمُوْمَاتِ الْوَارِدَةِ فِىْ شَرِيْعَةِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيْنَ الْاَشْخَاصِ، فَلَوْ كَانَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيْبًا لَزِمَ اِتِّصَافُ الْفِعْلِ الْوَاحِدِ بِالْمُتَنَافِيَيْنِ مِنَ الْحَظْرِ وَالْاِبَاحَةِ اَوِ الصِّحَّةِ وَانفسا اَوِ الْوُجُوْبِ وَعَدَمِهٖ، وَتَمَام تَحْقِيْقِ هٰذِهِ الْاَدِلَّةِ وَالْجَوَابُ عَنْ تَمَسُّكَاتِ الْمُخَالِفِيْنَ يُطْلَبُ مِنْ كِتَابِنَا التَّلْوِيْحِ فِىْ شَرْحِ التَّنْقِيْحِ .

সহজ তরজমা

“মুজতাহিদ কখনও কখনও ভুল করেন”- এব্যাপারেএকাধিক প্রমাণ রয়েছে। এক. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- ففهمناها سليمان (এ আয়াতের) যমীরে মানসূব ফায়সালা ও ফাত্ওয়া এর দিকে ফিরেছে। যদি দুটি ইজতিহাদই সঠিক হত, তাহলে বিশেষভাবে হযরত সুলাইমান (আ.) কে উল্লেখ করার কোনও কারণ ছিল না। কেননা এমতাবস্থায় {হযরত সুলাইমান ও দাউদ (আ.) এর মধ্য হতে} প্রত্যেকেই সঠিক হুকুম পেয়ে গেছেন এবং বুঝে ফেলেছেন।ঞ্জদুই. ইজতিহাদী সঠিক ও ভুলের মাঝে অবর্তিত হওয়ার পক্ষে এত বেশী হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের উক্তি রয়েছে, সেগুলো অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- তুমি যদি সঠিক হুকুম পেয়ে যাও, তবে তোমার জন্য দশ নেকী। আর যদি ভুল করে বস, তবে তুমি পাবে এক নেকী। হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, আমি যদি সঠিক হুকুম পেয়ে যাই, তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নতুবা আমার পক্ষ থেকে এবং শয়তানের পক্ষ থেকে। ইজতিহাদী মাসআলাগুলোতে সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক একে অপরকে ভুলকারী আখ্যা দেওয়া প্রসিদ্ধ কথা।

তিন. কিয়াস হুকুমকে যাহির বা পরিস্ফুট করে দেয়; প্রমাণিত বা সাব্যস্ত করে না। কেননা যে হুকুম কিয়াসের আলোকে সাব্যস্ত, তা ইল্লত হিসেবে নছ দ্বারা সাব্যস্ত। আর নছ দ্বারা সাব্যস্ত হুকুমে উলামায়ে কিরামের ঐক্যমতে সঠিক কেবল একটি।

চার. আমাদের রাসূল ﷺ এর শরী'আতে বর্ণিত আহকামের ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং প্রত্যেক মুজতাহিদই যদি সত্যের উপরে থাকেন, তাহলে একই কাজ দুটি পরস্পর বিরোধী যেমন, বৈধতা-অবৈধতা, বিশুদ্ধতা-অশুদ্ধতা কিংবা আবশ্যকতা-অনাবাশ্যকতার সাথে বিশেষিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। আর প্রমাণাদির গভীরতা এবং বিরুদ্ধবাদীদের প্রমাণের জবাব আমার اَلتَّلْوِيْحُ فِىْ شَرْحِ التَّنْقِيْحِ এর মধ্যে দেখে নিন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ: اَلضَّمِيْرُ ..الخ **قَوْلُهٗ** ঃ অর্থাৎ যমীরে মানসূবে মুত্তাসিলটি হুকুম তথা ফায়সা অথবা فتيا তথা ফাত্ওয়ার দিকে প্রত্যাবর্তিত। অবশ্য তা সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। কিন্তু مَعْهُوْدٌ فِى الذِّهْنِ বা যেহেন বিদ্যমান আছে। ঘটনা হল, এক ব্যক্তির বকরী পাল রাতের আঁধারে আরেক ব্যক্তি ফসল সাবাড় করে দেয়। মামলা যায় হযরত দাউদ (আ.) এর দরবারে। ফসলের ক্ষতির পরিমাণ বকরী পালের মূল্য সমান ছিল। তিনি বকরীগুলো ক্ষেতের মালিককে দিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত দিলেন। হযরত সুলাইমান (আ.) বললেন, এছাড়াও আরেকটি রায় হতে পারে। যাতে উভয় পক্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখা যাবে। হযরত দাউদ (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, কি সেটি ? তিনি বলেন, বকরীগুলো ক্ষেতের মালিককে দেওয়া হবে। বকরির মালিক ক্ষেতের পরিচর্যা করতে থাকবে। এমনকি ফসল যখন পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে, তখন ক্ষেত এবং বকরী নিজ নিজ মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

হযরত দাউদও (আ.) এ ফায়সালা পছন্দ করলেন। আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াতে হযরত সুলাইমানকে ফায়সালার বুঝ-জ্ঞান দেওয়ার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বাক্যের এ বাগধারায় বুঝা যায়, হযরত দাউদ (আ.) থেকে এ মাসআলায় ইজতিহাদী ভুল হয়েছে। তিনি সঠিক ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত বুঝতে পারেন নি।

وَرُسُلُ الْبَشَرِ اَفْضَلُ مِنْ رُسُلِ الْمَلَائِكَةِ وَرُسُلُ الْمَلَائِكَةِ اَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الْبَشَرِ، وَعَامَّةُ الْبَشَرِ اَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الْمَلَائِكَةِ، اَمَّا تَفْضِيْلُ رُسُلِ الْمَلَائِكَةِ عَامَّةَ الْبَشَرِ فَبِالْاِجْمَاعِ بَلْ بِالضَّرُوْرَةِ وَاَمَّا تَفْضِيْلُ رُسُلِ الْبَشَرِ عَلٰى رُسُلِ الْمَلَائِكَةِ وَعَامَّةِ الْبَشَرِ عَلٰى عَامَّةِ الْمَلَائِكَةِ فَبِوُجُوْهٍ، اَلْاَوَّلُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَمَرَ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُوْدِ لِاٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلٰى وَجْهِ التَّعْظِيْمِ وَالتَّكْرِيْمِ بِدَلِيْلِ قَوْلِهٖ تَعَالٰى حِكَايَةً عَنْ اِبْلِيْسَ أَرَأَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ وَاَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ وَمُقْتَضَى الْحِكْمَةِ الْاَمْرُ لِلْاَدْنٰى بِالسُّجُوْدِ لِلْاَعْلٰى دُوْنَ الْعَكْسِ . اَلثَّانِىْ اِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ اَهْلِ اللِّسَانِ يَفْهَمُ مِنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاۤءَ كُلَّهَا. اَلْاٰيَةَ ـ اِنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ اِلٰى تَفْضِيْلِ اٰدَمَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَبَيَانِ زِيَادَةِ عِلْمِهٖ وَاسْتِحْقَاقِهٖ التَّعْظِيْمَ وَالتَّكْرِيْمَ اَلثَّالِثُ قَوْلُهٗ تَعَالٰى اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ جُمْلَةِ الْعَالَمِ وَقَدْ خُصَّ مِنْ ذَالِكَ بِالْاِجْمَاعِ تَفْضِيْلُ عَامَّةِ الْبَشَرِ عَلٰى رُسُلِ الْمَلَائِكَةِ، فَبَقِىَ مَعْمُوْلًا بِهٖ فِيْمَا عَدَا ذَالِكَ، وَلَاخَفَاءَ فِىْ اَنَّ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةَ ظَنِّيَّةٌ يُكْتَفٰى فِيْهَا بِالْاَدِلَّةِ الظَّنِّيَّةِ . اَلرَّابِعُ اِنَّ الْاِنْسَانَ قَدْ يَحْصُلُ الْفَضَائِلَ وَالْكَمَالَاتِ الْعِلْمِيَّةَ وَالْعَمَلِيَّةَ مَعَ وُجُوْدِ الْعَوَائِقِ وَالْمَوَانِعِ مِنَ الشَّهْوَةِ وَالْغَضَبِ وَسُنُوْحِ الْحَاجَاتِ الضَّرُوْرِيَّةِ

الشَّاغِلَةِ عَنِ اكْتِسَابِ الْكَمَالَاتِ، وَلَا شَكَّ اَنَّ الْعِبَادَةَ وَكَسْبَ الْكَمَالِ مَعَ الشَّوَاغِلِ وَالصَّوَارِفِ اَشَقُّ وَاَدْخَلُ فِى الْاِخْلَاصِ، فَيَكُوْنُ اَفْضَلُ .

সহজ তরজমা

রাসূল ফিরিশতা ও মানুষের মর্যাদা

মাবন রাসূল ফিরিশ্‌তা রাসূল অপেক্ষা, ফিরিশ্‌তা রাসূল সাধারণ মানুষ অপেক্ষা এবং সাধারণ মানুষ আম ফিরিশ্‌তাদের থেকে উত্তম। যাহোক, ফিরিশ্‌তা রাসূলদেরকে আম মানুষ অপেক্ষা উত্তম বলা হয় ইজমার ভিত্তিতে বরং জরুরতে দ্বীন দ্বারাও সাব্যস্ত। থাকে মানব রাসূলকে ফিরিশ্‌তা রাসূল অপেক্ষা এবং সাধারণ মানুষ আম ফিরিশ্‌তাদের থেকে উত্তম হওয়ার বিষয়টি। সুতরাং তা একাধিক কারণে প্রমাণিত।

(১) আল্লাহ তা'আলা ফিরিশ্‌তাদেরকে আদমের সামনে সম্মানসূচক সিজদা করার নির্দেশ দিয়েছেন। বিবরণ স্বরূপ ইবলিস সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– أرأيتك هذا الذى ...الخ "ভালকথা! বলুন, একি সে ব্যক্তি, যাকে আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন! অথচ আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দিয়ে (যা স্বভাবতই উর্ধ্বগামী) আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে (যা স্বভাবতই অধঃগামী। কাজেই আমি উত্তম; সে অধম) অথচ হিকমতের দাবী হল, উত্তমের সামনে অধমকে সিজদার নির্দেশ দেওয়া; এর উল্টো নয়।

(২) দ্বিতীয় প্রমাণ হল, আল্লাহ তা'আলার বাণী وعلم آدم الاسماء كلها দ্বারা সকল আরবী ভাষা-জ্ঞানীই পরিস্কার বুঝে নিবেন, এ নাম শিক্ষা দেওয়ার দ্বারা ফিরিশ্‌তাদের উপর আদম (আ.) কে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া এবং তার ইলম-জ্ঞানের আধিক্যতা ও ইজ্জত-সম্মানের সুযোগ্য হওয়ার বিবরণ দেওয়া উদ্দেশ্য।

(৩) তৃতীয় প্রমাণ, আল্লাহ পাক বলেছেন– তিনি (আল্লাহ) আদম (আ.), নূহ (আ.) ইবরাহীম (আ.) এবং ইমরান এর পরিবার পরিজনকে গোটা জগৎবাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম দান করেছেন। ঐ ফিরিশ্‌তারাও জগদ্বাসীর অন্তর্ভুক্ত। আর ফিরিশ্‌তা রাসূল আপেক্ষা সাধারণ মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এর দ্বারা সর্বসম্মতভাবে খাছ করে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং এছাড়া অন্য ক্ষেত্রে উপরিউক্ত আয়াতে কারীমা কার্যকর থাকবে। এ মাসআলা যন্নি হওয়ার ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা নেই। তাতে যন্নি প্রমাণই যথেষ্ট।

(৪) চতুর্থ প্রমাণ হল, মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব, ফযীলত এবং ইলম-আমলে যোগ্যতা ও পরিপূর্ণতা অর্জন করে। অথচ বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও বাঁধা-বিপত্তি থাকে। যেমন– কামনা, যৌন চাহিদা, ক্রোধ এবং পরিপূর্ণতা অর্জনে বাঁধা দানকারী অনিবার্য প্রয়োজনাদির সম্মুখীন হওয়া। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার সাথে ইবাদত-বন্দেগী করা এবং পরিপূর্ণতা হাসিল করা অধিকতর জটিল ও দুস্কর। কাজেই তা অতি উত্তম হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কয়েকটি প্রশ্নের জবাব

قَوْلُهُ: الثَّالِثُ قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى ..الخ ঃ প্রমাণ প্রদানের কারণ হল, এ আয়াতটি বুঝায়, হযরত আদম (আলাই.), হযরত নূহ (আলাই.) প্রমুখ গোটা জগতদ্বাসীর থেকে উত্তম। অথচ তারা মানুষ ও রাসূল। আর জগতদ্বাসীর মধ্যে ফিরিশ্‌তা রাসূলও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বুঝা গেল, মানব রাসূল ফিরিশতা রাসূল থেকে উত্তম। তছাড়া আয়াতে কারীমায় আলে ইবরাহীম এবং আলে ইমরানকেও গোটা জগদ্বাসী অপেক্ষা উত্তম সাব্যস্ত করা হয়েছে। অথচ তাদের মধ্যে সাধারণ মানুষও অন্তর্ভুক্ত। আবার গোটা জগদ্বাসীর মধ্যে আম ফিরিশতারাও গণ্য। অতএব বুঝা গেল, সাধারণ মানুষ আম ফিরিশতাদের থেকে উত্তম। কিন্তু এতে সন্দেহ জাগে, যখন আলে ইবরাহীম ও আলে ইমরানের অধীনে সাধারণ মানুষও গোটা জগদ্বাসীর চেয়ে উত্তম হবে, তখন গোটা জগদ্বাসীর মধ্যে ফিরিশতা রাসূলও অন্তর্ভুক্ত। কাজেই সাধারণ মানুষ ফিরিশতা রাসূল অপেক্ষাও উত্তম হওয়া আবশ্যক হবে। ব্যাখ্যাতা তার উক্তি وَقَدْ قَصَّ مِنْ ذَالِكَ ..الخ দ্বারা উক্ত সংশয় নিরসন করে বলেন– ফিরিশতা রাসূল সাধারণ মানুষ অপেক্ষা উত্তম হওয়ার কথা যখন ইজমা দ্বারা প্রমাণিত, তখন সাধারণ মানুষ ফিরিশ্‌তা রাসূল অপেক্ষা উত্তম হওয়াকে খাছ করে নেওয়া হবে। কিন্তু তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়, এমতাবস্থায় আয়াতটি আম মাখসুস মিনহুল বা'আয এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যা যন্-এর ফায়দা দেয়। অথচ আকীদা সংক্রান্ত মাসআলায় ظن যথেষ্ট নয় বরং

ইয়াকীন প্রয়োজন। ব্যাখ্যাতা পশ্নের জবাবে বলেন– আকীদা সংক্রান্ত মাসআলা দু'ধরণের। যথা–

(১) যাতে ইয়াকীন উদ্দেশ্য। সুতরাং তার প্রমাণে অকাট্য দলীর প্রয়োজন।

(২) সেসব মাসআলা, যাতে নিছক ظـــن উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন, এটিই বক্ষমান ব্যাখ্যা সাপেক্ষ মাসআলা। এ ধরনের মাসআলায় যন্নি দলীলই যথেষ্ট মনে করা হয়।

وَذَهَبَتِ الْمُعْتَزِلَةُ وَالْفَلَاسِفَةُ وَبَعْضُ الْاَشَاعِرَةِ اِلٰى تَفْضِيْلِ الْمَلَائِكَةِ وَتَمَسَّكُوْا بِوُجُوْهٍ اَلْاَوَّلُ اِنَّ الْمَلَائِكَةَ اَرْوَاحٌ مُجَرَّدَةٌ، كَامِلَةٌ بِالْعَقْلِ، مُبَرَّءَةٌ عَنْ مَبَادِىْ شُرُوْرٍ الْاٰفَاتِ كاشهوة وايغضب وَعَنْ ظُلُمَاتِ الْهَيُوْلٰى وَالصُّوْرَة قَوِيَّة عَلَى الْاَفْعَالِ الْعَجِيْبَةِ عَالِمَة بِالْكَوَائِنِ مَا ضِيْهَا وَاٰتِيْهَا مِنْ غَيْرِ غَلَطٍ، وَالْجَوَابُ اَنَّ مَبْنٰى ذَالِكَ عَلَى الْاُصُوْلِ الْفَلْسَفِيَّةِ دُوْنَ الْاِسْلَامِيَّةِ اَلثَّانِىْ اِنَّ الْاَنْبِيَاءَ مَعَ كَوْنِهِمْ اَفْضَلُ الْبَشَرِ يَتَعَلَّمُوْنَ وَيَسْتَفِيْدُوْنَ مِنْهُمْ بِدَلِيْلِ قَوْلِهٖ تَعَالٰى علمه شَدِيْدُ الْقُوٰى، وَقَوْلِهٖ تَعَالٰى نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ وَلَاشَكَّ اَنَّ الْمُعَلِّمَ اَفْضَلُ مِنَ الْمُتَعَلِّمِ ، وَالْجَوَابُ اَنَّ التَّعْلِيْمَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْمَلَائِكَةُ اِنَّمَاهُمُ الْمُبَلِّغُوْنَ اَلثَّالِثُ اَنَّهٗ قَدْ اَطَّرَدَ فِى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ تَقْدِيْمُ ذِكْرِهِمْ عَلٰى ذِكْرِ الْاَنْبِيَاءِ، وَمَا ذَالِكَ اِلَّا لِتَقَدُّمِهِمْ فِى الشَّرَفِ وَالرُّتْبَةِ، وَالْجَوابُ اَنَّ ذَالِكَ لِتَقَدُّمِهِمْ فِى الْوُجُوْدِ ، اَوْلِاَنَّ وُجُوْدَهُمْ اَخْفٰى فَالْاِيْمَانُ بِهِمْ اَقْوٰى وَبِالتَّقْدِيْمِ اَوْلٰى، اَلرَّابِعُ قَوْلُهٗ تَعَالٰى لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَكُوْنَ عَبْدَ اللّٰهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ فَاِنَّ اَهْلَ اللِّسَانِ يَفْهَمُوْنَ مِنْ ذَالِكَ اَفْضَلِيَّةَ الْمَلَائِكَةِ مِنْ عِيْسٰى، اِذِ الْقِيَاسُ فِىْ مِثْلِهِ التَّرَقِّىْ مِنَ الْاَدْنٰى اِلَى الْاَعْلٰى، يُقَالُ لَايَسْتَنْكِفُ مِنْ هٰذَا الْاَمْرِ الْوَزِيْرُ وَلَا السُّلْطَانُ، وَلَايُقَالُ السُّلْطَانُ وَلَا الْوَزِيْرُ، ثُمَّ لَاقَائِلَ بِالْفَضْلِ بَيْنَ عِيْسٰى وَغَيْرِهٖ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْجَوَابُ اَنَّ النَّصَارٰى اِسْتَعْظَمُوا الْمَسِيْحَ بِحَيْثُ يَتَرَفَّعُ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ تَعَالٰى بَلْ يَنْبَغِىْ اَنْ يَكُوْنَ اِبْنًا لَهٗ لِاَنَّهٗ مُجَرَّد، لَااَبَ لَهٗ، وَكَانَ يُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَيُحْيِى الْمَوْتٰى بِخِلَافِ سَائِرِعِبَادِ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ بِاَنَّهٗ لَايَسْتَنْكِفُ مِنْ ذَالِكَ الْمَسِيْحُ وَلَا مَنْ هُوَاَعْلٰى مِنْهُ فِىْ هٰذَا الْمَعْنٰى وَهُمُ الْمَلَائِكَةُ الَّذِيْنَ لَا اَبَ لَهُمْ وَلَا اُمَّ لَهُمْ، وَيَقْدِرُوْنَ بِاِذْنِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى اَفْعَالٍ اَقْوٰى وَاَعْجَبَ مِنْ اِبْرَاءِ الْاَكْمَهِ وَالْاَبْرَصِ وَاِحْيَاءِ الْمَوْتٰى فَالتَّرَقِّىْ وَالْعُلُوُّ اِنَّمَا هُوَ فِىْ اَمْرِ التَّجَرُّدِ وَاِظْهَارِ الْاٰثَارِ الْقَوِيَّةِ ، لَافِىْ مُطْلَقِ الْكَمَالِ وَالشَّرَفِ، فَلَادَلَالَةَ عَلٰى اَفْضَلِيَّةِ الْمَلَائِكَةِ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهٗ تَعَالٰى اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَاِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَاٰبُ.

সহজ তরজমা, তাহকীক ও তাশরীহ

মুতাযিলী, দার্শনিক এবং কোন কোন আশ'আরীর মাযহাব মতে ফিরিশতারা উত্তম। তারা একাধিক পদ্ধতিতে প্রমাণ পেশ করেছে।(যেমন,)

(১) ফিরিশতারা স্বতন্ত্র রূহ। আকল-জ্ঞানে পাকা। অপকর্ম ও বিপর্যয়ের কারণ যেমন, যৌন-কামনা ও ক্রোধ থেকে এবং আকার আকৃতি ও হাইউলার কুটিলতা থেকে পবিত্র। বিস্ময়কর কাজে সক্ষম। অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনা নিখুঁতভাবে জানেন। **জবাব হল,** এ বক্তব্যের ভিত্তি দার্শনিকদের মূলনীতির ওপর; ইসলামী মূলনীতির উপর নয়।

(২) দ্বিতীয় প্রমাণ হল, আম্বিয়ায়ে কিরাম শ্রেষ্ঠ মানব হওয়া সত্ত্বেও ফিরিশতাদের থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। তাদের দ্বারা উপকার হাসিল করেন। প্রমাণ আল্লাহর বাণী- وَعَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেছেন, نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْأَمِيْنُ নিঃসন্দেহে শিক্ষায়েত্রী অপেক্ষা শিক্ষক শ্রেষ্ঠ। এর জাবাব হল, শিক্ষা দেওয়া হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে, ফিরিশতা কেবল সম্প্রচারক।

(৩) তৃতীয় প্রমাণ হল, কুরআন-হাদীস ব্যাপকভাবে আম্বিয়ায়ে কিরামের আলোচনার পূর্বে ফিরিশতাদের কথা বর্ণিত হয়েছে। এর একমাত্র কারণ, ফিরিশতারা মান-মর্যাদায় নবীদের চেয়ে অগ্রগণ্য।

জবাব হল, এর কারণ তারা আগে অস্তিত্বে এসেছে কিংবা তাদের অস্তিত্ব সুপ্ত। অতএব তাদের উপর ঈমান আনা আরও কঠিন বা শক্তিশালী এবং তাদেরকে অগ্রধিকার দেওয়া বা আগে আনা উত্তম।

(৪) চতুর্থ প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَلَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ ..الخ অর্থাৎ ঈসা মসীহ ও নিকটতর ফিরিশতারা কখনও আল্লাহর বান্দা হওয়াকে অস্বীকার করবেন না। কেননা আরবী ভাষাজ্ঞানীরা এর দ্বারা ঈসা মসীহ (আ.) এর উপর ফিরিশতাদেরকে উত্তম মনে করেন। কারণ, এসব স্থানে যুক্তির দাবী হল, অধ্বস্তন থেকে উর্ধ্বতন বা নিচ থেকে উপরে উন্নীত হওয়া। বলা হয়, এ কাজ করতে উযীর অস্বীকার করবেন না, সুলতানও (সম্রাটও) করবেন না। বলা হয় না- সম্রাটও নয়; উযীরও নয়। অতঃপর হযতে ঈসা (আ.) ও অন্যান্য নবীগণের পার্থক্যের কোনও প্রবক্তা নেই। কাজেই ফিরিশতাদের শ্রেষ্ঠত্ব নবীগণের উপর প্রমাণিত হয়ে গেল।

জবাব হল, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা মসীহ (আ.) কে এত মহান মনে করে যে, তাদের কথা মতে তিনি আল্লাহ তা'আলার বান্দা হওয়ার উর্ধ্বে বরং তার আল্লাহর পুত্র হওয়াই যথোচিৎ। কেননা তিনি পিতৃহীন ছিলেন। তাঁর কোন পিতা ছিল না। তিনি জন্মান্ধ এবং শ্বেত রোগীকে সুস্থ করে দিতে পারতেন। মৃতদেরকে জীবিত করতে পারতেন। পক্ষান্তরে অন্য কোন আদম সন্তান এসব করতে পারতেন না।

সুতরাং ব্যাখ্যাতা তাদের মত প্রত্যাখ্যান করে বলেন- একথা মাসীহ অস্বীকার করবেন না এবং তিনিও অস্বীকার করবেন না, যিনি এসব গুণে তাঁর চেয়েও অগ্রগামী। তিনি হলেন ফিরিশতা। যার না পিতা আছে, না আছে মাতা। আল্লাহর অনুমতিতে তার চেয়েও শক্তিশালী জন্মান্ধ ও শ্বেত রোগী সুস্থ করা এবং মৃতদেরকে জীবিত করার ব্যাপারে অধিক বিস্ময়কর কাজের শক্তি রাখেন। অতএব পার্থক্য শুধু তাজার্‌রুদ তথা পিতৃহীন জন্মগ্রহণ এবং শক্তিশালী কাজকর্ম প্রকাশ করার ক্ষেত্রে; ব্যাপক যোগ্যতা, পূর্ণাঙ্গতা ও মর্যাদার ক্ষেত্রে নয়। কাজেই ফিরিশতাদের শ্রেষ্ঠত্বের উপর কোন প্রমাণ নেই।

قَوْلُهُ: وَالْجَوَابُ اَنَّ ذَالِكَ ..الخ ঃ মোটকথা, ফিরিশতাদেরকে প্রথমে উল্লেখ করার কারণ তাদের মর্যাদা ও ফযীলত নয়। যেমনটা তোমাদের দাবী বরং তাদের আলোচনা আগে আনার কারণ হল, অস্তিত্ব লাভের ক্ষেত্রে তারা অগ্রণী অর্থাৎ তারা মানুষের পূর্বে অস্তিত্বে এসেছেন। অথবা এজন্য যে, নবী-রাসূলগণের উপর ঈমান আনয়ণ করা ফিরিশতাদের উপর ঈমান আনা ও বিশ্বাস স্থাপন করার উপর নির্ভরশীল। কেননা তারাই আম্বিয়ায়ে কিরামের কাছে অহী নিয়ে আসেন এবং আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ পৌঁছে দেন।

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَاِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَاٰبُ

স্বদেশী ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তি

সুরেশ্বরী

(সুরেশ্বরী পীরের মতিভ্রম ও চিন্তাধারা)

নাম পরিচিতিঃ সুরেশ্বর হচ্ছে "সুর+ঈশ্বর" এর সন্ধিরূপ। তার ভক্তবৃন্দের মতে তিনি সুরকে খুব ভালবাসতেন। সুরের মুর্ছনায় পরমাত্মার মাঝে লীন হয়ে যেতেন। ফলে তার ভক্তবৃন্দরা তাকে সুরের ঈশ্বর বা সুরেশ্বর নামে অভিহিত করেন। প্রকৃত নাম শাহ্ সূফী সৈয়দ আহমদ আলী। ডাকনাম হযরত সূফী সৈয়দ জান শরীফ। তবে তিনি সুরেশ্বরী পীর নামেই সমধিক পরিচিত। শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া থানাধীন সুরেশ্বর গ্রামে তার জন্ম। পিতার নাম শরীফ শাহ্ মেহেরুল্লাহ। জন্ম তারিখ ২রা অগ্রাহায়ণ ১২৬৩ বাং, মোতাবেক ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ।

আহমদ আলী থেকে সুরেশ্বরী পীর

তিনি কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন। ১০ বছর বয়সে বাই'আত হন শাহসূফী সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াহসীর হাতে। খেলাফত পান ১৭ বছর বয়সে। তাকে খেলাফত প্রদানকালে ওয়াহসী বলেন, হে বাবা জান শরীফ! আমি দেখছি, আরশে মুআল্লায় আপনার নাম শাহ আহমদ আলী লেখা হয়েছে। আজ থেকে আপনাকে এ লকব প্রদান করা হল। আপনাকে কুতুবুল এরশাদের নেসবত দেওয়া হল। আপনার লেখায় যে আহমদী ভাব ও নূরী ধর্মের বিকাশ ঘটবে তা আপনার আওলাদগণের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে থাকবে। আপনি শেষ যামানায় হযরত ইমাম মেহেদী আ. এর আবির্ভাবের সম্পূর্ণ অধিকারী ও সবিকাশী হবেন। (ছফীনায়ে ছফর-৪র্থ, সংস্করণ-১৯৯৯) বর্তমানে ৩৮৫/সি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা-১২১৭ তে "খানকায়ে সুরেশ্বরী" নামে তার ভক্তবৃন্দের এক জমজমাট আস্তানা গড়ে ওঠেছে। সেখান থেকে সুরেশ্বর নামে একটি মাসিক পত্রিকাও বের হয়ে থাকে।

সুরেশ্বরীর ভ্রান্ত আকীদা ও তার জবাব

ভ্রান্ত আকীদা-১ঃ তথাকথিত এ পীর ও তার ভক্তবৃন্দের মতে গান-বাদ্য, সামা, তালি বাজানো, নাচ সবই জায়েয। প্রমাণ স্বরূপ এরা একাধিক হাদীস উপস্থাপন করে থাকে। যেমন,

(ক) হযরত রুবাইয়া বিনতে মু'আওয়িয রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বামীর ঘরে প্রবেশকালে রাসূলে কারীম ﷺ এলেন এবং আমার বিছানায় তিনি এমনভাবে বসলেন, যেমন তোমরা আমার সামনে বসেছ। তখন আমাদের বংশের ছোট ছোট মেয়েরা দফ বাজাচ্ছিল। আর আবৃত্তি করছিল বদর যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী পূর্ব পুরুষদের বীরত্বগাঁথা। হাঠাৎ তাদের একজন বলে উঠল, আমাদের মাঝে এমন একজন নবী রয়েছেন, যিনি ভবিষ্যতের খবর জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন– এমন কথা বলো না বরং পূর্বে যে কথা বলছিলে, তা-ই বলতে থাক। –বুখারী- ২/৭৭৩ ও তিরমিযী।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লাহ আলী কারী রহ. বলেন– এখানে দফ দ্বারা উদ্দেশ্য, মুতাকাদ্দেমীনের (প্রবীন উলামায়ে কিরামের) দফ, যাতে ঝাঁঝ ছিল না। আর যে দফে ঝাঁঝ রয়েছে, তা সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহ।

হযরত আয়েশা রাযি. এর হাদীসে تَغْنِيَانِ দ্বারাও বাদ্যযন্ত্র বিহীন বা দফ (ঝাঁঝ বিহীন) বাজিয়ে রূপকার্থে গান গাওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে। নতুবা বস্তুতঃ তা ছিল কবিতা আবৃত্তি। কেননা স্বয়ং হযরত আয়েশা রাযি.-ই মেয়ে দুটির ব্যাপারে وَلَيْسَتَا مُغَنِّيَتَيْنِ তথা তারা গায়িকা ছিল না বলেছেন। তাছাড়া বুখারী শরীফে (৩/৭৭৫) হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে لَهْو দ্বারা বাতিলপন্থীরা ব্যাপকভাবে সব ধরনের গান-বাদ্য উদ্দেশ্য নিলেও বস্তুতঃ সেখানে বাদ্যযন্ত্র বিহীন আনন্দ ও বিনোদনমূলক কবিতা আবৃত্তি উদ্দেশ্য। আমরা আত্মপক্ষ সমর্থনে ইবনে মাজাহ শরীফে ১৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হাদীসখানা পেশ করতে পারি। তাতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, "তোমরা কি কনের সাথে ছোট ছোট মেয়ে প্রেরণ করেছ? কারণ, আনসাররা গজলপ্রিয় মানুষ। কাজেই এরা গিয়ে (গজল পাঠ করত) বলত أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ - فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ

"এসেছি, আমরা এসেছি; তিনি আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে দীর্ঘজীবি করুন।"

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফতহুল বারীতে অনুরূপ ব্যাখ্যাই প্রদান

করেছেন। সুতরাং উপরিউক্ত হাদীসের আলোকে কেবল জায়েয কবিতা আবৃত্তি কিংবা সর্বোচ্চ দফ বাজিয়ে কবিতা আবৃত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। এগুলো দিয়ে গান-বাদ্যের বৈধতার পক্ষে প্রমাণ পেশ করার আদৌ অবকাশ নেই। বস্তুতঃ এসব প্রমামাণাদির ক্ষেত্রে বাতিলপন্থীরা ডাহা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে এবং মনগড়া অলীক ব্যাখ্যা দিয়েছে। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

এসব হারাম হওয়ার প্রমাণঃ

গান-বাদ্য হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর একাধিক প্রমাণ রয়েছে।

১. কুরআনে কারীমের সূরায়ে লুকমানের ৬ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

এ আয়াতে কারীমায় لَهْوَ الْحَدِيْثِ দ্বারা গানবাদ্য উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে ইবনে আবী শাইবা, ইবনে আবিদ্দুনিয়া, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির এবং হাকিম ও বাইহাকী রহ. বিশুদ্ধ সনদে আবুস সাহাবা এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেন,

قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْد رض مِنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ قَالَ وَاللّٰهِ اَلْغِنَاءُ.

তদ্রূপ হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এ আয়াতে لهو الحديث এর ব্যাখ্যা করেছেন, এ জাতীয় ক্রীড়া -কৌতুক। (রূহুল মা'আনী- ১১/৬৭)

অন্যান্য মুফাসসিরগণও এ আয়াতের তদনুরূপ ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন।

২. সূরায়ে বানী ইসরাইলের ৬৪ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে,

واستفزز من استطعت منهم بصوتك

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা মুজাহিদ রহ. লিখেন, শয়তানের আওয়াজ দ্বারা গান-বাদ্য ও ক্রীড়া-কৌতুক উদ্দেশ্য। সুতরাং তা কখনও বৈধ হতে পারে না।

৩. সুরায়ে নাজম -এর ৫৯-৬১ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولاتبكون وانتم سامدون.

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবু উবাইদী বলেন- হিমইয়ারীদের ভাষায় السمود অর্থ গান-বাদ্য। কথায় আছে, ياجارية اسمدى لنا -হে খুকী, আমাদেরকে গান শোনাও! অনুরূপভাবে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এ ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন। তাছাড়া সুফী সম্রাট শাইখ সোহরাওয়ার্দী রহ. ও স্বরচিত عوارف المعارف গ্রন্থে উক্ত আয়াতে কারীমা দ্বারা গান-বাদ্যের নিষিদ্ধতা ও হারাম হওয়ার উপর প্রমাণ পেশ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে হাদীস ভাণ্ডারেও রয়েছে প্রচুর হাদীস। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

(ক) সহীহ বুখারী ২/৮৩৮ তে আবু মালেক-আবু আমের আশ'আরী রাযি. মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেন,

ليكون من أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير الخمر والمعازف

(খ) রুহুল মা'আনী ১২/৬৭ তে হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে সুনানের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত আছে,

قال رسول الله ﷺ الغناء ينبت النفاق فى القلب كماينبت الماء البقل

(গ) পূর্ব সূত্রেই হযরত আবু উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত,

ان رسول الله ﷺ قال رفع أحد صوتك بغناء الا بعث الله تعالى اليه شيطانين يجلسان على منكبيه يضربان باعقابها على صدره حتى يمسك

তাছাড়া হযরত ইমরা ইবনে হুসাইন রাযি., ইবনে আব্বাস রাযি., আলী রাযি. মুজাহিদ রাযি. সহ অনেক প্রখ্যাত সাহাবায়ে কিরাম থেকেও এ প্রসঙ্গে প্রচুর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (বিস্তারিত বড় বড় কিতাবে দ্রষ্টব্য)

সুতরাং পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল, গানবাদ্য হারাম। এতে বিভ্রান্তিকর অপব্যাখ্যা প্রদানের কোনও ফাঁক-ফোকড় নেই।

ভ্রান্ত আকীদা-২ ঃ সিজদায়ে তাহিয়্যা বা সম্মান প্রদর্শনের জন্য সিজদা করা জায়েয। অথচ একমাত্র আল্লাহ

ছাড়া অপর কাউকে যে কোন প্রকার সিজদা করা হারাম। এখানে ইবাদত বা সম্মান প্রদর্শন কোন রকম পার্থক্য নেই।

ভ্রান্ত আকীদা-৩ ঃ তাদের মতে মাজারে গিলাফ চড়ানো, ফুল, আগরবাতি, মোমবাতি, গোলাপজল ইত্যাদি দেওয়া জায়েয। অথচ এসবের নিষিদ্ধতার ব্যাপারে আদৌ কোন সেন্দহ নেই বরং নিঃসন্দেহে হারাম।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ তালীমুদ্দীন, আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল, রাহে সুন্নাত, আহসানুল ফাতওয়া-১ প্রভৃতি।)

ভ্রান্ত আকীদা-৪ ঃ কবরের মাটি নরম, ভেজা স্যাতসেতে বা কবরে পানি থাকলে তাতে বিছানা কিংবা খাট দেওয়া কর্তব্য। নেক্কারদের কবরে খাট দেওয়াও দোষণীয় কিছু নয়। (ছফীনায়ে ছফর-৮৫)

অথচ কুরআন-সুন্নাহ এবং প্রবীণ আলিমদের থেকে এর যথার্থতার পক্ষে আদৌ কোন প্রমাণ নেই।

ভ্রান্ত আকীদা-৫ঃ তাদের সবচেয়ে গুরুতর ভ্রান্তি হল,"পীরের হাতে বয়াত (বাই'আত) না হলে কোন ইবাদত-বন্দেগী কবুল হয় না। আবার কামেল পীরের জন্য ইবাদত-বন্দেগীর প্রয়োজন নেই।" (নাউযুবিল্লাহ) তাদের এ দুটি দাবীই চরম মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতা। কারণ, প্রথমতঃ কোন কিছু ফরয হওয়ার জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা (সরীহ নছ) থাকা আবশ্যক। কিন্তু এখানে তা নেই। অথচ এসব গোমরাহ অনায়েসেই বলে দিল, পীরের বাই'আত ছাড়া ইবাদত কবুল হয় না। তজ্জন্যে পীর ধরা আবশ্যক তথা ফরয।

দ্বিতীয়তঃ কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ (আমরণ তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর। সূরা হিজর-১৯) এ আয়াতে কারীমায় ইয়াকীন অর্থ মৃত্যু। কেননা নবীগণ ও সাহাবায়ে কিরাম অপেক্ষা অধিক ইয়াকীন আদৌ কারও ছিল না; থাকতেও পারে না। তদুপরি মৃত্যু পর্যন্ত তাদের উপর শরী'আতের বিধি-নিষেধ এবং ইবাদত-বন্দেগী করার দায়িত্ব ছিল। তাছাড়া সূরায়ে মারইয়ামে-৩০ হযরত ঈসা আ. সম্পর্কেও এমনিই কথা ইরশাদ হয়েছে।

ফলকথা, যেখানে নবীগণ ও সাহাবাগণের মত ইয়াকীন-বিশ্বাস অর্জন করা কোন উম্মতের পক্ষে সম্ভব নয়, তবুও তারা আমরণ শরী'আতের পরিপূর্ণ পাবন্দ ছিলেন, সেখানে সাধারণ এক উম্মতের পক্ষে শরী'আতের বিধান মুক্ত থাকা এবং ইবাদতের প্রয়োজন নেই বলা কতটা গোমরাহী হতে পারে? বাতিলপন্থী প্রতিপক্ষের মতানুসারে তো বলতে হয়, নবীগণ ও সাহাবাগণ কামেল হতে পারেননি। তারা বুযুর্গির উচ্চস্তরে পৌছতে পারেনি। নতুবা ইবাদত-বন্দেগী করেছেন কেন ? অন্তত রাসূলে কারীম ﷺ কেও যদি কামেল মেনে নেন, তবুও প্রশ্ন থাকে, তিনি কেন ইবাদতের জন্য পা মোবারক ফোলাতে গেলেন?

এ প্রসঙ্গে হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহ. কে জিজ্ঞাস করা হয়েছিল– হুজুর! কেউ কেউ বলে, আমরা তো পৌছে গেছি। এখন আর আমাদের শরী'আতের অনুসরণের দরকার নেই। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন, وصلوا ولكن الى سقر - হ্যাঁ, তারা পৌছে গেছে; তবে জাহান্নামে। বস্তুতঃ এ দাবী মদ্যপান, চুরি, যেনা-ব্যভিচার অপেক্ষাও ঘৃণিত। কেননা এসব কবীরা গুনাহ বটে; কিন্তু কুফরী নয়। অথচ উক্ত মতবাদ কুফরী মতবাদ। অবশ্য বাতিলপন্থীরা উক্ত আয়াতে কারীমার অপব্যাখ্যা করে বলে, এখানে ইয়াকীন অর্থ, পরিচিতি ও বিশ্বাস। অর্থাৎ তোমরা মারেফত লাভ বা পরিচিতি অর্জন করা পর্যন্ত ইবাদত কর। এরপর আর ইবাদতের প্রয়োজন নেই।

তাদের এ অপব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিশ্বনন্দিত তাফসীরে ইবনে কাছীর-২/৫৬০ সূরা হজর-এ বলা হয়েছে, তাদের এ আকীদা কুফর, পথভ্রষ্টতা ও মূর্খতা। কেননা নিঃসন্দেহে নবীগণ এবং সাহাবাগণ আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। আল্লাহ পাকের হক, সিফাত ও তাযীমের যোগ্যপাত্র হওয়ার মারিফাত তাদেরই সবচেয়ে বেশী ছিল। তদুপরি আমরণ তারাই ছিলেন সর্বাধিক ইবাদতকারী; সব সময় নেক কাজ করেছেন। বস্তুতঃ এখানে ইয়াকীন অর্থ "মাউত" ছাড়া আর কিছুই নয়।

রুহুল মাআনী-৮/৮৭ পৃষ্ঠায়ও তদনুরূপ ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে। মূলতঃ এসব বাতিলপন্থীরা বুঝে নি যে, এ আয়াতে প্রথমতঃ রাসূলে কারীম ﷺ কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, আপনি মৃত্যু পর্যন্ত ইবাদত করতে থাকুন। ফলে তারা চরম মুর্খতা ও গোমরাহীর অতল গহবরে নিপতিত হয়েছে।

বস্তুতঃ উপরিউক্ত প্রমাণাদি ছাড়া বহুবিধ দলীল-প্রমাণের আলোকে শরী'আত বর্জনকারী যে কোন তরীকতপন্থীই দ্বীন হতে খারেজ।

ভ্রান্ত আকীদা -৬ঃ আহাদ-আহমদ-এর মীমে কেবল হামদ-নাতের পার্থক্য। তারা এর অর্থ যদি "আল্লাহ-রাসূল

এক ও অভিন্ন সত্তা" ধরে থাকে, তবে নিঃসন্দেহে এটা কুফুরী আকীদা। আর যদি মনে করে, আল্লাহ পাক তার রাসূলের মধ্যে আত্মপ্রকাশিত হন, তাহলেও কুফরী আকীদা গণ্য হবে। এখানে মূলতঃ তারা "সর্বেশ্বরবাদ" দর্শনের আশ্রয় নেয়। অথচ ইসলাম শেখায় একত্ববাদ; সর্বেশ্বরবাদ নয়। কেননা একত্ববাদে স্রষ্টা ও তার সৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্বশীল, স্রষ্টা স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্ববান। পক্ষান্তরে সর্বেশ্বরবাদে দুটোই এক অভিন্ন। সুতরাং এ সাংঘর্ষিক বিষয়াদি টেনে আনাকে তাদের অজ্ঞতা ও গোমরাহীই বলতে হয়।

ভ্রান্ত আকীদা-৭ঃ রাসূল ﷺ আলেমুল গায়েব। তাঁর অদৃশ্য জ্ঞান আছে। অথচ কেবলমাত্র নবীজীকে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত এবং হাশর-নাশর প্রভৃতি বিষয়ে এমন কিছু জ্ঞান-ইলম প্রদান করা হয়েছে, যেগুলো অপর কোন নবী-রাসূল বা ফিরিশতাকেও দেওয়া হয়নি। কিন্তু সে ইলম ও জ্ঞান আল্লাহ পাকের ইলমে মুহীত (সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞানী) এর সামনে কিছুই নয়। পক্ষান্তরে বিদ'আতীদের মতাদর্শ হচ্ছে, পৃথিবীর শুরু থেকে জান্নাত-জাহান্নামে প্রবেশ করা পর্যন্ত যাবতীয় ক্ষুদ্রাণুও নবীজির ইলমে আছে। এটি কত বড় ভ্রষ্টতা!

ভ্রান্ত আকীদা-৮ ঃ তাদের আরেকটি আকীদা হচ্ছে, মরণের পর রূহ বা আত্মা যে দিনগুলোতে দু'আর জন্য আসে, তাকে বলে- তিজা, চাহারম, সপ্তমী ইত্যাদি। অথচ এসবের আদৌ কোন ভিত্তি নেই। নিতান্তই অলিক ও কল্পকথা। আবার কারও কারও মতে মৃতকে ছাওয়াব না বখশে দিলে তার রূহ তাকে অভিশাপ দেয়- একথাও ভিত্তিহীন। মোটকথা, সুরেশ্বরী পীরের একাধিক কুফরী আকীদা আজও তার ভক্তবৃন্দরা আকড়ে আছে।

এনায়েতপুরী

"এনায়েতপুরী" নামে খ্যাত পীর ছিলেন সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুরের সন্তান মাওলানা শাহ্ সূফী মুহাম্মাদ ইউনুস আলী। তিনি ১১/১২/ ১৩০০ হিজরী মোতাবেক ২১শে কার্তিক ১২৯৩ সালে মাওলানা শাহ্ সূফী আব্দুল কারীমের ঔরশে সাবেক পাবনার চৌহালী থানাধীন এনায়েতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুবরণ করেন ৫/৬/১৩৭১ হিজরী মোতাবেক ১৮/১১/১৩৫৮ বাং সনে। তিনি কলকাতার সৈয়দ ওয়াজেদ আলীর মুরীদ ও খলীফা। এনায়েতপুরীর ভক্তবৃন্দের মতে তাদের পীর ১৩০০ সালের মুজাদ্দিদ। নিম্নে তার ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসগুলো সংক্ষেপে পেশ করা হল।

(১) তার মতে বংশের সকলেই জন্মগত অলী। মৃত্যুর ক'দিন পূর্বে তিনি বলেছিলেন, আমার বংশের তেফেল-শিশু বাচ্চাকে পেলেও তোমরা তাকে জন্মগত অলী মনে করবে।

(২) তাদের মতে আহাদ ও আহমদে কেবল একটি মীমের পার্থক্য। অথচ এ আকীদা ঈমান পরিপন্থী। কেননা হকপন্থীদের মতে আল্লাহ-রাসূল ভিন্ন ভিন্ন দুই সত্তা; এক সত্তা নন। আল্লাহ হলেন স্রষ্টা আর রাসূল মাখলূক।

(৩) "একশত ত্রিশ ফরয" শিরোনামে মনগড়াভাবে লিখা হয়েছে, মুহাম্মাদ ﷺ চার কুরছী জানা তথা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মানাফ জানা থাকা ফরয। তদ্রূপ ৪ মাযহাব মানাও ফরয। অথচ কুরআনে কারীমের সুস্পষ্ট বর্ণনা ছাড়া কোন কিছু ফরয সাব্যস্ত করা যায় না। এটা তাদের শরী'আত সম্পর্কে চরম অজ্ঞতার প্রমাণ এবং শরী'আত বিকৃতির শামিল।

(৪) পীর ধরা বা পীরের অছীলা ধরা ফরয। প্রমাণ হিসেবে তারা সূরা মায়িদার ৩৫ নং আয়াত এবং সূরা কাহাফের ১৭ নং আয়াত পেশ করে।

অথচ তা কোন ভাবেই ফরয নয়; বড়জোর বাই'আতকে সুন্নত বলা যেতে পারে। কেননা সাহাবায়ে কিরামের মধ্য হতে কেউ কেউ নবীজীর হাতে চুরি, যেনা-ব্যাভিচার প্রভৃতি না করার বাই'আত গ্রহণ করেছেন বলে হাদীসে বর্ণিত আছে। অতএব তাদের এ দাবী শরী'আতের মধ্যে বাড়াবাড়ি বৈ কিছুই নয়।

(৫) তার ভক্তবৃন্দের মতে পীরের তাওয়াজ্জুহ মুরীদের মধ্যে পরিবর্তন এনে দিতে পারে। তারা বলে, এনায়েতপুরী সাহেবের মধ্যে এ ক্ষমতা ছিল। তারা লিখেছে, এ শক্তিই সবচেয়ে বড় শক্তি। সব পীরই তা পারে না। আল্লাহ প্রদত্ত তাওয়াজ্জুহ পীর সাহেব কাউকে দিলে আগুনের মত মুহূর্তেই দিলের ময়লা জ্বালিয়ে পাক-ছাফ করে দেয়। তখন লতীফা আল্লাহর নামে দুলিতে থাকে। বাস্তাবিকই এনায়েতপুরীর মধ্যে এমন ক্ষমতা থাকলে তিনি দুনিয়ার সকলের দেল পাক-ছাফ করলেন না কেন? এরূপ ক্ষমতা নবীজীর মেধ্য কি ছিল না? তাহলে কেন তিনি সকলকে হেদায়াত দিতে পারলেন না? কেন (সূরায়ে কাসাস-৫৬-এ) আল্লাহ বললেন, আপনি চাইলেই কাউকে হেদায়েত দিতে পারেন না বরং আল্লাহ পাক যাকে চান হেদায়েত করেন।

(৬) সন্তান লাভ, ব্যবসায় আয়-উন্নতি, আশা পূরণ এবং ভাল-মন্দ ইত্যাদির ক্ষমতা পীর সাহেবের আছে। পীর সাহেব চাইলে এসব করতে পারেন।

অথচ এ আকীদা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিপন্থী। কুরআনে কারীমে সূরায়ে নিসা-৪৮ তে ইরশাদ হচ্ছে, "আপনি বলে দিন, সব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। এ জাতির কি হল যে, এরা বুঝতেই পারে না।" হাদীসে এসেছে, ভালমন্দ সবই তোমার (আল্লাহর) হাতে।

(৭) এনায়েতপুরীকে তার ভক্তবৃন্দরা প্রায় নবীর পর্যায়ে মনে করে। তাদের মতে এনায়েতপুরীকে যে পেয়েছে, সে জান্নাতী। (নাউযুবিল্লাহ)

(৮) তাদে মতে সামা (গান-বাদ্য) জায়েয।

(৯) তারা ওরস-এর পক্ষপাতি বরং এ নিয়ে বাড়াবাড়িও করে। পরিত্যাগ করলে নাকি পরবর্তী এক বছর চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। আয়-উন্নতির সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়।

(১০) এনায়েতপুরীর ভাষ্য মতে এ তরীকায় মৌখিক বা উচ্চ স্বরে যিকির নাই।

এ সব দাবী ও মতাদর্শ নিশ্চিত কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী ও পরিত্যাজ্য।

আটরশী পীর ও তার আকীদা

"আটরশির পীর" বলতে ফরিদপুর শহরের নিকটস্থ বিশ্বজাকের মঞ্জিলের প্রতিষ্ঠাতা শাহ্ সূফী হাশমত উল্লাহকে বুঝানো হয়। তিনি এনায়েতপুরী পীরের খলীফা। জামালপুর জেলার শেরপুর থানাধীন পাকুরিয়া গ্রামে শাহ আলীম উদ্দীনের ঔরশে তার জন্ম। পাঁচ-ছয় বছর বয়সে নোয়াখালীর মাওলানা শারাফত আলীর কাছে আরবী ফার্সীর প্রাথমিক কিতাবাদি পড়েন। এতটুকুই ছিল তার নিয়মিত লেখাপড়া। দশ বছর বয়স থেকে তিনি ত্রিশ বছর পর্যন্ত এনায়েতপুরী পীরের খেদমতে থাকেন। এরপর কথিত পীরের নির্দেশেই ফরীদপুরে এসে "জাকের ক্যাম্প" নামে আস্তানা গড়ে তুলেন। কালক্রমে সেটি "জাকের মঞ্জিল" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাসাওউফের উপর তার লেখা বেশ কিছু দুর্বোধ্য বই-পুস্তক রয়েছে। যেগুলো নিছক কল্পনানির্ভর অলিক কিছু বিষয়ের গ্রন্থনা মাত্র। কুরআন-হাদীসের সাথে সে সবের আদৌ কোন সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। তাছাড়া আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি বহু জাল হাদীসও সুচারুরূপে চয়ন করেছেন। আবার নানা ধরনের অপব্যাখ্যার সমাহারও ঘটিয়েছেন। যেমন, "তোমরা মরার আগে মর"। এ প্রসঙ্গে ইবনে হাজার বলেন, হাদীসটি বিশুদ্ধ প্রমাণিত নয়। মোল্লা আলী ক্বারী রহ. বলেন, এটি সূফীদের কথা।

আটরশী পীরের বিভ্রান্তিঃ

(১) **ভল-মন্দ পীরের হাতে।** তিনি বলেন, এনায়েতপূরী রহ. সাহেব তিরোধানের পূর্বে আমাক বলে গেছেন, বাবা তোর ভালমন্দ উভয়ই আমার হাতে রইল। তোর কোন চিন্তা নেই।

অথচ এটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা পরিপন্থী। ইতোপূর্বেও এনায়েতপুরীর আলোচনায় এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। বস্তুতঃ এ শ্রেণীর লোকেরা পীরকে খোদায়ী আসনে অধিষ্ঠিত করে। এরাও "সর্বেশ্বরবাদে" বিশ্বাসী বাতিল সম্প্রদায়।

(২) **পীর মুক্তির ব্যব্যস্থা করে দিবে।** তিনি বলেন- দুনিয়ায় থাকতে তোমরা যে যতটুকুই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথে অগ্রসর হও না কেন, তোমাদের ছায়ের ছুলূক জীবৎকালে সম্পন্ন নাই হোক, তবুও ভয় নেই। মৃত্যুর পর দুই পুণ্যাত্মা (রাসূল ও আপন পীর) তোমাকে প্রশিক্ষণ দিবেন, মারেফাতের তালীম দিবেন। ফলে সকলেই হাশরের মাঠে অলি-আল্লাহ হয়ে পুনরুত্থিত হবে। তাই বলা হয়, এ তরীকায় যিনি দাখিল হন, তিনি বঞ্চিত হন না। অথচ আদৌ কোন পীর-মাশায়েখ তার মুরীদের পাপের বোঝা নিয়ে তাকে মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারবেন না। এ কথা সুস্পষ্ট। কারণ, কুরআনে কারীমে সূরা আন'আম-১৬৫ ইরশাদ হচ্ছে, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

বস্তুতঃ এ আকীদা খ্রিস্টানদের প্রায়শ্চিত্তের আকীদা এর সাথে খুব সাদৃশ্যপূর্ণ এবং একটি কুফরী আকীদা। এ তাদের চরম মূর্খতা ও গোমরাহী। অবশ্য হক্কানী পীরের কথা মত চলতে পারলে কিছু না কিছু ফায়দা অবশ্যই হয়। তাছাড়া স্বয়ং নবী কারীম ﷺ তার বংশের লোকদের সম্বোধন করে বলেছেন, হে বনী হাশেম! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা কর। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে কিছুই

করতে পারব না। হে বনু আব্দিল মুত্তালিব! তোমরা-----। হে ফাতেমা তুমি ------। (মুসলিম)

(৩) পীর সাহেব তার মুরীদকে এমনকি মুরীদের আত্মীয়-স্বজনকেও দুনিয়ার যাবতীয় বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন। পীর যার দিকেই তাওয়াজ্জুহ দেন বা খেয়াল করেন, তাকেই তিনি কুওয়াতে এলাহিয়ার হেফাযতে রাখতে পারেন। এরূপ ক্ষমতা আল্লাহ পাক কামেল মুর্শিদকে দান করেন। অথচ এ ধ্যান-ধারণা সুস্পষ্ট কুরআন বিরোধী। কেননা কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَاِن يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ

"যদি আল্লাহ তোমার অমঙ্গল চান, তবে তিনি ছাড়া তা দূরীভূত করার কেউ নেই। (সূরা ইউনুস-১০৭)
তাছাড়া বাস্তবিকই যদি তাই হত, তাহলে আটরশীর মুরীদান পথেঘাটে নানা জায়গা কেন দুর্ঘটনার শিকার হন? কেন তারা আততায়ীর হাতে নিহত হন? কেন তাদের বাড়ি ঘরে চুরি-ডাকাতি হয়?

(৪) পরকালে নাজাত বা মুক্তি পাওয়ার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার আবশ্যকতা নেই। যে কোন ধর্মের লোকই নিজ নিজ ধর্ম মতে সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতে পারে। তবেই কেবল বিশ্ববুকে শান্তি আসতে পারে। অথচ আল্লাহ তা'আলা সূরায়ে আলে ইমরান-৮৫তে ঘোষণা করছেন– اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ
আহমদ ও বাইহাকী শরীফের উদ্ধৃতিতে মিশকাত শরীফে এসেছে, রাসূল কারীম ﷺ ইরশাদ করেন,

لَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا لَمَا وَسِعَهٗ اِلَّا اِتِّبَاعِىْ

(৫) চার মাযহাব ও ইমামদের সম্পর্কে নানা কটুক্তিও করে থাকে এ আটরশীরা। তাদের মতে ইমামগণের অনমনীয় নীতির কারণেই আজ ইসলামী আইন ব্যবস্থায় অবক্ষয় এসেছে। তারা এর মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করে ইসলামী আইনকে অনমনীয় ও বাস্তবতার সাথে সমাঞ্জস্যহীন শাস্ত্রে পরিণত করেছে। বস্তুতঃ তাদের ন্যায় ইমামগণ মনগড়া ব্যাখ্যাদাতা এবং সকল মাযহাবের ফিকহ শাস্ত্রকে অবাস্তব শাস্ত্র বলার মত ধৃষ্ঠতা খুব কম বাতিলপন্থীরাই দেখিয়েছে।

(৬) ওরস নিয়ে বাড়াবাড়ি। এ প্রসঙ্গে এনায়েতপুরীর উদ্ধৃতি দিয়ে আটরশীর পীরের বক্তব্য ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

মোটকথা, আটরশীর পীর ও তার ভক্তবৃন্দের মাঝে রয়েছে নানা ধরনের কুসংস্কার ও বাতিল আকীদা-বিশ্বাস।

চন্দ্রপুরী পীরের আকীদা

চন্দ্রপাড়া ফরিদপুর সদর থেকে অনতি দূরে একটি গ্রাম। সেখানের বাসিন্দা মৌঃ সাইয়িদ আবুল ফযল সুলতান আহমদ (মৃতঃ ১৯৮৪ খ্রিঃ) চন্দ্রপাড়া পীর নামে প্রসিদ্ধ। তিনি এনায়েতপুরী পীরের শাগরেদ এবং দেওয়ানবাগী পীরের মুর্শিদ ও শ্বশুর। তার ভ্রান্ত আকীদা নিম্নরূপ।

(১) কোন লোক যখন মাকামে ছুদূর, নাশোর, শামসী, নূরী, কুরবে মাকিনের স্তর পেরিয়ে নফসীর মোকামে গিয়ে পৌছে, তখন তার কোন ইবাদত থাকে না। জযবার অবস্থায় ও কেউ ফানাফিল্লার প্রান্তসীমায় পৌছালে তারও ইবাদত থাকেন। এমনকি তখন ইবাদত করলে কুফুরী হবে। তাসাওউফের বহু কিতাবে এ কথা বর্ণিত আছে। সুরেশ্বরী পীরের আকীদা প্রসঙ্গে এ নিয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য। অবশ্য সুরেশ্বরী পীরও এতটা ধৃষ্ঠতা দেখিয়ে বলেননি যে, কামেল লোকের ইবাদত করা কুফরী। চন্দ্রপাড়া পীরের ভাষ্য মতে নবীগণ এবং সাহাবায়ে কিরাম রাযি. সম্ভবতঃ (নাউযুবিল্লাহ) বুযুর্গির উচ্চাসনে বা কামেল দরজায় পৌছাননি। নতুবা তারা কুফরী করেছেন। একথা কত বড় অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতা ভাবা যায় কি?

(২) জিবরাঈল আ. এবং আল্লাহ তা'আলা এক ও অভিন্ন সত্তা।
অথচ ফিরিশতাগণ কেবল আল্লাহর মাখলূক ও দাস। কুরআনে কারীমে (সাফফাত-১৫০) ইরশাদ হচ্ছে,

اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شَاهِدُوْنَ

অন্যত্র (যুখরুফ-১৯) ইরশাদ হচ্ছে,

وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ـ

(৩) আল্লাহর ফিরিশতারা আল্লাহর নাফরমানি করে। অথচ কুরআনে পাকে (সূরা তাহরীম-৬) ইরশাদ হচ্ছে,

لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

(৪) পুনর্জন্ম বা জন্মান্তর্বাদে বিশ্বাসী। তারা আত্মপক্ষ সমর্থনে কুরআনে কারীমের সূরা বাকারা-২৮ নং আয়াত পেশ করে বলে, ثُمَّ نُحْيِيْكُمْ এর অর্থ "পৃথিবীতে পুনারায় জন্ম লাভ করা। অথচ হক পন্থীদের মতে ثم نُحْيِيْكُمْ এর অর্থ, হাশরে পুনরায় জীবিত অবস্থায় উত্থিত হওয়া। অধিকন্তু পুনর্জন্মবাদ বহু কারণে কুফরী। বস্তুতঃ চন্দ্রপুরীর পথভ্রষ্টতা ও কাফির হওয়ার বহুবিধ কারণ রয়েছে। কেননা শরঈ উযর-আপত্তি ও সমস্যা ছাড়া ইবাদত ফরয না হওয়ার আকীদা-বিশ্বাস নিঃসন্দেহে একটি কুফরী আকীদা। তাছাড়া কোন ফরয কাজকে কুফরী ঘোষণা দেওয়াও একটি কুফরী আকীদা। মোটকথা, তারা জরুরিয়াতে দ্বীন তথা দ্বীনের আবশ্যকীয় বিষয়গুলোকে অস্বীকার করে। মাওলানা ইদ্রীস কান্দলবী রহ. বলেন, এসব ক্ষেত্রে ভিন্নতর ব্যাখ্যা করাও কুফরীর নামান্তর।

দেওয়ানবাগী পীরের আকীদা

তিনি বি.বাড়িয়ার আশুগঞ্জ থানাধীন বাহাদুরপুর গ্রামের সৈয়দ আব্দুর রশীদ সরকারের পুত্র। নাম মাহবুব-এ-খোদা। জন্ম ২৭/৮/১৩৫৬ বাংলা মোতাবেক ১৪/১২/১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে। প্রাথমিক পড়াশুনা করেন তালশহর কারিমিয়া আলিয়া মাদরাসায়। ১৯৭১ সালে তিনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। স্বাধীনতার পর সেনাবাহিনীতে চাকুরীও করেন। চন্দ্রপাড়ার পীর ছিলেন তার শ্বশুর ও মুর্শিদ। স্বয়ং তিনি এবং ভক্তবৃন্দ তাকে সূফী সম্রাট পরিচয় দেন। তিনি ঢাকার অদূরে দেওয়ানবাগে একটি এবং ১৪৭ আরামবাগে "বাবে রহমত" নামে আরেকটি দরবার স্থাপন করেন। "সূফী ফাউণ্ডেশন" নামে তার একটি সেবা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেখান থেকে ইতোমধ্যে তার রচিত বহু গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, সূফী সম্রাটের যুগন্তকারী অবদান, "আলাহ কোন পথে? মুক্তি কোন পথে? শান্তি কোন পথে? ওযীফা, সুলতানিয়া খাবনামা প্রভৃতি। তাছাড়া মাসিক আত্মারবাণী এবং সাপ্তাহিক দেওয়ানবাগ নামে দুটি পত্রিকাও বের হয়।

দেওয়ানবাগীর ভ্রান্ত চিন্তাধারা

(১) মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা জরুরী নয়। অথচ কুরআনে কারীমে (সূরা আলে ইমারান- ১৯) এসেছে-

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

অনত্র সূরায়ে আলে ইমরানে-৮৫ ইরশাদ হয়েছে,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

তদ্রুপ রাসূল ﷺ বলেন- لَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ اِلَّا اِتِّبَاعِىْ

(২) তিনি জান্নাত-জাহান্নাম হাশর-নশর, মিযান-পুলসিরাত ইত্যাদি অস্বীকার করেন। তিনি এসব সম্পর্কে এমন বিভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা অস্বীকার করার নামান্তর। যেমন, হুর বলতে মানুষের জীবাত্মা বা নফসকে বুঝায়। জাহান্নাম বলে আত্মার চিরস্থায়ী যন্ত্রণাদায়ক অবস্থাকে ইত্যাদি। এভাবে ঈমান-আকীদা সংশ্লিষ্ট বহু ব্যাপারে সে এমন এমন অলিক ব্যাখ্যা দিয়েছে, যেগুলো জরুরিয়াতে দ্বীনকে অস্বীকার কারার নামান্তর। অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতে মতে এ সবের ঈমান রাখার উপর সকলের ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ধরনের জরুরিয়াতে দ্বীনকে অস্বীকার করা কুফরী কাজ। আল্লামা সুবকী রহ. جَمْعُ الْجَوَامِعِ গ্রন্থে লিখেছেন, জরুরিয়াতে দ্বীন যার উপর ইজমা রয়েছে, তা অস্বীকারকারী একবাক্যে কাফির। তবে দেখতে হবে, তাদের বক্তব্য সরাসরি কুরআন সুন্নাহ-অস্বীকারমূলক মনগড়া ব্যাখ্যা নাকি তাবীল বা ব্যাখ্যার শর্তানুসারে নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা। তাহলে শরঈ নস মাফিক না হওয়ায় তারা কুফরীতে লিপ্ত হবে।

মাওলানা ইদ্রীস কান্দলবী রহ. বলেন, কোন জরুরিয়াতে দ্বীনের সুবিদিত ও প্রসিদ্ধ অর্থের বিপরীত ব্যাখ্যাও অস্বীকৃতির নামান্তর।

(৩) তিনি জন্মান্তর্বাদ বা পুনর্জন্মবাদের প্রবক্তা। এ প্রসঙ্গে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

(৪) তিনি হজ্ব করেননি। তার হজ্ব করার প্রয়োজন নেই। কারণ, তার জনৈক ভক্ত স্বপ্নযোগে রাসূলে কারীম ﷺ কে বলতে শুনেছে, তিনি বাবে রহমতে এসে বলছেন, আমি স্বয়ং আল্লাহর নবী মুহাম্মদ ﷺ সর্বক্ষণ তার সাথে আছি এবং থাকি; কাবা ঘরও তার সামনে আছে। তিনি আমার মুহাম্মদী ইসলামী ধর্ম প্রচার করছেন। তার হজ্ব করার প্রয়োজন নেই। বস্তুতঃ এখানে হজ্বকে অস্বীকার করা হয়েছে।

অথচ এটি ইসলামের পঞ্চম বুনিয়াদ ও স্তম্ভ। তা অস্বীকার করা সরাসরি কুফরী। এভাবে সে কুরআন-হাদীসের বহু অপব্যাখ্যা করেছে। যেমন, কুরআনে বর্ণিত হযরত আদম-হাওয়া আ. এর নিষিদ্ধ ফল খাওয়া প্রসঙ্গে তার ধৃষ্ঠতা এতই জঘন্য যে, সে বলে– এ ফল দ্বারা যদি গন্দম উদ্দেশ্য হয়, তবে অর্থ হবে, গমের আকৃতির মত নারীদের গোপন অংগ আর আঞ্জির ফল উদ্দেশ্য হলে অর্থ হবে, যৌবনা নারীর বক্ষযুগল বা স্তনদ্বয়। সুতরাং আদম-হাওয়ার ফল খাওয়ার অর্থ দাঁড়ায়, তাদের যৌনমিলন। জুমহূর উলামায়ে কিরামের পরিপন্থী এরূপ ব্যাখ্যাদাতাকে মুলহিদ ও যিন্দিক বলা হয়। অথচ তার এ জাতীয় অপব্যাখ্যার জুড়ি নেই। এতদসত্ত্বেও তার দাবী হচ্ছে,

(১) সে ইসলাম প্রচারক। তার মতবাদের বাইরে সারা বিশ্বে প্রচলিত ইসলাম এজেদী ইসলাম; তা এজেদী চক্রান্তের ফসল।

(২) আল্লাহই তাকে নূরে মুহাম্মাদীর ধারক-বাহক বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য সাপ্তাহিক দেওয়ানবাগ-১২/৩/৯৯ শুক্রবার)

(৩) সে নাকি সমকালের মুজাদ্দিদ, মহান সংস্কারক ও শ্রেষ্ঠতর অলিআল্লাহ। (আল্লাহ কোন পথে-১৩৭) ৩য় সংস্করণ, রাসূল সত্যি কি গীরব ছিলেন-১২)

তার এসব অলিক ও গাঁজাখোরী দাবী প্রমাণের জন্য তার ভক্তবৃন্দের বিভিন্ন স্বপ্নের প্রলাপ বকেছেন। অথচ বিশুদ্ধ কথা মতে স্বপ্ন কোন দলীল নয়। অবশ্য কোন কোন অজ্ঞ লোক আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাযি. এর আযানের বাক্য সম্পর্কিত স্বপ্ন দিয়ে আত্মপক্ষ প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তারা জানেন না যে, এখানে নিছক স্বপ্নই নয় বরং সে আযান রাসূলে কারীম ﷺ কর্তৃক সমর্থিত ও স্বীকৃত। নতুবা এর গ্রহণযোগতার কোন কারণ নেই।

শেষকথা হল, যত স্বপ্নের প্রলাপই বকা হোক না কেন, এতে তার বুযুর্গি প্রমাণ হবে না; বুযুর্গি প্রমাণ হবে ঈমান-আকীদা ও সহীহ আমলের মাধ্যেমে। সুতরাং দেওয়ানবাগীর মত যিন্দিক, মুলহিদ ও কুফরী আকীদা পোষণকারী লোক নিশ্চিত কখনই বুযুর্গ হতে পারে না।

রাজারবাগী পীরের চিন্তাধারা

কথিত এ পীরের নাম দিল্লুর রহমান। ৫নং আউটার সার্কুলার রোড, রাজাবাগ, ঢাকা- ১২১৭ মুহাম্মদীয়া জামিয়া শরীফ ও সুন্নতী জামে মসজিদ তার দরবার। তিনি নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার থানাধীন প্রভাকরী গ্রামের তাতী ও সূতা ব্যবসায়ী মরহুম মোখলেছুর রহমানের ৩য় পুত্র। তিনি লেখাপড়া করা কোন আলেম নন; একজন কলেজ শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্র। অবশ্য তিনি দাবী করেনে, তাকে ইলমে লাদুনী দান করা হয়েছে এবং তিনি বাহ্রুল উলূম বা জ্ঞানের সাগর। আরও দাবী করেন, তিনি সাধারণ কোন পীর নন বরং গাউসুল আযম ও আমীরুল মুমিনিনীন ফিত তাসাওউফ তথা তাসাওউফ জগতের সার্বোচ্চ নেতা। তার মুরীদানের মতে বড় পীর আব্দুল কাদীর জিলানীর চেয়ে তার মাকাম উর্ধ্বে। তিনি কোন পীর থেকে খেলাফত পাননি। তবে তিনি দাবী করেন, স্বয়ং আল্লাহ ও তার রাসূল তাকে খেলাফত প্রদান করেছেন। তিনি নিজের বুযুর্গী যাহির করার জন্য তিনটি পন্থা অবলম্বন করেছেন।

(১) নিজের নামের আগে-পিছে প্রায় ৫২টি উচ্চাঙ্গের বিশেষণ বা উপাধী জুড়ে দিয়েছেন। আজ পর্যন্ত উম্মতের কাউকে এ ধরনের খেতাবের বিশাল বহর নিজ নামের সাথে যুক্ত করতে দেখা যায়নি। তার দাবী মতে এ সব খেতাব স্বপ্নযোগে কিছু স্বয়ং আল্লাহ, কিছু স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ আর কিছু তরীকতের ইমাম বা পীর-আউলিয়াগণ তাকে দিয়েছেন।

অথচ শরী'আতে স্বপ্ন কোন হুজ্জত বা দলীল নয়। কাজেই স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত তার এসব খেতাব অবান্তর ও ভিত্তিহীন। তাছাড়া স্বঘোষিত এসব খেতাবের মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদ বহির্ভূত অনেক দাবীও এসে গেছে। যেমন, ইমামুস সিদ্দীকীন। অথচ এ সিদ্দীকীনের মধ্যে হযরত আবু বকর রাযি. ও রয়েছেন, যিনি মর্যাদায় সর্বসম্মতভাবে গোটা উম্মতের মধ্যে সকলের উর্ধ্বে। আর সাহাবা নন এমন ব্যক্তি, কখনও আদনা সাহাবার মর্যাদায়ও উপনীত হতে পারে না। কিন্তু অনায়েসেই দিল্লু সাহেব এমন স্বগোক্তি করতে পেরেছেন। আল– বাইয়িনাত পত্রিকায় লেখা হয়েছে– হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. বলেন– আমি উরূয করতে করতে

সিদ্দীকে আকবর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. এর মাকাম অতিক্রম করলাম। (নাউযুবিল্লাহ)

বলা বাহুল্য যে, হযরত মুজাদ্দিদ রহ. এমন কথা বলেছেন কিনা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। বস্তুতঃ এ সব বুযুর্গানে দ্বীন সম্পর্কে এ জাতীয় বেশ কিছু মিথ্যে কথা অতিভক্তের মাধ্যমে রটে গেছে, যার সত্যতা বেশ সংশয়পূর্ণ। অবশ্য এ উক্তির দ্বারা রাজারবাগীর আকীদা পরিষ্কার বোঝা যায়। অধিকন্তু তার খেতাবে বেয়াদবীও রয়েছে। যেমন, তিনি নিজেকে "হাবীবুল্লাহ" দাবী করেছেন। অথচ হাবীবুল্লাহ কেবল রাসূলে কারীম ﷺ। এটি তার চরম বেয়াদবী। নতুবা তিনি রাসূলের সমমর্যাদায় পৌঁছে যান, যা কুফরী পর্যায়ভুক্ত। (নাউযুবিল্লাহ)

তদ্রুপ তার খেতাবে কুফরীও রয়েছে। যেমন, কাইয়ূমুয যামান। অথচ এটি আল্লাহ গুণ। উক্ত খেতাবের অর্থ হবে, যুগের ধারক ও রক্ষক। এ কথা শুধুমাত্র আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; অন্য কারও ব্যাপারে নয়। কারণ, মাখলূক কাইয়ূম হতে পারে না বরং আব্দুল কাইয়ূম বা কাইয়ূমের গোলাম হতে পারে। সুতরাং মানুষের জন্য এ খেতাব ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে কুফরী কাজ। তাছাড়া এ সব যে তার চরম দাম্ভিকতা ও বাড়াবাড়ি, তা বলাই বাহুল্য।

(২) কথিত এ পীর আত্মপক্ষ প্রমাণে দ্বিতীয় পন্থা হিসেবে তার ভক্তবৃন্দের এবং নিজের নানা স্বপ্নের কথা উপস্থাপন করেন।

অথচ স্বতঃসিদ্ধ মতে স্বপ্ন কোন হুজ্জাত নয়। অপরদিকে তিনি নিজস্ব মাসিকী আল-বাইয়িনাত সম্পর্কে অতির নের শিকার হয়েছেন। বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি স্বীয় স্বপ্নের কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, নবীজী তাকে বলেছেন– তুমি বাইয়িনাত পড়! যারা এর বিরোধিতা করবে, তারা হালাক ও ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা ঈমানহারা হয়ে যাবে। অধিকন্তু রাজারবাগী তাদের বাইয়িনাত পত্রিকাকে "বাংলা ভাষায় কুরআন" বলার ধৃষ্ঠতাও দেখিয়েছেন। কবরেও নাকি বাইয়িনাত পড়তে দেওয়া হবে। (জুলাই-১৯৯৯)

অথচ কবরে পত্রিকা তো দূরের কথা কারও কুরআন পড়ার কথাও প্রমাণিত নয়। তবে হাদীসে পাকে মৃত্যুর পর কবরে নবীগণের নামায পড়ার কথা উল্লেখ আছে। তাছাড়া প্রকৃত অর্থে আল-বাইয়িনাত কুরআন সমতূল্য হওয়া তো দূরের কথা রূপকার্থেও কুরআন সমতূল্য বলা বড় হাস্যকর। তাছাড়া ঐ পত্রিকাটিতে দেশ বরেণ্য উলামায়ে কিরামের উপর যে সব অকথ্য গালিগালাজ ছাপা হয়, তা কোন শালীনতার আওতায় পড়ে না। অধিকন্তু গালিগালাজ করা ফাসেকী ও হারাম। হাদীসে পাকে এসেছে سباب المسلم فسوق "মুসলামানকে গালি দেওয়া ফাসেকী।" কুরআনে কারীমেও (সূরা আনআম-১০৮) গালিগালাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু দিল্লু সাহেব এ ধরনের হাস্যকর, অবাস্তব অশ্লীল সব কাজকর্ম অনায়েসে করে থাকেন।

(৩) নিজের বুযুর্গানে দ্বীনের প্রশংসায় অতি উচ্চমাত্রায় বাড়িবাড়ি করেছেন, বলেছেন– জ্ঞানীদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট। বুঝাতে চেয়েছেন, তার মধ্যেও বুযুর্গি রয়েছে। যেনম, মুজাদ্দিদ রহ. মাফতুবাত পাঠকালে কেউ নবী না হলেও তার নাম নবীর দফতরে থাকে। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহ. অনুমতিক্রমে চন্দ্রসূরুজ উদিত হয়; অস্ত যায়। (নাউযুবিল্লাহ) বর্তমান কালের সেই মুজাদ্দিদ হলেন দিল্লু সাহেব। (আল-বাইয়িনাত- জুলাই-১৯৯৯ ইং)

অথচ কেউ এ ধরনের খোদায়ী বিধানকে মানুষের ইচ্ছাধীন মনে করলে সে নিশ্চিত কাফির হয়ে যায়। কোন কোন কট্টরপন্থী শী'আও হযরত আলী রাযি. এর ব্যাপারে এরূপ মন্তব্য করেছিল। অর্থাৎ জগত পরিচালনার দায়িত্বভার আল্লাহ তা'আলা হযরত আলী রাযি. উপর ন্যস্ত করেছেন। এভাবে তাকে শী'আরা দ্বিতীয় খালেক বানিয়ে ছেড়েছে। উম্মত সেসব কট্টরপন্থীদেরকে কাফির সাব্যস্ত করেছে। তাছাড়া এই দিল্লু সাহেব জুমহূর উলামায়ে কিরামের বরখেলাফ গর্হিত কিছু মাসায়ালাও উদ্ভাবন করেছেন। যেমন, চারকুল্লি টুপি পড়া নবীজির খাস সুন্নাত। বিপদের সময় কনূতে নাযেলা পড়া জায়েয নয়। এতে নামায ফাসেদ হয়ে যায় প্রভৃতি। মোটকথা, দিল্লু সাহেব এবং তার ভক্তবৃন্দের মাঝে বহু গর্হিত ও হাস্যকর কর্মকাণ্ড এবং কুফরী আকীদা রয়েছে।

মাইজভাণ্ডারী পীরের চিন্তাধারা

মাইজভাণ্ডারী বলতে চট্টগ্রাম মাইজভাণ্ডার দরবারের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সৈয়দ আহমদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারীকে বুঝায়। তিনি মৌলভী সৈয়দ মতিউল্লাহ ও খাইরুন্নেসার ঔরসে ১লা মাঘ ১২৩৩ বাং মোতাবেক ১৮২৬ ইং সনে জন্মগ্রহণ করেন। আর ইন্তেকাল করেন ১০ই মাঘ ১৩১৩ বাং, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে মোতাবেক ২৭শে জিলকদ ১৩২৩ হিজরী সোমবার। পরবর্তীতে তার স্থলাভিষিক্ত হন তারই পৌত্র মাওলানা শাহ সূফী সৈয়দ দেলাওয়ার হুসাইন।

মাইজভাণ্ডারীর আকীদা-বিশ্বাসঃ

(১) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অর্থাৎ যে কোন ধর্মালম্বী লোকই স্বধর্মে থেকে মুরীদ হতে পারেন। মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আবশ্যকতা নেই। মাইজভাণ্ডার দরবার থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাবলিতে বিবৃত ঘটনাই এর সমর্থন করে। তাদের ভাষ্যমতে বিভিন্ন মতবাদের মত ও পথ ভিন্ন ভিন্ন হলেও গন্তব্যস্থল এক। আত্মপক্ষ সমর্থনে তারা কুরআনে কারীমের সূরায়ে বাকারা-৬২ নং আয়াত পেশ করেন। এমনকি ইচ্ছেমত ধর্ম গ্রহণের ব্যক্তি স্বাধীনতাও মানুষের আছে বলে মনে করেন। বেলায়েতে মুতলাকা-এপ্রিল-২০০১

অথচ আল্লাহর কাছে মনোনীত ধর্ম একমাত্র ইসলাম। এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। পূর্বেও এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্মালম্বী হওয়ার আবশ্যকতা বলাই বাহুল্য।

(২) বিশেষ পর্যায়ে শরী'আতের বিধান শিথিল হয়ে যায়। যেমন, বেলায়েতে মুতলাকা গ্রন্থে আছে, "শরী'আত নাছুস বা দৃশমান জগতের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং এ স্তরের লোকদের জন্য প্রযোজ্য।"

বেলায়েতে মুতলাকা-এপ্রিল ২০০১ ইং

মোটকথা, বিশেষ পর্যায়ে কামেল লোকদের জন্য নামায-রোযা ইত্যাদির হুকুম শিথিল হয়ে যায়। ফলে অনেক ভাণ্ডারীই বাতেনী নামাযের ধূয়া তুলে ফরয নামায ছেড়ে দেন। অধিকন্তু তাদের এ সব অলিক দাবীর আলোকে শরী'আত ও তরীকত ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার মতাদর্শও সুস্পষ্ট অনুমেয়। অর্থাৎ সর্বসাধারণের জন্য শরী'আত; কামেল লোকদের জন্য নয়। কেননা শরী'আতের অনেক জরুরী বিষয়ও তরীকতে জরুরী নয়।

অথচ শরী'আত-তরীকত আদৌ কোন ভিন্ন জিনিস নয় বরং তরীকাতের জন্য শরী'আত অপরিহার্য। এমনকি শরী'আত ছাড়া তরীকত অসম্ভব ব্যাপার। শরী'আত পালানের মাধমেই তারীকতে উচ্চস্তরে পৌছা যেতে পারে। এ ছাড়া তরীকত অর্জনের দাবী বাতুলতা বৈ কিছু নয়। আর ইবাদত-বন্দেগীর অপরিহার্যতা নিয়ে পিছনে আলোচনা করা হয়েছে।

(৩) তাদের ভাষ্য থেকে আরও বুঝা যায়, পীরের মধ্যে আল্লাহর সত্ত্বার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাদের পীর আল্লাহর প্রকাশ বা অবতার। এমনকি স্বয়ং খোদা। আরও বুঝা যায়, আল্লাহ আহাদ আর মাইজভাণ্ডারী আহমদ। এখানে কেবল একটি মীমের পার্থক্য। নতুবা আল্লাহ ও মাইজভাণ্ডারীর মাঝে কোনও ফারাক নেই।

(৪) হায়াত-মউতের ব্যাপারে পীরের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে। যেমন, জনৈক মাইজভাণ্ডারী সম্পর্কে কথিত আছে, সে রোগের আতিশয্যে অজ্ঞান হয়ে পড়লে দেখেতে পায়, আজরাইল তার বুকে চড়ে গলায় ছুরি চালাতে উদ্যত হয়েছে। তখন তার পীর ভাণ্ডারী সাহেব সেখানে হাজির হয়ে তার ছুরি ছিনিয়ে নেন এবং তাকে ফিরে যেতে বাধ্য করেন। (মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কারামত -জুলাই-২০০২ খ্রিঃ)

বস্তুতঃ এরা সর্বেশ্বেরবাদের আশ্রয় নিয়ে পীরকে খোদায়ী আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। ইতোপূর্বেও বলেছি, এ ধরনের কাজে লিপ্ত ব্যক্তিরা কুফরী করছে। তাদেরকে কাফির বলাই যথার্থ।

(৫) ভাণ্ডারীদের মতে তাদের পীর পরকালে তাদের নাজাতের ব্যবস্থা করবেন। মৃত্যু যন্ত্রণা দূরীভূত করবেন। কবরে-হাশরে আরামে ব্যবস্থা করবেন। আমলে ত্রুটি থাকলে উদ্ধার করবেন। অথচ এ সব নিতান্তই অজ্ঞতা ও গোমরাহী। ইতোপূর্বে আটরশীর আকীদা প্রসঙ্গে এগুলোর জবাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(৭) তাদের মতে গানবাদ্য জায়েয। এ প্রসঙ্গে পূর্বে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। মোটকথা, মাইজভাণ্ডারী ও তার ভক্তবৃন্ধরা অবলীলায় নানা ধরনের গোমরাহী প্রসারিত করে যাচ্ছে। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

রেজবী বা রেজাখানী মতাদর্শ

রেজবী বা রেজখানী বলতে আহমদ রেজাখানা বেরেলবীর অনুসারীদেরকে বুঝায়। তিনি বেরেলবী নামেও পরিচিতি। ১৪ই জুন ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতে বেরেলীতে তার জন্ম হয়। প্রকৃত নাম মুহাম্মদ, ওরফে আহমদ রেজা, আর স্বঘোষিত নাম আব্দুল মুস্তফা। কিন্তু তার ভক্ত-অনুচররা তাকে "আলা হযরত" নামে স্মরণ করে। পিতার নাম নাকী আলী। দাদার নাম রেজা আলী। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ভাইয়ের কাছে। রুক্ষ ও উগ্র মেজাজের এ লোকটির কলম ছিল খুবই ক্ষুরধার। গালি প্রদানে অত্যন্ত বে-পরোয়া ও পারঙ্গম। আজীবন নদুয়া ও দেওবন্দী উলামায়ে করামে বিরুদ্দে লেগেছিলেন। তাদেরকে কাফির ফাত্ওয়া দেওয়াই ছিল তার জীবন সাধনা। এতেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এমনকি হযরত কাসিম নানুতবী রহ. রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ.

প্রমূখ মহান বুযুর্গ সম্পর্কে বিদ্বেষের আতিশয্যে বলেন- এরা এমন কাফির, যে তাদের কাফির হওয়াতে সন্দেহ করবে তারাও নিশ্চিত কাফির ও জাহান্নামী।

পারিবারিক স্বচ্ছলতা হেতু নিজস্ব বই-পুস্তক প্রকাশে তাকে ভাবতে হত না। মক্কা-মদীনা পর্যন্ত তার ধৃষ্ঠতা ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানকার লোকেরা উর্দু জানত না। তথাপি সেখানকার লোকদেরকে আদা পড়িয়ে নিজের মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করায় এবং পূর্বোক্ত মনীষীদের বিরুদ্ধে লিখিত জাল ফাত্ওয়ায় তাদেরকে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়। অতঃপর উর্দূ ভাষায় দেশব্যাপী প্রচার করে।

ততদিন পর্যন্ত এদশের উলামায়ে কিরাম তার ফাত্ওয়ায় কর্ণপাত করতেন না। কিন্তু ১৩২৫ হিজরীর এ ঘটনায় তারা ভাবনায় পড়ে যান এবং অনেক ফিৎনায় জড়িয়ে পড়েন। অবশ্য রেজা খান দেশে ফেরার পর হারামাইনের উক্ত ফাত্ওয়ায় স্বাক্ষরকারী কতিপয় আলেম রেজাখানের প্রতারণার কথা জেনে যান। ফলে তারা বিভ্রান্তিকর ২৬টি ব্যাপারে দেওবন্দী ওলামায়ে কিরামের আকীদা জানার জন্য পত্র প্রেরণ করেন। এর জবাব লিখেন পাঠান হযরত খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ.। উক্ত জবাবে হারামাইনের উলামায়ে কিরাম নিশ্চিত হন যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামামতের আকীদা-বিশ্বাস তদনুরূপ। বিস্তারিত জানার জন্য المهند على المفند المعروف بالتصديقات لدفع التلبيات দেখা যেতে পারে। রোজাখানের লিখিত حسام الحرمين নামে খ্যাত উক্ত ফাত্ওয়া গ্রন্থের বিস্তারিত জবাবে হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. الشهاب الثاقب রচনা করেন। মুর্তূজা হাসান সাহেবের السحاب المدار গ্রন্থে এ সম্পর্কে বহু তাত্ত্বিক আলোচনা এসেছে। কিন্তু রেজাখান ও তার অনুচরদের প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা থেমে থাকেনি। এখনও রয়েছে।

দেওবন্দী উলামায়ে কিরামের ব্যাপারে তার এসব আপত্তি এবং বাড়াবাড়ি সম্পর্কে عقائد علماء ديوبند কিতাবটিও অতিগুরুত্বপূর্ণ। এখানে স্ববিস্তর আলোচনার অবকাশ নেই। কিন্তু কেন রেজাখান এসব করলেন, এর রহস্য আল্লাহ মালুম। তবে তার পেছনে ইংরেজদের যোগসাজশ ছিল বলে অনেকেই মনে করেন। তার কারণ কয়েকটি।

(১) রেজাখানের শিক্ষক ছিল গেলাম কাদিয়ানীর ভাই মির্জা গোলাম কাদের। আর কাদিয়ানী ছিল ইংরেজদের সেবাদাস ও তল্পিবাহক। সুতরাং দুজনই এক পরিবারের হওয়ায় তাদের মধ্যে যোগসূত্র থাকাটাই স্বাভাবিক।

(২) ভারতবর্ষে ইংরেজ দখলদারিত্বের এক পর্যায়ে শাহ আব্দুল আযীয রহ. ভারতকে "দারুল হরব" ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের উলামায়ে কিরাম একাত্বতা ঘোষণা করে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অথচ তথাকথিত রেজাখান সে সময় ভারতকে দারূল ইসলাম ফাত্ওয়া দেন। বলেন, আইম্মায়ে ছালাছার মতে আমাদের দেশ দারুল হরব নয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, একদিকে ইংরেজ আধিপত্যবাদীদের চরম বিরোধী উলামায়ে কিরামকে তিনি কাফির আখ্যা দিয়েছেন, অপরদিকে ইংরেজ সরকার যখন মুসলম ও দ্বীন-ইসলামের নাম-নিশানা মিটিয়ে দেওয়ার অব্যাহত চেষ্টা করছে। তখন তিনি স্বদেশকে দারুল ইসলাম বলছেন। এখানে কিভাবে যোগসূত্র নেই বলা যয়?

(৩) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হিন্দুস্তানে খেলাফত আন্দোলন চলাকালে সর্বস্তরের উলামায়ে কিরাম এক শিবিরে এসে দাঁড়ান। অথচ তখন তিনি ইসলামের পবিত্র ভূমি রক্ষায় এগিয়ে আসেন নি বরং উলামায়ে কিরামকে গান্ধি ফিরকা নামে অভিযুক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে কলমযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ১৩৪০ হিজরীতে তার ইন্তেকাল হয়। কিন্তু তার মিশন থেমে থাকেনি। মৌলভী নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী, মৌলভী আমজাদ আলী আজমগড়ি প্রমূখ তার মিশন নিয়ে এগিয়ে চলেন। আজও সে ধারা অব্যাহত। এ রেজভী গ্রুপের কাজ প্রধানতঃ দুটি।

(ক) নবীগণ ও অলী-আল্লাহদের প্রতি অতিভক্তি। (খ)এরা বিভিন্ন ধরনের রসম-রেওয়াজ ও
বিদ'আত-কুসংস্কারগুলোকে যঈফ বা দুর্বল এমনকি জাল-মওজু হাদীসের আশ্রয় নিয়ে জায়েয সাব্যস্ত করে। অধিকন্তু প্রতিপক্ষ উলামায়ে কিরামকে কথায় কথায় গালিগালাজ করে; কাফির বলে। তার এ লাগামহীনতার কারণে তাকে "তাকফীর পার্টি" বললেও অত্যুক্তি হবে না।

আমাদের দেশের রেজভী নামে পরিচিত গ্রুপটির অবস্থাও তাই। আহমদ রেজাখানের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে তারাও মুসলিম মিল্লাতের মাঝে ওহাবী-সুন্নীর বিবেধ সৃষ্টি করে, আমাদের হক্কালী উলামায়ে কিরামকে কথায় কথায় কাফির বলে। এামনকি তাদের ভাষ্যমতে ওহাবী সম্প্রদায় ও তাবলীগ জামাতের সঙ্গে উঠাবসা

খাওয়া-দাওয়াত, লেনদেন, আচার-অনুষ্ঠান, বিয়েশাদী, সমাজে থাকা, তাদেরকে সাহায্য করা, সালাম দেওয়া, সম্মান করা, মুসাফাহা করা, তাদের পিছনে নামায পড়া, তাদের সাথে সামাজিক কিংবা ধর্মীয় কোন আচার-অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া শক্ত গুনাহ; কুফরী। এমনকি যেসব সুন্নী মুসলমান না বুঝে তাবলীগ জামাতভূক্ত হয়েছেন, তাদের জন্য তাবলীগ জামাত ছেড়ে তাওবা করা ফরয।

(বর্তমান প্রচলিত তাবলীগের ইহিতাস– মাওঃ আকবর আলী)

তাদের মতে ওহাবী তাবলীগীদের আকীদা নিম্নরূপ ঃ

(১) আল্লাহ মিথ্য বলেছেন। (ফাত্ওয়ায়ে রশীদ আহমদ গঙ্গুহী।)

(২) নবীজীর ইলম থেকে শয়তানের ইলম বেশি। (বারাহিনে কাতিয়া)

অথচ এসব অভিযোগ কেবল অলীক-ভিত্তীহীনই নয় বরং হকপন্থী উলামায়ে কিরামের প্রতি তার বিদ্বেষ, তার গোমরাহী এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সদূর প্রসারী ষড়যন্ত্রকারীদের ও এজেন্ট এবং তাল্পবাহক হওয়ার বহিঃপ্রকাশও বটে।

বে-শরা পীর ফকীর

যেসব লোক নিজেদেরকে পীর-ফকীর-দরবেশ বলে দাবী করে। অথচ নামায পড়ে না, নাচ-গান করে, তারী-গাঁজা-মদ ইত্যাদি সেবন করে, পর্দার বিধান মানে না, যিকিরের আসর নামে নারী-পুরুষ অবাধে মাখামাখি ও যৌনাচারে লিপ্ত, কেউ কেউ মাথায় জট রাখে, উলঙ্গ থাকে, রংবেরংয়ের ছিঁড়েফাঁড়া শত তালিযুক্ত কাপড় পড়ে কিম্ভূৎকিমাকার হয়ে থাকে ইত্যাদি। এধরনের বাতিল পন্থায় যারা নিজের বুযুর্গি যাহির করতে চায়, বে-শরা পীর বলতে তাদেরকেই বুঝায়। এদের মধ্যে শরী'আত বিরোধী আকীদা-বিশ্বাসের অন্ত নেই।

(১) শরী'আত ও মারেফাত এক নয়। শরী'আত যাহেরী বিধি-বিধান আর মারেফাত বাতেনী বিধি-বিধান। শরী'আতে যা নাজায়েয মারেফাতে তা জায়েয। তাদের দাবী মতে তারা বাতেনী শরী'আতের উপর আমল করে।

জবাবঃ এরা দুটি শরী'আত দাঁড় করালেও কুরআন-হাদীসে এর কোন প্রমাণ নেই। অধিকন্তু শরী'আত থেকে তরীকত পৃথক করে নিলে প্রকারান্তরে শরী'আতকে রহিত করা হয়। এ জাতীয় লোকদেরকে যিন্দিক ও মুলহিদ বলা হয়। সহীহ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম কুরতুবী রহ. এর প্রদত্ত্ব ব্যাখ্যায় তাই ফুটে উঠে।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, কুরতবী-১১/২৮-২৯ ও ফাতহুল বারী-১/২৬৭)

(২) এদের কেউ কেউ বাতনী নামাযের প্রবক্তা। অথচ এটা ইসলাম বিরোধী সম্পূর্ণ কুফরী কথা। এ জাতীয় আকীদায় বিশ্বাসী লোক যিন্দিক ও কাফির। কারণ, শরী'আতে শারীরিক নামাযের কথা আছে; কালবী নামায নয়। রাসূল ﷺ শারীরিক নামাযই দেখিয়ে গেছেন। এ জগতে রাসূল ﷺ অপেক্ষা উর্ধ্বে আর কে আছে?

(৩) কলব ঠিক তো সব ঠিক। তাদের অনেকেই বলে, "মনের পর্দা বড় পর্দা, বাইরের পর্দা উঠিয়ে দে।" আরও বলে, কলব ঠিক থাকলে ইয়াকীন অর্জন হয়ে গেলে আর যাহেরী ইবাদত-বন্দেগীর প্রয়োজন নেই।

জবাব ঃ ইতোপূর্বে সুরেশ্বরী, আটরশী ও মাইজভাণ্ডারী পীরের আকীদা প্রসঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের আকীদাও এমনই ছিল।

(৪) কুরআনের ৩০ পারা যাহির আর ১০ পারা বাতিন। এ বাতেনী ১০ পারা বাতেনী পীর-ফকীরের সীনায় সীনায় চলে আসছে। কেউ কেউ বলে, মিরাজে রাসূলে কারীম ﷺ ৯০ হাজার কালাম লাভ করেছিলেন। তার ৩০ হাজার কালাম পেয়েছে আলেমরা আর ৬০ হাজার আছে এসব সূফী-ফকীরদের কাছে। তারা এসব সীনা বা-সীনা পেয়েছে।

জবাব ঃ ফকীররা এসব ইলম কিভাবে পেল? কে কাকে কখন কিভাবে শিক্ষা দিল? এর সনদ কি? সনদ ছাড়া দ্বীনের কোন কথাই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু তারা কখনও সনদ পেশ করতে পারবে না। অথচ ইবনে মুবারক রহ.(মুসলিম - ভূমিকা) বলেন, الاسناد من الدين لولا الاسناد لقال من شاء ماشاء

বস্তুতঃ এ চিন্তাধারা শী'আদের থেকে উদ্ভুত। মুনাফিক ধূর্ত আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার সফল চাতুর্যতা। সে তাদের মধ্যে প্রচার করেছির, নবীজী আহলে বাইত বিশেষতঃ হযরত আলী রাযি. বেশ কিছু গোপন তথ্য শিক্ষা দিয়েছেন, যা অপর কেউ জানে না। এরই সুবাধে সে নিজের মনগড়া তথ্যাবলি বাজারজাত করে। ফলে ধ্বংস হয়ে যায়

উম্মতের বিরাট এক জনগোষ্ঠী। অথচ কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

يَاأَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا انْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ سوره انعام

বিদায় হজ্বের ভাষণে লক্ষাধিক সাহাবায়ে কিরামের উপস্থিতিতে নবীজী বলেছেন,

اَلا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ اَلا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ اَلا هَلْ بَلَّغْتُ؟

তিনবার একই প্রশ্নের জবাবে সমবেত সাহাবাগণ একবাক্যে বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর নবীজি বললেন,

اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ - اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ - اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ

(৫) যিকিরের আসর নামে তারা পর্দার বিধান লঙ্ঘন করে। অবাধে নারী-পুরুষে ঢলাঢলি করে। বস্তুতঃ এটি পর্দাকে অস্বীকার করার নামান্তর।

অথচ কুরআনে কারীমে সূরায়ে নূর ৩১ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ

কাজেই গাইরে মাহরাম নারী-পুরুষে তাদের এই অবাধ মেলামেশা-ঢলাঢলি সুস্পষ্ট হারাম ও কুফরী।

(৬) তাদের মতে যে কোন পুরুষ যে কোন নারীকে ভোগ করতে পারে। এদের কেউ কেউ অবাধ যৌন মিলনকে সিদ্ধি লাভের সহায়ক মনে করে। তাদের মতে পঞ্চরস তাথা মলমূত্র, বীর্য, ঋতুর রক্ত ও শ্লেষ্মাই শক্তির আধার। নারী মিলনে পর নিঃসৃত বীর্য সেবনকে তারা রতি সেবন বলে। কেউ কেউ 'লাল সাধন' এবং 'গুটি সাধন'ও বলে। পরস্ত্রী মিলনে তাদের কেউ অসন্তোষ্ট প্রকাশ করে না। অধিকন্তু বলে অসন্তোষ প্রকাশ না করা আত্মশুদ্ধির প্রধান লক্ষণ! আরও বলে, নারী বহতা নদীর মত। ময়লা-আবর্জনা পড়লে নদী যেমন নাপাক হয় না, তদ্রুপ নারীর যোনীতে পরপুরুষের বীর্য-স্খলনে যোনী নাপাক হয় না। এমনকি তাদের মতে নারীরা গঙ্গাস্বরূপ। তাদের গিলন প্রত্যাশী পুরুষ স্নানপ্রার্থী তীর্থ যাত্রীর ন্যায়। আর গঙ্গা স্নানে তথা যৌন মিলনে কোন আপত্তি থাকতে পারে না।

তদ্রুপ নারী-পুরুষ মিলে নাচ-গান করলে কামরিপু দমন হয়। যেমন, পরস্ত্রী মিলনে হিংসা রিপু দমন হয়। অবাধ যৌনাচারে স্খলিত বীর্য ময়দায় মিলিয়ে রুটি বানিয়ে খায়। এর নাম দিয়েছে প্রেমভাজা। (নাউযুবিল্লাহ)

বস্তুতঃ এসব কথা বলে তারা যেনার বৈধতা দিতে দেয়েছে। অথচ সবই সুস্পষ্ট কুরআন বিরোধী এবং সর্বজন বিদিত হারাম। এ আকীদা রাখা কুফরী।

(৭) তাদের মতে নাচ-গান জায়েয।

অথচ এ ধরনের হারাম কাজ বৈধ মনে করা কুফরী। পূর্বেও এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

(৮) তাদের মতে খাঁজা খাওয়া জায়েয। কেবল তাই নয়। হায়েয-নেফাস, মলমূত্র-বীর্য ইত্যাদি খেলে তাদের মতে রিপু দমন হয়।

অথচ কুরআনের অকাট্য নছ দ্বারা এসব হারাম বলে প্রামাণিত। সূরা মায়েদা-৯০ তেও তাই বিবৃত হয়েছে।

(৯) তাদের মতে পীর ফকীরের মধ্যে আল্লাহর প্রকাশ ঘটে অর্থাৎ যিনি মুর্শিদ তিনিই খোদা। তাদের গান-কবিতায় এ সবের অহরহ ব্যবহার দেখা যায়।

অথচ এ ধরনের আকীদা নিশ্চিত শিরিক। আহলে সুন্নাত ওয়ার জামাতের মতে আল্লাহ তা'আলার সত্তা কারও সত্ত্বায় মিশ্রিত বা প্রবিষ্ঠ হয় না। অবশ্য খ্রিস্টানদের মতে আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আ.) এর সত্ত্বায়, হিন্দুদের মতে ইশ্বর মানুষপ্রাণী সব কিছুর মধ্যেই প্রবিষ্ঠ হন। কিন্তু এ সব সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও কুফরী আকীদা। পূর্বেও এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(১০) এমনকি তারা পীর-ফকীরকে খোদার উর্ধ্বে স্থান দেয়। যেমন, তারা বলে, খোদার ধন রাসূকে দিয়া খোদা গেলেন খালি হইয়া; রাসূলের ধন খাজাকে দিয়া, রাসূল গেলেন খালি হইয়া, --------- ইত্যাদি।

অথচ এগুলো যে কুফরী আকীদা, তার প্রমাণ পেশ করার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়াও এরা পীর বা পীরের কবরে সিজদা দেওয়া, মেয়েদের থেকে খেদমত নেওয়া, যিকিরের নামে মেয়ে নিয়ে ঢলাঢলি করাসহ বহু কুফরী আকীদা ও কাজে অভ্যস্ত।

বাউল গোষ্ঠী

"বাউল" শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, তা হল, কারও মতে এটি আরবী 'আউয়াল' শব্দ থেকে, কারও মতে বাউল্যা হতে বাউলা এরপর বাউল আর আউলিয়া হতে আউল্যা, এরপর আউলা এবং তা থেকে আউল শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। আবার কারও মতে ফার্সী "বা" এর সাথে "উল" যুক্ত হয়ে "বাউল" শব্দ তৈরী হয়েছে। যার অর্থ, যে ব্যক্তি সন্ধানের সাথে অথবা যে মনের মানুষের সন্ধানে আছে। আবার কেউ কেউ বলেন– সংস্কৃত শব্দ "বাতুল" (উন্মাদ) শব্দের প্রকৃতরূপ "বাউল" এবং হিন্দি শব্দ "বাউরা" (পাগলা) থেকে "বাউল" শব্দের উৎপত্তি। তবে তাদের ভাষ্য মতে বাউলরা পোশাক-আশাক, আচার-ব্যবহারে অন্যদের থেকে আলাদা; আপনভাবে মশগুল এবং উন্মাদ প্রকৃতির হয়ে থাকে, বিধায় তাদেরকে বাউল বলে। উভয় বাংলায় এরা (লালন অনুসারী) বেশরা ফকীর, নেড়ার ফকীর এবং কোথাও বাউল নামেও পরিচিত। এদের মধ্যে হিন্দু জাতের বাউলরা বৈষ্ণব, বৈষ্ণব-বাউল, বাউল-মোহান্ত ও বৈষ্ণব রসিক প্রভৃতি আর মুসলমান জাতের বাউলরা পীর, কতুব, সাঁই, ফকীর ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত।

বাউলাদের উত্থান ঃ

এদের উত্থান প্রসঙ্গে বাউল গবেষক ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টচার্য বলেন– মুসলমান নেড়ার বা বেশরা ফকীররাই এ ধর্মের আদি প্রবর্তক। আবার কারও মতে এদের আদি গুরু চৈতন্যদেব। কারও মতে আউল চাঁদ। কেউ কেউ মাধব বিবি ও আউল চাঁদের নামও নেন। ডঃ ভট্টার্যের মতে এ শ্রেণীর হিন্দু-মুসলিম সকল সাধকই বাউল। এদের উত্থান প্রায় ১০ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে।

এদের নীতি দর্শনঃ

বস্তুতঃ এরা হিন্দু-মুসলিম কোনও মতাদর্শের অনুসারী নয়। এদের মধ্যে রয়েছে নানা ধরনের মনগড়া নীতি-দর্শন ও স্বেচ্ছাচারিতা, যেগুলো কুফরী হওয়াই সুনিশ্চিত। যেমন,

(১) চারচন্দ্র ভেদ তথা শুক্রু, বর্জঃ, বিষ্ঠা ও মূত্র ভক্ষণ অর্থাৎ সিদ্ধি অর্জনে মল-মূত্র, বীর্য ও ঋতুস্রাব খাওয়া তথা চারচন্দ্র সাধানার গুরুত্ব অপরিসীম। এমনকি এরা বীর্যকে ইশ্বরও বলে। এজন্য এদেরকে কেউ কেউ বীর্যেশ্বরবাদী বলেন।

জবাবঃ ইসলামে এসব ভক্ষণ করা অকাট্য হারাম। আর হারামকে হালাল বললে ঈমান থাকে না। এ ধরনের হারাম পন্থায় আবার কি রকম সাধনা হয়, বোধগম্য নয়। বস্তুতঃ এ তাদের গাঁজাখোরী, মাতলামী ও আল্লাহর পরিচয়ের বিকৃতমাত্র। এভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করা অবিশ্বাসের নামান্তর। সুতরাং এ দর্শন ইসলাম পরিপন্থী ও ঈমান বিরোধী দর্শন।

(২) তাদের মতে আল্লাহ, অচিন পাখী, মনের মানুষ, আলোক সাঁই সবই সমার্থক শব্দ। আত্মসাধনের মাধ্যমে তারা কথিত এ মনের মানুষকে সন্ধান করে। "মনে মানুষ" অর্থও গোলমেলে। কারও মতে নূরে মুহাম্মাদী আবার কারও মতে স্বয়ং আল্লাহ। কেননা তিনি মানব অন্তরে সমাহিত হন। মোটকথা, ইসলামী আকীদা মতে নূরে মুহাম্মাদী ও আল্লাহ এক নয়। তিনি মানুষও নন। তিনি স্থান-কাল সবকিছুর উর্ধ্বে ভিন্ন এক সত্ত্বা; উত্তম গুণের আধার। কাজেই তাদের কথিত "মনের মানুষ" সন্ধান মানে আল্লাহকে সন্ধান করা নয়।

(৩) আলাহ-রাসূল ﷺ একই সত্ত্বা। এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যেমন, ভাণ্ডারীদের মতে আহাদ আর আহমদে কেবল মীমের পার্থক্য। এরকম আকীদার জবাব পেছনে গেছে। বিধায় পুনরাবৃত্তি করা হল না।

(৪) এরা আলাহ ও পীরের মধ্যেও কোন পার্থক্য করে না। যেমন, কথিত আছে "যেহি মুর্শিদ সেহি খোদা।" তাদের এ ধ্যান-ধারণাকে মুর্শিদতত্ত্ব, পীরতত্ত্ব বা গুরুতত্ত্বও বলে। পেছেনে এর জবাব বর্ণিত হয়েছে। তদুপরি জানা দরকার যে, এরা "ফানা ফিল্লাহ", অজুহাতে আলাহ ও পীরকে একাকার কারার লক্ষ্যে মনসূর হাল্লাজ প্রমুখের মজযূব জযবার হালতের কিছু উদ্ধৃতি টেনে আপনা মতলব হাসিলের বৃথা চেষ্টা করে। অথচ "ফানা ফিল্লা" মানে সবই আল্লাহ হয়ে যাওয়া নয় বরং সব কিছু আল্লাহর জন্য হয়ে যাওয়া। এদুভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। তাছাড়া মাজযূবের জযবার হালতের কোন কথা শরঈ দলীল নয়।

(৫) সকল ধর্মের সার সমন্বয় সাধন করা, একাকার করে দেওয়া। কারণ, সব ধর্মের মূলকথা আত্মার মুক্তি। এ বাণী সমূহের সমন্বয়েই সৃষ্টি হয়েছে বাউল মতবাদ। ফলে তারা আল্লাহ-রাসূলের নাম নিলেও একই মুখে রাম.

নারায়ণ, প্রমুখকে ইশ্বর বা ইশ্বরের অবতার বলে। আল্লাহকে পাওয়ার সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথ অবলম্বন করে। এজন্য বাউল গানে যে কোন ধর্মের সংমিশ্রণ ও স্তুতি দেখা যায়।

অথচ সূরায়ে আলে ইমরান-৮৫ সহ একাধিক আয়াতে কারীমা ও হাদীস শরীফে এসবের তীব্র নিন্দা ও নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে। কাজেই এনায়েতপুরী ও ভাণ্ডারী মতবাদের মত এটিও একটি কুফরী মতবাদ। ইতোপূর্বে এর জবাব আলোচিত হয়েছে।

(৬) তারা অহী নির্ভর কোন ধর্ম মানে না। কারণ, এর ভিত্তি চেতনা। এরা সম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী নয়। দেশ-জাত-বর্ণ নির্বিশেষে কেবল মানুষকে মানতে ও শ্রদ্ধা জানাতে চায়।

জবাব ঃ বস্তুতঃ সব ধর্মকে একাকার বা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা থেকেই এদের এ চেতনার উৎপত্তি। এটি একটি কুফরী আকীদা।

(৭) এরা বৈরাগ্যতা, সংসারধর্ম ছেড়ে নিষ্ক্রিয়তাও জীবন-বিমুখতায় বিশ্বাসী।

অথচ ইসলামে এ ধরনের সন্নাসবাদ ও সংসারত্যাগী হয়ে থাকা অনুমোদিত নয়। হাদীসে এসেছে, আমাদেরকে সন্নাসবাদ বা বৈরাগ্যতার বিধান দেওয়া হয় নি। (আহমদ ও ইবনে মাজাহ)

(৮) মারফতী, মুর্শিদী বা বাউল গান, দেহ তত্ত্বের গান এক কথায় সঙ্গীত সাধনাই তাদের প্রধান কাজ। এসব গানে সব ধর্মের কথাই থাকে। লালন (ফকীর) শাহ এজন্য বিখ্যাত। গঙ্গারাম, শিখা ভূঁইমালী, কাঙ্গালী ও সিরাজসাঁই প্রমুখের নামাও উল্লেখযোগ্য। রবি ঠাকুরও এধারার গান কম লিখেননি।

গানের নিষিদ্ধতা ও হারাম হওয়া সম্পর্কে পূর্বে বেশ আলোচনা হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য। এছাড়া তাদের প্রেমতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, আত্মিক বিবর্তনবাদ প্রভৃতি বহু কুফরী দর্শন রয়েছে।

সর্বেশ্বরবাদ

"সব কিছুই খোদা' এরই নাম সর্বেশ্বরবাদ বা সর্বখোদাবাদ। ইংরেজিতে প্যান্‌থিইজম (অর্থাৎ Pan= All- সব, Theo=God-ইশ্বর।) আরবীতে وحدة الوجود (আস্তিত্বের একক) কিংবা সমগ্র বিশ্বই খোদা –এ মতবাদ। কাজেই বলা হয়, স্রষ্টার বাইরে কোন সৃষ্টির অস্তিত্ব নেই। তিনিই (আল্লাহ) সব কিছু। স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক, অভিন্ন অস্তিত্ব। সূফীগণের পরিভাষায় তাওহীদ, আইনিয়্যাত, মাযহারিয়্যাত ইত্যাদি এরই বিভিন্ন শিরোনাম।

এ মতবাদের প্রথম প্রবক্তা উবনুল আরাবী। এ প্রসঙ্গে বলেন– وجود المخلوقات عين وجود الخالق

" সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্ব হুবহু স্রষ্টার (আল্লাহর) অস্তিত্ব"

নাবলূসী এর ব্যাখ্যায় বলেন– আল্লাহই একমাত্র অস্তিত্ববান সত্তা অর্থাৎ তিনি অন্যের দ্বারা অস্তিত্ববান নন বরং স্বকীয় সত্ত্বায় অস্তিত্ববান। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলিমগণ এ মতের সমর্থন করেন নি। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. সেই সঙ্গে আরেকটি পরিভাষা وحدة الشهود (অস্তিত্ববান জিনিসের মধ্যে কেবল একটি সত্ত্বার প্রতি দৃষ্টিপাত করা)-ও যোগ করেছেন। কিন্তু মুহাক্কিক উলামায়ে কিরামের মতে وحدة الوجود এর শাব্দিক অর্থ নয়, রূপক অর্থ তথা আল্লাহর অস্তিত্ব পূর্ণাঙ্গতর; পক্ষান্তরে অন্যান্য যাবতীয় বস্তুর অস্তিত্ব নেতিবাচক বা নাস্তি পর্যায়ে ধরা। যেমন, সাধারণ বাগধারায় পূর্ণাঙ্গ বস্তুর বিপরীতে অপূর্ণাঙ্গ বস্তুকে অস্তিত্বহীন ধরা হয়। উদাহরণতঃ বীর শার্দুলের সামনে জীর্ণশীর্ণ দুবলের ক্ষেত্রে "এতো কিছুই নয়" বলা হল।

তদ্রুপ সুফীগণ (রূপকভাবে) আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ অস্তিত্বের সামনে মাখলূকের অস্তিত্ব নেই সাব্যস্ত করেন। হযরত শেখ সাদী রহ. এর চমৎকার উপমা দিয়ে বলেছেন,–তুমি হয়ত দেখে থাকবে, রাতের আঁধারে মাঠ-প্রান্তরে জোনাকী জ্বলে, কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করল– হে রাতের আলোর প্রদীপ জোনাকী! তোমাকে দিনের বেলায় দেখা যায় না কেন? উত্তরে জোনাকী বলল– আমি তো দিন-রাত মাঠেই থাকি; অন্য কোথাও থাকি না। কিন্তু সূর্যের সামনে আমি প্রকাশ হতে পারি না। (যেন সূর্যের সামনে আমি অস্তিত্বহীন। তাই দিনের বেলায় দেখা যায় না।)

তদ্রুপ আরেকটি উদাহরণে দেখা যায়, "বৈখাশে এক ফোঁটা বৃষ্টি সমূদ্রে পড়ে লজ্জায় বলে, সমুদ্রে এক ফোঁটা বৃষ্টি আমি আর কি! আমি তো অস্তিত্বহীন।"

এরূপ রূপক অর্থেই সকল অস্তিত্ববান জিসিসগুলোকে আল্লাহর মোকাবেলায় অস্তিত্বহীন বলা হয়েছে। বস্তুতঃ পরিভাষায় এরই নাম وحدة الوجود (ওয়াহদাতুল উজূদ)। অদ্রুপ আইনিয়্যাত শব্দটিও রূপকভাবে মোখাপেক্ষীতার অর্থে ব্যবহৃত। এ অর্থে মাখলূকই স্রষ্টা অর্থাৎ তার মোখাপেক্ষী। শুধুমাত্র আরিফ ব্যক্তির জন্যই এর ব্যবহার বৈধ।

অধিকন্তু আরিফ ব্যক্তিকে মারেফাতে এতধিক বিভোর থাকতে হবে, যেন তার নিজের সত্ত্বার প্রতিও দৃষ্টি না থাকে।

আবার কখনও কখনও এ পরিভাষা দুটি সালেকের দুটি অবস্থা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। তখন নিমগ্নতা, যা শরী'আত ও বিবেক বিবৃত পার্থক্য জ্ঞানকে বিলুপ্ত করে দেয়। নতুবা সালেক জানতে পারে, সব কিছু কোন এক দৃষ্টিকোণে এক হলেও মূল দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন। সালেকের এ স্তরের নামই وحدة الشهود ।

আবার কখনও এ পরিভাষা দুটি বস্তুর হাকীকত বা প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অভিজ্ঞান অর্জন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়। ফলে কেউ কেউ অনাদি ও নশ্বর (قديم وحادث) প্রসঙ্গে এসে জগতের সব কিছুকেই আরয বা আপতন মনে করেছেন। যা ভিন্ন আরেকটি সত্ত্বায় কেন্দ্রীভূত হয়। যেমন, মোম দিয়ে ঘোড়া ইত্যাদি বানানো হল। আবার কেউ বলেছেন, জগত আল্লাহর নাম ও গুণাগুণের প্রতিষ্ঠান। যেমন, অক্ষমতার আয়নায় ক্ষমতার আলো প্রতিবিম্বিত হয়। মোটকথা, প্রথমটি وحدة الوجود আর দ্বিতীয়টি وحدة الشهود বলে গণ্য।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, فيصلئه وحدة الوجود والشهود)

পক্ষান্তরে ভাণ্ডারী, এনায়েতপুরী ও আটরশীদের মত কিছু অজ্ঞ, গোমরাহী এবং তাদের ভক্তকবৃন্দরা وحدة الوجود। পরিভাষাটিকে শাব্দিক অর্থে নিয়ে পীরকে খোদার স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। এ সব জাহেলদের ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য মাশায়েখগণ وحدة الوجود এর পরিবর্তে وحدة الشهود পরিভষাটি ব্যবহার করাকে নিরাপদ বলেছেন। কেননা এ ক্ষেত্রে অস্তিত্ববান জিনিসের মধ্য হতে একটির প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ থাকে মাত্র।

আবার কোন কোন ইংরেজী পড়ুয়া কথিত দার্শনিক একে সর্বেশ্বরবাদ বুঝে মন্তব্য করেছেন– একেশ্বরবাদ নয়; সর্বেশ্বরবাদই ইসলামমের সূফী দর্শন। এরা সংঘার্ষিক দুটি বিষয়কে একাকার করে দিয়েছে। বস্তুতঃ একেশ্বরবাদ ও সর্বেশ্বরবাদ আদৌ এক নয়। কারণ, একাত্মবাদে স্রষ্টার অস্তিত্বকে সৃষ্টির অস্তিত্ব থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র মানা হয়। পক্ষান্তরে সর্বেশ্বরবাদে বলা হয়, স্রষ্টা ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব নেই। জগতে খোদা ছাড়া ভিন্ন কিছুই নেই। মহাবিশ্বের সবই তার সঙ্গে লীন হয়ে আছে; কারও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। ফলে তিনি (খোদা) হয়ে যান এক নৈর্ব্যক্তিক সত্ত্বা। তাঁর জ্ঞান প্রভৃতি কিছুই থাকে না। অথচ ইসলাম এসবে তার একচ্ছত্রতা প্রমাণ করেছে। মোটকথা, সেসব অশিক্ষিত মতলববাজদের সর্বেশ্বরবাদ কোন অবস্থাতেই ইসলামের মতবাদ হতে পারে না। যেসব সূফীয়ায়ে কিরাম وحودة الوجود পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন, তারা আমাদের পূর্বোক্ত সঠিক ও রূপক অর্থ হিসেবেই করেছেন। আবার কেউ কেউ ওয়াহদাতুল উজূদ –সর্বেশ্বরবাদ ও অদ্বৈতবাদকে সমান্তরাল ভেবেছেন। কোন কোন হিন্দু মনে করে বিশ্বই ব্রক্ষ্মা। এরকম মতবাদই অদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। অথচ হিন্দু ধর্মে ব্রক্ষ্মই আসল প্রভূ কিনা তা অস্পষ্ট। বিষ্ণু, মহেশ্বর দেবতাও তার প্রতিদ্বন্ধী। কাজেই وحدة الوجود আর অদ্বৈতবাদ আদৌ এক নয়।

এন, জি, ও

'এনজিও (N, G, O) কথাটি একটি দীর্ঘ বাক্যের সংক্ষিপ্তরূপ। পুরো কথাটি হল, Non government Organization তথা বেসরকারী সংস্থা। শাব্দিক অর্থে সব ধরনের বেসরকারী সংস্থাগুলোকেই এন, জি, ও বলা যায়। আর সাংবিধানিক অর্থে এনজিও বলা হয়, মুনাফার উদ্দেশ্য ছাড়া কেবল সেবার উদ্দেশ্যে গঠিত বেসরকারী সংস্থাকে। উদাহরণতঃ যে সংস্থাগুলো বেসরকারীভাবে অর্থ সংগ্রহ করতঃ তা নিরক্ষরতা দূরীকরণ, কর্মসংস্থান, প্রাকৃতিক দূর্যোগে শিশু ও মাতৃসেবা দান, সমাজ উন্নয়ন, ও ঋণ বিতরণ ইত্যাদি সেবামূলক কাজে ব্যয় করে।

এসব কাজের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই মূলতঃ বাংলাদেশ সরকার অন্যান্য দেশের মত দেশী-বিদেশী এনজিওগুলোকে এদেশে কাজ করার অনুমতি দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে এনজিওগুলো প্রতিশ্রুতি মত শুধু সেবামূলক কাজেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তারা (বিশেষভাবে খৃষ্টান এন, জি, ও গুলো) সেবার ছদ্মাবরণে এদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের কৃষ্টি কালচার, রীতিনীতি ও ধর্মীয় অনুভূতিতে চরমভাবে আঘাত হানছে। গ্রাম বাংলার পারিবারিক ও সমাজ ব্যবস্থাকে ক্রমেই ধ্বংস করছে। এখানেই থেমে নেই। এমনকি জাতীয় অর্থনীতি এবং রাজনীতিতেও হস্তক্ষেপ শুরু করেছে।

বিভিন্ন তথ্য সূত্রে জানা যায় বর্তমানে অনুমোদিত ও অননুমোদিত অরেজিস্ট্রীকৃত দেশী-বিদেশী ইসলামী ও অনৈসলামিক সব মিলে ত্রিশ হাজার এন,জি,ও এদেশে কার্যরত রয়েছে। তন্মধ্যে ২২/১১/০৩ ইং সন পর্যন্ত রেজিস্ট্রীকৃত বিদেশী এন, জি, ও এর সংখ্যা ১৮০ টি। আর দেশী এন, জি, ও এর সংখ্যা ১৬৪৩টি। সর্বমোট ১৮২৩ টি। উল্লেখযোগ্য কতিপয় দেশী-বিদেশী এনজিও নাম নিম্নরূপঃ

দেশী	বিদেশী
(১) কেয়ার (CARE)	(১) ব্রাক (BRAC)
(২) আর, ডি, আর এস (RDRS)	(২) প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র।
(৩) এম, সি, সি (MCC)	(৩) কারিতাস।
(৪) এডরা (ADRA)	(৪) সি, সি, যি, বি।
(৫) কনসার্ন (CONCERN)	(৫) নিজেরা করি।
(৬) ওয়ার্ল্ড বিশন অব বাংলাদেশ।	(৬) গণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র।
(৭) সেভ দি চিলড্রেন ফাণ্ড (ইউ কে)	(৭) হীড বাংলাদেশ
(৮) সেভ দি চিলড্রেন ফাণ্ড (ইউ, এস, এ)	(৮) কুমিল্লা প্রশিকা
(৯) ডিয়া কোনিয়া	(৯) আশা
(১০) অক্সফাম (OXFAM)	(১০) ডি এইচ এস এস এস
(১১) এ্যাকশন এইড	(১১) বি, এ, ভি এস
(১২) সুইডিশ ফ্রি মিশন	(১২) এডাব
(১৩) আইডিয়াস ইন্টারন্যাশনাল	(১৩) ইউসেফ
(১৪) সাউথ এশিয়া পার্টনারশীপ	(১৪) সপ্তগ্রাম নারী স্বনির্ভর
(১৫) ইউ, এস, সি সি, বি	(১৫) বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি
(১৬) ফ্যমিলিজ ফর চিলড্রেন	(১৬) ওয়াই এস, সি এ
(১৭) অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি	(১৭) বাঁচতে শেখা
(১৮) ই, ডি এস	(১৮) উন্নয়ন সহযোগী টীম
(১৯) টি, ডি, এইচ (T. D. H) সুইজারল্যাণ্ড	(১৯) সি, ডিস এস
(২০) রাড্ডা বারনেন।	(২০) রাড্ডা বারনেন।

উল্লেখযোগ্য কিছু ইসলামী সেবা সংস্থাও রয়েছে। তবে এখানে কেবল পাশ্চাত্য ভাবধারার বিদেশী এবং পাশ্চাত্যের মদদপুষ্ট দেশীয় সেসব এনজিও সম্পর্কে আলোচনা করব, যেগুলো সেবার ছদ্মাবরণে অর্থনৈতিক শোষণ, ধর্মান্তরীত করণ এবং সমাজ ধ্বংস করণের মত জঘন্য কাজেও লিপ্ত।

এনজিওদের আগমণ ঃ

১৯৭১ সালে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। কিন্তু দীর্ঘদিন যুদ্ধের ফলে গোটাদেশ তখন একটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল। নূন্যতম মানবিক চাহিদা পরনের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এবং চিকিৎসার চরম অভাব দেখা দেয়। চতুর্দিকে হাহাকার পড়ে যায়। দেশের এহেন সংকটপূর্ণ মুহূর্তে মানুষের দরিদ্রতা ও দুরাবস্থার অজুহাতে ধূর্ত ও মতলবাজ এনজিওগুলো সেবার আকর্ষণীয় মোড়ক জড়িয়ে বাংলার বুকে এসে আস্তানা গাঁড়ে।

এমনিভাবে ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ, ১৯৮৮ সালে সর্বনাশা বন্যা, ১৯৯১ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণি ঝড়, ১৯৯৮ সালের দীর্ঘস্থায়ী সর্বগ্রাসী বন্যার সময়সহ দেশের চরম দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তগুলোতে এনজিওদের অতি উৎসাহ নিয়ে এ দেশে এসেছে। কিন্তু অল্প দিনেই তাদের আসল স্বরূপ জাতির উলামা ও সচেতন মহলের সামনে ধরা পড়ে যায়। তখন থেকেই উলামায়ে কিরাম এবং সচেতন মহল সরকার ও জাতিকে এনজিওদের অপতৎপরতা সম্পর্কে সতর্ক করে আসছেন।

খ্রিস্টান মিশনারীগণ ১৫১৭ সালে প্রাকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের আকর সুজলা সুফলা এ বাংলার বুকে সর্বপ্রথম প্রবেশ করে। এর একশত তেত্রিশ বছর পর তারা তাদের স্বজাতি খ্রিস্টান বণিকদেরকে এদেশে নিয়ে আসে।

এরপর থেকে দুদলে মিলে বাংলার হিন্দু, মুসলমানের মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টিসহ বিভিন্ন ধরনের শোষণ ও লুণ্ঠন চালায়। ১৭৫৭ সালে এসে আমাদের সার্বভৌম সত্ত্বাকে পদদলিত করে। দীর্ঘদিন দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ থাকার পর একটি বৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠী ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৬১ ও ১৯৭০ সালে সেই খ্রিস্টান মিশনারীগণ বাংলার হিন্দু মুসলমানকে খ্রিস্টান বানানোর দূরভিসন্ধি নিয়ে এনজিওদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আবার এ দেশে আগমন করে। তাই সার্বিক দিক বিবেচনায় দেখা যায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে এনজিওদের গভীর মিল রয়েছে। কেবল শ্লোগান ভিন্ন; অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য এক।

নিম্নে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে এনজিওদের অপতৎপরতার সংক্ষিপ্ত চিত্র পেশ করা হল।

সামাজিক ক্ষেত্রে এনজিওদের অপতৎপরতা ঃ

দীর্ঘদিন ধরে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা আমাদের গ্রাম বাংলার পারিবারিক এবং দাম্পত্য জীবন ছিল এনজিওদের দূরভিসন্ধি তথা সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে খ্রিস্টান বানানোর ক্ষেত্রে প্রধান বাঁধা। ফলে এরা আমাদের পরিবারিক ব্যবস্থা এবং দাম্পত্য সম্পর্ক ধ্বংস করার জন্য আদাজল খেয়ে মাঠে নামে। লক্ষ লক্ষ পুরুষ বেকার ও কর্মহীন থাকা সত্ত্বেও নারী সমাজকে সাবলম্বী করার ছুঁতা দেখিয়ে আমাদের কোমল মতি নারীদেরকে হাট বাজারে যতসামান্য মজুরীতে হাড় ভাঙ্গা খাটুনির কাজে লাগাচ্ছে। কোথাও কোথাও এনজিও কর্মকর্তাদের সেবা ও মনতুষ্টির মত পাপ কাজে ব্যবহার করছে। এভাবে এনজিওগুলো মহিলাদেরকে স্বামী থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। কোথাও কোথাও এনজিওদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে স্ত্রীরা স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অফিসে গিয়ে এনজিও কর্মকর্তাদের সাথে ফস্টিনষ্টি পর্যন্ত করে। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর দামপত্যকলহ। উপরন্তু এনজিও সংস্থাগুলো মহিলাদেরকে 'কিসের বর কিসের ঘর' 'ঘরের ভিতর থাকব না স্বামীর কথা মানব না', 'আমার মন আমার দেহ, যাকে খুশি তাকে দেব', এরূপ জঘন্য যৌন উদ্দীপক শ্লোগান শিখিয়ে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং অবাধ যৌনাচারিতার দিকে ধাবিত করছে। 'স্বামী স্ত্রীকে লাঠি দিয়ে প্রহার করছে' এ ধরনের উদ্ভট চিত্র সম্বলিত পোষ্টার, ফেস্টুন দেখিয়ে এবং নারী নির্যাতনের কল্প-কাহিনী শুনিয়ে স্ত্রীদেরকে স্বামীর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলছে। পরিণামে অহরহ বিবাহ বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে অসংখ্য সুখের সংসার ভেঙ্গে যাচ্ছে। এভাবে আমাদের সামাজিক ভারসাম্যতা ক্রমেই ভেড়ে পড়ছে। অপরদিকে এনজিওরা তালাক প্রাপ্তা মহিলাদেরকে 'ফ্রি লিগেল এইড' দিয়। যদ্দরুন নারীরা এখন স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে ভয় পায় না। এভাবেই নারীরা খ্রিস্টানদের খপ্পরে পড়ে ধর্মচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। অনেকে নিজেদেরকে রঙ্গিন করছে পশ্চিমা জীবন সভ্যতায়।

অর্থনৈতিক শোষণ ঃ

এ সংস্থাগুলো অর্থনৈতিক সাহায্যের আদলে মূলতঃ অর্থনৈতিক শোষণ চালাচ্ছে। ২০% থেকে ৬০% এমনকি কোন কোন সংস্থা ২২৬% ও ২০০% পর্যন্ত উচ্চ হারে সুদে অর্থ লগ্নী করে। তারা এ সুদ দৈনিক ও সাপ্তাহিক উসূল পদ্ধতিতে সংগ্রহ করে। এ সর্বনাশা সুদী ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে অনেক পরিবার ভিটে-বাড়ী থেকেও উচ্ছেদ হয়েছে। অনেকে তাদের অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়ে ক্ষোভে দুঃখে বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। কখনও নিরুপায় হয়ে কোলের সন্তান বিক্রি করেও অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছে বহু লোক। এভাবে আমাদের সমাজ জীবনে চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে। তাই বিভিন্ন সমীক্ষার রিপোর্ট অনুসারে পরিস্কার বলা যায়, দারিদ্র বিমোচনের পরিবর্তে এনজিওগুলোর কারণে উল্টো দরিদ্রতা আরও চরমভাবে সমাজকে গ্রাস করে নিচ্ছে।

রাজনৈতিক অপতৎপরতা ঃ

এনজিওগুলো মূলতঃ অনুমোদন পায় সাহায্য-সহযোগীতার নামে। সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা সাংবিধানিকভাবে তাদের জন্য নিষিদ্ধ। কিন্তু বর্তমানে বিদেশী খ্রিস্টান মিশনারীদের মদদপুষ্ট এনজিওগুলো শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিগত সাধারণ নির্বাচনগুলোতে দেখা গেছে, এনজিওগুলো রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করে তাদের স্বার্থ রক্ষাকারী প্রার্থীকে বে-আইনিভাবে প্রচুর অর্থ এবং ভোট ব্যবসা করে। বলা বাহুল্য যে, এভাবে যথেষ্ট সংখ্যক এনজিও সমর্থক প্রার্থী বিভিন্ন সময় শীর্ষ স্থানীয় তিনটি

দলের টিকিটে সংসদ সদস্য হয়েছে। তাছাড়া বিদেশী এনজিওগুলো তৃণমূল পর্যায়ে শতকরা ৪৪ ভাগ গ্রামে তাদের সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছে। উপজেলা পরিষদ নিবাচনে তারা প্রকাশ্যে অংশগ্রহণ করছে। তারা ৪০০ প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল। তার মাঝে ১০ জন মহিলা নির্বাচিতও হয়েছেন। এছাড়াও এনজিও নিয়ন্ত্রিত ভূমিহীন সমিতির অনেক মহিলা ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বর নির্বাচিত হয়েছেন। এরা শুধু নির্বাচন কালেই নয় বরং প্রত্যেকটি রাজনৈতিক ইস্যুতেই তারা কোন না কোনভাবে নগ্ন হস্তক্ষেপ করে থাকে। যা আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য মারাত্মক হুমকী স্বরূপ।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে এনজিওদের অপতৎপরতা ঃ

এনজিওগুলো অন্যান্য ক্ষেত্রের মত ধর্মীয় ক্ষেত্রেও আশঙ্কাজনকভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। মুসলমানদেরকে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার লক্ষ্যে তারা বহু রকমের অপকৌশল গ্রহণ করছে। শিক্ষা প্রদানের নামে এনজিও তারা কোমলমতি শিশুদের মগজ ধোলাই করছে। শিশুদের মনে ঢুকিয়ে দিচ্ছে 'ইসলাম' ও 'আল্লাহ' সম্পর্কে বিভ্রান্তির বীজ। এভাবে আমাদের আগামী প্রজন্মকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করে দিচ্ছে। অপর দিকে শক্তিশালী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জোরেসোরে সারা বাংলায় ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে ন্যাক্কারজনক প্রোপাগাণ্ডা ও তথ্য সন্ত্রাস চালাচ্ছে। তারা গ্রাম বাংলার সরলপ্রাণ মুসলমান ভাইদের কাছে বলছে 'মুসলমান মানেই দরিদ্র আর খ্রিস্টান মানেই ধনবান।' তারা মানুষকে ধর্মবিমূখ ও ধর্মহীন করার জন্য নানা কৌশল গ্রহণ করেছে। এমনকি শুক্রবারের নামাযসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায না পড়ার উপদেশ দেয়। তারা পর্দা ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী, পর্দা অগ্রগতির অন্তরায় বলে মেয়েদের শিক্ষা দেয়। (দৈনিক ইনকিলাব)

আরও বলে "মুহাম্মদ অপেক্ষা ঈসা বড়।" 'মুহাম্মদ ﷺ এর শাফা'আত করার অধিকার নেই।" 'ইসলামের ইতিহাস হত্যা ও ধ্বংসের কাহিনী' ইত্যাদি।

এছাড়া খ্রিস্টান মিশনারীরা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের অপব্যাখ্যা সম্বলিত বইপত্র দেশের পল্লী অঞ্চল পর্যন্ত বিনামূল্যে বিতরণ করছে। এসব পুস্তকের মূল কথা হল– "ইসলামের নবী শান্তির দূত নন বরং তিনি একজন যোদ্ধা। ইসলাম মানবতার মুক্তি দিতে পারে না। পরকালে ও কোন নিশ্চয়তা দিতে পারে না। পক্ষান্তরে খ্রিস্টধর্ম দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ বিধান করে।" এভাবে স্বরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে নানা প্রতারণার ধূম্রজালে ফেলে খ্রিস্টান বানানোর সকল অপকৌশল গ্রহণ করেছে। আজ অনেক নিষ্ঠাবান মুসলমানও খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছে।[১]

ধর্মীয় ক্ষেত্রে এনজিওদের অনাসৃষ্টির একটি দৃষ্টান্ত হল, তারা "জজ মেজিস্ট্রেট থাকে ঘরে, মোল্লা এখন বিচার করে"–এ ধরনের কটুক্তিমূলক চরম আপত্তিকর শ্লোগান সম্বলিত পোষ্টার, প্লাকাড, ব্যানার দিয়ে মহিলাদেরকে আলেম সমাজের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। আজ এনজিওদের কার্যক্রম গোটা দেশব্যাপী। "এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ২.৫৫ গ্রামে একটি করে এন, জি, ও ।" তাই তাদের দুস্কৃতি ও অপতৎপরতার পরিধিও সর্বত্র বিস্তৃত। এ অল্প পরিসরে লিখে তা শেষ করা যাবে না।[২]

---

১. উল্লেখ্য যে, খ্রিস্টান এনজিও মিশনারীদের বিশ বছরের প্রচেষ্টায় ১৯৯২ সন পর্যন্ত খ্রিস্টান জনসংখ্যা বেড়ে পঞ্চাশ লাখে উন্নীত হয়েছে। তাদের টার্গেট ছিল ২০০০ সাল নাগাদ জন সংখ্যা এক কোটিতে উন্নীত করা, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক॥

২. তথ্যসূত্র ঃ বাংলাদেশ এনজিও উপনিবেশবাদের দুর্ভেদ্য জালে– মুহাম্মদ নূরুযযামান। এনজিওদের ষড়যন্ত্রের কবলে বাংলাদেশ– মুহাম্মদ এনামুল হক জালালাবাদী॥